মহাকালের ঘোড়া

[দ্বিতীয় খণ্ড]

প্রফুল্ল কুমার সিংহ

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৬০ ॥ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক
তপন দে
৩ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রাকর
সমরেন্দ্র মণ্ডল
দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা ৭০০০০৬

পরিবেষক
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : সন্দীপন ভট্টাচার্য

ভূমিকা

ইতিহাস বলতে রাজতন্ত্রের যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্যবাদ, উত্থান পতন, স্থাপত্যকলা, রাজা রাণীর প্রণয় কাহিনী ও দু'একজন বাইজীর বাজুবন্ধে যুদ্ধবাজ সেনাপতির আত্মসমর্পণের প্রতি আমরা যতটা আগ্রহী; অগণিত ব্যর্থ ও বঞ্চিত কর্মযোগী এবং লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানবাত্মার প্রতি ততটাই নিস্পৃহ।

ম্যান ও মেসিনারি নিয়ে যে শিল্পজগৎ সেই রুক্ষ কর্কশ পটভূমির বিচিত্র কুশীলব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সমাজের বিবর্তন নিয়ে আট দশটি উপন্যাসে কয়লাকুঠির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার যে মাস্টার প্ল্যান মহাকালের ঘোড়া— প্রথম খণ্ড থেকে তার সূত্রপাত।

আসানসোল

প্রফুল্ল কুমার সিংহ

মহাকালের ঘোড়া

কয়লাকুঠির শ্রমিক ভাইবোনদের

এক

ইসাবেলা পিটের পুলিচাকা বন্ বন্ করে ঘোরে। সর্ সর্ করে ডুলি নামে। হরদম লোল হাবিস [ওঠানামা] খালি টব গাড়ি খাদে নামে। কয়লা বোঝাই টব গাড়ি উপরে উঠে আসে।

পাশাপাশি দু-খানা চানকে অনবরত একই প্রক্রিয়া চলছে দিনে ও রাতে। রবিবারটা ছুটির দিন। সেদিন টব গাড়ির লোল হাবিস হয় না। কিন্তু লোকজন ওঠানামা করে।

বয়লার ফার্ণেসে হরদম আগুন গন্ গন্ করে। ইটের তৈরি আকাশ ছোঁয়া চিমনি দিয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরোয়। সেই ধোঁয়া নীল আকাশের বুকে ঝাপসা কালো ছাপ দিয়ে প্রতিনিয়ত কত না ছবি এঁকে যায়। শিল্প বিপ্লবের ছবি, মানুষের ঘামঝরা গায়ের ছবি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছবি। সেই ছবির মর্ম যে জানে সেই বোঝে কতটা কয়লা পুড়ে কত তাপ উৎপন্ন হয়। তার ক্ষমতায় কত অশ্বশক্তির যন্ত্রদানব অবলীলায় টেনে আনে ধরিত্রীর গর্ভাশয়ে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ধনরাশি। প্রকট হয়ে ওঠে রক্ত মাংস, পাপ-ঘৃণা-লোভ ও রিরংসার ছবি।

কোল ইজ দ্যা কমপ্যাক্ট ষ্ট্রাটিফায়েড মাস অফ মামীফায়েড প্ল্যাণ্টস। স্তূপীকৃত উদ্ভিদের স্তরীভূত শিলার নাম কয়লা। অজয়, দামোদর, গঙ্গা, গোদাবরীর বিস্তীর্ণ অববাহিকায় যার থাক থাক সজ্জা। গণ্ডোয়ানা ডিপোজিশন।

ব্যারাকলউ সাহেবদের মগজ থেকে বেরিয়ে আসে ধরিত্রীর সেই গর্ভাশয় বিদীর্ণ করার নতুন নতুন কৌশল, নতুন নতুন সিঁদ কাঠি। যার হাতে যেটি দরকার তার হাতে সেটি ধরিয়ে দিয়ে তালিম দেন। মানুষ চলে যন্ত্রের তালে তালে। জীবন ও জীবিকার অমোঘ প্রয়োজনে।

শিল্প বিপ্লবের দামামা বাজে নগরে বন্দরে, অরণ্যে প্রান্তরে। একদা চষা-মাটা, চাষীর চোখের সবুজ স্বপ্ন, অনাবৃত মাঠ ঘাট কালো কালো কয়লায় ভরে যায়। কালো কালো মানুষের দল সাদা চামড়ার সাহেবদের হাত তুলে সেলাম দেয়। দাঁতে করে খুঁটে নেয় পেটের ভাত, গায়ের কাপড়। সাহেবদের ঠাঠ চলে আর বাট চলে কুলিকামিনের রক্তে ধোয়া পথের উপর।

ছয়মাস ছুটি কাটিয়ে মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর স্থইট হোম থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আরো একটি সাহেব। তরতাজা জোয়ান। কটা চামড়া। নীল চোখ। লম্বা চওড়া বলবান যুবক। নাম—পিটার জোন্স।

কয়লা কুঠির আদিপুরুষ মিঃ জোন্সের কেউ হবেন বোধ হয়। কিন্তু মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর প্রতি অনেক আশা পোষণ করেন। আপাতত, চার বছরের চুক্তিতে পানমোহরার ম্যানেজার করে নিয়ে এসেছেন। তারপরে হয়ত মিস্ সিসিল ব্যারাকলউয়ের পাণিগ্রহণও করতে পারেন।

সিসিলের এখন টিন্ এজ চলছে। এই সময়ে পড়াশুনা, খেলাধূলা ও নাচ-গানের সঙ্গে বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে আমোদ স্ফূর্তি করার বয়স। এখুনি কি বিয়ে দেওয়া যায়? তবে যে জীবনের সূচনা পর্বেই সব খোয়াব বরবাদ। টিন এজ তো জীবনে দুবার আসে না। কাজেই এ ব্যাপারে কোন প্রস্তাবনা এখনো হয়নি।

উনি ডার্বিশায়ারের ছেলে। মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে এসেছেন। এখন পানমোহরার ম্যানেজার হবেন। ক্রমে ক্রমে গাতখরিয়া ও দেউলটি যখন খোলা হবে তখন গ্রুপ ম্যানেজারে প্রমোশন পাবেন। তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

ব্যারাকলউ সাহেব আগে থেকেই মালিক, ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ারের বাংলো তৈরি করিয়ে রেখেছেন। অতএব তাঁর থাকার কোন অসুবিধে নেই। ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ সহ নতুন বাংলোতে ঢুকে পড়লেই হল।

এবার তাঁর জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যেমন লোকজন। দারোয়ান, আর্দালী, বাবুর্চি, খানসামা, সহিস, কচোয়ান, ধোবী, মালি ও মুচি না হলেই চলে না। তবে সবচেয়ে যেটা বড় প্রয়োজন তা একটা যুবতী আয়ার। ব্যাচিলার মানুষ। ভোগবিলাসের স্বর্ণময় জগৎ থেকে আসছেন তাঁর জন্য ন্যূনতম চাহিদাটুকু মেটাতে হবে বৈকি! রোটি কাপড়া উর মকানের মত এসেনসিয়েল কমোডিটি।

ওহ্! তখনকার মালিকরা ম্যানেজারদের জন্য কত দরদ দিয়ে ভাবতেন হে!

ছুটে এলেন মিছির বাবু। তাঁর সঙ্গে জয়গোপাল। শক্ত সমর্থ ছোকরা। পানমোহরার শুরু থেকেই সে ওঁর মুনশী।

বিগলিত ভঙ্গিতে সাহেবকে সেলাম দিলেন। ওঁর ছুটি কাটাবার সময় ওঁরা যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কলিয়ারীর যাবতীয় কাজকর্ম ঠিক ঠাক করেছেন সেজন্য সাহেব ধন্যবাদ দিলেন। জয়গোপালের কাজের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

তারপর হুকুম হল—আমি অবিলম্বে রেলওয়ে সাইডিং লাইন চালু করে কয়লা বিক্রী করতে চাই, দিন রাত্রি ডিপোতে পড়ে থেকে কাজ করার মত কম-পক্ষে পঞ্চাশজন কুলিকামিন হাজির কর।

সাহেবের হুকুম মানেই কাজ। তাতে টালবাহানা চলে না। সেদিন রাত্রেই জয় রওনা হল কুলিকামিন সংগ্রহ করতে।

কাজটি অত সহজ নয়। আপন আপন দেশগাঁয়ে কুলিকামিনরা ভূমিদাস। বণ্ডেড লেবার। জমিদার, জোতদার ও মহাজনরা জানতে পারলে জয়ের মত মুনশীকে জ্যান্ত কবর দেবে। তবে সে মিছিরবাবুর সঙ্গে যাতায়াত করে ঘাঁৎ ঘোঁৎ শিখেছে। তাই জামুই, সেকেন্দ্রা, লক্ষীসরাই অঞ্চল থেকে দালাল ও ফড়ে লাগিয়ে জন পঞ্চাশেক কুলিকামিন সংগ্রহ করল। রাত্রে ট্রেনে চড়ে বেলা দুপুর নাগাদ সীতারামপুর ষ্টেশনে নামল। পুকুর ঘাটে স্নান করে কিছু ছাতু মুড়ি আহার। তারপর পদযাত্রা।

আগে আগে জয়গোপাল। পিছনে বাঁক কাঁধে, মোটরি গাঠরি ও বাচ্চা বুতরু কোলে কুলিকামিনের দল। সবারই পিছনে চাপরাশি। যেন ভেড়ার পাল চড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সে যুগে তার চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করা হত না। সাহেবদের কাছে ভেড়ার মাংসের সঙ্গে কি তফাৎ? একটাকে রান্না করে খাওয়া হয়, অন্যটাকে জ্যান্ত চুষে।

কাঠ,বাঁশ, খড় দিয়ে খোলা আশমানের নীচে রুখু ডাঙার জমি দেখিয়ে দিল। সবাই আপন আপন পরিবার নিয়ে চেঁছে ছুলে জমি তৈরি করল, ঘর তৈরি করল, উনুন পাতল। কয়লা কুঠির কালো যবনিকায় শুরু হল ওদের আহার, নিদ্রা, মৈথুন এবং হাড়ভাঙা খাটুনির নূতন জীবনযাত্রা।

মিছিরবাবু রোজ আসেন। নানকু দুশাদের বউ চিলিকে দেখে ভাবেন এতো বাঘের ভয়ে পালিয়ে ঘোগের ঘরে বাসা হল। যে সব রসিকরা আছে তারা চটকে কাদা করে দেবে। তার চেয়ে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করাই ভাল। পাঁচ ভূতের ভয় থাকবে না। তাই একদিন জয়কে বলল—নানকু আর উয়ার জানানাকে সাহেব কোঠিতে লিয়ে যাবি বেটা। সৎ নারাণকে সাথ লিবি। উ সাহেবকে বলিয়ে দিবে।

ব্যাপারটা জয়ের কাছে ধোঁয়াশা। কিন্তু মিছিরবাবুর হুকুম। তাই সন্ধ্যাকালে সাহেব বাংলোতে ফিরে আসার পর সত্যনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে একজোড়া কবুতরের মত কুলিকামিন সাহেব বরাবর দাখিল করল। সাহেব তখন ওদের দিকে অতটা মনোযোগী ছিলেন না। জয়কেই বললেন—ওয়েল ডান মাই বয়। এই নাও বকশিশ।

সাহেব ওর দিকে একটি রূপোর টাকা ছুঁড়ে দিলেন। লেবার রিক্রুট-মেণ্টের বকশিশ। জয় ওঁকে সেলাম দিল।

সত্যনারায়ণ সাহেবকে বলল—হুজুর। মিছিরবাবু বলিয়েছেন—ইস্নে আওরৎকে হাপনি একবার দেখিয়ে লিবেন। উসকে বাদ যো ভি হুকুম হোবে।

সাহেব তৎক্ষণাৎ এই ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে বললেন —ইউ উওম্যান! কাম হিয়ার।

সত্যনারায়ণ বলল —যাও। নজদিক যাও। সাহেব তোকে বুলাইতেছেন।

চিনির আর পা চলে না। যেন দশমন ভারী। সাহেব বাংলোয় ঢুকতে ঢুকতেই তো বুকে শিল-নোড়া চলছিল। সাহেবকে দেখে আক্কেল গুড়ুম। ভয়ে, বিস্ময়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। যেন হাড় কাঁপিয়ে বাত-শিরার জ্বর এসেছে। সত্যনারায়ণের কোন কথাই ওর কানে যায়নি। ঘোমটাটা বুক অবধি টেনে নিল।

কিন্তু অন্তর্বাসহীন আটহাতী কাপড়ে খলবলে দেহাতী যৌবন ঢাকা পড়বার নয়। সাহেব দেখলেন বন্য সৌন্দর্যের নিউ ভ্যারাইটিজ। বললেন —অলরাইট! আমি বুঝেছি সি ইজ ওয়াইল্ড বিউটি। ওর পক্ষে ঝোড়া বইবার কাজ করা সম্ভব নয়।

সত্যনারায়ণ বলল —জী হুজুর।

—ওকে আমার বাংলোয় আয়ার কাজে লাগিয়ে দাও। ওর হাজব্যাণ্ডকে কোন ভালো কাজ দিও। আই মীন তদারকীর কাজ।

—জী হুজুর।

—আচ্ছা যাও। কাল ওকে পাঠিয়ে দিও। বাট নাইসলী ড্রেসড। নট ইন স্থা ম্যানার অফ ওপেনিং ব্রেস্টস। ও. কে.।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। জয় সাহেবকে সেলাম দিয়ে ফিরতি পথ ধরল। বাংলোর গেট পার হয়ে সত্যনারায়ণ বলল —তোর কপাল খুলে গেল রে নানকু। সাহেবের নজর পড়েছে। আবার কি?

নানকু জিজ্ঞাসা করল —আয়ার কাজ কি বাবু? কি করতে হবে?

—কি আবার? বসে বসে পান চিবুবে আর ড্রেসপেণ্ট করবে। চুক চুক করে মহুয়া খাবে আর ফস্ ফস্ করে বিড়ি টানবে।

জয় কথাটা ঘুরিয়ে দিল —না না। ওসব কিছু নয়। সাহেবের এত বড় বাংলো। তা ঝাড়ু দিয়ে সাফ-সুতরো করা, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা এই-সব। আবার কি? খুব ভাল কাজ। কত মেয়ে ঐ কাজ পাবার জন্য মাথা ঠুকে মরে।

তা ঠিক। মাথা ঠুকে মরবার কাজ বৈকি! ন্যাড়া বাঁধতে হলে বড় গাছেই বাঁধা ভাল।

নানকু তো কয়লা-কুঠির হাল-হকিকত জানে না। সে রাজি হয়ে গেল। বিশেষ তাদেরকে ঝোড়া বইবার কাজ করতে হবে না—এটা কি কম কথা হল?

চিনি-চামেলী —ছলনা-বঞ্চনা —ভাবিনী-রাগিনীরা সাহেব বাংলোর খাস

কামরায় ঢুকে প্রথমে যেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল চিলিও কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে? তা নয়। সে বেবাক ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সাত সকালে জয়গোপাল ওর জন্যে নতুন সায়া, শাড়ি, ব্লাউজ এনে দিল। তাই পরে কেমন আহ্লাদিত মনে ও সাহেব বাংলোতে আয়ার কাজ করতে গেল। আকাট মুখ্যু কাঠ আহাম্মক নানকু তুশাদ তার বৌকে সাহেব বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে গেল।

পুরনো আয়া চিলিকে আদর করে পান খাওয়াল। ফুলান সাবান দিল স্নান করতে। রুক্ষ চুলে খুশবু তেল দিয়ে খোঁপা বেঁধে দিল। চোখে সুর্মা ও কানে আতর গুঁজে দিল। কাঁসা, পিতল ও রূপোর গয়নায় গা ভরে দিল। আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল —ছাখ তো এবার চিনতে পারিস কিনা?

চিলি সত্যিই নিজেকে চিনতে পারছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল —হয়তো বা ওর শরীরে কোন জিন পরী ভর করেছে। না হলে গা থেকে এত সুবাস বেরুচ্ছে কি করে? নাকের পাটায় নোলক দুললে বুকের ভিতরে গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকে কেন? এত কিসের প্রস্তুতি?

নারীর সহজাত বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। দুনিয়ার সর্বত্রই হরিসিংবাবু। তবে রকমটার ফারাক আছে।

ফাটা পায়ে আলতার রঙে রক্তের লালিমা। জোয়ার বাজরা খাওয়া পেটে চিকেন রাইস। ঘাম জবজবে গায়ে ফুলান তেল সাবানের মৃদু সৌরভ। মেহনতী নারী শ্রমিকের টানটান মাংসপেশী আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে। নৈবেদ্যের নাড়ুটির মত ধরধর ভঙ্গিতে দাঁড়ায় ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে। সারা অঙ্গে ঠিকরে পড়ে আলো। একটু একটু করে সাজানো-গোছানো শরীরটা অবলীলায় ভেঙে পড়ে এক মূর্তিমান লালসার সামনে।

পানমোহরা সাইডিংয়ে যেদিন প্রথম ওয়াগন লাগল সেদিন তো রীতিমত ভোজ। রেল কোম্পানির পাইলট ইঞ্জিন হস্ হস্ শব্দে পাঁচখানা ওয়াগন ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসে বাফারে ঠেকিয়ে দিল। মিঃ ব্যারাকলউ সাইডিংয়ে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে স্বাস্থ্যপান করলেন মিঃ জোন্সের সঙ্গে। সত্যনারায়ণ, জয়গোপাল, বাসু সাহেব সেই প্রসাদ ভক্ষণ করেই স্খলিতপদ। কুলি-কামিনদের তেড়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল ওয়াগন বোঝাই করার জন্য।

সাহেব খুব খুশি। বললেন —এক সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক বিশ ওয়াগন বোঝাই করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি কাস্টোমার ঠিক করে রেখেছি।

[সে আর বেশী কথা কী? পঞ্চাশজন কুলিকামিন তো আছে। তারা

দিনরাত কাজ করবে। বাল-বাচ্চা বিবিবেগম নিয়ে কয়লার ডিপোতে পড়ে থাকবে। ওরা তো মানুষ নয় ভেড়া।

সেই ভেড়ার পালের সরদার হল নানকু দুশাদ। চিলির যৌবন বন্যায় সাহেবের এত মন মজেছে যে একমাসের মধ্যে একটা আনপোড় আদমীকে সরদার বানিয়ে দিলেন। একেই বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ। ওঁর শুভদৃষ্টি পড়লে আদমী বনতেও যতক্ষণ, কু-দৃষ্টি পড়লে পড়তেও ততক্ষণ। মন-মর্জির ব্যাপার।

জয়গোপালের মাথার উপর তাঁরই বরাভয় মুদ্রা।

সহাস্যে বলেন —বহুত কামাল কিয়া বাবু। লড় যাও।

জয় সেলাম দিয়ে বলে —ইয়েস স্যার।

এই জয়গোপাল ফুটফাট ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করে। হাতের লেখা ঝর-ঝরে পরিষ্কার। বানান ভুল হয় না। হিসেব নিকেশে পাকা। কথাবার্তায় চৌকশ। অথচ তার বিদ্যার দৌড় মোহিত মাস্টারের পাঠশালা পর্যন্ত। পনের ষোল বছর বয়সেই জীবিকার অন্বেষণে দাস্যবৃত্তি শুরু করেছে। পাঁচ ছয় বছর যাবৎ মিছির গোমস্তার খিদমৎ খাটতে খাটতে জীবনের সবচেয়ে জরুরী পাঠ—পয়সাকড়ির হিসেব ও উপরওলার মন জোগানোর কৌশল হাতে কলমে শিখেছে। খাটতে পারে গাধার মত। বুদ্ধিটি ক্ষুরধার। তার পক্ষে জীবনের কোন পাঠই অনায়ত্ত থাকতে পারে না।

মোহিত মাস্টারের পাঠশালায় সে যেমন সেরা পড়ুয়া ছিল মিছির গোমস্তার তাঁবেতেও সে তেমনি সেরা মুন্‌শী। উনি ওর উপর কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।

ব্যারাকলউ সাহেবও আজকাল ওকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন। সব কাজেই ওর ডাক পড়ে। প্রত্যেকদিন সাতসকালে লোকজন বিলিব্যবস্থা করে ও সাহেবকে সেলাম দিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব কখনো কখনো খুশি হলে টাকাটা সিকিটা বকশিশ ছুঁড়ে দেন। বশংবদ ভৃত্যের মত জয় তা গ্রহণ করে সেলাম দেয়। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার বলে।

মিছিরবাবু ওকে তারিফ করে বলেন - বাঃ বেটা। সাহেব তোর উপর বহুত খুশ্। ঠিক ঠিক কাম করিয়ে যা রূপেয়া কামাবার বহুত রাস্তা পাবি]

জয় জান লড়িয়ে দেয়। তার বাপ খাদের একসিডেণ্টে মরেছে। সতী-সাবিত্রীর মত অহল্যা পিসী হারিয়ে গেছে। একপাল ভাই-বোন, মা ও সৎ মা নিয়ে এক বিরাট সংসার মাথার উপর জগদ্দল পাথরের মত বসে আছে। ঘরে বাইরে দারিদ্র্যের ভয়াল ভ্রূকুটি। এ সময়ে বাঁচতে হলে লড়তে হবে। লড়তে হলে শিখতে হবে। অন্তত ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় লেখাপড়া ও কথাবার্তা। চলতে থাকে একলব্যের সাধনা।

নিশুতি রাতে লক্ষ বাতি জ্বলে। কালো শীষ উগরে হলুদ শিখা লক্ লক্ করে। চারিদিক নিস্তব্ধ। থেকে থেকে ভেসে আসে পানমোহরায় স্টিম ইঞ্জিন চলার হস্ হস্ শব্দ। জয়গোপাল নিবিষ্ট মনে পড়ে ইংরেজী গ্রামার ও ট্রানশ্লেসন। কখনো বা সুদকষা ও ক্ষেত্রফলের অঙ্ক। মতিলাল শীলের বাংলা ধারাপাত ওর মুখস্থ। তেমনি কণ্ঠস্থ শুভঙ্করের আর্যা।

ওরই মধ্যে যদি পানমোহরা সাইডিংয়ে ওয়াগন বোঝাইয়ের কাজ রাত্রে থাকত তবে সে ছুটে যেত। আবার ইঞ্জিনের শব্দেও কান থাকত। সে ছন্দ কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পিট টপে গিয়ে হাজির। দরকার হলে খাদেও।

ওর জীবনে দিনরাত্রির বিশেষ ফারাক ছিল না। ঘুমোত কুকুরের মত। কাজ সারত নিঃশব্দে। সাহেব অন্ত প্রাণ। সাহেবের সুখেই সুখী। জীবন পাঠের এত শিক্ষা ও পেয়েছে দারিদ্র্যের জ্বালায়।

দুই

ঢালু দাস তো বারো মেসে মাতাল। সাহেবদের এঁটো চেটেই দিন যায়। যখন তখন লাথি জুতো খায়। তখন তার গায়ে মালিশ করতে তেল ধার করতে যায় চিনি, চামেলী বা বঞ্চনার ঘরে। তাদেরও সেই একদশা। দারিদ্র্য দোষে শতগুণ নাশে। কেউ বা দু'ফোঁটা তেল দেয় তো লাখ কথা শোনায়।

গোউর নিতাই জবা পারুল চারটি তো নিজের পেটের সন্তান আর একটি আছে সতীন কাঁটা। তার নাম মনসা রাম। সব অপোগণ্ড খাবার বেলায় এক কাঁড়ি চালের ভাত। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। সে একা কত জোগাবে? তারও তো ভাঙা গতর। ঠেলেঠুলে চালাতে হয়। বাবুদের পায়ে তেল দিয়ে রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়ার কয়লা সারাদিনে এক টব গাড়ি বোঝাই করে।

ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে গোউর সালুঞ্জী গাঁয়ের এক চাষীর ঘরে গরু রাখালীর কাজ পেল। নিতাইকেও ভর্তি করে দিল একটা দোকানে এঁটোকাঁটা ধোয়ার কাজে।

কিন্তু মনসারামটি যে রাজপুত্র। কি তার রূপ! ঐটুকু ছেলে উদোম ধুমধুমে হয়ে ধুলোবালিতে খেলে বেড়ায়। মাথায় চুলে জট বাঁধে, নীল চোখ দুটি টল্ টল্ করে। ক্ষিদে লাগলে মুখ শুকিয়ে আমসী। বড় মায়া লাগে ওকে দেখলে।

ঐ বয়সেই তার মনে অভাবের বোধ এসে গেছিল। একদা হ্যাট কোট পরে যে শিশুটি ছিল দস্যি দামাল, সারা বিবিবাথান কম্পমান করে রাখতো, সেই একটু বয়স বাড়লে ক্ষুধাকে জয় করার চেষ্টায় হয়ে গেল অন্যরকম। দুরন্ত ছেলের ভিতর বাহির টগ্ বগ্ করে ফুটে।

[ছলনা সারা দিনরাতে একবারই রান্না করত।

সন্ধ্যানাগাদ খাদ থেকে উঠে বিবিবাঁধে স্নান করে ধাওড়ায় ফিরত। মাটির উনুনে কয়লার আঁচ দিত। একই সময়ে প্রায় সব ঘরেই উনুনের আঁচ পড়ত। ফলত ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত সারা পাড়া। খড় ও খোলার চালের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার আকাশ মার্গে নিষ্ক্রমণ এক আবিল দৃশ্য।

ছলনার সংসারে ভাতের মাড় গড়াবার জো ছিল না। তাহলে অকুলান পড়ত। শাক, বেগুন, লাউ, কুমড়োর ঘ্যাঁট একটা যদি কোনদিন জুটল তবে তো ছেলেদের পরম আনন্দ। না হলে স্রেফ নুন দিয়ে মাড় ভাত।

মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটত। ফুটন্ত ভাতের ভাপ উঠত। ছেলে মেয়েগুলি জুল্ জুল্ করে তাকিয়ে থাকত। ভাতের গন্ধ নিত। এসব করুণ দৃশ্যে প্রাণ টাটাবার মত প্রাণ ওদের ছিল না। ক্ষুধাটাই প্রকাণ্ড হয়ে দেখা দিত।

একদিন ভাত নামাবার সময় ছলনার হাত ফসকে হাঁড়িটা পড়ে গেল। মাটির হাঁড়ি পড়া মাত্র ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। তাতে ওর হাতও খানিকটা পুড়ল। পায়ের উপর দিয়েও গরম মাড় বয়ে গেল। যন্ত্রণায় হু হু করতে লাগল ও।

গোউর নিতাই দু'ভায়ে বহুকষ্টে এক ফুট মেঝের মাটি শুদ্ধ চেঁছে ভাত মাড় সব সানকীতে তুলে নিল। তারপর ওরা নুন দিয়ে খেতে শুরু করল।

ছলনা শুয়ে পড়েছিল। মনসা একটা সানকী ওর মুখের কাছে ধরে বলল— মা! ভাত খা।

—তুরা খেলি?

—হুঁ।

ছলনা খেতে লাগল। মনসা কাছেই বসে আছে। ওর পোড়া পায়ে হাত দিয়ে বলল —মা! তুর পা-টি তো অনেক পুড়েছে।

– হুঁ বেটা। কাল যে কি করে কাজে যাব সেই ভাবছি।

—না-মা। তুর পা ভাল না হলে কাজে যেতে হবেক নাই।

—তার কি জো আছে বেটা? একদিন কাজে না গেলে চপরাসীতে লাঠি নাচাতে আসবেক যে।

মনসা খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল —চপরাসীর লাঠি আমি একদিন ভেঙে দিব মা।

ছলনার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। বলল —পারবি বেটা?

—জরুর।

ঐটুকু ছেলের মুখে এতবড় কথা ছেলেমানুষি মনে করেই ছলনার চোখ দুটি নিষ্প্রভ হয়ে গেল। একটু পর বলল —যা ঘুমো।

মনসা ওর বুকের ওপর মাথা দিয়ে বলল —মা ! আমাদের পেটে কি কুমুদিন ভাত জুটবেক নাই ? কুমুদিন পেট ভরে খেতে পাব নাই ?

—পাবি বেটা। তুরা তিনটা ভাই আছিস। তিন ভাইয়ে যখন কাজ করবি, তখন ভাতের অভাব হবেক নাই বেটা।

—তাও হবেক নাই মা। বেবাক রুজগার মিছির গোমস্তার পেটে ঢুকবেক। আমাদের কুলি-কামিনরা তো নিজের জন্যে কাজ করে না মা। কাজ করে সুদওলা আর মদওলাদের জন্যে।

এমনতর বোধ যখন ওর জন্মেছিল তখনও সে বালক। পেটে কালির আখর পড়েনি।

তারপরে গোউর নিতাই যখন মালকাটার কাজ করার মত হল তখন তারা তো খাদে ঢুকে গেল। আর মনসারামকে পাঠাল পাঁচু মাস্টারের পাঠশালায়। ওর ভাইদের ও মায়ের কিভাবে যেন মনে হয়েছিল মনসারাম তাদের মত খাদে মাল কাটার জন্য জন্ম নেয়নি। তার আরো অনেক বড় কাজ আছে। সে জন্য ওর লেখাপড়া শেখা খুব দরকার।

মনসারামের মনে একটা ধারনা ছিল যে মাস্টারমশাই সব বিদ্যা জানেন।] সেজন্য একদিন সে প্রশ্ন করে বলল —স্যার। ক্ষিদাঁতে বড় কষ্ট হয়। কি করলে এই ক্ষিদাঁকে দমন করা যায় সেই বিদ্যা আমাকে শিখাঞে দিবেন ?

পাঁচু মাস্টার থ হয়ে শুনলেন। তারপর বললেন —ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যেতে পারে। তা ক্ষুধার খাদ্য জোগানের জন্য। তাকে দমন করার জন্য নয়। শরীর তো একটা ইঞ্জিন রে। তাকে জ্বালানী না দিলে চলবে কেমন করে ? সেই জ্বালানী অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহের জন্য অনাহারী মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে।

পাঠশালা বসে একটি আটচালাতে। তার সামনে একটি অশ্বত্থ গাছ। তারই জাফরী-কাটা ছায়া পড়ে আটচালার সামনে। পড়ুয়ারা সব চট পেতে বসে দুলে দুলে নামতা মুখস্থ করে। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়া হয়। ছাত্ররা তালব্যশ ও মূর্ধন্যষ-এর তফাৎ বোঝে না। ভুল হলেই কানমলা খেতে হয়।

মনসারাম যখন প্রথম ভাগ পড়ে তখন সে ডাগর ডোগর ছেলে। কৈশোর ডাক দিয়েছে আবার বিয়েও হয়ে গেছে।

সংসারে যতই অভাব থাক বিয়েতে দেরি হলে চলে না। ছলনা দাসীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে পারুল ছাড়া বাকি সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। এটাই ওদের রীতি পদ্ধতি।

পাঠশালার পড়ুয়ারা সব সাহেব সাহেব বলে মনসারামকে ক্ষেপাতো। তাকে জারজ বলত। তার কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। সেজন্য বড় ব্যথা পেত মনে। রাগে ভিতরটা গমগম করত।

পাঁচু মাস্টার তা বুঝতেন। ওঁর বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল ওর ওপর। তাই কোনদিন চোখ ছল ছল করলেই কাছে ডাকতেন। পাঁচটা ভাল কথা বলে ভুলিয়ে দিতেন।

ওঁরও ভিতরে একচারা আগুন ছিল। তা সদা সর্বদা ধিক ধিক করে জ্বলত। সে জ্বালা পরাধীন ভারতের মুক্তি কামনায়। ওঁর জীবনের বড় সাধ একদিন দেশের জন্য প্রাণ দেবেন।

আটচালার পাশেই একটি কুঁড়ে বেঁধে থাকেন। স্বপাক আহার। একা মানুষ। ঘর-সংসার নেই। কোন এক সময় ছিল, কালের গর্ভে তলিয়ে গেছে। ছোটখাট বৃদ্ধ মানুষটি দশ-পনেরটি ছাত্র নিয়ে ছোট্ট একটি গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন।

তাঁর দৃষ্টিতে মনসারাম তেমনি একটি ছাত্র যে ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক সারাজীবন প্রতীক্ষা করতে পারেন। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সম্ভ্রম, সতীত্ব নিয়ে যার ভাবনার জগৎ তাকে আদর করবেন না তো কাকে করবেন ? মনসারামকে তিনি বিশেষভাবেই শিক্ষা দিতে শুরু করলেন।

প্রকৃতিগত কারণেই মনসারাম ছিল দুরন্ত দুর্দান্ত। বিবিবাথানের সমবয়সী ছেলে ছোকরারা তখন থেকেই তার অনুগত ছিল। সে যে লেখাপড়া শিখছে এটা তার বন্ধুদেরও গর্ব অহঙ্কার। এবং ক্রমশই সে হয়ে উঠছিল একটা দলের নেতা।

মতি সিং কাবেরী কুটিরের দারোয়ান। টুসীর সঙ্গে আশনাই। দুজনের প্রেম যমুনায় ভরা তুফান। প্রতি শনিবার পানমোহরা আসে বেতন নিতে। খাজাঞ্চীবাবুর কাছে টিপছাপ দিয়ে দুজনের হপ্তা হাজারি তুলে নেয়। লাঠি কাঁধে দুলতে দুলতে চলে। মুখভর্তি খৈনি তামাক থাকে। পিক্ পিক্ করে থুতু ফেলে। নাগরা জুতো মচ মচ করে। আপনমনে গান গায়।

সে হঠাৎ ব্যারাকলউ সাহেবের সামনে পড়ে হকচকিয়ে গেল। সব মৌজ ফৌত। স্বভাবগুণে সেলাম্ দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরে অপরাধ বোধের পীড়া শন শন করে উঠল।

ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে সে যে সুদ ও দুধের কারবার ফেঁদে বসেছে এই তথ্য সাহেব পেয়ে গেছেন এমন একটা ধারণা করে মুখটা যত মলিন তত সঙ্কুচিত হয়ে গেল। এই বুঝি তার চাকরি খতম হয়ে যায়। তবে তো সব চৌপট। কোথায় ভেসে যাবে সাধের গোলদারী। ও-হো-হো কি বিষম ঠ্যালা হে!

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন —মতি সিং! তোমার মেমসাহেব কেমন আছে?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওর। বলল —জী! আচ্ছা হ্যায় হুজুর।

—নাচগান চলছে ?

—জী হ্যাঁ।

—আজকাল নাচগান কেমন হয় ?

—বহোত স্নন্দর। যো ভি আদমী আসে বহুত তারিফ কোরে।

—ইনাম দেয় না ?

—হাঁ হুজুর দেয়।

—মুহাব্বৎ করে না ?

—নেহী হুজুর।

—সে কি এতদিন হয়ে গেল এখনো একটা পেয়ারের লোক জোটাতে পারল না ?

—নেহী হুজুর। কেতো রইস আদমী, বরিয়ার কাপ্তান মেমসাহেবের লিয়ে দেউলিয়া লেকিন মেমসাব একদম সাচ্চা হীরা। থোড়াসা ভি দাগ লাগে নাই।

—দ্যাটস ভেরী গুড। সাহেব যেন প্রীতিলাভ করলেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন —আচ্ছা! ওর গুরুজীর সঙ্গে সাদী হয়েছে তো ?

—নেহী হুজুর।

—সেকি ? আমি যে বলেছিলাম।

—হুজুর। গুরুজীকে উ বাপ বোলে। একদম বাপ বেটীর মতন থাকে।

—মাই গড! আচ্ছা—ওর মেয়েটা কত বড় হয়েছে ?

—বড় হোয়েছে হুজুর। বহুত স্নন্দর হোয়েছে। একবার আঁখে দেখলে মন খুশ হয়ে যায়। হামি জিন্দেগীতে কভি এতো স্নন্দর বাচ্চা দেখি নাই।

সাহেবের মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। ওকে একটা টাকা বকশিশ দিয়ে বললেন —যাও।

ও বকশিশ নিয়ে সেলাম করল। বলল —হুজুর। একবার যাইতেন তো মেমসাব বহুত খুশ হোতো।

—ও আমার কথা বলে নাকি ?

—হাঁ হুজুর। আপনাকে উ বহুত পেয়ার করে। আঁখসে পানি নিকালে যায়।

—ও.কে.! তুমি যাও।

মতি সিং সেলাম দিয়ে চলে গেল।

বহুদিন পর কাবেরীর জন্য ওর বুকটা মুচড়ে উঠল। ওর জীবনে মেয়েরা এসেছে তাৎক্ষণিক স্নখের জন্য। জৈবিক প্রয়োজনে। একটা মেয়েকে বিদায় দিয়ে—অন্য মেয়ের শরীরে স্নখ খুঁজেছেন। যতদিন পেয়েছেন ততদিন রেখেছেন, তারপরে খারিজ করে দিয়েছেন। কাবেরী এখন সেই খারিজ

তালিকার একজন। তাকে ডেকে এনে আবার কণ্ঠলগ্না করতে পারেন কিন্তু মিসেস ব্যারাকলউ এই নিয়ে বহু অশান্তি করেছিলেন। আবার না তার পুনরাবৃত্তি হয়।

কিন্তু ঐ মেয়েটি? বয়স প্রায় দু-বছর হতে চলল। এখনো যদি কাবেরীর হাজব্যাণ্ড না হয় তবে মেয়েটির লিগ্যাল ফাদার কে হবে? না—না। এটা তো ঠিক নয়। ওর মেয়ে জারজ বলে পরিচিত হবে—কোন স্কুলে পড়তে গেলে বাপের নাম দিতে পারবে না—ওহো! এর ব্যবস্থা করতেই হবে।

বাট টু হুম? ঠিক এই সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যার পরামর্শ নেওয়া একান্ত জরুরী বলে বিবেচনা করলেন তার নাম রামনগিনা মিশ্র। হেড গোমস্তা। শেরগড় কোল কোম্পানি।

উনি সেলাম করে দাঁড়াতেই সাহেব তার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—

—হু ইজ জয়? আই মীন ওর আইডেন্টিটি কি? ওকে কোথায় পেয়েছো? মিছিরবাবুর ধারণা ছিল সাহেব সব জানেন। তাই প্রশ্ন শুনে বললেন—

—হুজুর! ইয়ে জয়গোপাল মদন সরকারের বড়কা লেড়কা। আপনার মালুম নাই?

সাহেব একটু হেসে বললেন—মালুম থাকলেই কি সব সময় স্মরণ থাকে? কিন্তু তাহলে সেই মেয়েটি ওর কে হচ্ছে? সেই যে—সতী উওম্যান!

—হাঁ হুজুর—উ তো জয়ের ফু ফু লাগছে। আপনা খুনকা জড়।

—মাই গড! ও জানে সে কিভাবে মারা গেছে?

—কি করে জানবে হুজুর? ঈ বাৎ কোই জানে না।

—দ্যাটস গুড। ওকে জানতে দিও না।

মিছিরবাবু কানমলে এক হাত জিভ কেটে বললেন—রামশ্চন্দ্রঃ!

পুরুষের ভাগ্যোদয়ের জন্য একটা হেতু চাই। আবার পুরোটাই ভাগ্য ফলে হয় না। ভাগ্য ও কর্ম যখন হাত ধরাধরি করে জাতকের প্রতি শুভ দৃষ্টি দেয় তখনি হয় ভাগ্যোদয়।

জয় ভালো কর্মী একথা এখন স্বীকৃত সত্য। আবার তার ভাগ্যোন্নতির সোপান তৈরি হচ্ছে ব্যারাকলউ সাহেবের মনে যার প্রথম সিঁড়িটি বেঁধে দিয়ে গেছে তার পিসী অহল্যা। দ্বিতীয় সিঁড়ি তার কর্মোদ্যোগে। তৃতীয় সিঁড়ি সাহেবের প্রতি নিবেদিত প্রাণ আনুগত্য। চতুর্থ সিঁড়ি সাহেবের নিজস্ব প্রয়োজন।

মিছিরবাবু ওকে সাহেবের কাছে ডেকে নিয়ে এলেন। সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন—ইয়ং ম্যান! তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ গড়তে চাও?

জয় বিগলিত ভঙ্গীতে বলল—ইয়েস স্যার।

—তাহলে তুমি আমার একটি ক্যাণ্ডিডেটকে বিয়ে কর।

জয় আকাশ থেকে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল —স্যার! আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

—সো হোয়াট? ইণ্ডিয়াতে ওয়ান ম্যান পজেসেস মেনী উওম্যান। এটা কোন কৈফিয়ৎ নয়। চল আমার সঙ্গে। আদার-ওয়াইজ গো-আউট অফ মাই কলিয়ারী।

ওরে বাব্বাঃ। তবেই তো লোটিয়া গোল। কলিয়ারীর মধুচক্রে সবে-মাত্র মৌ জমতে শুরু করেছে এরই মধ্যে গো-আউট। কেমন বিমূঢ় ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বলল — এক্সকিউজ মি স্যার। আই য়্যাম রেডী।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

সে এক অসম সম্পর্কের লগন ঘটন।

ব্যারাকলউ সাহেব নিজের প্রয়োজনে কত রকমারি সুখের পাখী পুষেছেন। তাদের আবার গাছতলাও করে দিয়েছেন। সৃষ্টি করে এসেছেন বিবিবাথান। জারজ প্রজন্মের কারখানা।

ওঁর ভাবনাচিন্তার ব্যাপারগুলোও কমার্শিয়াল। একটা মেয়ে তার সতীত্ব হারিয়ে সুখ বিক্রি করেছে তার একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন। সেটির ব্যবস্থা করে দিলেই তার কর্তব্য শেষ।

যেহেতু কাবেরীকে ভালবাসতেন সেজন্য তার বিয়ের বাসর সাজাতে চলেছেন সাঙ্গো পাঙ্গো নিয়ে। দু'খানা ঘোড়ার গাড়ি চলছে খট্ খট্ খট্ ক্ষুরের শব্দ তুলে। তার একটিতে ফাদার ডাইসনের সঙ্গে উনি নিজে। অন্যটিতে মিছিরবাবু, জয়গোপাল, যদুনন্দন, রাম-ভরোসা এবং পটলবাবু। ওরা সব বরযাত্রী।

অথচ সন্তানবতী কন্যারত্নটি এর বিন্দু বিসর্গও জানে না। মুন্না বড়া পেয়ারা —গান গেয়ে গেয়ে সাত সন্ধ্যায় বাচ্চাটিকে ঘুম পাড়াচ্ছে। হঠাৎ সাহেবের আগমন। তাও এতবড় দল বল নিয়ে। কি ব্যাপার? বলা নেই, কওয়া নেই, একটি খবর পর্যন্ত নেই, হঠাৎ আসবার কারণ কি?

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর টুসী ও মতি সিংয়ের সাহায্যে ওদের বসবার ব্যবস্থা করে সরবৎ তৈরি করে দিল।

জয়গোপাল তখনো জানে না কার সঙ্গে বিয়ে হবে? বাড়িতে দুটি মেয়ে। দু'জনেই যুবতী। এই পরমাসুন্দরী মেয়েটি যে সাহেবের আপন দিল্‌কী চিড়িয়া তা বুঝতে বিলম্ব হবার কারণ নেই। অন্যটি দাসী বাঁদী। তবে তারও যৌবনের জেল্লা আছে। জয়ের ধারনা ওর সঙ্গেই বোধহয় তার বিয়ে হবে। তাই তার কৌতুহল ছিল কিন্তু আগ্রহ ছিল না। সে শুধু চোরাচোখে কাবেরীকেই ফিরে ফিরে দেখছিল আর ভাবছিল স্বর্গে যেসব অপ্সরারা থাকে

এ বুঝি তাদেরই কেউ হবে। না হলে এত রূপ কোথা থেকে এল? এঃ! মাইরী গাল দুটি রাঙা হয়ে গেছে যে।

তিন

কাবেরী মনে করে না যে জয়গোপাল তার একটা অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতেরও যোগ্য। মদন সরকারের ছেলে আর কত সুপাত্র হবে? বাপের মতই লম্বা তবে হাড়ের উপর মাংস আছে। মেহনত করা শরীরের মাংসপেশীগুলি সবল ও সুগঠিত। বয়সটা বড়ই কাঁচা। চোখের তারায় কৌতুক ঝিক্ ঝিক্ করছে। মুখের ভাবে কেমন এক অস্থিরতা।

কাবেরী কুটিরের এই ঘরটার সাজ-সজ্জা এমন ছিল যে অন্তত দশ-বারো জন আয়েস করে বসতে পারেন প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে। একটা দিক ফাঁকা। যেখানে কাবেরী ও যন্ত্রশিল্পীরা বসে গান করতে পারে। নাচও হতে পারে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে সেই আয়োজন চলছিল। কাবেরী ভেবেছিল সাহেব বুঝি এতদিন পর ইয়ার দোস্ত নিয়ে আমোদ প্রমোদের জন্য এসেছেন।

সেইভাবেই তৈরি হচ্ছিল এবং মন্মথ ঘোষ এসে পড়েছিলেন। তিনি সবাইকে নমস্কার করে পাখোয়াজে সুর বাঁধতে শুরু করলেন—টুং টাং শব্দে। কাবেরী ততক্ষণে নতুন ছাঁদে খোঁপা বেঁধে ঘাগরা ওড়না কাঁচুলী পরে আসরে নেমে পড়েছে। তার সুর্মাটানা চোখে তখন মনচোরা ঝিলিক। এক একটি ঠমক দেখলে বুকের ভেতর বাদ্য বাজে।

সাহেব বললেন—কাবেরী! ইউ মাস্ট হ্যাভ এ লিগ্যাল হ্যাজব্যাণ্ড। তোমার একটা স্বামী চাই। যে তোমার মেয়ের বাপ হতে পারবে। না হলে ওর কি পিতৃ পরিচয় দেবে?

কাবেরী চমকে উঠল। হয়ত বা তাল ভঙ্গ হল। একটু ভেবে বলল—তুমি নিজের পিতৃত্ব অস্বীকার করতে চাইছো তো সাহেব?

—সিওর।

—আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে বলেছ তাই থাকতে দাও।

—বাট ইয়োর ডটার? তোমার মেয়ের আইডেণ্টিটি কি?

—বেশ্যা গর্ভজাত জারজ সন্তান!

যেন কোন কালোয়াতি সুরের প্রথম আলাপেই ঝাঁঝ পড়ে গেল। সারাঘর তেমনি ভাবেই স্তব্ধ। শুধু তার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এক রঙ্গনটীর অভিমানী কণ্ঠস্বর।

সাহেব বললেন—আমি এই ইস্যুটাকে লিগেলাইজ করতে চাই।

—কিভাবে?

—লুক্ অ্যাট দিস্ বয়। হি কেম ফ্রম এ গুড হিন্দু ফ্যামিলী। ভেরী ইন্‌টেলিজেন্ট। ওর একটা ব্রাইট ফিউচার আছে। ওকে ঠিকাদার বানিয়ে দেব।

জয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাহেবের এই কথা বলার ভঙ্গি দেখেই কাবেরীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেমন নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল—

—তাতে আমার কি?

—ও তোমাকে বিয়ে করবে। এ লিগ্যাল ম্যারেজ।

কাবেরী এবার হাসবে না কাঁদবে তাই ভেবে পায় না। বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বলল —কি বলছো সাহেব? একটা কালকের ছেলেকে ধরে এনেছ আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে?

—সো হোয়াট? এ ইয়াং হাজব্যাণ্ড উইল গিভ ইউ মোর প্লেজার। রাসমণির হাজব্যাণ্ড বুধনা ওর চেয়ে দশ বছরের ছোট। বাট দে হ্যাভ এ ডিপ লাভ। দে আর এনজয়িং ভেরী নাইসলী।

কাবেরী অধৈর্য কণ্ঠে বলল —ওঃ সাহেব! এসব কথা বোল না।

—বাট ইউ আর ব্যাডলী সাফারিং ফ্রম সেকস্যুয়েল আর্জ!

কাবেরীর মনচোরা চোখের তারায় বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। স্থিরকণ্ঠে বলল —তাই একটা বশংবদ ছোকরাকে নিয়ে এসেছো আমার দাবি মেটাতে? যা তুমি পারোনি, জমিদার পারেনি তাই ওকে দিয়ে করাবে? কি মনে করেছো, আমি তোমার মতলব বুঝিনি?

কাবেরীর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠছে। সাহেব বললেন —আহা! কথাটা ভেবেই ত্যাখো না।

—না। কিচ্ছু ভাবার নেই। তুমি আমাকে চিনি-চামেলী-ছলনা-বঞ্চনার মত ভেবে নিয়েছো। তোমার নতুন কলিয়ারীতে আর একটা বিবিবাথান তৈরি করে তার মধ্যে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে চাইছো। একটা কোন কুলি কাবারীর সঙ্গে গেঁথে দিয়ে নিজে ভোগ করতে চাইছো। তা সাহেব! আমাকে ভোগের বাসনা তোমার যদি না মিটে থাকে তবে যখন খুশি আসবে। এসব ঘর-দুয়ার তোমার। আমিও তোমার, দয়া করে বিয়ের প্রহসন করে আমাকে অপমান কোর না।

নায়িকার প্রস্থান এবং কক্ষান্তরে রোদন। ওর বিস্ময়ের সীমা নেই। মনেও একরাশ প্রশ্ন। একি জুলুম? তার ইচ্ছা নয় তবু একটা নাদান ছোকরাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। সতীত্ব ব্যাপারটা না হয় শেষ হয়ে গেছে। তাই বলে কি মন বলে কিছু থাকবে না? জবরদস্তি করে কেউ না হয় তাকে শয্যাসঙ্গী করে নিতে পারে তাই বলে জীবনসঙ্গিনী? বুকটা তোলপাড় করে চোখ ফেটে জল এল।

সাহেবের সাদা মুখটা তখন লাল হয়ে গেছে। নাক দিয়ে বইছে গরম নিঃশ্বাস। কারো সাধ্য নেই যে তার মুখের দিকে তাকায়। জয় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ওর মনে অপরাধবোধের পীড়া। কি জানি সাহেব হয়তো তাঁকেই দায়ী করে বসবেন।

এই সময় বৃদ্ধ মিছিরবাবু এবম্বিধ বাদানুবাদের একটা লাগসই ব্যাখ্যা পেশ করে বললেন —ও-হো-হো! ক্যা বে-তরিণ মুহাব্বৎ! হুজুর ইয়ে জানানা আপকো বহুত পেয়ার করতি হ্যায়! উসকি দিলমে বহুত ভারী চোট লাগ গয়ী।

সাহেব ওর দিকে তাকালেন। তখনো নিজেকে ঠিকমত সামলে উঠতে পারেননি। তাঁর মুখের উপর কেউ যে এমন করে কথা বলতে পারে, এভাবে অভিযুক্ত করতে পারে তাই ওঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে কোন সাহসে?

মিছিরবাবুর ব্যাখ্যা শুনে উনি যেন কিছুটা ধাতস্থ হলেন। একটু ভেবে বললেন — তাহলে কি করবে মিছির? আজ ফিরে যাবে?

—হুজুর বহুত দিন বাদ আপনি আসিয়েছেন। মেমসাব খুশি ভি হইয়েছেন। নাচা-গানাকে লিয়ে তৈয়ার ছিলেন। ইসি বকৃত পর আপনি সাদীর বাৎ করিয়ে উয়ার দিমাক বিগড়াইয়ে দিলেন। আব থোড়া উন্‌কা পাশ যা কর দুঠো মিঠি বাৎ বলুন।

বৃদ্ধস্য বচনম্ গ্রাহ্য। এই আপ্ত বাক্য স্মরণ করে ব্যারাকলউ সাহেব কাবেরীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন জলভরা দুটো চোখের এমন বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখলেন যে সাহেবেরও বুকটা মুচড়ে উঠল। ওর পাশে বসে পিঠের উপর চওড়া হাতের পাঞ্জাটি রাখতেই কাবেরী প্রায় ভেঙে পড়ল। কান্নাভেজা গলায় বলল —তুমি আমাকে যা বলেছ আমি তাই করেছি সাহেব। তোমার সংসারে শান্তি আনবার জন্য আমি কখনো তোমাকে বিরক্ত করিনি। তবু তুমি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হতে পারলে?

সাহেব ওকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বললেন —কাবেরী! মাই ডারলিং! তুমি আমার স্বপ্নের রাণী। তোমাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে কি আমার মন চায়? কিন্তু একটু ভেবে ছাখো —তোমার একটা লিগ্যাল হাজব্যাণ্ড ছাড়া তোমার মেয়ের পিতৃপরিচয় থাকবে না। ভবিষ্যতে তাকে যখন লেখাপড়া শেখাবে তখন স্কুলে বাপের নাম কি লিখবে? বিয়ের সময় বাপের কি পরিচয় দেবে? আমি এই কারণেই বিবিবাখানের ভাল্‌গার উওম্যানদের জন্যও একটা করে লিগ্যাল হাজব্যাণ্ড ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু তুমি একেবারে উল্টো মানে করে আমার উপর রাগ করছো।

কাবেরীর আবেগটা তখন অনেকটা কেটে গেছে। বলল —কিন্তু সাহেব!

আজ যার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে সে তো কাল আমার উপর দখলদারী করতে আসবে।

—অফকোর্স! এটা তার রাইট এণ্ড প্রিভিলেজ।

—তাহলে তুমিই বল—ঐ কালকার ছেলেটার কাছে আমি কিভাবে নিজেকে বে-আবরু করব?

সাহেব তখন নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। তার মগজটাও সাফ হয়ে গেছে। বললেন—সেটা তোমার মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে। তবে আমি জানি একদা তুমি টাটু ঘোষকে সত্যিকারের ভালবাসতে। সে ছিল নাচমহলের চাকর। বয়েসেও তোমার চেয়ে ছোট।

—ওর কথা বোল না সাহেব। অমন জীবনপণ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না।

—আমার মনে হয় জয়গোপাল তার চেয়ে কম হবে না। তাছাড়া তুমি যদি না চাও তাহলে ওর ঘরকন্না তোমাকে করতে হবে না, যেমন আছো তেমনি থাকবে। কেউ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবে না—আমিও না—জয়গোপালও না। শুধু তোমার ইস্যুটাকে লিগ্যালাইজ করতে চাই। এস! ফাদার ডাইসনকে সঙ্গে করেই এনেছি। সে তোমাদের বিয়ে দিয়ে ম্যারেজ সার্টিফিকেট লিখে দেবে।

—ওঃ! আবার এক ফ্যাচাং! আমি কি খ্রীষ্টান যে পাদ্রী সাহেব এনেছো?

—অলরাইট! তুমি যদি খ্রীষ্টান হতে না চাও তবে আমি তা বলব না। মিছিরবাবু ব্রাহ্মণ। উনি তোমাদের বিয়েতে পুরোহিত হবেন। একটা বিয়ের দলিল তৈরি হবে তাতে আমরা সবাই সহি করব যাতে ভবিষ্যতে জয়গোপাল অস্বীকার করতে না পারে।

ব্যস! সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। মিছিরবাবু তা কার্যকরী করার জন্য ড্রেস বদলে ধুতি পরে গামছা গায়ে দিয়ে গাড়ু হাতে পুরোহিত বনে গেলেন। মন্মথ ঘোষ কন্যা সম্প্রদান করবেন। বাড়ির ঝি ও দারোয়ান আকন্দ ফুল তুলে মালা গেঁথে দিল। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে লোক চলে গেল বিয়ের বাজার করতে। সাহেবের নাম করলে গভীর রাত্রেও দোকানদার মাল দেবেন। ননম্যাট্রিক গুদামবাবু পটল সাদা কাগজে সিঁদুরের ছাপ দিয়ে আলতার ভিতর ময়ূর পাখার কলম গুঁজে বিয়ের দলিল লিখলেন—শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ। ইদং শুভবিবাহ কার্যাকালে আত্মীয়কুটুম্ব ও বান্ধবগণের উপস্থিতিতে ৺মদন সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান…শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল।

বিবাহের পূর্বেই সে দলিল বর কনে ও অন্যান্যদের সহি সাবুদ হয়ে গেল। তারপর রাত তিনটে নাগাদ বরকনে বসল বিয়ের পিঁড়িতে।

তখন কাবেরীর কপালে কনে চন্দন। পরণে বেনারসী শাড়ি। গা-ভরা সোনার গয়না! পায়ে রূপোর মল। কানে ঝুমকো। ঘাড়ের উপর এলোখোঁপা। সুর্মাটানা একজোড়া আয়ত চোখ। ব্রীড়াবনতা চিবুক। যেন একটি টাটকা বিয়ের কনে।

প্রেম, অভিসার, শৃঙ্গার ও রতিক্রীড়ায় পরম অভিজ্ঞা সন্তানবতী সেই বর-নারী তখন যেন একটি সলাজ কুণ্ঠিতা কিশোরী। মোহিনী রমণীদের কত কিছুই না জানা আছে।

জয়গোপালের চক্ষু ছানাবড়া। আরে শাল্লা! এই পরীটা তার বৌ হবে! কিন্তু পরক্ষণেই মনটা ছোট হয়ে যায়। বেল পাকলে কাকের কি? ব্যারাকপুর সাহেব সারমন দিয়েছে—লুক হিয়ার জয়! আনলেস সি ওয়ান্টস্ তুমি ওকে কোনভাবেই ডিসটার্ব করবে না। ইয়োর রোল ইজ সিম্‌পলি টু বি লিগ্যাল হাজব্যাণ্ড অফ দিস ওম্যান অ্যাণ্ড লিগ্যাল ফাদার অফ দিস বেবী। নাথিং মোর। ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

অর্থাৎ সাতমণ ঘিও পুড়বে না রাধাও নাচবে না। এই হুরী, পরী, জিন কি কোনদিন ঠিকাদারের মুন্‌শী জয়গোপালের শয্যা-সঙ্গিনী হয়?

সাহেব আবার বললেন—মনে রাখবে আজকের দিনটা তোমার বিয়ের দিন নয়। দলিলে লেখা হয়েছে তিন বছর আগেকার তারিখ। সো দ্যাট ভারচুয়্যেলী এটাই প্রমাণ হবে যে ঐ বেবীকে তুমিই পয়দা করেছ।

মিছিরবাবু বৈদিক মতে কন্যা সম্প্রদান, মালাবদল, হোমযজ্ঞ, সিঁদুর দান, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী ইত্যাদি অনুষ্ঠান এবং প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রী ছন্দে…যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম—ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা শুভ বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন করিয়ে দিলেন।

এসব ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোন গোঁড়ামি উনি মনের মধ্যে রাখেন না। তিনি একটা বস্তুই চিনেছেন তার নাম অর্থ। তা উপার্জন করতে হলে সাহেবের হুকুম তামিল করাটাই মহৎ আদর্শ। সে যে কর্মই হোক—অহল্যার বাসি মড়া পোড়ানো বা কাবেরীর বিয়ে দেওয়ার মধ্যে বিশেষ তারতম্য নেই।

বরকনে যখন বাসর ঘরে পৌছাল তখন সূর্যদেব পূর্ব দিগন্ত ফুঁড়ে উঠে এসেছেন গর্বোদ্ধত আলোকমালায় অন্ধকার ছিঁড়ে দিয়ে। বাসর জাগার কোন ব্যাপার ছিল না। তাই জয় ওর গাঁটছড়াটি কাবেরীর ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে সাহেবের কাছে এসে দাঁড়াল বশীভূত মেষের মত।

প্রচুর মদ্যপান করে সাহেব তখন টপ-ভূজঙ্গ। জয়ের হাত ধরে সহর্ষে করমর্দন করে বললেন—কন্‌গ্রাচুলেশন মাই বয়। উইশ ইউ গুডলাক।

তারপর ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আমি প্রমিস করছি—তোমার

এমন ভবিষ্যৎ বানিয়ে দেব যা দেখে লোকের তাক্ লেগে যাবে। তুমি টাকার গদিতে শুয়ে হাজার হাজার লোকের উপর খবরদারী করবে।

চার

জয়গোপালের চোখে তখন ঝিলমিল রোশনী। বাসর ঘর থেকে উঠে এসেছে। সে স্মৃতি ভুলতে পারছে না। একটা নীল পরী আকাশ ফুঁড়ে তার সামনে এসে হাজির হচ্ছে। তার বাহুদুটি সোনা দিয়ে মোড়া। মেঘের মত রাশীকৃত কালো চুলের চালচিত্রে সোনার প্রতিমার মত মুখ। সেই পরীটি নৃত্যছন্দে গান করছে, কল্ কল্ শব্দে কথা বলছে, খিল্ খিল্ শব্দে হাসছে, তার হাসিতে মুক্তো ঝরছে। ইসাবেলা পিটের চিমনির ধোঁয়ায় তার অবয়বটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তাকে ধরতে কত যে চেষ্টা করছে কিন্তু একবারও নাগালের মধ্যে আসছে না।

দণ্ডে পলে দিনক্ষয় তারপর মাস। সময় যত পার হচ্ছে তত তার মনে একটি মনোরম নারীমূর্তি কত বিচিত্র ভঙ্গিমায় গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। বড় আকাঙ্ক্ষা একবার তাকে ভালো করে দেখবে। বিড়ালের ভাগ্যে সিকে নাই বা ছিঁড়ল চোখে দেখলেও জীবন সার্থক।

—বাবুজী ? বারকুলি সাহাব বুলায়েছেন।

এ শ্লালা চাপরাসী ! ভাবনাটা তালগোল পাকিয়ে দিল। চায়ে মাছটা এসেছিল দিলি তো ভেঁচড়া করে।

স্বগতোক্তি করেই সে দৌড়াল।

সাহেব তাকে হাসি মুখে বললেন —হ্যালো ইয়াংম্যান ! আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার ফিউচার বানিয়ে দেব। এবার এসো। কাজে নেমে পড়। তোমার এলেম দেখাও।

—কি করতে হবে স্যার !

—সাতখরিয়ায় দু'খানা চানক কাটাইয়ের প্ল্যান করেছি। তোমাকে তার ঠিকাদারী দেব।

—চানক কাটাই ! দূরাগত ধ্বনিতরঙ্গের মত তার কণ্ঠস্বর।

—ইয়েস ! ঘাবড়ে গেলে নাকি ?

—তা ঠিক স্যার। আমি যে ও কাজের কিছুই জানি না।

—মাই গড ! তুমি আবার জানবে কি ? খাদ কেটে কেটে আমার এত বয়স হল তবু কি আমিই সব জানি ? নো মাই বয় ! সেজন্ত ভাবনা নেই। আমি সব দেখিয়ে দেব !

—কিন্তু স্যার —আমার যে টাকাকড়ি পুঁজিপাটা নেই।

—তা জানি। সেজন্য তোমাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট দেব। যাও কুলি-কামিন ঠিক করগে। কাল সকালে যাতখরিয়ায় হাজির হবে।

তৃতীয় বার বাহানা দিলেই সাহেব ব্যোম খাপ্পা হয়ে যাবেন। এই তথ্য ওর জানা আছে। কাজেই সেলাম দিয়ে চলে গেল। তার মাথাটা তখন নানা ভাবনায় জট পাকিয়ে গেছে। সামনে বিরাট ভবিষ্যতের হাতছানি। চানক কাটাইয়ের ঠিকাদার। ওরে বাপরে! ভাবলেও গা শিব্‌শিব্‌ করে। কিন্তু ছেড়ে দিলেও তো চলে না।

সে সারাদিন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরল কুলি-কামিন যোগাড় করতে। এই সময়েই উড়ে এসে পড়ল লঙ্কেশ্বর ধোবী ওরফে লঙ্কা। তার গুণের ঘাট নেই। ষোল বছর বয়সেই মাসীপিসীর বয়সী এক ভরা যুবতীকে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে এসেছে পানমোহরায়।

যেহেতু যৌবনের রহস্য রোমাঞ্চ ইত্যাদির আস্বাদন ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই আগে পেয়ে থাকে এবং কামকলায় অভিজ্ঞা একটা বিবাহিতা যুবতী বয়ঃসন্ধিকালের একটা ছেলের সঙ্গে যে পালিয়ে এসেছে এমন ঘটনার জন্য আপাতদৃষ্টিতে মেয়েটিকে সবাই দোষারোপ করে বসবে—এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এই ব্যাপারে মেয়েটির চেয়ে লঙ্কার দায়িত্বই ছিল বেশি।

সে বঞ্চনার ছেলে। মলিন্দ ধোবী তার সদর বাপ। পয়দা হয়েছে ব্যারাকলউ সাহেবের ঔরসে। গোল গোল ডুমুর চেরা চোখ। নীল তারা। কটা চামড়া। এখন তার চোখে মুখে কৈশোরের কোমল লাবণ্য। না হলে ওর চোখ দুটিতে হরদম প্রতিহিংসার জ্বালা। বাল্যকালে রাগিনী ও বঞ্চনার সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় যে ভূমিকা পালন করেছিল তার সুবাদে নামের আগে ধানী বিশেষণ যুক্ত হয়ে ধানীলঙ্কা নাম পেয়েছিল। যা অতীব ঝাল।

মেয়েটির নাম মুগী। দো-আঁশলা জাতের হ্যানফেনে মেয়ে। নিজের স্বামী বর্তমান থাকতেও লঙ্কার সঙ্গে ক্যাজুয়েল প্রেম করত যৌবনের তাড়নাতেই। ওর স্বামী জানতে পেরে দিল আড়ং ধোলাই। প্রতিজ্ঞা করল—তোকে আর লঙ্কাকে কেটে এক কবরে মাটি দেব।

লঙ্কা তার চেয়েও হুঁশিয়ার। সে মুগীকে ভাগিয়ে নিয়ে হাজির হল জয়ের কাছে। সে বুঝল অসম বয়সী প্রেমিকাকে নিয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আরো কি কুকীর্তি করেছে কে জানে? সঙ্গে যখন ডবকা ছুক্‌রী তখন কত কি হতে পারে? তাতে ওর কী? কুলি-কামিন খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাতের কাছে পেয়ে গেছে। আবার কি? বহাল হয়ে গেল।

সে রাত্রে মুগীর বড় সুখ। মাথার উপর খোলা আশমান। ঠিক্‌রে পড়ছে চাঁদের আলো। মাটিতে শুক্‌নো ঘাসের চাপুড়ী। গড়িয়ে পড়লেই চোখ জুড়ে যায়। গায়ে লেগে থাকে অজস্র ঘাসের বীচি, ঝিক্‌ঝিকে বালি। পেটে

গজ্ গজ্ করছে ফ্যানাভাত, ধেনো মদ। লঙ্কার গুলি-গুলি চোখে অক্লান্ত প্রণয় ক্ষুধা। দুই বে-গানা রাহী অবলীলায় এগিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের পথে।

জয়গোপাল তাদের ঘাম নিয়ে ঠিকাদারী করবে, মুনাফা লুটবে এই তাদের ভবিতব্য। কাল সকালে একটা কুঁড়ে বানাবার জন্য কাঠ, খড়, বাঁশ, দড়ি পাবে। চার আনা খোরাকিও পাবে। তারপর পরমসুখে মধুচন্দ্রিকা যাপন করুক। ছানাপোনার জন্ম দিক। কলিয়ারীর কুলি-কামিন দিনে দিনে পালে বাড়ুক।

পরদিন সকালে সাতখরিয়ার সাতনলী বহালে সাজ সাজ রব। চৌদ্দ পনেরোটি কুলি-কামিন, গাঁইতি, ঝোড়া, টাম্না, শাবল নিয়ে জয়গোপাল তৈরি। একটু পর এলেন শিবতোষবাবু সার্ভেয়ার ও তার সহকারী। মাপজোক করে ষোল ফুট ব্যাসের একটি বৃত্ত এঁকে ফেললেন মাঠের উপর। চুন দিয়ে দাগ করলেন।

ছুটে এল সাহেবের কালোঘোড়া। লাগাম কষে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবাই তটস্থ। উনি বললেন —হ্যাল্লো কম্পাসবাবু কাজ শুরু করেছ?

—হ্যাঁ স্যার।

—অলরাইট! পাশের চানকটাও দাগ করে দাও।

—হ্যাঁ স্যার।

—জয়! তুমিও শুরু কর। কম্পাসবাবু এই ছোকরাকে চানক কাটাইয়ের ঠিকা দিয়েছি। ওকে সব দেখিয়ে দিও। সর্বতোভাবে সাহায্য কর। হি ইজ মাই পেট ম্যান।

—ও-কে স্যার।

জয় বলল —মা-কালীর পুজো দিয়ে শুরু করতে হবে তো স্যার?

—সিওর।

—মিছিরবাবু কিছু বলবেন না তো স্যার?

—সো হোয়াট? তোমার নিজস্ব ফিউচার আছে। তা বানিয়ে দেবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আচ্ছা। আমি ওকে বুঝিয়ে বলে দেব।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার! ইউ আর মাই গড ফাদার!

আত্মনিবেদনের ভঙ্গিমায় জয়ের সেই বিগলিত কণ্ঠের কথাটি নাটকীয় সংলাপের মত শোনাল। সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সাহেব বললেন— ওহ্! নাইস্! তুমি ইংরেজী শিখে গেছ। ভেরী গুড। ইয়ংম্যান! তাজা রক্ত। হরদম টগবগ করে ফুটবে। কাজের নেশায় পাগল হয়ে যাবে। তবে তো উন্নতি। তবে তো এনজয় করবে শেরী, শ্যাম্পেন, সেক্স, ওম্যান। চিয়ার ইউ মাই বয়।

চানক-কাটাই চলছে। মিছিরবাবুর সঙ্গেও সমঝোতা হয়ে গেছে। সে

যে নিজস্ব ঠিকাদারী কোম্পানী খুলে দিয়েছে বলে তার কারবারে ঢিলে দেবে তা চলবে না। সেসব আগের মতই তৎপরতার সঙ্গে চালাতে হবে। কারণ উনি ওঁর ভাইপোদের চেয়েও জয়কে বেশি বিশ্বাস করেন।

ফলত, জয়ের কাছে দিবারাত্রি সমান হয়ে গেল। সোমবার সকালে সপ্তাহের কাজ শুরু। রবিবারের সকালে শেষ। ঐ একটি দিন বিশ্রাম। জয়ের কপালে তাও জোটে না। সকাল দিকটা কুলি-কামিনদের দেনা-পাওনার জের মেটাতে হয়। হাট-বাজার, দোকান-দানি যেতে হয়। তাছাড়া যত অকাজের কাজগুলি রবিবারের জন্যই জড় হয়ে থাকে।

ঘরবাস তো একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। সাতখরিয়ায় নতুন চানকের কাছেই একটি দু' কুঠুরি মাটির ঘর বানিয়ে নিয়েছে। তার একটিতে অফিস। অন্যটিতে শোয়াবসা। সামনে একফালি বারান্দা বাঁশের খুঁটিতে ভর দিয়ে ঝুলে আছে। অফিস-ঘরে একটি টেবিল ও খান দুই চেয়ার আছে। শোবার ঘরে একটি তক্তা। বারান্দায় একটি দড়ির খাটিয়া। রাত্রিকালে খোলা আশমানের নিচে খোলা খাটে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। তখন সেই নীল পরীটা ডানা মেলে তার কাছে উড়ে আসে। মধুর কণ্ঠে গান শোনায়।

পাশেই লক্কা ও মুগীর সোহাগ-বাসর। জয় চোখ মেললেই দেখতে পায় তাদের আহার, নিদ্রা ও মিথুনের দৃশ্যাবলী। গা-গরম হয়ে যায়। মনে হয় দুনিয়ায় সবারই জন্য প্রেমের হাট খোলা আছে। শুধু তারই জন্য দরজা বন্ধ। অথচ ইচ্ছা করলে কত যুবতী পায়ের কাছে লোটাবে। কিন্তু কেন ইচ্ছা করে না? অথবা ইচ্ছা করে, সাহসে কুলায় না। ওদের মত সাহস ওর নেই।

ওহো! একি বেদনা হে! মন পুড়ে যায় মনের আগুনে।

সেদিন ছিল শনিবারের সন্ধ্যা। হপ্তা হাজরি পেয়ে দিনপালির কুলি-কামিনরা বড় বড় হাঁড়ায় মদ নিয়ে এসেছে। শুয়োর কেটে মাংস তৈরি করেছে। তারই ছাল-চামড়া পোড়ানোর দুর্গন্ধের সঙ্গে মদের ফেনিল তরঙ্গ ভাঙছে ওদের নাচে ও গানে। রাত পালিওয়ালারা খাদে আছে। সাহেবের কড়া হুকুম—রাত পালি ডিউটিওলাদের পেমেণ্ট হবে রবিবার সকালে। না হলে সব মদ খেয়ে ফিলাট হয়ে যাবে।

বিকেলে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। রুখু মাটিতে বৃষ্টির জল পড়ামাত্র উইপোকারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ফর ফর করে উড়ে এসে পড়ছে লন্ফ বাতির শীষে। সোঁদা গন্ধ উঠছে মাটিতে। জয় শুয়ে আছে সেই খোলা খাটটিতে। লক্কার গলা জড়িয়ে মুগী আদি রসের গান ধরেছে। যার মর্ম কালকে আমার নাগর ছুটু পারা ছিল আজকে কত ডাগর হয়েছে।

তাই শুনে জয়ের হাসি পাচ্ছে। গান শেষ হবার পর সেও কেমন হয়ে

গেল। লঙ্কা মুগী, বুধনা রাসমণির মত জয় কাবেরীও যদি এমন ধারা প্রেমে ডুবে যেতে পারত —কিন্তু তা কি হবে?

টিক্ টিক্! কোথায় যেন একটা টিকটিকি সত্য হাঁচি দিল।

জয়ের শরীর ও মনে একটা হ্যাঁচকা দোলা লাগল। যা আছে কপালে কাল রবিবারে সে একবার যাবেই লাক্ ট্রাই করতে। মনস্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠল।

পরদিন দৌড় দৌড় করে কাজকর্ম সেরে বিকেল বেলায় নেবু নাপিতের কাছে দাড়ি কামাল। স্নান সেরে শার্ট ফুলপ্যাণ্ট পরে হাঁটুতক মোজা ও কাঁচা চামড়ার জুতো পায়ে দিতেই মেজাজটা শরিফ হয়ে উঠল। সাহেবদের মত মাথায় টুপি লাগিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হতেই নিজেকে কোন রূপকথার রাজপুত্র বলে মনে হল। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে রক্তরাগের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

পাঁচ

রাস্তা অনেকটা। ঘণ্টা দুই ঘোড়া ছুটিয়ে কাবেরী কুটিরে পৌছাল। দারোয়ান মতি সিং ওকে দেখেই চিনতে পারল। একটু হেসে সেলাম দিল। সাহেবদের মত নড করে ও ভিতরে ঢুকে পড়ল। মনে মনে ভাবল প্রথম অভ্যর্থনাটা নেহাৎ মন্দ হয়নি। যতটা ভাবছিল তা নয়।

মোরাম রাস্তার উপর কয়েক কদম যাওয়ার পরই বাড়িটার সদর দরজা। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামতেই টুসী ঝি একহাত জিভ কেটে বলল —ওমা! জামাইবাবু! সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিল। জয় খুব খুশি। মচ্ মচ্ শব্দে বারান্দা পার হল। ভিতরে তখন বরিয়ার মাইফেল চলছে। সঙ্গীতের সুমিষ্ট ঝঙ্কার। কাবেরী ভাবাবিষ্ট হয়ে সুরের ঝর্ণাধারা বইয়ে দিয়েছে। মন্মথ ঘোষ পাখোয়াজে সঙ্গত.করছে। দুজন বিশিষ্ট অতিথি তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে গান শুনছেন।

সেই জম-জমাট আসরে মচ্ মচ্ শব্দে পা ফেলে খোলা দুয়ারে দাঁড়াল ফ্রেমে আঁটা ছবির মত। স্বাভাবিক বাইজী ঢঙে নতুন আগন্তুকের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করে যেমন কুর্নিশ করে কাবেরী স্বীয় স্বভাববশত সেই মুদ্রায় তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে হাতটা তুলেই থেমে গেল।

হঠাৎ তাল ভঙ্গ। গানেও ছেদ। যে হাতে কুর্নিশ করতে যাচ্ছিল সেই হাত আঁচল টেনে মাথায় ঘোমটা দিল।

অতিথিরা বিরক্ত। তাঁরা গানের গমক, গিটকিরী ও তেহাই মাফিক ঝমাঝম বকশিশ ফেলে গান শুনছেন। তাল ভঙ্গ সহ্য করবেন কেন? কটমট করে জয়ের দিকে তাকালেন।

কাবেরী বললেন —মাফ করবেন বাবুজী। আমি এখুনি আসছি। উঠে দাঁড়িয়ে জয়কে বলল —ভিতরে এস।

জয় এতটা আশা করেনি। মনে তো ভয় গুড় গুড় করছিল। আবার গানের আসর দেখে ভেবেছিল —না জানি হিরোইন কত বিরক্ত হবে। তা নয়। রীতিমত আন্তরিক আপ্যায়ন। হে মা-কালী মুখ রেখো মা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। কাবেরী ওকে পালঙ্কটা দেখিয়ে বলল —বোস! একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে বলল — ইস্! কত ঘেমে গেছ।

জয়ের ভিতরটা কুল কুল করছে। তবে সে সদা সপ্রতিভ। ওর দিকে তাকিয়ে বলল —অনেকদূর রাস্তা তো। ঘোড়াটাও খুব জোর ছুটেছিল।

—কোথা থেকে আসছ?

—পানমোহরা থেকে।

—সাতখরিয়ায় নতুন ঠিকা পেয়েছ? খুব কাজ করছ শুনলাম।

জয় হাসল। বলল —এসব খবর কোথায় পেলেন?

—ওমা! তুমি আমাকে আপনি আজ্ঞে বলবে নাকি?

সদা সপ্রতিভ জয় অপ্রতিভ হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল— না। মানে —আপনি হুকুম দিলেই তুমি বলব।

—আমার হুকুমের অপেক্ষা করে সিঁদুর পরাতে এসেছিলে? জান না— আমার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

জয় এবার একটা উত্তর খুঁজে পেল। বেশ আবেগ দিয়েই বলল —বড় নিকট, বড় আপন। তবু মনে হয় তুমি যেন কত দূরের। ঐ আকাশের গায়ে রামধনুর মত।

কাবেরী খিল্ খিল্ করে হেসে বলল—এই তো বুলি ফুটেছে। টুসী সরবৎ নিয়ে আয়। আমি বাবুদের সঙ্গে কথা বলে আসছি।

কাবেরী পাশের ঘরে চলে গেল। টুসী এল সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে। জয় বেশ আয়েস করেই তা খেল। টুসী বলল —জামা-কাপড় ছাড়বেন তো জামাইবাবু?

—হ্যাঁ। তা ছাড়লে হয়। কিন্তু আমি তো পরবার কিছু আনিনি।

—গুরুজীর কাচা ধুতি আছে। পরবেন?

—বেশ।

টুসী একটা ধুতি দিয়ে গেল। জয় তা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাবেরী আবার ঘরে ঢুকে বলল —অতিথিদের বিদায় করে দিয়ে এলাম। যদি জানতাম তুমি আসবে তবে বসাতামই না।

জয় বলল —আমার কি আসার ঠিক ছিল? কত ভয়ে ভয়ে এলাম।

—ওমা। কিসের ভয়? কাবেরীর চোখ ভুরু সকৌতুকে নেচে উঠল। এ সেই ভ্রূভঙ্গ যা দেখে জমিদার থেকে ব্যারাকলউ পর্যন্ত মুগ্ধ। জয়ের তো কথাই নেই। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার পরেই বুঝতে পারল এটা তার অশোভন হচ্ছে। চোখ নামিয়ে বলল —একটু ভেবে বল তো সত্যি কি ভয় করে না?

কাবেরী গম্ভীর হবার চেষ্টা করেও হেসে ফেলল। বলল —হ্যাঁ! আমার সঙ্গে অত বড় একটা জাঁদরেল সাহেবের যা সম্পর্ক ছিল তাতে তোমার ভয় হতেই পারে।

তাহলে?

—সে সম্পর্কটা অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে আমি তোমার বউ। তুমি এই সম্পর্কটাকে কেমনভাবে নেবে জানি না কিন্তু আমি তো একটা হিন্দু মেয়ে। বিয়ে শব্দটার যাদু আমাদের রক্ত মজ্জায়। তাই প্রথমে যতই অমত করি তুমি যখন আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলে, সপ্তপদী করলে তখন যেন মনে হল তোমার সঙ্গে আমার জীবনটাও সাত পাকে বাঁধা হয়ে গেল। এ বন্ধন আর ছিন্ন হবার নয়। তখন থেকে সত্যিই আমি তোমার জন্য ভাবি। তোমার কাজের খবর রাখি। প্রতি শনিবার মতি সিং পানমোহরায় হাজরি নিতে যায় তার কাছেই তোমার খবর শুনি।

জয় ওর কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কেমন স্খলিত কণ্ঠে বলল —সত্যি নাকি?

—হ্যাঁ!

—অথচ আমি মনে করতাম তুমি কত দূরের —আকাশের নীল পরী।

কাবেরী খিল্‌খিল্‌ শব্দে হাসতে হাসতে বলল —ধোৎ! তুমি একটি আনাড়ী বর। বোস। আমি রান্নাবান্নার খবর নিইগে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখে জয় খুব খুশি। মাছের ডিম ভাজা, সরষে দিয়ে ইলিশ মাছ, রুই মাছের মুড়ো, বাসমতী চালের ফুরফুরে ভাত, শাক-সব্জি, মুগের ডাল, পায়েস, মিষ্টান্ন, দই, চাটনি।

ওহো! সুখাসনে সুখাহার। কাবেরীর হাতে তালপাতার পাখা। ছন্দে ছন্দে চুড়ির রিনিঠিনি। এটা খাও, সেটা খাও আবদার। এযে তোফা ব্যবস্থা হে!

এক-খিলি মিষ্টি-পান মুখে দিয়ে বাগানে পায়চারি শুরু করল। ঠিক এই পরিবেশে বিড়ির ধোঁয়াটা মানায় না। পকেটে সিগারেটও নেই। অথচ পেটে ধোঁয়া না গেলে এত খাদ্য পরিপাক হওয়া দায়। অবশেষে পেট ভুট-ভাট। দেওয়ালের পাশে গিয়ে একটি গাছের আড়ালে ফস্‌ করে বিড়ি ধরাল। আঃ! এতক্ষণে জীবনটা এল। বাব্বাঃ জামাই-আদরের ঠেলা বটে!

ধোঁয়াটা পেটে যেতেই মাথাটা সাফ হয়ে গেল। এত দূর যখন হয়েছে তখন বাকাটাও হয়ে যাবে মনে হয়। আহা-হা! ঐ নীলপরী তার বুকের পাঁজরে শিঙা ফুঁকছে হে। ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

সুখটান দিয়ে বিড়িটা দেওয়াল ডিঙিয়ে ফেলে দিল। বাইরের ঘরে এসে বসল। তখন সেখানে বিছানা পড়ে গেছে। সরিতা শুয়ে আছে ননীর পুতুলের মত। ঘুমে ন্যাতা হয়ে গেছে। জয় আলতো করে তার কপালে হাত রাখল। একটু একটু করে গালে ঠোঁটে চিবুকে আঙুল বুলিয়ে একটি চুমু খেল। মনটা তার ভরে উঠল। এ কাবেরীর মেয়ে। তারও। ব্যারাকলউ সাহেব জন্মদাতা হলেও বাবা বলবে তাকেই।

এক-গলা ঘোমটা মাথায় টুসী এসে—বলল—আসুন জামাইবাবু! বিছানা হয়ে গেছে।

ওকে অনুসরণ করে সেই ঘরটিতেই ঢুকল। তখন তার সাজ-সজ্জা বদলে গেছে। ধবধবে বিছানার চাদর। বালিশগুলোয় নতুন ওয়াড়। লণ্ঠনের মৃদু আলো। সারা ঘর এক আশ্চর্য সুগন্ধিতে মহ-মহ। ফুলদানিতে টাটকা গোলাপ গুচ্ছ।

সারাজীবন ঝোলা খাটে, ছেঁড়া চটে অঘোর ঘুমে রাত কাটিয়েছে। আজ হঠাৎই এই রাজসিক শয্যায় শোওয়া দূরের কথা বিছানাটায় হাত দিতেই গা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

টুসী সে ঘর থেকে সরে গেছে। ও একা বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। নবীন গোঁফের রেখায় হাত বুলোল।

কাবেরী ওর পিছন দিক থেকে বলল—কি দেখছ? গোঁফগুলো এখনো ঠিক পুরুষ্ট হয়নি?

জয় হেসে ফেলল। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় পাশাপাশি দুটি হাসি মুখ আয়নায় প্রতিবিম্বিত হতে দেখল।

জয়ের তো তাক লেগে গেছে। ওরে বাব্বাঃ! এ আবার কোন বেহেস্তের হুরী! কি তার খোঁপার বাহার! ঢল ঢল চোখে প্রণয়ঘন আবেশ। নীলাম্বরী নায়িকার সহজভাবে দাঁড়ানটাই যেন নাচের মুদ্রা। এতরূপ যে দেখে আশ মেটে না। সাধে কি আর ওর জন্তে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই বেঁধেছিল।

কাবেরী বলল—তোমাকে সেদিন যতটা কচিকাঁচা মনে হয়েছিল ততটা তুমি নও। ভিতরে পাক ধরে গেছে।

—কি করে বুঝলে?

—তোমার চোখের তারায় চঞ্চল চাতুরী দেখে।

—বাঃ। তুমি বেশ সুন্দর কথা বলতে পার তো।

—তাই নাকি। মুচকি হেসে কাবেরী দরজায় খিল লাগিয়ে দিল।

জয় পালঙ্কের উপর হাঁটু মুড়ে বসেছে। ওর ভিতরটা গুরগুর করছে। আঙুল কাঁপছে। বলল —তুমি যে আমাকে এত সহজে এমন আপন করে নেবে তা আগে ভাবিনি।

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ! কিন্তু সাহেব বলেছিলেন —ওকে তুমি কোনভাবেই ডিসটার্ব করবে না। সত্যি বল তো —আমি কি তোমাকে ডিসটার্ব করছি ?

—তাহলে কি তুমি এই বিছানায় বসতে পেতে ? জান —বিয়ের পরে থেকেই আমি তোমাকে মনে মনে কামনা করতাম। তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে ?

—বল কি কথা ?

—এই যে তুমি আজ এসেছ তা কি আমার রূপ যৌবনের মোহে ?

জয় অকপটে স্বীকার করল —রূপ যৌবনের মোহ কাকে বলে তা আমি জানি না। তোমাকে বিয়ে করার পর থেকে কি যে হয়ে গেল যখন তখন তোমার মুখটাই কত বিচিত্র ভঙ্গিতে আকাশের বুকে ফুটে উঠতে দেখতাম। তোমাকে পাবার আশা কোনদিনই করতাম না। তবে এই যে এসেছি তা তোমাকে আরেকবার ভাল করে দেখতে।

—আচ্ছা! তুমি আমার সব পরিচয় জান ?

—তা জানি।

—আমিও তোমার পরিচয় জানি। তোমার বাবাকে জানতাম ছোটবেলা থেকেই। উনি আমার পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে দিতেন। তালে ভুল হলে গুরুজী সপাং করে চাবুক বসিয়ে দিতেন। আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত। তোমার বাবা আমার চোখ মুছিয়ে দিতেন।

বলতে বলতে কাবেরীর চোখে জল উপচে পড়ল। এমন আনন্দবাসরে জয় তার হতভাগ্য বাপের কথা স্মরণ করে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলল।

কাবেরী বলল —যাক্ গে এসব কথা। তুমি আমাকে একটা কথা দেবে ?

—কি কথা ?

—বিয়ে বিয়ে খেলা আমার জীবনে অনেক হয়ে গেছে। কতভাবে কত বাসরই না জেগেছি। কিন্তু বারকুলি সাহেবের কাছ থেকে আসার পর আবার যে কোন পুরুষের কাছে আমাকে আসতে হবে তা ভাবিনি। তবু তুমি এলে ন্যায্য দাবি নিয়ে। আমি তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসা দেব। কিন্তু আমার জীবনে এই যেন শেষ বিয়ে হয়। আর কোন পুরুষের কাছে যেতে না হয়।

—কথা দিলাম। সেজন্য আমাকে কি করতে হবে ?

—তুমি আমাকে সৎভাবে ভালবাসবে ?

—নিশ্চয় !

—আমাকে ছেড়ে দেবে না ?

—কখনো না।

—ব্যস। আবার কি ? এস—জয়ের দুই বাহুতে হাত রেখে মুখটি বাড়িয়ে দিল। পলকে প্রলয়। জয়ের মাথায় ফটাফট বাজি ফুটতে শুরু হল। সে যে এত স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু কখনও এমন দৃশ্য দেখেনি। ওর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করে এমন এক মনোহারী দৃশ্য ও রূপসজ্জার নায়ক হয়ে উঠল যে তার সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল।

কাবেরীর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। শরীরের কানায় কানায় কামনার উথাল-পাথাল ঢেউ। রতি অনভিজ্ঞ জয়কে সে সচেতনভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিম্ন নাভির অনুচ্চ উপত্যকায়। নারীদেহের চৌম্বক ক্ষেত্রে।

জয় বিমুগ্ধ। কাবেরীর অঙ্গবাস যত উন্মোচিত হচ্ছে তত সে আবিষ্ট হয়ে পড়ছে। নেশাখোরের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যখন ও সম্পূর্ণ নগ্নিকা হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল তখন জয়ের মনে হল কোন অপ্সরা বুঝি কামদেবের মনস্তুষ্টির জন্য নৃত্য শুরু করেছে। এ রমণী তার জন্য নয়। সে শুধু এই অলৌকিক দৃশ্যের দর্শকমাত্র। তাই বিস্ফারিত লোচনে নারীমূর্তির নগ্ন বিভঙ্গের মোহজালে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তার কাছে হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দুটি মেলে দিল।

ছয়

ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

চারিদিকে শুধু নিন্দা ও ধিক্কার। জয়চরিত্র তার বাপের চেয়েও ঘৃণ্য জঘন্য হয়ে উঠেছে। পানমোহরা, সাতখরিয়া, শেরগড়, সালুঞ্চীর সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র সে।

জনে জনে গুজগাজ ফুসফাস—শুনেছো জয়ের কীর্তি ? আরে নাড়ীর ব্যাটার ঘোড়ারোগ।

--কি রকম ? কি রকম ?

—জানো না ? আরে সেই যে জমিদারবাবুর নাচমহলের নাচুনী, বারকুলি সাহেবের রাখনি—জয় তাকে বিয়ে করেছে।

—ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ! যেন ছেরা গুয়ে পা দিয়েছে এমনি তার মুখভঙ্গি !

—বেশ্যা সংস্রব মহাপাপ হে !

—শালা ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে।

—ওর বাপের চেয়েও এককাঠি সরেস।

—এ ব্যভিচার চলতে দেওয়া চলবে না। জয়কে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

এই সেই গ্রাম্য গোঁড়ামি। বার্তা ছুটছে ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামান্তরে। জয়ের মা খবর শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন।

আহা! বেচারী স্বামীর আমলে পেট ভরে ছেলে পেয়েছে ভাত পায়নি। সেই ছেলের মুখ টিপলে দুধ বেরুবে আর পড়ে গেল আধবুড়ী বেশ্যার পাল্লায়। হায় হায়! সব গেল। ওর মা, সৎমা ঘরে মড়াকান্না জুড়ে দিল। বিলাপের ভাষায়প্রাইমারী ইস্যু —আমার সোনার চাঁদ রোজগেরে ছেলেকে ডাইনী বশ করে নিয়েছে। আঁটকুড়ি, গতরখাকী, সাতভাতারী বেউশ্যে মরে যা —মরে যা! হে ঠাকুর! তে-রাত্তির যেন পার না হয়। আঙুল মটকে শাপশাপান্ত দিতে থাকে।

জয় তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে শনিবারটির জন্য।

সারা সপ্তাহের হিসেব নিকেশ দেনাপাওনা মিটিয়ে দেয়। রবিবারের পেমেণ্ট দিতে খাজাঞ্চিবাবুকে ঠিক করেছে। ওর চানক কাটাইয়ের কুলি-কামিনদের দেখাশুনা করতে লঙ্কাকে ফিট করে দিয়েছে। কটা চামড়া ও নীল চোখ হওয়ার দরুন কুলি-কামিনরা সব লঙ্কার বশ মেনে নিয়েছে।

অতঃপর সব বিলি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে স্নান সেরে, চুলে আলবেট কেটে, গোঁফে আতর, চোখে সুর্মা টেনে প্রিয়া সম্ভাষণে যায়। পৌছতে কোন কোনদিন রাত দুপুর হয় তবুও তার জন্য সেজেগুজে বসে থাকে কাবেরী। বাতায়নে চোখ রেখে ঘোড়ার টগ্‌বগ্‌ শব্দ শোনে।

তারপর সারারাত প্রমোদ বিহার। জয় তখন মোহগ্রস্ত। সারা সপ্তাহের সঞ্চিত বাসনা উজাড় করে ঢেলে দেয়। সকালে আর ঘুম ভাঙে না।

রবিবার ছুটির দিন। সাহেবরা খানাপিনা, আমোদ প্রমোদ, ড্যান্স ড্রামা, সেক্স, লিকার, গীর্জা ও প্রার্থনা নিয়ে মশগুল থাকেন। কুলি-কামিনরা হাটবাজার, কাপড়কাচা, স্নান করা নিয়ে দিনমান কাটিয়ে দেয়। সন্ধ্যালগ্নে গুলাবী নেশায় নাচগান, ঝগড়া বিবাদ, সেক্স ছিনালী নিয়ে উন্মত্ত। জয়ের খোঁজ কেউ রাখে না। সেও ডুবে থাকে রঙ্গিণী নটীর লীলাবিলাসে।

সোমবারে কারো খোয়ারী ভাঙে কারো ভাঙে না। কিন্তু জয় ভোর না হতেই হাজির সাতখরিয়ার চানক মুখে।

যথারীতি সেদিনও ভোরবেলায় ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে গা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। কেমন সব মধুময়। ঠোঁটের আগায় একটি বিদায় চুম্বনের চিনচিনে রেশ। হঠাৎ সুর কেটে গেল। সাতখরিয়ার চানক মুখে পৌছেই দেখে সব ছাই।

ঘর দুয়ার ঝুপড়ি পুড়ে গেছে। কুলি-কামিনরা কেউ কেউ পালিয়েছে। কেউ কেউ আছে। এক মাতাল দম্পতি ও তাদের দুটি সন্তান পুড়ে আঙার হয়ে গেছে।

একটি ছুটি করে কুলিকামিন ও তাদের ন্যাংটো উদোম ছেলে মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। দুঃখের কথা শোনাল। আগুন লাগার বিবরণ দিল লম্বা — শনিবার রাত্রে ঢোল ঠুকা করে মদ খেয়ে নাচগান করেছিল। যেখানে সেখানে পড়ে ঘুমিয়েছিল। উনুনের আগুন কেউ নিভিয়েছিল কেউ নেভায়নি। যে মাতালটি মারা গেছে তার ঘর থেকেই প্রথম ধোঁয়া বেরিয়েছিল। তারা সগুষ্টি বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। লম্ফ বাতি থেকেই হোক বা উনুন থেকেই হোক আগুনটা ওর ঘরেই প্রথম ধরেছিল। ধোঁয়া নাকে লাগতেই আমরা উঠে পড়েছিলাম। আপন আপন ছানাপোনা জিনিসপত্র বাইরে টেনে আনতে আনতেই ঘর গুলান বেবাক পুড়ে গেল।

রবিবার সকালে মিছিরবাবুর সঙ্গে বারকুলি সাহেব এসেছিলেন। আপনার খোঁজ করছিলেন। সাহেব বলেছে —আপনি ফিরে এসেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

শুনেই আক্কেল গুড়ুম। একি সাংঘাতিক অঘটন! ও থাকলে নিশ্চয় এমনটা হত না। কারণ শনি রবিবার কুলি-কামিনরা নেশায় বেহুঁশ হয়ে থাকে বলে ও নিজে খুব সতর্ক থাকে। ধাওড়ায় ঘুরে দেখে। কেউ মদ খেয়ে লাট হয়ে গেলে ধোলাই করে। কাজেই রাশছাড়া ব্যাপার কিছু ঘটত না। এবম্বিধ দুর্ঘটনার কৈফিয়ত দিতে তার উপর ব্যারাকলউ সাহেবের ফরমান জারি হত না। এইবার কার বাপের সাধ্যি তাঁর রুদ্রমূর্তির কাছে দাঁড়ায়?

জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে মুর্দাগুলো কি করলি?

—কি করব বাবু? উয়ারা তো পুড়েই গেইছিল। দামুদরে ফেলে দিএ্রে এসেছি। শিয়াল কুকুরে খাবেক।

—হে ভগবান! তুরা কাল রেতে কুথায় ছিলে?

—গাছতলাতেই ছিলাম। বাব্বাঃ যা জাড়। হাড় গুলান টাঠুরে গেল।

—আচ্ছা। আজকেই ব্যবস্থা করে দিব। তুরা কাজ শুরু কর। আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ছেঁড়া পোড়া কাপড়-চোপড়, কাঁথা-কানি, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যে সব হতভাগ্য কুলিকামিন রাত্রের শিশির ও দিনের রোদ খাচ্ছিল তারা একে একে চানক মুখে জড় হল —হেঁই মারো হেঁইয়ো শব্দের তালে তালে রসা টানবার জন্য।

ততদিনে দুটি চানকেই কাঠের ভেরিক খাড়া হয়ে গিয়েছিল। মোটা রসা (দড়ি) পুলিচাকা পার করে এক প্রান্তে ঢাউস একটা কামার মিস্ত্রীর তৈরি বালতি আংটায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত। অন্য প্রান্তে কাঠ বেঁধে রাখত জোয়ালের মতন করে। কামিনরা সব জোড়ায় জোড়ায় সেই কাঠ ধরে রসা টানত। বালতি উঠে আসত নিচে থেকে। এই ছিল প্রিমিটিভ চানক কাটিং।

সমকালীন ঘটনা দুর্ঘটনা ও সুখদুঃখের অনুভূতি নিয়ে একজন ছড়া কাটত অন্যেরা সেই তালে হেঁইয়ো বলে পা ফেলত।

লম্বা চানকের নিচে পাথর কাটে মুগী উপরে রসা টানে। জন দুই থাকে বালতি টেনে ধরতে। এইভাবেই কাজকর্মের ভাগাভাগি। লম্বার হাঁক ডাকে যে যার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজের জন্য তৈরি। বুড়া হরিলাল হাঁক দিল—

জুয়ান ব্যাটা বিটিরা হুঁশিয়ার!

সকলে —হুঁশিয়ার!

হরিলাল – ঘর গেল দুয়ার গেল।

সকলে —হেঁইয়ো!

হরিলাল —আগুনে পুড়ে ঝামা হল।

সকলে —হেঁইয়ো!

হরিলাল —মাতলা বুড়া মরে গেল।

সকলে —হেঁইয়ো!

হরিলাল —হিসাব নিকাশ ফারখৎ।

সকলে —হেঁইয়ো!

হরিলাল —মুগীর নাকে নতুন নথ!

খিল্ খিল্ খিল্ খিল্।

কামিনরা সব হেসে লুটিয়ে পড়ে। মৃত্যু শোকের হিসাব নথ দিয়ে ফারখৎ করে দেয় বুড়া হরিলাল। কাজ চলে জোর কদমে।

মিঃ ব্যারাকলউ তখন পানমোহরা অফিস থেকে চানক দিকে যাচ্ছিলেন। জয় সেলাম করতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হাতের হাণ্টার নাচিয়ে বললেন —ফাকিন্ ঠিকাদার! তোমার ধাওড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেল, লোক মরে ভূত হয়ে গেল, কুলি-কামিন পালিয়ে গেল আর তুমি এতক্ষণে আসছ সুরত দেখাতে। শনিবার থেকে কোথায় ছিলে?

জয় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বলল —স্যার আমার দোষ হয়ে গেছে। এইবারটি মাফ করে দেন।

—আঃ। ফাকিন্ কুত্তেকে বাচ্চে—যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও।

—আমার বাড়িতে একটু কাজ ছিল স্যার, তাই—

—নো। তুমি বাড়ি যাওনি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি তুমি প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় চলে যাও। সোমবার আসো। কোথায় যাও?

—স্যার! জয় ওর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। সাহেব তৎক্ষণাৎ ওর মুখে সবুট লাথি মেরে হাণ্টার তুলে দিলেন ঝেড়ে।

মিছিরবাবু থপ্ থপ্ করে ছুটে আসছেন। জয়কে যে এমন অবস্থায় পড়তে হবে তা উনি কালকেই জেনে গেছেন। জয়ের গতিবিধিরও পুরো খবর

রাখেন। তাই উনি সাত সকালে পানমোহরার হাজির হয়েছেন। দূর থেকেই হাত তুলে বলতে শুরু করলেন —হুজুর! ইয়ে নাদান ছোকরার কসুর মাফ করিয়ে দেন। আপনি দেওতা আছেন সাব।

ছুটে আসার দরুন ঘন ঘন হাঁফাচ্ছেন।

সাহেব বললেন — তুমি জানো না মিছিরবাবু এই ছোকরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছে। জানে না আমি ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বের করে নিতে পারি। হিজ ফ্লেশ অ্যাণ্ড ব্লাড সেপারেট করে দিতে পারি।

সাহেবের সেই রুদ্রমূর্তির সামনে মিছিরবাবু ছাড়া কে দাঁড়াবেন? জয় তো প্যাণ্টে পেচ্ছাব পায়খানা করে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ধারে পাশে কেউ নেই। সব ফুটফাট কেটে পড়েছে। দূর থেকে মজা দেখছে।

মিছিরবাবু বললেন। হুজুর! ইয়ে ছোকরা সরমের লিয়ে সাচ বাত বোলতে শেখছে নাই। হামি সব পাত্তা লাগায়েছি। ও ব্যাচারী ভারী মুহাব্বতে ফাঁসিয়ে গেছে।

—মুহাব্বৎ! আই মীন লাভ। বাট টু হুম? কার সঙ্গে?

—আপনার জানানার সঙ্গে।

—হোয়াট ননসেন্স! ওর ওয়াইফ তো মেয়ার এ চাইল্ড।

—নেহী হুজুর। উ চাইল্ডকা মাদার।

—মেক ইট ক্লিয়ার। ব্লাডী ওল্ড হ্যাগার্ড!

সাহেবের প্রচণ্ড গর্জনের মুখে ভীষণ মোলায়েম স্বরে উনি বললেন,

—হুজুর, ইয়াদ করুন। হাপনি মজুদ থাকিয়ে উয়ার সাদী দিলেন।

—হোয়াট? ইউ মীন কাবেরী?

—হাঁ হুজুর।

সাহেব থতমত খেয়ে গেলেন যেন। অবিশ্বাস্য ঘটনা। এমন অপ্রস্তুত উনি কখনো হননি। বললেন —তুমি কাবেরীর কাছে গিয়েছিলে?

জয় তখন ধাত ফিরে পেয়েছে। বলল —হাঁ স্যার।

—স্ট্রেইঞ্জ! সে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে?

—হাঁ স্যার!

সাহেবের তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। ভেতরটাতে রাগ, ঈর্ষা, জ্বালা ও বিস্ময় একই সঙ্গে ক্রিয়া করে যাচ্ছে। মিছিরবাবু তার ব্যাখ্যা পেশ করলেন।

—হুজুর! হিন্দু জানানার পতিভক্তি বহুত সাঁচ্চা। হাপনি যব উয়ার বিয়া দিয়া দিলেন, তব তো পতিকো পূজা করনাহি হোগা।

এতক্ষণে সাহেবের বোধোদয় হল। মনে পড়ল অহল্যার আত্মদান। সতীত্ব এবং পতিপূজা যে হিন্দু মেয়েদের জীবনে কি পরম বস্তু তা আরেকবার বুঝলেন। বললেন —আই সী! দিস ইজ ট্রু!

জয় বলল —আপনি আমার গডফাদার স্যার। দোষ মাফ করে দিন।

সাহেবের হাণ্টারটা সস্নেহে ওর কাঁধ স্পর্শ করল। উনি ওর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। জয়ের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। বুট এবং হাণ্টারের সক্রোধ আঘাতেও যা হয়নি তাই হয়ে গেল স্নেহের স্পর্শে। টপ্ টপ্ করে গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল।

সাহেব গডফাদারের ভঙ্গিতেই বললেন —নেভার মাইণ্ড মাই বয়! জীবনে অমন দু-চারটে কুলি-কামিনও মরে, ধাওড়াও পোড়ে। বুট হাণ্টার খেতে হয়। তার জন্য মহাকালের ঘোড়া থেমে থাকে না। প্রসিড!

ছয়

কিন্তু ও কোথায় প্রসিড করবে। বাড়িটা তো অশ্রুগর্ভ। সেখানে শুধু কান্নার হাট। শাপ-শাপান্তের বান বন্যা।

সারাদিনের চেষ্টায় কাঠ, বাঁশ, খড, যোগাড় করে কুলি-কামিনদের ঘর বানাতে দিল। নিজের ঘরটাও ওদেরকে দিন কয়েকের জন্য ছেড়ে দিল। তারপর বাড়ির রাস্তা ধরল। শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন। দুপুরে সেরখানেক মুড়ি আর দুটো বাসি চপ ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। শনি-রবিবার স্বপ্ন সোহাগের খোয়ারী ও আজকের বুট হাণ্টারের ঘা শুকোতে যা দরকার তার নাম একথালা গরম ভাত, এক রাত টানা ঘুম।

ভাতটা অবশ্য জুটল। পেটে খিদে চনচন করছে। আলু ভাতে, পোস্ত বাটা ও কলাইয়ের ডালে অমৃতের আস্বাদন। কয়েক গ্রাস বেশ তৃপ্তি করেই খেল। কিন্তু তারপরই ওর মা, সৎমায়ের যুগলবন্দী সঙ্গত শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

এই এক গ্রাম্য মেয়েদের স্বভাব দোষ। কেন? ব্যাচারীর খাওয়াটা শেষ হলে পর বলতে পারত না? তা নয়। শুরু হল দুজনের পালা করে পালা গান —এ তুই কি করলি বাবা? আমরা যে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। নিন্দা মন্দতে কান পাতা-দায়। কত লোকের কত খোঁটা। কত ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, উপহাস। সাহেব নাকি তোকে হাণ্টার দিয়ে পিটিয়েছে। এসব কোন মায়ের সহ্য হয়?

জয় অধৈর্য হয়ে বলল —তোমরা যা জান না তা নিয়ে কথা বল কেন? সাহেব যেমন মেরেছেন, তেমন আদরও করেছেন।

—কিন্তু ঐ বেশ্যাটাকে কেন বিয়ে করলি বাপ?

—সাহেবের হুকুমে।

—নিজের জাত ধর্মের চেয়ে সাহেবের হুকুম বেশি হল?

—হ্যাঁ হল। কারণ তোমার, আমার, ভাইবোনদের পেটের ভাত, গায়ের কাপড় তার দয়াতেই জোটে। এই বিয়েটা না করলে সাহেব আমাকে কলিয়ারী থেকে তাড়িয়ে দিতেন।

—তাই বলে এত পাপ করবি ব্যাটা?

—পাপ! জয় তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল —কিসের পাপ? যে ভাত কাপড় দেয় তার হুকুম তামিল করি। অগ্নিসাক্ষী করে যাকে বিয়ে করেছি তাকে স্ত্রী বলে মানি।

—কিন্তু ওটা যে বেশ্যা?

প্রবল প্রতিবাদে জয় ফেটে পড়ল —কে বানিয়েছে? জমিদারের মত কামুক লম্পটেরা। আর জান আমার বাবা ওর পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে দিত। ভুলিয়ে ফুসলিয়ে জমিদারের পায়ে উৎসর্গ করত। সেই উচ্ছিষ্ট ভোগী বাপে যে পাপ করেছিল আমি বেশ্যা স্ত্রী পালন করে তা স্খালন করছি।

ওর মা ডুকরে কেঁদে উঠল —হায় হায় বাবা! ওই ডাইনীটা তোকে এমন করে বশ করেছে। মায়ের কথাতেও কান দিস না। বাপের নামে কালি দিস। চিরকাল দুখ ভিখ করে তোকে মানুষ করলাম। এই প্রতিদান দিলি?

—আঃ। অত ভ্যান ভ্যান করো না তো।

থালা আছড়ে উঠে পড়ল।

ব্যস্! শুরু হয়ে গেল মা ও ভাইবোনদের কান্নার কোরাস। ভগ্নকণ্ঠের বিচিত্র বিলাপ বহুল ধ্বনিতে ভাবনা, সমস্যা ও অশ্রুজলের প্লাবন বইতে লাগল অবিরাম। শুনতে শুনতে জয় বধির হয়ে গেল।

ব্যারাকলউ সাহেব ইঞ্জিন ঘরে দাঁড়িয়ে বললেন —এই লাস্ট ইঞ্জিনটা এখানে বসল!

মিঃ জোন্স বললেন —তা কেন বলছেন স্যার?

—ও হো! এর পিছনে একটা ইতিহাস আছে মিঃ বাসু, তুমি তো জান এই ইঞ্জিন এবং অন্যান্য সব মেসিনারী পানমোহরার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। বাট আনফরচুনেটলী আমার মিসেস তখন আমার উপর ভীষণ রাগ করে ফাইন্যান্স বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমিও দমে যাবার বান্দা নই। পানমোহরার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে ফেললাম। তারপর সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। মিসেস নিজেই উদ্যোগী হয়ে সবকিছু পাঠিয়ে দিলেন। অ্যাণ্ড নাউ উই ডিজায়ার সাকসেস!

—সিওর!

নতুন বয়লারে আগুন গমগম্ করছে। চিমনী দিয়ে গল্‌গল্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। স্টিমের চাপ উঠেছে একশ বিশ পর্যন্ত। ঝক্‌ঝকে প্রেসার গজে

ঝাঁটাটা কাঁপছে। গোটা এলাকাটা বয়লারের শব্দে রন্‌রন্ করছে। কানের পাতা দুটো ভরাট শব্দে ঝম্ ঝম্ করছে। এতদিন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। কলিয়ারীতে বয়লার আর ফ্যান না চললে তার আবহমণ্ডল ভরাট হয় না। এ যেন রঙ্গমঞ্চে আবহ সঙ্গীত।

এটা সেটা নাটবল্টু টাইট, এডজাস্টমেণ্ট, ওয়েলিং, গ্রীজিং, ফাইন্যাল চেকিং ইত্যাদি যেমন চলছে অন্যদিকে তেমনি মা-কালীর পুজো দিয়ে বয়লারে সিঁদুর লেপাও চলছে। বয়লার খালাসী মনসুর আলী, ইঞ্জিন খালাসী হাবু ডোম, ফিটার মিস্ত্রী আবদুল গফুর তটস্থ।

তখন বেলা তিনটে। সাহেব হুকুম দিলেন —চালু কর।

মনসুর স্টিম ভাল্ব খুলে দিল। হাবু লিভার টেনে ধরল। ব্যস্।

পিসটন রড এগিয়ে গেল —এক-দুই-তিন-চার-ফুলস্পীড। ঝক্-ঝক্-ঝক্ঝক্। ইঞ্জিনের ড্রাম বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল।

ট্রায়াল সাকসেসফুল।

ব্যারাকলউ সাহেব খুব খুশি। সবারই সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক শুরু করলেন।

জয়কে বকশিশ দিয়ে বললেন —ওয়েল ডান মাই বয়। তোমার কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট।

—ধন্যবাদ স্যার। জয় হাসল কিন্তু মুখের উপর ম্লান ছায়া। সাহেব সেদিকে লক্ষ্য করে বললেন —তুমি এত চিন্তিত কেন জয় ?

—না স্যার। তেমন কিছু নয়।

—আমি বুঝেছি মাই বয়। ঠিক আছে। তোমাকে আমি প্লিজেণ্ট সারপ্রাইজ দেব।

সাত

শনিবার ইঞ্জিন ট্রায়ালের দিন।

জ্যোতিষীদের মতে কয়লা শিল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর শনিদেবতার সু বা কু প্রভাবের বড়ই গুরুত্ব। ব্যারাকলউ সাহেব অতসবের ধারধারেন না। শনিবারটা উনি ট্রায়ালের দিন ধার্য করেছেন এই জন্যে যে যদি ট্রায়াল সাকশেসফুল হয় তবে রবিবারের ছুটিটা জমবে ভাল। কুলিকামিন, বাবুভেইয়া, সাহেব-সুবো সব স্ফূর্তির দরিয়ায় গা ভাসিয়ে দিতে পারবে।

ব্যাপারটা সবারই কাছে গ্রহণীয়। বিশেষ করে বাসু সাহেবের। তিনিই পানমোহরা চালু করেছিলেন। আবার সাতখরিয়াতেও তিনি। মা-কালীর পরম ভক্ত। শনি মঙ্গলবার মায়ের পুজো দিয়ে শুভকার্যের শুরু হওয়ার ব্যাপারে তাঁর একটা সংস্কার জন্মে গেছে। সাহেবও উগ্র সাহেবীয়ানায় তা

নস্যাৎ করে দেন না। তিনি নেটিভদের ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত না করে কাজে লাগিয়ে নেন।

সকাল সাতটার মধ্যেই হাজির হয়েছেন। পানমোহরা থেকে মিঃ জোন্স এসেছেন। একজন সাহেব ইঞ্জিনীয়ার তো লেগেই আছেন। সবাই খুব সিরিয়াস। ইঞ্জিন, বয়লার, হেডগিয়ার, চিমনি সব পরীক্ষা চলছে। জয় এতগুলি সাহেব, একপাল কুলি-কামিন ও একরাশ যন্ত্রপাতি হেফাজৎ করতে ব্যস্ত। সে চানক কাটাইয়ের ঠিকাদার। ফাউণ্ডেশন তৈরিও তারই ঠিকাতে। ইঞ্জিন ট্রায়ালের কাজে তার ভূমিকা গৌণ। কিন্তু ব্যারাকলউ সাহেবের আশীর্বাদে সেই হয়েছে মুখ্য। যার যা দরকার ডাক পড়ে জয়ের।

একটা ঘোড়া ওর ঘরের দুয়ারেই থামল। ঠেসানো দরজা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে কোট ফুলপ্যাণ্ট টুপি পরা যে সাহেব ছোকরা নাগরা জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ তুলে ঢুকল তার দিকে এক পলক তাকিয়েই জয়ের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

সাহেবটি হাতের চাবুক টেবিলে আস্তে করে ঠুকে বলব —টুমি কি করিয়েছ ম্যান ?

জয় মুচকি হেসে বলল —ঐ মুখটা আমার বুকের ভিতর এমন ভাবে গেঁথে আছে যে কোন রকম ড্রেস পোশাকেই তা লুকোতে পারবে না।

—যদি এক জোড়া গোঁফ লাগিয়ে নিতাম।

—তবুও।

—ও মা! তবে তো মজা হল না। বলতে বলতে মাথার টুপিটা খুলে খিল্ খিল্ শব্দে হেসে উঠল। সে যেন জলতরঙ্গের লঘু লহরা। সরু গাঁথুনীর দু'সারি দাঁত, তারমধ্যে উপরের সারিতে ডানদিকের কোরাশে একটি দাঁত তেরছা ভাবে বসান। এই সামান্য ত্রুটিটুকু অসামান্য সৌন্দর্যে ঝলসে উঠল। জয় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। ওর দিকে অপলকে চেয়ে আছে।

—তুমি কি গো ? আমাকে বসতেও বলছ না। ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে টুক্ করে একটা চুমু খেয়ে বলল।

জয় ওকে বুকে চেপে ধরে বলল —আমি ভাবতেই পারছি না যে তুমি আমার এই খড়ের ঘরে এসেছ।

—কেমন অবাক করে দিলাম তো ?

—দারুণ। কিন্তু তুমি এই রাত্রে এলে কী করে ?

—কেন ঘোড়ায় চড়ে।

—সে তো বুঝলাম। কি করে বুঝলে যে আমি তোমার জন্য হাদুসে গেছি।

—ওমা! সাহেব যে লোক পাঠিয়েছিল।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ সন্ধ্যার মুখে. রজন শেখ গিয়ে বলল —মেমসাব! সাহাব খবর পাঠিয়েছে এক্ষুণি আপনি সাতখরিয়ায় জয়বাবুর কাছে যান। আমার তো ভীষণ ভাবনা হয়ে গেল। কি জানি কোন বিপদ-আপদ হল নাকি ?

জয় হেসে উঠল। বলল —ও হো! এটাই তাহলে সাহেবের প্রিজেন্ট সারপ্রাইজ। বকশিশটা ফাউ।

ওর মনটা হাল্কা হয়ে গেল। সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আরো একশো ডিগ্রী বেড়ে গেল। বলল —চল। অফিস বন্ধ করি। তুমি এসেছো তারপরে কি আর কাজ হয় ? এসো।

অফিস বন্ধ করে তার পাশেই শোবার ঘরটিতে এল। বলল —তুমি একটু বোস। আমি কাউকে ডাকি। খাবার দাবার ব্যবস্থা করি।

কাবেরী বলল —ওহো! তোমার জন্য মিষ্টি এনেছি। ছাখ কেমন ? তোমার মুখটি দেখে সব ভুলে গেছি।

তাই তো স্বাভাবিক। নর ও নারীর, প্রেমিক ও প্রেমিকার বিরহ মিলন নিয়েই তো জগতের যাবতীয় শিল্প সুষমা। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কি যে ‍দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে, মিলনের জন্য কত যে উন্মুখ হয় তা পরিমাপ করার যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গের ভোল্টেজ মাপতে পারি। বড় বড় মেশিন চালাতে পারি। অনায়াসে সিঁদকাঠি চালিয়ে ধরিত্রীর গর্ভাশয় ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারি।

জমিদারের নাচমহলে সতীত্বের বিনিময়ে সহবৎ শিখেছে কাবেরী। সেই সঙ্গে রতিরঙ্গের চৌষট্টি কলা। গলায় গান আছে মাটির বুকে ফুল ফুটিয়ে দেবার মত। আর নাচের ছন্দে নিজেই ফুটে উঠতে পারে স্থল পদ্মের শতদল হয়ে।

জয়ের বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। সে যেন দাঁড়িয়ে আছে কোন অলৌকিক দৃশ্যের সামনে। সেখানে এক অপ্সরা নেচে নেচে শরীর থেকে খুলে ফেলছে কোট, ফুলপ্যান্ট, শার্ট। কেরোসিন বাতির হলুদ শিখায় তার বর্ণ ও লাবণ্য চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। কটিতটে মাংসস্তূপের সুচারু বিন্যাসে, নিম্ন নাভির ঢেউ খেলানো উপত্যকায় ভ্রমরকৃষ্ণ দ্বীপে-দীপান্বিতা উৎসবের অশান্ত উচ্ছ্বাস।

এক পলকের একটা প্রলয়। অসংবৃতার অমোঘ আহ্বান। তুচ্ছ করে কার সাধ্য ? জয় হারিয়ে যায় সেই গহীন অরণ্যে। বয়ে যায় রাত্রির প্রহর। মস্তবড় শীতের রাত নিমেষে শেষ হয়। আলুলায়িতা, অসংবৃতা নায়িকার মুখ দুই তালুতে ধরে জয় বলে —কাবেরী! এত রূপ যৌবন নিয়ে তুমি আমারই প্রতীক্ষা করেছিলে এই কথাটা যখন ভাবি তখন মনে হয় এত ভাগ্য আমি কোথায় পেলাম ?

—সত্যি বলছ ? তুমি আমাকে নিয়ে সুখী হয়েছ ?

—খুউব !!

বারাঙ্গনার বারোমাস্যায় প্রণয় ব্যাকুল মধুর ক্ষণ। কাবেরীর অন্তর ভালবাসার নিখাদ বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে।

আট

একটা আশ্চর্য সুখের ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রোদে পা মেলে বসে আছে জয়। কাবেরী চলে গেছে। কিছু অসমাপ্ত কাজ শেষ করেই জয় কাবেরী কুটিরে যাবে বহুদিন পর পাওয়া একটা রবিবারের ছুটি এনজয় করতে।

ভাবটা কেটে গেল ওর ভাই নাড়ুগোপালকে দেখে। সে বয়ে নিয়ে এসেছে জমিদারের হুকুম। জয়ের উপর এটাই তার শেষ হুকুম। মান্য না করলে উনি অ্যাকশনে নেমে পড়বেন।

নাড়ু বলল —একবার চল দাদা। যাহোক কিছু একটা কর। না হলে মায়ের কান্না দেখতে পারছি না।

জয় স্বগতোক্তি করল —গিয়েই আর কি হবে ? সেই তো এক কথা।

তবুও সে গেল। যদি কোন রকমে শেষ রক্ষা হয়।

জমিদারের কাছারি বাড়ি তখন গমগম করছে। চন্দনবাবু চেয়ারে বসে গোফ চোমরাচ্ছেন। তার ইয়ার দোস্তরা ঘুর ঘুর করছে। জয়ের শ্বশুর মিত্রঠাকুর মশাই গলায় কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার পাশেই হরিহরবাবু। আরো সব গাঁয়ের মুরুব্বি, গোমস্তা, পাইক পেয়াদা লোক লস্কর। এমন কি তার মা ও সৎমা মাথায় ঘোমটা দিয়ে দেওয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে। স্বভাবতই তার অন্যান্য ভাইবোনরাও সেখানে হাজির।

জয় একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল।

চন্দনবাবু গলায় শ্লেষ দিয়ে বললে —কি হে লাটের-বাঁট ডেকে পাঠালে আসা হয় না কেন ?

জয় উত্তর দেবার আগেই বাবুর ইয়ার শ্রীপদ মণ্ডল বলল —কাজের ভাতার তো।

নগেন সেন যোগ করল —সাহেবের কুকুর। বেশি প্রভুভক্ত।

জয়ের গায়ে বিছুটির জ্বালা। বলল —ভগবান করেন যেন আমি কুকুরের মতই বিশ্বাসী প্রভুভক্ত হতে পারি।

—বাঃ বাঃ। কেমন কথা শিখেছে ভাখো।

—হবে না ? সাত ভাতারী প্রেমের গুরু হরদম কানে মন্ত্র দেয়।

— পাখী পড়া করে শেখায়।

ইয়ার দোস্তদের শ্লেষ বিদ্রূপে অন্যান্য মুরুব্বিরাও বিরক্ত। একজন বললেন —এবার কাজের কথা হোক বাবু।

—হাঁ-হাঁ। কাজের কথা। চন্দনবাবু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন—শোন জয়গোপাল। তোমার নামে অনেক অভিযোগ। হাজার রকম নিন্দা বদনাম। তোমার জন্য সমাজটাই কলুষিত হতে বসেছে। এখন ভেবে ছাখো —তোমার মত সবাই যদি একটা করে বেশ্যা স্ত্রী নিয়ে আসে তবে আর গ্রামের সমাজ থাকবে না। বেশ্যাখানা হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর —তোমার ঐ ঢ্যামনা বউটিকে ছেড়ে দাও।

ব্যস্। জাজমেণ্ট হয়ে গেল। কোর্টে মামলা উঠলে তার শুনানী হয়। আসামীকে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। জমিদারের আদালতে তার কোন প্রয়োজন নেই বলেই ওঁরা মনে করেন।

জয় একা প্রতিবাদী। রায় বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রতিবাদীর কিছু বলার থাকে না। জয় তা জানে। এখানে কোন আবেদন, নিবেদন, প্রতিবাদের নিয়ম নেই। তবু বলল —ছোটবাবু। বিয়ে করা স্ত্রীকে যদি ছেড়ে দিই তবে সে কোথায় দাঁড়াবে?

গণেশবাবু বৃদ্ধ গোমস্তা। ওর বাপের আমলের লোক। বললেন —ও কি তোর ভরসায় দাঁড়িয়ে আছে রে? ওর পিছনে বড় বড় কাপ্তান। তুই আর কটা দিন বিয়ে করেছিস। আমি ওকে এতটুকু থেকে দেখছি। ও কালনাগিনী। ওর দাঁতের বিষ যার লাগবে তার সর্বনাশ হবেই। বারকুলি সাহেবের মতন লোক ল্যাজে গোবরে হয়ে গিয়েছিল। শেষে ওকে বিদায় করে তবে হালে পানি পেল। তবে সাবধান করে দিচ্ছি —ভালয় ভালয় ওকে ছেড়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর! বুঝলি?

—আমি কি পাপ করেছি গোমস্তা কাকা যে প্রায়শ্চিত্ত করব?

—ঐ বেশ্যা সংসর্গ।

—সে পাপ থেকে কটা লোক মুক্ত আছে বলতে পারেন?

চন্দনবাবু বললেন —তোমাকে এখানে তর্ক করার জন্য ডাকা হয়নি। এই আমাদের আদেশ। মানবে কিনা বল?

—বিনাদোষে স্ত্রীকে ত্যাগ করার পাপ ধর্মে সইবে কেন?

শ্রীপদ মণ্ডল আড়ঠেকা দিল —বেশ্যা স্ত্রী হয় এ কথা তোমার কাছেই শুনলাম হে।

—যাকে বিয়ে করা হয় তাকেই স্ত্রী বলে। এই কথাটি বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে।

চন্দনবাবু বললেন —ওসব ইস্ত্রী ফিস্ত্রী আদিখ্যেতা রাখ হে।

নগেন সেন যোগ করল —ওকে তুমি আবার নাচমহলে পাঠিয়ে দাও।

শ্রীপদ বলল —প্রভুর পায়ে নিবেদন কর।

—সেখানেই তো নিবেদিত ছিল। রাখতে পারলেন না কেন? বড়বাবু তো অনেক চেষ্টা করেছিলেন তবে তার অভিশাপে কুকুরের মত মরতে হল কেন? মাতৃহরণ করতে গিয়েছিলেন বলেই তো।

চন্দনবাবুর মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বললেন —শ্যালা বেজন্মা! তোর এত সাহস যে আমার মুখের উপর এমন কথা বলিস?

সমানভাবে জয় উত্তর দিল—হ্যা বলি। কারণ পরস্ত্রী লোভীকে আবার রেয়াত কি?

—রেয়াত এই! পা থেকে জুতো খুলে জয়ের গালে ঠকাস্ করে বসিয়ে দিলেন।

ঘটনাটা বড়ই অকস্মাৎ। কেউ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। জয় জুতো খেয়েই পিছিয়ে গেল। দ্বিতীয়বার জুতো তোলার আগে নাগালের বাইরে চলে গেল। জয়ের মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। চন্দনবাবু তাকে ধমকে উঠলেন —থাম হারামজাদী! এখুনি কি? তোর ব্যাটাকে আগাপাস্তালা ধোলাই করব।

জয় বলল —নিজের ঘরে পেয়ে তা আপনি করতে পারেন ছোটবাবু। কিন্তু আমার এলাকাতে গেলে আমিও বদলা নিতে পারি। কথাটি মনে রাখবেন।

—হাঁ। এতবড় কথা। এই পেয়াদা ধর ব্যাটাকে।

পেয়াদারা হাঁক ডাক শুরু করে দিল। জয়ের মা ও ভাইবোনেরা তাদের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। চন্দনবাবু আবার একবার ধমক দিলেন। তখন ওরা গর্জন করতে করতে এগিয়ে গেল। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই জয় দেউড়ী পার হয়ে গেছে। ওর ঘোড়া কদম চালে ছুটছে।

চন্দনবাবু চেয়ারে বসতে বসতে বললেন —যত্তসব অকর্মার ঢেঁকি।

কাছারি বাড়ি থম্ থম্ করছে। জয়ের মা ও ভাইবোনরা কাঁদছে। গোমস্তাবাবু বললেন —আর কেঁদে কি করবে মদনের বউ? তোমার ছেলের কথা তো শুনলে। এর ফল তো তোমাকে ভোগ করতেই হবে।

মিত্রঠাকুর বললেন —তাহলে আমার মেয়ের গতি হল না বাবু?

চন্দনবাবু রাগে গস্ গস্ করতে করতে বললেন —তোমার মেয়েকে কি আমি বিয়ে করেছি? যাকে বিয়ে দিয়েছো তাকে তো জুতো পেটা করলাম। এর পর ওর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে জুতো বানাব। এ্যাই পেয়াদা ও ব্যাটাকে যেখানে পাবি ধরে নিয়ে আয়।

জয়ের মায়ের মাথায় বজ্রপাত হল। সে যত কাঁদে ওর জ্ঞাতিরা ওকে তত টিটকিরি দেয়। এরপর চন্দনবাবু ঘোষণা করলেন —জয়গোপাল আজ

থেকে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত। বুঝলে জয়ের মা ওকে তুমি ত্যাজ্যপুত্র কর। নাহলে তোমাদের ঘরগুষ্টিকে সমাজচ্যুত করা হবে।

জয় যখন সাতখরিয়ায় ফিরে এল তখন ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না। রাগে ক্ষোভে, অপমানে ওর সারা অঙ্গ জ্বলছে। একটা বিষের ছুরি আমূল ঢুকে গেছে ওর হৃৎপিণ্ডে। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত কেটে ফালা-ফালা করে দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সে যখন ছট্‌ফট করছে তখন উৎসব-মত্ত কুলি-কামিনরা একটি-দুটি করে তার কাছে ছুটে আসছে। টলটলে পায়ে লঙ্কা ছুটে এসেছে। তার পিছনে মুগী।

কোনরকম ভূমিকা না করেই লঙ্কা বলল—বাবু! জমিদারের ব্যাটা তুমাকে জুতা মেরেছে?

জয়ের পক্ষে এই অপমানকর কথাটা কানে শুনতেও গা রী-রী করছে। হ্যাঁ শব্দ উচ্চারণেও জড়তা। লঙ্কা আবার বলল—আমাকে একটি হুকুম দাও বাবু, শ্যালার লাশ নামাঞে দিই গা।

জয়ের ভিতরে রাগ তখন এমনভাবে শন্‌-শন্‌ করছে যে চন্দনবাবুকে মার্ডার করার ষড়যন্ত্র করেই ফেলে। অন্যান্য কুলি-কামিনরা বেশ গরম। হঠাৎ দামু ঘোষ ছুটে এসে বলল—তেই বাবু আপনার হাতে ধরে বলছি হঠকারিতা করবেন না।

লঙ্কা রাগে লাল। ঝাঁঝ দিয়ে বলল—ঈ-কি বলছো হে বাবু? রাগে সারা গা জ্বলছে আর তুমি বলছো হঠকারিতা!

মুগী যোগ দিল—লি মরদা মরদ।

দামু বলল—তুরা বাবুকে রাগাস না। মাথার উপর সাহেব আছেন। তাঁর হুকুম না নিয়ে কিছু করতে যাবেন না বাবু। আম্মর কিরা রইল।

জয় সত্যিই থমকে গেল। সাহেবের কথাটা এতক্ষণ ওর মনেই ছিল না। তাছাড়া কাবেরী এখনো কিছু জানে না। দামু ঘোষ কথাটা মনে পড়িয়ে দিয়ে ভাল করেছে। বহু কষ্টে কুলি-কামিনদিকে বিদায় করে সারাটা দুপুর একাই কাটাল। এমন বিরস, এমন যন্ত্রণাক্ত প্রহর ওর জীবনে এই প্রথম। ক্ষণেক্ষণেই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। বার-বার মনে হচ্ছিল—লঙ্কাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ওর হাত খুব সাফ। পলকের মধ্যে একটা চাকু আমূল বিঁধিয়ে দিতে পারে। ব্যস্‌। জুতোর বদল চাকু।

কিন্তু বংশানুক্রমিক মধ্যবিত্ত খানদানের ভীরুতা তার পথের উপর কাঁটা বসিয়ে দিচ্ছিল। সাহেবের কাছে কি করে মুখ দেখাবে সেটাও ছিল প্রশ্ন।

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যে। হঠাৎ সেই ঘোড়ার খুরের খট্‌খট শব্দ। জয়ের বুকটা ছলাৎ করে উঠল। কাবেরী ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল।

অস্ফুট কণ্ঠে জয় বলল—তুমি?

—হ্যাঁ। মতি সিংহের কাছে খবর পেয়েই ছুটে এলাম।

—ভালোই হল। একা সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল একটা মার্ডার করেই ফেলি।

কাবেরী তক্তার উপরে বসে বলল —কেন করলে না বল তো? জমিদারের রক্তে পাপ। আমার মনে হচ্ছে জানো —যদি ভীমের মত আমার একটা স্বামী থাকত —যে ঐ কুত্তার বাচ্চাকে ফর্দা ফাঁক করে দিতে পারত তবে আমি দ্রৌপদীর মত রক্তপান করতাম।

কোন মেয়ে যখন প্রতিহিংসায় দ্রৌপদী হতে চায় তখন তার বুকে দশটা বয়লারের স্টিম হস্ হস্ করে। কাবেরীরও তাই। পানমোহরার জমিদার গোষ্ঠীর কাছে সে যেভাবে অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছে তাতে ওর হিংসা-বৃত্তি আগুনের মত জ্বলবে সে আর বেশী কথা কি?

দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় পিতামাতার বালিকা কন্যাকে জমিদার রাধাগোবিন্দ রায় নাচ মহলে এনে তুললেন। তেরো বছর বয়সে তিনি স্বয়ং তার নথ মোচন করলেন। কাবেরী হল নাচ মহলের নাচুনী। কিন্তু চরিত্রটি ঠিক গণিকার মত ছিল না। জমিদারকে স্বামী মনে করত।

তাই যেদিন জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্র চম্পক কুমার তাকে ভোগ করতে এল সেদিন সে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। পরিষ্কার বলে দিল আমি তোমার মা। আমার উপর জবরদস্তি করলে মাতৃহরণের পাপ লাগবে।

অনিবার্যভাবে তার কপালে জুটল অশেষ লাঞ্ছনা। সহ্য করতে না পেরে রাত্রির অন্ধকারে সঙ্গীত গুরু পিতৃ প্রতিম মন্মথ ঘোষকে নিয়ে পালিয়ে গেল। ধরা পড়ল ব্যারাকলউ সাহেবের হাতে। তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন, প্রেম দিলেন এবং সন্তানও দিলেন। জমিদার বাবু সেখান থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেবার কম চেষ্টা করেননি। দাঙ্গা, ফৌজদারী, মামলা মোকদ্দমা সবই হয়েছিল সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু সাহেবও তাকে শেষপর্যন্ত রাখতে পারেননি। মিসেস ব্যারাকলউয়ের প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে তার জন্য কিছু ধানজমি ও একটা বাড়ি বরাকর নদের পাশে কিনে দিয়ে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে সঙ্গীতগুরু তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন তিনিই এবার তাকে বিয়ে করবেন। কিন্তু যাঁর সঙ্গে পিতা পুত্রীর সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।

তাই তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হল জয় গোপালের সঙ্গে। তবুও দুর্ভাগ্যের শেষ হল না। এখন এই জয়ের সর্বনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সেই জমিদারের তৃতীয় পুত্র চন্দন কুমার। ক্রোধ তো হবেই।

ওরা দুজনে ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে গিয়ে জয়ের অপমান ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা চেয়ে বসল।

দীর্ঘ আলোচনার পর উনি বললেন ডোণ্ট ওরি। জমিদারের যদি জমিদারীটাই না থাকে তবে কিসের গরমে রোয়াবি করবে? আমি সেই ব্যবস্থাই করব। তোমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর।

কাবেরী বলল —আমরা কি সেদিন দেখার জন্য বেঁচে থাকবো? —ওঃ সিওর।

নয়

ভরা আশ্বিনের সাতালী বহালে সবুজ ধানের চারা বুকে থোড় নিয়ে গর্ভিণীর পুলকে বাতাসে দোল খাচ্ছে। সাতখরিয়া দেউলটির খন্না ভাঙ্গায় সাদা কাশফুলের নয়নাভিরাম দৃশ্য। যেন সবুজ প্রেক্ষাপটে সাদা সাদা পাল তোলা নৌকা হেলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে। ওদিকে দক্ষিণদিগন্তে দামোদরের দু'কানা জলের স্রোতোধারা। তারপরই বাঁকুড়া জেলার প্রান্তসীমায় বিস্তীর্ণ তালবীথি। ঘন সবুজ গাছ-গাছালি। প্রকৃতি তার যাবতীয় রূপসজ্জায় নিজেকে সাজিয়েছে মা দশভুজাকে স্বাগত জানাবার জন্য। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে আগমনী সঙ্গীতের সুর।

সেই কাশবনের মধ্যে জয়ের জন্য লাল টালির বাংলোটা তৈরি হয়ে গেছে। আট দশটি ঘর, কিচেন, বাথ, আস্তাবল। এক একর জায়গা জুড়ে বাউণ্ডারী দেওয়াল। তার ভিতরে একটা ইঁদারা।

এই বাংলোটার সামনে দাঁড়ালে জয়ের বুকটা আনন্দে ভরে যায়। সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা থাকে না। এখানে সে বাস করবে। এটাই কি স্বপ্নের জগৎ?

বড় কষ্টে দিন কাটছে। সংসার ছড়িয়ে গেছে। পানমোহরার গ্রামে আছে মা ভাইবোনরা। কাবেরী তার নিজের কুটিরে। তাছাড়া কাজ তো দিনরাত চলছে। এতগুলি টানা পোড়েনে সে বেশ বিব্রত। দেবীপক্ষের শুক্লা ত্রয়োদশীতে গৃহপ্রবেশ। তখন সবাইকে এক ঠাঁই জড় করবে। এই টানা-টানির দিন শেষ হবে। পানমোহরার জমিদারকে দেখিয়ে দেবে তার সমাজের বাইরেও আরো সমাজ আছে। যেখানে মানুষ সেখানেই সমাজ। জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাবে?

গৃহপ্রবেশের দিন একটা অনুষ্ঠান করবে। বন্ধু, বান্ধব, হিতৈষী ও কুলি-কামিনদিকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। সাহেবদের বাংলোতে ডালি পাঠাবে —আঙুর, আপেল, কাজু, পেস্তা, কাটুলী, মুরগী ও স্কচ হুইস্কী। জয় কাবেরী দুজনেই গিয়ে দিয়ে আসবে।

দুর্গাপূজার ঢাক বাজছে। বলি হচ্ছে। বাজি পুড়ছে। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের প্রাণবন্যা উপচে পড়ছে। নবমীর দিন কলিয়ারীতেও ছুটি

হয়ে গেল। দশমীর দিন সকালে জয় যাবার জন্য পা বাড়াল মাকে প্রণাম করতে ও ঐ সঙ্গে সেখানকার বাস উঠিয়ে চলে আসবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে। নাড়ুগোপালকে দিয়ে সেকথা বলে পাঠিয়েছে।

দামু ওর সঙ্গ নিল। মাঝাপথে এসে জুটল লক্কা ও রামলগন।

—আরে তোমরা কি জন্য যাবে?

জয়ের কথার জবাবে রামলগন বলল—বাবুজী! একবার ধোঁকা খাইয়ে হাপনার শিখায়েৎ হয় নাই?

জয় কথা বাড়াল না। গাঁয়ে ঢুকতেই গা-টা ছম্-ছম্ করছে। এই তার গ্রাম। এই মাটি মেখে সে মানুষ হয়েছে। আজ তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্য এসেছে ভাবতেই ওর বুকটা মুচড়ে ওঠে। বাইরে থাকতে এত কথা মনে হয় না। কিন্তু এইসব ঘর দুয়ার, গাছগাছালি, পথঘাট দেখলে কত কথাই না মনে হয়।

একপাল ছেলেমেয়ে, পুরোহিত, ঢাকী ও লোকজন ঢাক বাজাতে বাজাতে নবপত্রিকা বিসর্জন করতে যাচ্ছে। ওরা ঘোড়া থেকে নেমে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

কে একজন মন্তব্য করল—ঐ জাতখেকোটা কি জন্য এসেছে?

অন্য একজন বলল—আহা! আসুক। মায়ের টান! মাটির টান! পুজোর দিনে কি কারো বাইরে থাকতে মন চায়?

জয় ভেবে আশ্বস্ত হল যে তাকেও সমবেদনা জানাবার লোক গাঁয়ে আছে।

ঢাকঢোল কাঁসি বাঁশী বাজিয়ে সেই দলটা দুটো বাচ্চার কাঁধে হলুদ কাপড়ে মোড়া বাঁশের তৈরি ছোট পাল্কীতে নবপত্রিকা চড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। দুয়ারে দুয়ারে বৌ ঝিরা দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখল।

উঠোনে পা দিয়েই জয় ডাকল—মা!

ওর মা বললেন—জয় এলি? বোস!

কেমন নীরস অভ্যর্থনা। বোনটা কাছে এল। ওকে কোলে তুলে নিল ও। ওর মা রান্নাঘরে ঢুকেছেন। আর বেরুচ্ছেন না। জয় তখন রান্না চালটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ওর মা বললেন—আহা! রান্নাঘরে উঠিস্ না বাবা।

—কেন উঠবো না মা? আমি তো জুতো খুলে দিয়েছি।

—তা হোক। উনি মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

জয় অবাক। তাকে দেখামাত্র যে মা হেসে কেঁদে সাত ঝুড়ি কথা বলতেন সে মায়ের মুখে কথা নেই কেন?

নাড়ু বাইরে কোথাও ছিল। খবর পেয়ে ছুটে এল। প্রথমেই একটা

প্রণাম করে বলল —বিজয়া প্রণাম হয়ে গেল দাদা।

ওর দেখাদেখি অন্যান্য ভাইবোনরাও ওকে প্রণাম করল। জয় তাদের এক আনা করে পয়সা দিল পট্‌কা ফুটোতে।

বলল —এসো মা। তোমাকে বিজয়া প্রণাম করি।

—ঐখান থেকে কর বাবা। আমার হাত জোড়া আছে।

জয় বেশ রাগ করেই বলল —বেশ তাই করছি।

দাওয়ার উপর ঠক্ করে মাথাটা ঠুকে দিল। ওর মায়ের সারা অন্তর তোলপাড় করে চোখ ছেপে জল গড়িয়ে পড়ল। মুখটা প্রায় উনুনের মুখে ঢুকিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন।

জয় বলল —ছোট মা —তুমি এস। তোমাকে প্রণাম করি।

—কর বাবা। দেখিস ছুঁয়ে দিস্ নে। উনি দু-পা এগিয়ে এলেন।

জয় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ওর আর ভাল লাগছে না। দেওয়ালের গায়ে মাটি দিয়ে বাঁধানো ধারির উপর বসে বলল —মা! দেউলটিতে নতুন বাংলো বাড়ি হয়েছে। সাহেব সব খরচ দিয়েছেন। সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। ত্রয়োদশীর দিন গৃহপ্রবেশের দিন ধার্য করেছি! নাড়ু তোমাদিকে বলেনি?

—হ্যাঁ বাবা। সব বলেছে।

—তা আমি বলছিলাম —জাত সমাজ তো সব গেছে তবে আর পানমোহরা গ্রামে কি জন্য থাকবে? সবাই মিলে ওখানেই থাকবে চল।

জয়ের মা নিরুত্তর। অনেকক্ষণ কেটে গেল। জয় অধৈর্য হয়ে বলল— কি হল মা? কথা বল।

ওর মা বললেন —বলে দে ছোট বৌ।

ওর ছোট মা একটু ইতঃস্তত করে বলল —আমাদের যাওয়া হবে না বাবা।

জয় চমকে উঠল। এ উত্তর সে আশা করেনি। বড় আশা নিয়েই এসেছে —মা ও ভাইবোনদিকে সে নিয়ে যাবে। জমিদারের নির্যাতন, নিত্য দিন লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে গোটা সংসারটাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু একি হল?

বেশ রাগ করে বলল —কেন হবে না ছোট মা?

উনি বললেন —ওখানে গেলে কি হবে বাবা?

—নিত্য অপমানের হাত থেকে বাঁচবে।

—ওখানে যে তার চেয়েও বেশি জ্বালা আছে বাবা।

—সে কি? কি জ্বালা বলতে চাইছো মা?

—আমরা কি তোর বেশ্যা বউটার হাততোলা খেতে যাব?

—মা! জয়ের মাথায় একটা হাতুড়ি পড়লেও সে এমন আর্তনাদ করে উঠতো না। একটু সামলে নিতেই শরীরের শিরা ও ধমনী বেয়ে শন্ শন্ করে রাগ উঠে গেল। উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল —মা। এখন তোমরা কার হাত-তোলা খাচ্ছো জানো? হপ্তায় হপ্তায় যে টাকা পাঠাচ্ছি তা কোথা থেকে আসছে জানো?

নাড়ু বলল —থাক দাদা। ওসব বলে কি করবে? ওরা কি গোঁ ছাডবে?

—নারে নাড়ু। সত্যি কথাটা ওদের জানা দরকার। সবাই মনে করে আমি ঐ বেশ্যা মাগীটার রূপের ফাঁদে মজে গিয়ে কুল নাশ করেছি। কিন্তু জানে না আমাদের একদানা অন্নের পিছনেও তার হাত আছে। তাকে বিয়ে করেছি বলেই আজ আমি ঠিকাদার। আজ ঘরে ভাতের অভাব নেই। ভাই-বোনেরা নতুন জামা-কাপড় পরে পুজো দেখতে যায়। আমি যতই গাধার মত খাটি, মাথা ঠুকে মরি না কেন সাহেবের দয়া না থাকলে একমুঠো ভাতও জোটাতে পারব না। তাই সাহেবের হুকুমে যেদিন তাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম সেদিন চোখের উপর সংসারের ভীষণ দারিদ্র্য, উপোষে আমশী ভাই-বোনেদের মলিন মুখগুলিই ভাসছিল। ওকে বিয়ে করে আমি তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। এর পরেও বলছ —জালা।

দীর্ঘ নীরবতা। ওর মা মুখ তুললেন। তাঁর লোল শীর্ণ গণ্ড বেয়ে দু'ধারা অশ্রু বাঁধনহারা বন্যার মত গড়িয়ে পড়ছে। বললেন —রাগ করিস না বাবা। আমরা সব জানি। তোর বউয়ের অনেক গুণের কথাও শুনেছি। কত ভেবেছি —তাকে বুকে নিয়ে চোখের জলে স্নান করিয়ে দিই।

জয় আবেগ দিয়ে বলল —তুমি কেন চোখের জল ফেলবে মা? সেই চোখের জলে আমার দুই মায়ের পা ধুইয়ে দেবে। তার সেবাময়ী মূর্তিটা দেখবে চল মা। কখনো তো দেখনি মা, একবার দেখলে সব ভুল ভেঙে যাবে। সে মা বলে ডাকলে তুমি মনে করবে এত সুমিষ্ট শব্দ জীবনে কখনো শোননি।

—তুই ওকে নিয়ে সুখী হ বাবা। আমি আজ বিজয়া দশমীর দিন হিয়া খোলসা করে তোকে আর তোর বউকে আশীর্বাদ করছি। মায়ের আশীর্বাদ বৃথা যায় না। তুই অনেক বড় হবি। ধনী মানী হবি। কিন্তু তোর সঙ্গে আমাদিকে জড়াস্ না বাবা।

একটু ভেবে জয় বলল—আচ্ছা মা—এমন যদি হয় যে সে আলাদা থাকবে। তোমাদিকে তার ছোঁয়া খেতে হবে না, তাহলে? অথবা যদি বল তবে সে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। তার যা কিছু সম্পর্ক আমার সঙ্গেই থাকবে। তোমাদিকে তার ছায়াও মাড়াতে হবে না। তাহলে?

তা হয় না বাবা। অত ধাষ্টামির কি দরকার?

ভীষণ আহত-কণ্ঠে জয় বলল – এই তোমার শেষ কথা মা ?

—হাঁ বাবা। আমাদের আরো ছেলেমেয়ে আছে। তাদের বিয়ে-থা দিতে হবে। সমাজে থাকতে হবে। একটা ছেলেকে ছেড়ে যদি বাকীগুলিকে সমাজে ঠাঁই দিতে পারি সেটাই কি ভালো নয় ? তুই রাগ করিস না বাবা।

জয়ের বুকটা ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল। এতবড় আঘাত তাকে কেউ দিতে পারেনি। এর কাছে কোন ছার চন্দনকুমারের জুতো। শেষবারের মত মরীয়া হয়ে প্রশ্ন রাখল —তবে কি ত্যাজ্যপুত্র থাকব মা ?

ওর মায়ের সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। উনুনের কালি ল্যাবড়ানো দেওয়ালটা ধরে মুখটা সেখানে গুঁজে দিল। জীর্ণ শীর্ণ পাঁজরগুলো হাপরের মত দুলতে লাগল।

জয়ের মাথাটা তখন বেবাক ফাঁকা। গোটা পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে। পায়ের নীচে ভূমিকম্প হচ্ছে। টলতে টলতে উঠোনটা পার হচ্ছে। দামু ঘোষ ওকে ধরে ফেলল।

জয় আবার চীৎকার করে উঠল —মা! আমি যাচ্ছি —কাবেরীকে ত্যাগ করে দিচ্ছি গে। বারকুলি সাহেবের ঠিকাদারি ছেড়ে দিচ্ছি গে। তুমি প্রসন্ন হও মা। আমি আমার ভাইবোনদের নিয়ে ভিখ মাগতে বেরুব।

ও পড়ে যাচ্ছিল। দামু ঘোষ সামাল দিল। রামলগন ছুটে এসে ওকে ঝাঁকি দিয়ে বলল —হিম্মৎ না টুটাইয়ে বাবুজী। চলিয়ে।

জয় কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত বলল —কোথায় যাব ?

লঙ্কা বলল —সাতথরিয়ায়।

দামু বলল —চলুন বাবু। বউদি আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবেন।

দামু ওকে জোর করে ঘোড়ায় তুলে দিল। ঘোড়া ছুটল গ্রামের সীমানা পার হয়ে কয়লা কুটির কালো শিলাস্তরের বিস্তীর্ণ অববাহিকায়। সমাজের কুটিল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে রূপ ও রূপোর অমোঘ আকর্ষণে। এইভাবে কত সমাজতাড়িত মানুষ বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে চলে গেছে। ভেঙে দিয়েছে সমাজের বাঁধন। গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ, নতুন মূল্যবোধ নিয়ে।

ওদের মায়েরা হাহাকার করে ফিরেছে —হায়! হায়! বুকের ধন। নাড়ী ছেঁড়া সন্তান। বিজয়া দশমীর দিন তাকে জন্মের মত বিদায় করে দিলাম। এক গ্রাস জল খেতে দিলাম না। এমন পাষাণী মা কেউ কখনো দেখেছো গো ?

দশ

সে এক ক্রান্তিকাল। উনবিংশ শতাব্দী বিদায় নিয়েছে। শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দী। একশ বছর যাবৎ কয়লা শিল্পে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। কত পরিবর্তন দেশের ইতিহাসে।

একদিন দামিনী, গোড্ডা, ভাগলপুরের মহুয়া বনে যে আগুন লেগেছিল, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরবের ডাকে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল তার ফলে যেমন সাঁওতালরা নিজ বাসভূমি ছেড়ে পালাতে পালাতে কয়লাকুঠির কালো পাথরে এসে আছড়ে পড়েছিল তেমনি আর এক বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিলেন বীরসা মুণ্ডা। রাঁচি, পালামৌ, হাজারিবাগ কম্পমান। একই পটভূমি। সেই শাসন, শোষণ ও যন্ত্রণার। ভূমি দখল ও বঞ্চনার।

মার-দাঙ্গা, গুলী-বন্দুক, তীর-ধনুক, টাঙ্গি-বল্লম, খুন-খারাবীর রক্তাক্ত পটভূমি থেকে পলায়মান মুণ্ডা সম্প্রদায় জীবন হাতে নিয়ে দৌড়ায় পালামৌর জঙ্গলে, মানভূমের পাহাড় ডুংরিও প্রান্তরে। দামোদরের জল ডিঙিয়ে পেঁাছে যায় কয়লাকুঠিতে।

সরদার, গোমস্তা ও আড়কাঠীর দল ভীত, ত্রস্ত, ছিন্নবস্ত্র, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মেয়ে পুরুষদিকে দু'মুঠো ভাতের লোভ দেখিয়ে ঢুকিয়ে দেয় খাদের অন্ধকারে। সেটা এতই ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে লঙ্কাও সরদার বনে গেল।

একদা মিঃ জেমন গ্রাণ্ডি কয়লাকুঠিতে নিরাপত্তার জন্য আইন রচনার কাজে হার ম্যাজেষ্টির নির্দেশে ভারতে কাজ করে গেছেন। মাইনস অ্যাক্ট পাশ হয়েছে। ২২শে মার্চ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তা বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কয়লা-কুঠির মালিকরা এখনো সে আইনকে উদাসীনভাবেই দেখছে। তাই উনি পরিদর্শন করতে এসেছেন এবং ভারতে চীফ ইনস্‌পেক্টার অফ মাইনস পদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কয়লাকুঠির মালিকরা নানাভাবে অনুষ্ঠান করছেন। উনি মিঃ ব্যারাকলউয়ের পুরনো বন্ধু। তাই তাঁর অভ্যর্থনা ও পানমোহরায় নবনির্মিত ক্লাব হাউসটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান করছেন।

ক্লাব ও ড্রয়িংরুম নিয়ে সাহেবদের বড় আদিখ্যেতা। তাঁরা এ দুটোকে প্রেষ্টিজ ইস্যু মনে করেন। তাই ক্লাবটাকে উনি মনের মত সাজিয়েছেন। বেশ বড়সড় হলঘর। নাচের মঞ্চ। ডাইনিং রুমে চেয়ার টেবিল। বার ও রসুইখানা। টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলার সাজ সরঞ্জাম। সাজানো বাগান ও লন। ইটের কেয়ারী করা, হেজ লাগানো মোরাম বিছানো রাস্তা। কম্পাউণ্ডের মধ্যে তিন-চারটি কটেজ। বিশিষ্ট অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য সুরা ও সাকীর তোফা ব্যবস্থা। ঘরে ঘরে খাট পালঙ্ক, আসবাবপত্র। হলঘরের

দেওয়ালে নানা বিভঙ্গের মিথুন মূর্তির চিত্র বিচিত্র কারুকার্য। বড় আয়না। ইচ্ছা করলে ঐসব ছবির মত ডিমোনেষ্ট্রেশন দিয়ে নিজেদের দেখে নিতে বাধা নেই।

পুরো পানমোহরা সেদিন আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল। বেঙ্গল কোল, ইকুইটেবল, টারনার মরিশন, ইস্ট ইণ্ডিয়া, শেরগড় কোল কোম্পানী, বীরভূম কোল কোম্পানী, জাডিন এণ্ডারসন, আপকার, বার্ণ প্রভৃতি কোল কোম্পানীর বিশিষ্ট সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সাহেবরাও নিজেদের মেম সাহেবদিকে নিয়ে এসেছেন।

জম-জমাট আসর। ফুল, ফুলদানী ও ফুলের মালায় ছয়লাপ। মিঃ গ্র্যাণ্ডিকে অভ্যর্থনা করার পর কিছু বক্তৃতা ও পানভোজন। শেরী, শ্যাম্পেন, চিকেন রোস্ট ও শিক-কাবাবের ছড়াছড়ি। ইওরোপীয়ান অর্কেস্ট্রায় রক্ত নাচানো সুর। সাহেবরা জোড়ায় জোড়ায় নাচগানে মশগুল। পার্টি চলছে—রাত বাড়ছে। ভাঙা চাঁদের আলোতে দিক-দিগন্ত ভেসে যাচ্ছে।

একটুক্ষণের বিরতি।

একজন ছোকরা সাহেব মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন —নাউ উই প্রেজেন্ট ইউ দ্যা কুইন অফ গজল—দ্যা ইণ্ডিয়ান লাভ সংস, মিসেস কাবেরী সরকার।

কাবেরী এসে মঞ্চে দাঁড়াল মনোমোহিনী মূর্তিতে। পরনে নীল বেনারসী শাড়ি। কানে ঝুমকো, পায়ে নূপুর। গলায় সাতনরী হার। বলয়, কঙ্কন, কেয়ূরের ছন্দোবদ্ধ শিঞ্জন। রাজ্যের স্বপ্ন ভর করে আছে দুই চোখের পাতায়। পানের রসে রাঙানো ঠোঁট। ঈষৎ চাপা চিবুক ও লম্বা গ্রীবা। ঘন কালো চুলের মনোহারী খোঁপায় লাল ফুল। সারা অবয়বে অনুরাগ রঞ্জিত ব্রীড়াময়া অভিসারিকার চঞ্চল তড়িৎ তরঙ্গ। যার একটি মুদ্রায় যুবক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত বেবাক সাহেবের চোখ ছানাবড়া। ছোকরারা বললেন—আঃ! বিউটি! বিউটি!

হাত জোড় করে অতিথিদিকে নমস্কার করল কাবেরী।

দর্শকদের প্রতিক্রিয়া তার জানা আছে। এটা তার নতুন নয়। এমন বহু আসরে নাচগান করেছে। কাজেই বিস্মিত বা অভিভূত হল না। সহজ, অনায়াস ভঙ্গিমায় শুরু করল আলাপ।

মন্মথ ঘোষের শরীর ভাল ছিল না। কিন্তু এই আসরে কাবেরীর গানের সঙ্গে তাঁকে সঙ্গত করতেই হবে। বড় মান-সম্মানের প্রশ্ন।

গান শুরু হল। প্রথম আলাপেই শ্রোতারা মুগ্ধ।

কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! ওয়াণ্ডার ফুল! চিয়ার্স!

ইত্যাদি ধ্বনিতে হল ভরে গেল।

গজলের রাণী সে। ওমরাও জান জাহার গুজল প্রাণভরে উজাড় করে মাঠ

দিচ্ছে। করুণে, কোমলে, হিল্লোলে ও চাপল্যে দর্শকদিকে জাদু করে নিয়েছে। এমনকি যে সাহেবরা ভারতীয় ভাষা বোঝেন না তাঁরাও তার অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্য, সুর তাল লয় ও দেহ ভঙ্গিমার অনিন্দ্য সুন্দর সুষমায় মুগ্ধ।

গান যে কতক্ষণ চলেছিল কে জানে? হঠাৎ অবশ হয়ে গেল মন্মথ ঘোষের হাত। তেহাই পড়ল না। কাবেরীর শরীরটা সেই লহরার ঠেকাতে গিয়ে ঠমক দেবার পূর্বেই থেমে গেল। আর্তনাদ করে উঠল—গুরুজী! সমানভাবে ঝঙ্কার দিল বেহালার ছড়।

দর্শকরা মনে করলেন এটাও বুঝি গানের ক্লাইম্যাক্স।

কিন্তু না! ক্লাইম্যাক্স হয়ে গেল এক সঙ্গীত গুরুর জীবনের।

যে মানুষটা সারা জীবন তাল যন্ত্রে লহরা করে এসেছেন তাঁর আঙুল এক জায়গায় থেমে গেল। মুখটা যন্ত্রণাক্ত। আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছিলেন। কাবেরী তাঁকে ধরে ফেলল। আসরে একটা হৈ চৈ উঠল। অতিথিদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে বললেন—প্যারালিসিস!

তাতে কার কী এসে যায়? কাবেরী হয়ত দিন কয়েক কেঁদে ভাসাবে। বৈদ্য, ডাক্তার, ওষুধ, ইঞ্জেকশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু মন্মথ ঘোষের হাতে পাখোয়াজ বাজবে না। মা সরস্বতীকে তার ইন্তেকাল ঘোষণা করে দিয়েছেন।

কাল বয়ে যাচ্ছে তার অমোঘ শক্তিমত্তায়। কয়লা, বাষ্প, ইঞ্জিন, যন্ত্রদানব মানুষের কোষে কোষে জীবন ও জীবিকার যে মোহজাল বিস্তার করেছে তারই প্রভাবে যন্ত্রযুগের কুশীলবগণ বুকভরা দাবানল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লাল ধুলোর ডহরে, কঠিন পাথরে, কালো শিলাস্তরে।

এগারো

ষোল বছর বয়সেই মনসারাম দামাদড় মালকাটা, আঠার বছরে পাকা কয়লা কুলি। খাদের সব কাজ জানে। তার চেয়েও বড় কথা সে কুলি-কামিনদের বেতন হিসেব করতে পারে। সুদকষা জানে।

মিহিরবাবুর উত্তরাধিকারী তার দুই ভাইপো হরদেও ও বরমদেওয়ের কাছে সে এক বুকের কাঁটা। কুলি-কামিনরা যদি হিসেব শিখে যায় তবে তাদের ব্যবসা চলবে কি করে?

পানমোহরায় ঢুকতে পায় না কারণ সেখানে জয়বাবু আছে। যতদিন মিহিরবাবু ছিলেন ততদিন তাঁকে মুনাফার কড়ি দিয়েছে। রাজরোগে অথর্ব হয়ে দেশে চলে যাবার পর কাবেরীর সুপারিশ মত ওঁর ভাইপোদিকে ব্যারাকলউ সাহেব নিজেই আউট করে দিয়েছেন। [illegible] [illegible] দিয়েছে।

তারপর দু'ভাই শেরগড় খোজা কোম্পানীতে নানা রকম বাণিজ্য শুরু করেছে। সুদে, মদে, দোকানের সওদা বেসাতিতে, মেয়ে মানুষের যৌবন ক্রয় বিক্রয় হরণ ধর্ষণ ইত্যাদি নানা ধরনের শোষণের জাল বিস্তার করে বসে আছে।

মনসারাম যখন তাদের কাছে মোট ঋণের পরিমাণ জানতে চাইল সেদিন টিটকিরি দিয়েই সারল। দাবি যখন জোর হল তখন তাদের পুরো পরিবারের বেতন বন্ধ হল। ঢালুদাস গিয়ে বহু মিনতি করে আধামন চাউল ধার নিয়ে এল। বাকীটা বলল —সুদের দরুণ জমা হল।

মনসারাম বলল —আমরা তিনভাই, ভোজী, মা এই পাঁচ জনের সারা সপ্তাহের বেতন হয়েছে আঠার টাকা, তাতে তুমরা দু'টাকার চাল দিলে বাকী ষোল টাকা সুদ। তাহলে আসল কত?

ওরা এ খাতা সে খাতা হাতড়ে বলল —একশ বিশ রুপিয়া। দিতে পারবি?

তখনকার বাজারে একশ বিশ টাকা অনেক। মনসারাম ভেবে কূল কিনারা পায় না কি করে উশুল করবে? তারপরে যা রোজগার করবে সবই হবে সুদের দরুণ উশুল। তাহলে এ জীবনে ঋণমুক্তি ঘটবে না।

এই সময়ে একদিন ভিশেরগড হাটে লঙ্কার সঙ্গে দেখা। যে শেরগডের জড। প্রাণের টান আছেই। পরামর্শ দিল —তুই জয়বাবুর সঙ্গে দেখা কর। ওর সুদের হার কম। মেমসায়েবও আছে। দয়ার শরীর। কিছু করবেক।

কাবেরীকে ওরা মেমসায়েব বলে। মনসারাম ভালোই জানে। সে এক রবিবারে লঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে কাবেরীর কাছে জোড় হাত করে দাঁড়াল।

লঙ্কা বলল —মনসা বহুত বিপদে পড়ে এসেছে মেমসায়েব। দেখবেন যেন কুছু সুসার হয়।

—আচ্ছা আচ্ছা! তোকে অত সুপারিশ করতে হবে না।

লঙ্কা চলে গেল। মনসা মেঝেতেই বসে পড়েছিল। কাবেরী ওর কাছে মোড়া নিয়ে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকথা শুনল। বেশ যত্ন করে খাওয়াল ভাত, ডাল তরকারী, মাছের ঝোল।

স্মরণাতীত কালেও সে এমন খাবার খায়নি। খেতে খেতে জল এসে গেল চোখে। বলল —কি বলব কাকিমা, পারুলটাকে বড় মনে পড়ছে। বৌদিদিকে মনে পড়ছে। এত খাবার গলা দিয়ে নামছে না।

—দুঃখ করিস না মনসা। মানুষের জীবন অনেক বড়। কত কি যে ঘটে যায় তার খবর কে বলতে পারে? নিজে কষ্ট না পেলে অন্যের কষ্ট বুঝবি কি করে? তোর জন্য আমার গর্ব হচ্ছে মনসা। বিবিবাথানের একটা মানুষও যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তা এক মজাদার খবর রে। তুই জানিস না।

মনসার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ওর হাতে একশ কুড়িটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল —সব দেনা শোধ করে দে-গা।

মনসার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠল। কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল —আপনার টাকা আমি মারবো না কাকিমা। হপ্তায় হপ্তায় শোধ দিয়ে যাব।

কাবেরী চোখ পাকিয়ে বলল —চুপ। শোধ দেবার কথা বলিস না। মহাজনী কারবার জয়বাবু করে, আমি নই। এই টাকা তোকে আমি দিলাম তোর লড়াইয়ের ভিত তৈরি করতে। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমো। জয়বাবু এলে ওর সঙ্গে দেখা করে যাবি।

শব্দ তো নয় শব্দব্রহ্ম। সঞ্জীবনী মন্ত্র।

আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে মনসারাম স্বপ্ন দেখছে সুদখোরের শোষণ থেকে মুক্ত এক নতুন বিবিবাথানের। জারজ প্রজন্মের কলুষিত রক্ত প্রবাহে শুদ্ধির সঙ্কল্প।

বয়সে দু'চার বছরের ছোটবড় এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠছিল বিবিবাথানের আবিল পটভূমিতে। স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে। তাদের মধ্যে সাদা কালো দু'রকমেরই ছেলেমেয়ে ছিল। এরাই এখন আঠার থেকে পঁচিশের মধ্যে পৌঁছেছে। অনেকেই ছেলেমেয়ের বাবা-মা হয়েছে। কারো কারো দ্বিরাগমন হব হব করছে।

একদা চিনি-চামেলী-ছলনা-বঞ্চনা-রাগিণী-ভাবিনীদের মত সাহেবদের এঁটোপাতার জড় ঝাড় ওরা। মায়ের লজ্জা, বাপের অসহায়তা, দারিদ্র্যের অপমান, ক্ষুধার জ্বালা, খাদের খাটালি, সেক্স ছিনালী নিয়েই আবর্তিত হত ওদের জীবন। মনসারাম তাদের বুকে আগুন ধরিয়ে দিল।

বিবিবাথান আর সহিস, কচোয়ান, বেয়ারা বাবুর্চিদের পাড়া নয়। খনিশ্রমিক পয়দা করারও একটা যন্ত্র। উৎপাদন প্রচুর হয়েছে, আরো হচ্ছে এবং হবে। প্রতিনিয়ত আহার-নিদ্রা-প্রজনন-জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের প্রাকৃতিক লীলা চলছে।

এখানকার ছেলেরা বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে আবার মেয়েরা জামাই নিয়ে আসে। কারণ ক্ষুদ-কুঁড়ো যাইহোক, যে মূল্যের বিনিময়েই হোক অন্নের সংস্থান আছে। বিপুল ব্যাপ্ত জীবনধারণের ক্রিয়ার মধ্যে অন্নের স্থান সবারই উপরে। তাই বিবিবাথান হরদম মানুষজনে গিজ্ গিজ্ করে।

একদা বিবিবাথানের যে তেঁতুল গাছটির তলায় ভাদু, ঝুমুর, কাওয়ালির আসর বসত, তাস-পাশা খেলা হত, নেশা-ভাঙ করে মাতলামি হত তা এখনো হয়। বারোমাস গুলজার হয়েই থাকে। তবু তারই মধ্যে আরো কিছু নতুন সুরও ধ্বনিত হয়।

মনসারাম, শিবু, চামেলীর ছেলে ব্রজলাল, ইরফানের ছেলে আবদুল, হারু,

জগু, মুন্না, রামা, গোবিন্দ প্রভৃতি ছোকরার দল যখন এসে বসে তখন সেই বৈঠকের চেহারাটা পাল্টে যায়।

শোষণের ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। সে যে একটা বিরাট জাল তার খেই খুঁজতে আধুনিক কালের ঢুঁদে অর্থনীতিবিদ্‌রাই নাজেহাল তো সেদিনের কয়লা কুলিরা কি বুঝবে? কোম্পানীরা খেয়ালখুশীমত বেতন দিত। তার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাধ্য তাদের ছিল না। ওরা ভাবত এটাই কোম্পানীর আইন। আর আইন মানেই তো ধর্মের অনুশাসন।

কিন্তু তার চেয়েও মর্মান্তিক ছিল মধ্যবিত্ত বাবু, চাপরাসী, গোমস্তা, সরদার ও কুসীদজীবীদের শোষণ। সে এক রীতিমত প্রতারণা।

কোন মালকাটা পরিবারের যদি সপ্তাহে বাইশ টব গাড়ী কাজ করা থাকে তাহলে তার পাওনা হবে আট টাকা চার আনা। বিল ভাউচার সবই হবে ঐ টাকার কিন্তু পেমেণ্টের সময় পেল আট টাকা।

এটা একটা উদাহরণ। এমন কারচুপি নানাভাবে করা হত। তাকে প্রতারণা বলাই ভাল।

যৌন শোষণ তো দিবালোকের মত স্পষ্ট। ওরা নিজেরাই তার প্রোডাক্ট। বন্ধু বান্ধব নিয়ে বসলেই মনসারাম এই ব্যাপারগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। হপ্তা হাজিরির হিসেবটা ও সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। সব কুলি-কামিন আপন আপন ঘরের দেওয়ালে গোবরের দাগ দিয়ে রাখত। প্রতিদিন খাদ থেকে উঠেই যে কটি গাড়ী বোঝাই করে আসত ততটি দাগ পড়ত। ওরা কুড়ির বেশি গুণতে জানত না। সেজন্য এক কুড়ি, দু কুড়ি, তিন কুড়ি করে হিসেব রাখত।

সেই অন্ধকারের যুগে এটা কম কথা নয়।

তারপরে এল সুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যে কারণে তাদের ঘরগুষ্টি উপোস দিচ্ছে, পাঁচজন কয়লা কাটার হাজিরি একসঙ্গে করেও পেট চলছে না। আজ সে টাকা পেয়েছে। হরদেও, বরমদেওয়ের মুখের উপর টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে বলবে —ফারখৎ লিখো বাবু। ঢালুদাসের গুষ্টি আর ধার উধারের দুয়ার মাড়াবে না।

একশ কুড়িটি নগদ টাকা ফেলে দিলেই যদি একটা শ্রমিক পরিবার শোষণ থেকে মুক্ত হত তবে তো ভাবনা ছিল না। সংগ্রামের দরকার হত না। শোষণের জাল শুধু সুদের কারবারেই সীমাবদ্ধ নয়। আরো অনেক ব্যাপার আছে। হাজিরি কাটা, পাথরের অজুহাতে গাড়ী কাটা, সময়ে খালি টব গাড়ী সাপ্লাই না দেওয়া এবং আরো নানাবিধ বাধাবিপত্তি, যাতে ওরা রোজগার করতে না পারে।

জবা ও তার স্বামী এসেছিল। বোন ভগ্নীপতিদের সঙ্গে খেতে বসেছিল ওরা। জবার স্বামী বলল —এই অত্যাচারের বদলা লিবার কি কুন্থ উপায় নাই ?

মনসা বলল —আছে। যদি বেবাক কুলি-কামিন একিন হয়। তাহলে আমি মুনশীর লালচোখ গেলে দিতে পারি। চাপরাসীর লাঠি ভেঙে দিতে পারি! এই দেওরটির প্রতি ওদের বড়বৌ শান্তির হৃদয়ে স্নেহের সমুদ্র ছিল। সে বলল —একিন ক্যেনে হবেক নাই ? সবাই ত মরছে। তাদেদিকে জাগাতে হবেক। —হঁ। জাগাতে হবেক। বেবাক কুলি-কামিন ভয়ে মরছে, না খেঞে মরছে, খাদে চাল চাপা পড়ে মরছে। তাদেদিকে জাগাতে হবেক।

একটি স্ফুলিঙ্গ। শোষণের যন্ত্রণাপীড়িত ইতিহাস মাড়িয়ে উঠে আসছে একটা প্রজন্ম। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী ভূমিকার ভূমি কর্ষণ হচ্ছে মগজে, ফুসফুসে, রক্ত প্রবাহে।

বারো

খাদের ভিতরে ভীষণ গরম। গোউর, নিতাই, মনসা, ছলনা, শান্তি, জবা ও তার স্বামী —এক পরিবারের এতগুলি কুলি-কামিন একটা সুড়ঙ্গে কাজ করছে। প্রায় তিনশো ফুট দূরে ট্রাম লাইন। যেখানে টব গাড়ী লাগানো আছে। তিনভাই কয়লা কাটছে। জামাই সহ তিনটি মেয়ে ঝোড়াতে কয়লা বয়ে টব গাড়ী ভর্তি করছে। মেয়েদের পরনে একটা ফ্যানাড়ী ও বুকে এক ফালি ছেঁড়া কাপড়। পুরুষরা নেংটি সার।

চরিতর পণ্ডিত মুনশী। টব গাড়ী বোঝাই করার তদারকির অজুহাতে শান্তি ও জবাকে আবিল দৃষ্টিতে লেহন করছে।

দুটোই ভরা-যুবতী এবং মেহনতী মাংসপেশী পাথর খোদাই মূর্তির মত দৃঢ়।

লোভে চরিতরের জিভ লকলক্ করছে। লম্ফবাতির হলুদ শীষে একটুখানি আলোর ছটায় ভরা যুবতীর অনাবৃত ত্বক ঝক্‌ঝক করছে। তাতে ওর হাত নিস্‌পিস করবে না তো কি ?

চোখের লোভ দেহের ক্ষুধায় পরিণত হতে দেরী লাগল না। শান্তির গাল টিপে বলল —কিলো ছুঁড়ি! বড় যে ঠমক দিচ্ছিস।

শান্তি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। হাতের ঝোড়াটা ওর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে পালাল। সুড়ঙ্গের মুখে যেখানে পুরুষরা কয়লা কাটছিল সেখানে গিয়ে হাঁফাতে লাগল।

মনসা বলল —কি হল ভোজী ?

ও কিছু বলবার আগে জবা ছুটে এল এবং চরিতরের বেয়াদপ ব্যবহারের

কথা বলল। মনসার আর বেশি কথা শুনবার ধৈর্য ছিল না। সে এক সাক্ষাৎ যমদূতের মত ছুটে গেল ট্রাম লাইনে। চরিতরকে ধরে আছড়ে ফেলল। বুকে পা দিয়ে বলল —শালা! হারামির বাচ্চা। আজ তোর জান খতম করে দিব। ঠক ঠক শব্দে ওর মাথাটা শক্ত পাথরের মেঝেতে ঠুকে রক্তবহান করে দিল। চরিতরের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। গোঁ গোঁ শব্দে চিৎকার শুরু করে দিল।

ততক্ষণে টালোয়ান, মাইনিং সরদার, মালকাটা, কুলি-কামিন পড়ি কি মরি করে দৌড়ে আসছে। কারো চোখে মুখে জিঘাংসা, কারো বা ভীতি। কেউ শুধু হাউ মাউ করছে। কেউ তারস্বরে চিৎকার করে বলছে —ছেড়ে দে মনসা। না হলে মরে যাবেক যে।

মনসাকে ছাড়ায় কার সাধ্য? ছলনা ওকে ঝাপটে ধরে বাদুড়ের মত ঝুলে পড়ল। গোউর নিতাই বহুকষ্টে টেনে ছাড়াল। ক্রোধ, হিংসা ও উন্মত্ততার এক রুদ্ধশ্বাস নাটক সেখানে। চরিতর ছাড়া পাওয়া মাত্র কুকুরের মত পালাল।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল বিদ্যুৎ চমকের মত। তার জন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। পরে যে কি পরিণাম হতে পারে তারও কোন ধারণা ছিল না। শুধু ঝোঁকের বশে জীবনের দাবদাহী খরার জ্বালায় হাত তুলে দিল মালিক ও শোষকশ্রেণীর প্রতিভূদের গায়ে।

খবর রটে গেল সবদিকেই।

মিছিরবাবুদের চ্যালা চামুণ্ডা এবং চাপরাসী, খয়ের খাঁদের মধ্যে যেমন সাজ সাজ রব পড়ে গেল, তেমনি মনসারামের ও বন্ধু-বান্ধব এবং বিবিধাওড়ানের ছেলে ছোকরারাও প্রস্তুত হয়ে পড়ল।

সেদিন তো কাজকর্ম কিছু হল না। টব গাড়ী যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রইল। গোটা সেকশানের চল্লিশ-পঞ্চাশজন কুলি-কামিন উপরে যাবার পথে পা বাড়াল।

মাইনিংবাবু বলল —কোথা যাচ্ছিস তুরা?

—উপরে।

—কাজ পুরা করে যা। গাড়ীগুলো ভর্তি কর।

—না। গাড়ী ভরব নাই।

—বেবাক লোকের হাজরি কেটে দিব।

—তাই দিস।

—কুটস সাহেবকে বলে দিব।

—তাই বলিস।

—বাভা গরম হয়েছে যে রে?

—গরমের কি দেখলি? শ্যালা আমাদের বৌ বিটিদের ইজ্জত নাই? লুটে-পুটে খাবি? এত মরদ!

—তুরা লুটের মালই বটিস। তুদের মা দিকে শুদাবি।

—সেই মায়ের অপমানের শোধ আমরা লিব। বৌ-বিটিদিকে কানা-কড়িতে বিকাতে দিব নাই।

যে মাইনিং, মুনশীবাবুদের একটা হুঙ্কারে কুলি-কামিনরা কাপড়ে-চোপড়ে পেচ্ছাব-পায়খানা করত তাদের মুখের উপরে এমন কাটা কাটা জবাব শুনে রাগের চোটে ব্রহ্মরন্ধ্র যতই জ্বলুক ভিতরে ভয়ও তেমনি ঢুকে গেল।

ওরা এবার সিঁড়ি খাদের মুখ দিয়ে উপরে উঠছে। দু'তিন জনের পরেই মনসারাম সিঁড়ি ভেঙে ওঠার দরুণ বুকে হাঁফ ধরেছে। হয়ত বা অন্যমনস্কও ছিল। একজন চাপরাসী লাফ দিয়ে ওর উপর লাঠি চালাল।

শাস্তি ছিল মনসার পিছনে। সে ত্বরিৎ গতিতে তার ঝোড়াটি পেতে দিল লাঠির মুখে। লাঠির ঘা থেকে বাঁচল। কিন্তু তারপরেই চারদিক থেকে লাঠি পড়তে লাগল ওর উপর। শাস্তি সেখানেই চোট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল এবং মনসারাম ঝোড়াটি নিয়ে কয়েকটা মোক্ষম মার যদিও বাঁচাল তবু তার সারা শরীর বেয়ে রক্ত ফুটে বেরতে লাগল।

তারপরই দৃশ্যটা পাল্টে গেল। নীচের দিক থেকে খাদের কুলি-কামিন এবং উপরের দিক থেকে মনসার বন্ধু-বান্ধব মিলে শুরু করে দিল দাঙ্গা।

মেয়েগুলিও সেদিন রণরঙ্গিণী। ইট পাথর কয়লা যা পেল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল। মালকাটাদের হাতে গাঁইতি। তাও চলল এলোপাথাড়ি। ধিবিবাথানে ছোকরাগুলির হাতে লাঠি বল্লম।

গালি ও বাথান যা হল তাতেই সারা কলিয়ারী মাৎ। সেই সঙ্গে তর্জন-গর্জন ও আর্তনাদ। লড়াই জমে উঠল। উভয় পক্ষেরই লোকবল বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে আসছে হাতিয়ার।

হঠাৎ চারজন অশ্বারোহী খট খট শব্দে এসে পৌছলেন। তাঁদের একজন মিঃ কুটস ম্যানেজার। আরেকজন তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তাঁদের পিছনে হুরদেও ও বরমদেও। সবারই হাতে বন্দুক।

মিঃ কুটস বললেন —হল্ট! দাঙ্গা থামাও। না হলে গুলী চলবে। সব আপনা আপনা হাতিয়ার জমা করো।

বন্দুক দেখে সবারই আক্কেল গুড়ুম। চাপরাসীদের বুকে বল এল। আর কুলি-কামিনদের রক্ত হিম হয়ে গেল। কেউ কেউ পালাবার চেষ্টা করল। মনসারাম হুঙ্কার দিল —খবরদার। কেউ পালাবি না।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। মনসারাম কুটস সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল—মারো সাহেব! গুলী কর।

রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত কুলি-কামিনদিকে দেখাচ্ছিল এক একটি বীভৎস প্রেতাত্মার মত। সারা অঙ্গ কয়লার কালিতে লেপটা-লেপটি হয়ে তো খাদ থেকে উঠেছে তার উপরে পড়েছে বেধড়ক লাঠি বল্লম টাঙ্গির চোট। কতজন যে মরবে আর কতজন বাঁচবে তাই বোঝা দায়। তারই মধ্যে মনসারাম মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সাহেবের বন্দুকের সামনে।

কয়লাকুঠির ইতিহাসে সে এক ঘটনা। মুখে মুখে খবর রটে গেল আশে-পাশের সব কলিয়ারীতে। ধান্দাবাজ, আড়কাঠি, বাবু, সরদাররা কয়লা থেকে নির্গত রস নিয়ে যে কায়েমী স্বার্থের আখড়া গড়ে তুলেছিল সেই মাটিতে এ ঘটনা ভূমিকম্পের মত। কুটসের মত সাহেবরা তাদের মদতদার। মনসা-রামের প্রতিবাদী ভূমিকা তাঁর কাছে বেয়াদপি। তাঁর অহংকার ভীষণ ভাবে আহত। তবুও হাতে বন্দুক থাকতেও ট্রিগারটা তিনি টিপতে পারলেন না।

তিনি এখন বেশ চিন্তিত। অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে হুকুম দিলেন —আহত কুলি-কামিন ও চাপরাসীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

অন্যদিকে বললেন — তোমরা হাতিয়ার জমা দিয়ে আপন আপন ধাওড়ায় চলে যাও। মনসারাম তুমি অফিসে চল আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে।

সাহেবের হাতে বন্দুক। কাজেই হুকুম না মেনে উপায় নেই। লোকজন সরে গেল। মনসারাম ও তার গোষ্ঠীর সবাই অফিসে গেল। ওরা তখন কার্যত বন্দী। অফিসে কৈফিয়ত দেবার নাম করে একটা ছোট কুঠুরিতে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিল।

যত সময় যাচ্ছে তত ওদের চোট খাওয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠছে। ডাক্তারবাবু এলেন চিকিৎসা করতে। মনসারামের মাথায়, কপালে ও হাতে সতেরটা সেলাই পড়ল। শান্তি যে উপুড় হয়ে মুখের ওপর পড়েছিল সেজন্য ওর দাঁতের পাটা নড়ে গেছে। মুখটা ফুলে ঢোল। কথা বলতে পারছে না। ঢোঁক গিলতে পারছে না।

তবু সে মনসারামের মাথার কাছে বসে আছে। আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তাতেই কত আরাম বোধ করছে ও। ছলনা একদিকে দেওয়াল ঠেস্ দিয়ে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। গোউর নিতাই জবা গালে হাত দিয়ে চুপ-চাপ বসে আছে।

সেই ভোরবেলাতে এক জামবাটি করে মাড়ভাত খেয়ে খাদে গিয়েছিল। সে খাবার হজম হয়ে গেছে। এবার খিদেতে পেট কল কল করছে।

যার ঘরগুষ্টি সাহেবদের কয়েদখানায় বন্দী সেই ঢালুদাস তখন কুটস সাহেবের ড্রয়িং রুমে মদের ভিয়েন করছে। বাচ্চা শূকরের মাংস দিয়ে ভোজ হচ্ছে সেখানে। জমিদারবাবুর নাচমহল থেকে দুজন নাচগার্ল এসেছে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য। মস্তবড় লড়াই ফতে করে এসেছে কিনা তারই উৎসব।

সেই তরলা বারকুলি সাহেবের আমল থেকে সাহেব কোঠির আয়া তখনো সেখানেই আছে। মনসারামের খবর তার কাছে পৌছে গেছে। এক সময় ঢালুদাসকে ডেকে বলল — খালভরা। মদের গন্ধেই মাতাল হএে গেছিস। সাহেবদের এঁটো চাটবার লেগে ভগ্‌ভগাছিস। উদিকে যে তুর ঘরগুষ্টিকে বেঁধে রেখেছে তা জানিস? বেবাক কুলি-কামিনদিকে মেরে লোৎ করে দিএেছে সে খবর রাখিস?

তরলার কথাবার্তা বড়ই কটকটে। ঢালুদাস আগেই শুনেছিল মারা-মারির খবর। আবার তার ঘরগুষ্টিকে যে বেঁধে রেখেছে এ খবর জানতো না। পেটে তো মদের খোয়ারী ছিলই। তরলার কথা শুনে তা ফেনিয়ে উঠল। কুটস সাহেবের পায়ে পড়ে বলল — হুজুর! আমার লেড়কা লেড়কি বহু বিবিকে বেঁধে রেখেছো ক্যেনে? উয়াদিকে ছেড়ে দাও।

সাহেব বললেন —উয়ারা বেয়াদব আছে। থোড়া টাইট করতে হবে।

— কত টাইট করবে সাহেব? সবাইকে তো মেরে লাশ বানাএে দিএেছ।

—আমি মারি নাই। উয়ারা দাঙ্গা করেছে। আমি ডাক্তার দিয়ে এলাইজ করাছি। যাও বেশি বকবক করো না।

—ওঃ। আমার ছোলাপুলা মার খেএে মরছে সেই কথাটি বলতে এলাম তো বকবাস হল।

—তুমি এখান থেকে যাবে?

—না। ক্যেনে যাব? আমার ছোলাদিকে ছেড়ে দাও।

— ব্লাডি বাস্টার্ড!

সাহেব দড়াম করে একটা লাথি ঝাড়লেন ওর পেটে। ওতেই চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে ঢালুদাস পড়ে গেল।

নিমন্ত্রিত সাহেব মেমরা সে দৃশ্য দেখে খুব প্রীত হলেন। নাচ শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু আমোদ ফুর্তির বেবাক খোয়াব বরবাদ হয়ে গেল একটি খবরে। শেরগড়, সালুঙ্কী ও হাটনল তিনটি কলিয়ারীতেই বেবাক কুলি-কামিন খাদে গিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কেউ কাজ করেনি।

সাহেব চমকে উঠলেন। মদের গ্লাসটা গলায় ঢেলে আর্দালিকে হুকুম দিলেন —ঘোড়া তৈয়ার কর।

শ্রমিক ঐক্য, শ্রমিক অশান্তি, শিল্পবিরোধ, ধর্মঘট, আপস মীমাংসা প্রভৃতি শব্দগুলোই তখনো তৈরি হয়নি। মনসারামের সহজাত আবেগের তাড়নায় যা ঘটল তাতে শ্রমিকদের দুর্গতি আরো এক কাঠি বাড়ল।

খাদে গিয়ে কাজ না করে চুপচাপ বসে থাকাটা এক ধরনের ধর্মঘট কিন্তু শ্রমিকরা তো তার তাৎপর্য বুঝত না। তার যে একটা ব্যাপক কর্মকাণ্ড

আছে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ আছে এসবের কোন ধারণা ছিল না। যা করেছিল তা আবেগ ও সহানুভূতির কারণে।

ফলত, সাহেবদের ঘোড়া এবং হাতের চাবুক আস্ফালন করতেই তারা সুড় সুড় করে কাজে লেগে গেল। চোটঘাট খাওয়া শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে কিছুদিন সময় লাগল। ততদিন বাকী শ্রমিকদের উপর হুকুম জারি হল পুরো উৎপাদন বহাল রাখার।

মনসারামের গুষ্টিকে তার পরের দিনই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মনসা ছাড়া বাকী সবকে খাদে নামিয়ে দেওয়া হল। মনসার চোটঘাট তখনো সারেনি। সেলাই কাঁচা আছে এবং বিষিয়ে গেছে। সে একাই ধাওড়াতে পড়ে আছে। দিন কাটে তো রাত কাটে না এমন দুঃসহ একাকীত্ব। কাটা ফাটা ঘায়ের ব্যথা তো হরদম টিস্ টিস্ করছে।

একদিন দুপুরে কপালের উপর দুটি বাহু রেখে চোখ বুঁজে শুয়েছিল। অতি সন্তর্পণে টিনের আগল খুলে কেউ যেন ঢুকল। চোখ খুলে তাকিয়েই সে অবাক।

একটি ন'দশ বছরের বালিকা খালি গায়ে ফ্যানাড়ী পরে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথার উপর এক বোঝা কালোচুল উড়ছে। তারই ফাঁকে সিঁথি ভর্তি সিঁদুর। চোখ দুটি ভাসা ভাসা এবং নিবিড় মমতা মাখা।

মনসা ডাকল —আয়! কাছে আয়!

সে ব্যস্ত ও লজ্জিত ভঙ্গিতে বিহ্বল হয়ে পড়ল। মনসা আবার ডাকল—আয়।

মেয়েটি কাছে এল। একটা হাত বাড়িয়ে মনসা ওকে বেষ্টন করে বলল—বোস। আমার কাছে বোস।

মেয়েটি বসল। মনসা বলল —আমার গায়ে হাত বুলাঞে দে।

মেয়েটি পরম যত্নে ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল —সাহেবরা তুমাকে মেরেছে?

—হঁ। তুকে কে বললেক?

—আমি তো মামাঘর গেইছিলম। কুছুই জানতাম নাই। আজকে এলম। মা বললেক সাহেবরা তুমাকে বেঁদে ঠেঙাঞেছে।

—তায়েই দেখতে এলি?

—হঁ তো। আসব নাই? তুমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

—না না। আর আমার কষ্ট নাই। তুঁই এলি তো আমার সব কষ্ট চলে গেল। ই-বারে তুঁই আমার কাছেই থাক। আমি একা একা ভেবে মরে যেছি।

—হঁ তো। থাকব তো।

এই মেয়েটির নাম বৈশাখী। মনসারামের বিবাহিতা স্ত্রী। বালিকা বধূ। কখন সেই পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। যত বড় হচ্ছে তত ওর টান পড়ছে মনসারামের উপর।

বিবিবাথানেরই মেয়ে। ওর মা বাবাও শেরগড় কলিয়ারীতে মালকাটার কাজ করে। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দুঃখে দারিদ্র্যে দিনযাপন করে। সেই শ্রমজীবী পরিবারের মেয়ে দশ বছর বয়সেই স্বামী চিনে নিয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিক জড়তা নেই ওর মনের মধ্যে। তাই তো অবলীলায় আসতে পেরেছে।

আর মনসারাম ব্যথাক্লিষ্ট জীবনে ওর হাতের ছোঁয়াতেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে।

এখন সে অনায়াসে ভাবতে পারছে সে একা নয়। তার সঙ্গে বিবি-বাথানের বেবাক জোয়ান আছে। কুলি-কামিন আছে। তাদের বুকে আগুন আছে। সবকে জড় করতে হবে। সবাই মিলে একতাবদ্ধ হতে হবে। একা বিবিবাথান নয়। তামাম শেরগড় কোল কোম্পানীতে জনে জনে বুঝিয়ে বলতে হবে শাসন, শোষণ ও যন্ত্রণার কথা। মালিক, ম্যানেজার ও দালালদের যে চক্র তাদের হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে তাদেরকে চিনিয়ে দিতে হবে। হাতিয়ার ধরতে হবে। অত্যাচারীর অহংকার ভেঙে দিতে হবে। তাদের হাতের লাঠি কেড়ে নিতে হবে।

এইসব ভাবনার মধ্যে কি যে প্রাণস্পন্দী উন্মাদনা আছে যার ঘোরে সে সব ব্যথা ভুলে যায়। তার বালিকা বধূটি হাতের কাছে লুটুর-পুটুর করে। সে ভাবে তার স্বামী —মস্ত মরদ।

শেরগড় কোল কোম্পানীতে যখন শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র চরিত্রটি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে, পানমোহরা কোল কোম্পানীতে তখন ব্যারাকলউ সাহেবের ঘোড়া কদম কদম ফরোয়ার্ড মার্চ করছে।

তেরো

সাতখরিয়ার পর দেউলটি।

মহাকালের ঘোড়া অপ্রতিহত গতিতে ছুটে যাচ্ছে। তার পায়ের ক্ষুরের দাগে দাগে গড়ে উঠছে নতুন নতুন জনপদ। ছুটে আসছে নতুন মানুষ। নাবী বহাল, সিঁড়ি ভাঙা কানালী ও ধূলি ধূসর বাইদ জমি একাকার হয়ে যাচ্ছে কয়লা কুঠির কালো পাথরে। এক একটা চানক কাটাইয়ে যে পরিমাণ পাথর ওঠে তাতেই তৈরি হয়ে যায় পিট টপের এমবাঙ্কমেণ্ট, টব লাইন ও জমির লেভেলিং।

এখন তিনি ভাবছেন—জমিদারবাবুর আরো দশ হাজার বিঘা কোল প্রোপার্টি কুক্ষিগত করবেন কি করে।

জমিদারী রক্তে যত অহংকার তত স্বার্থ। দুইয়ের টানা-পোড়েনে রাধা-গোবিন্দবাবুর বংশধররা আত্মকলহে নিমজ্জিত।

একদা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র চম্পককুমার ব্যারাকলউ সাহেবের উচ্ছিষ্ট রক্ষিতা রাগিণী দাসীর প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে খাদের শুড়ঙ্গেই মিথুন মগ্ন হয়ে পড়েছিল। সেখানে ছিল ব্ল্যাক ড্যাম্প গ্যাস। মিথুনমগ্ন নরনারীর প্রাণ নিঃশব্দে হরণ করে নিল। উভয়েরই সেই লজ্জাজনক মৃত্যুর পর রাগিণীর ছেলে মনসারাম তার সংমা চঞ্চলাদাসীর কাছে মানুষ হয়ে ক্রমশই এক লড়াকু হিম্মতে পরিণত হচ্ছে। আর চম্পকবাবুর বিধবা স্ত্রী জমিদারীর অংশ ভাগ বাঁটোয়ারা করে তিন অংশের এক অংশ নিজের ছেলেদের নামে করে দেবার জন্য তাঁর শ্বশুরের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছেন। তৃতীয় পুত্র চন্দনকুমার জমিদারী চালাচ্ছেন তাঁর বাপের মতই রোয়াবে।

কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র চঞ্চলকুমার অন্য ধাতুতে তৈরি। চম্পকবাবু মারা যাবার পর শেরগড় কোল কোম্পানীর ঠিকাদারী করতে এসে কলিয়ারীর রস পেয়েছেন। বড় দাদা যোনিগর্তে ডুবে গেছে এ খেয়াল তাঁর ছিল। তাই সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রূপচাঁদকেই চিনেছিলেন। তিনি চান একটা নিজস্ব কলিয়ারী করতে।

পানমোহরাতে রাধাগোবিন্দবাবুর মোট ত্রিশ হাজার বিঘা কোল প্রোপার্টির তলস্বত্বের মালিকানা ছিল। তার মধ্যে বিশ হাজার বিঘা ব্যারাকলউ সাহেবের পানমোহরা কোল কোম্পানীর নামে লীজ দেওয়া হয়ে গেছে। বাকী দশ হাজার বিঘার জন্য সাহেব খুব জোর তদবির করছেন।

ভাইদের আত্মকলহের কারণে চঞ্চলবাবু কিছু করতে পারছেন না। অবশেষে তিনি বিধবা বৌদিকে প্রণাম করে কিছু টাকা দিয়ে বললেন—এটা দাদার অংশের টাকা। বাবাকে দিলাম না বৌদি তোমাকে দিলাম এবং যা পাবো তা তোমাকেই দেবো।

উনি তাতে খুশী হলেন। এরপর চন্দনবাবুকে বশ করলেন খুব গোপনে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা একটি খুবসুরৎ জানানা দিয়ে। তারপর তার বাবাকে একগোছা নোট দিয়ে বললেন—ব্যারাকলউ সাহেবকে যে সর্তে লীজ দিয়েছেন আমাকেও সেই সর্তে দশ হাজার বিঘা দিন।

অতঃপর একা চঞ্চলবাবুর নামেই লীজ বন্দোবস্ত হল।

পুরনো সার্ভেয়ার দিয়ে মাপজোক করিয়ে সিঁড়ি খাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সমস্যা হল জমি নিয়ে।

তবে তার অন্য একটি সুযোগ আছে। তা হল নাচমহলের জমিটা।

বাড়ির মেয়েরা তো এক কথাতে রাজী। বরং তাঁর মা ও বৌদি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তিনি এখন ভাবেন —নাচমহলের বাড়িটাকে যদি কলিয়ারী অফিস ও গুদাম করেন, পশ্চিমের বাগানে পাশাপাশি দুটো সিঁড়ি খাদ কাটান এবং পূবদিকে পুকুরপাড়ে কুলি-ধাওড়া, বাবু কোয়ার্টার তৈরি করান তাহলে জমি কিনতে হয় না। অন্যত্র করতে হলে গ্রামের সীমানা পড়ে যাবে। সেসব ঘরের ক্ষতিপূরণ অনেক লেগে যাবে। ভালো চাষের জমিগুলো নিলে তার দাম পড়বে বেশি। খাস খতিয়ানভুক্ত ডাঙা বা জমি এদিকটায় বিশেষ নেই। রায়ত স্থিতিবান স্বত্বীয় জমি ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে চড়া দাম পেয়ে রায়তরা মজে গেছে।

নায়েব গোমস্তাদের উপর রাগ হয়। এইসব বৃদ্ধ ঘুঘুরা জমিদারের স্বার্থকে চৌপট করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। তাঁর বাপ ওয়াইন এণ্ড উওম্যান নিয়ে স্ফূর্তি করেছেন। ভবিষ্যৎ ভাবার ক্ষমতা ছিল না। না হলে কি পানমোহরা কোল প্রোপার্টি ব্যারকলউ সাহেবকে লীজ দেন। কি ভুলটাই না করেছেন।

হায় আজ্ঞা পাপ হে!

একদিন চম্পককুমার তাঁর কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যখন নাচমহলে ঢুকেছিলেন তখন নাচুনীরা সব বিহ্বল চিত্তে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। আবার চঞ্চলকুমারের ঘোড়া যখন টগ্‌ বগ্‌ করে ঢুকে পড়ল তখনো তাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নাচুনীরা সব নতুন ছাঁদে চুল বাঁধল। ঘাঘরা কাঁচুলী পরে পায়ে ঘুঙুর বাঁধল। বাজিয়েরাও কোঁচা দোলানো ধুতি পরে, পরিষ্কার ভাবে দাড়ি কামিয়ে, চুলে আলবেট কেটে, গোঁফে আতর, চোখে সুর্মা দিয়ে গায়ে আংরাখাটি চড়িয়ে নিল।

চন্দনার হাতে একটা ট্রেতে ঠাণ্ডা সরবৎ, অঞ্জনার হাতে একটা ডিশে ফল মিষ্টি ও রেশমী বাঈয়ের হাতে ফুলকাটা ঝালর দেওয়া পাখা। নৃত্যছন্দে ঘরে ঢুকে বাহারী কেতায় কুর্নিশ করল। উনি আরাম কেদারায় বসেছিলেন। তার পাশে ছোট্ট একটি টেবিলে ফলমিষ্টি সরবৎ নামিয়ে রেখে পাশে দাঁড়াল। রেশমীবাঈ পাখার বাতাস দিতে লাগল।

চঞ্চলকুমারের তাক লেগে গেল। কি আশ্চর্য কেতাদুরস্ত এইসব নাচুনীরা। এই জন্যই বুঝি যে আসে সেই মজে যায়। কি তাদের সাজ-সজ্জা! সুচারু প্রসাধন। কোথাও ত্রুটি নেই। সবাই সুন্দরী। রূপের গরব করার হক্ আছে। এরা সব তাঁর পিতার রক্ষিতা। ইচ্ছা করলে তিনিও ভোগ করতে পারেন। এই তাঁর উত্তরাধিকার।

রতনবাবু ওদের মাস্টার। মন্মথ ঘোষের মত উঁচুদরের ওস্তাদ না হলেও সুরের রাজ্যে তাঁরও যথেষ্ট দখল আছে। তিনিই একে একে সকলের সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিলেন।

চঞ্চলবাবু ওদের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। আবার তাঁর মনের অদম্য কৌতূহলও দমন করতে পারছিলেন না। কিরকম ঘোর ঘোর লাগছিল। তাদের চঞ্চল চাতুরী মাখা হাস্য-লাস্যে ভিতরটা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

রতনবাবু বললেন —হুজুর মেহেরবানি করে আজ এখানে এসেছেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। হুকুম করুন —নাচগান শুরু করি।

—বেশ। তাই করুন।

চঞ্চলবাবু এই বয়সেই বিষয়ী পুরুষ। ঘুঙুরের বদলে টাকার রমঝম শব্দটাই তাঁর কানে মধুরতর হয়ে বাজে। সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কারের চেয়ে স্টীম ইঞ্জিনের শব্দ আরো বেশি মাদকতাময়। তিনি ভাবনার মধ্যে ডুবে যান। রতনবাবু অভিজ্ঞ মানুষ। তথাপি তিনি বুঝতে পারেন না বাবুর কি ইচ্ছা—নৃত্যগীত অথবা নারী সম্ভোগ।

নাচগান চলছে। পাখোয়াজে বোল উঠেছে। মেয়েরা সব নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইছে। সুকণ্ঠী রেশমীবাঈ সুর ধরেছে—

পিয়া বিনা মোর নিদ নহী আঁখে

তা না থাক সেজন্য চঞ্চলবাবু চঞ্চল নন। তিনি গানের তালে তালে ভাবনাটাকে ঝালিয়ে নিলেন। দু'চারটি গান হল। কিন্তু রসিকের মন না ভিজলে কার বা উৎসাহ থাকে? গায়িকা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ল। এত যে দরদ দিয়ে গান করল তবু একটা কেয়াবাৎ উচ্চারিত হল না, অন্তত সমে এসে ঠমক দেবার সময়েও।

গান থামলে পর চঞ্চলবাবু বললেন —আপনাদের আপ্যায়নে খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আপনাদিকে আমার একটা কথা বলার আছে।

ওরা সব কৌতূহলী। উনি বললেন —আমি ভেবে ঠিক করেছি এখানে একটা কোলিয়ারী খুলব। পশ্চিমের বাগানে সিঁড়ি খাদ হবে। এই বাড়িটা হবে কোলিয়ারীর অফিস ও গুদাম। তাই আপনাদিকে এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

মাথায় বজ্রঘাত হলেও তারা এত চমকাত না। প্রথমে তো কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। এমন সুন্দর সাজানো বাগান, এতসব বাহারী ফুল ফল লতাপাতা, তিনপুরুষ ধরে তিল তিল করে যার সৌন্দর্য রচিত হয়েছে, যা সার্থক অর্থে যৌবনের উপবন তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?

সবুজ শ্যামল ঘাস, ফলবান তরুলতা কেটে তার উপরে কালো কালো পাথরের স্তূপ রচিত হবে। এমন সুন্দরী নৃত্যগীত পটিয়সী নর্তকীর পরিবর্তে সাঁওতাল, বাউরী, কোল, ভিল, মুণ্ডা, ভুনিয়া, পাশরল, দুসাদ, হরিজন কুলি-

কামিনদের অর্ধনগ্ন কালো কালো চেহারার প্রদর্শনী বসবে। সুললিত সঙ্গীত ঝঙ্কারের পরিবর্তে হড় হড় শব্দে টবগাড়ী ঝাড়াই হবে। হে ভগবান!

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে রতনবাবু বললেন —হুজুর। আর কোথাও কোলিয়ারী করবার জায়গা হল না? এমন সুন্দর সাজানো বাগান ধ্বংস করে দেবেন? আপনার মায়া লাগছে না?

উনি বললেন — দেখুন এখানেই কোলিয়ারী করার উপযুক্ত স্থান। কাজেই ওসব সস্তা সেন্টিমেন্টের কোন মূল্য নেই। কোলিয়ারী এখানে হবে এবং আপনাদের যেতে হবে।

ওরা সবাই থ। মেয়েরা ফরাসের উপর পাছার ভরে বসে পাগুলিকে সামনে মেলে দিল। এত হতাশ, এত ছন্দহীন ভাবে তারা কখনো বসেনি। কেউ বা হাঁটুর উপর ঘাগরা তুলে দিল। কেউ বা ঘুঙুর খুলতে লাগল। অনেকক্ষণ পর চন্দনা বলল —আমরা যৌবনের শুরু থেকেই এই নাচমহলে আছি। আপনার বাবা এবং তাঁর অতিথিদের মনোরঞ্জন করেছি। চার দেওয়ালের বাইরে যে একটা জগৎ আছে তার সঙ্গে কোন পরিচয় নেই। জীবন, যৌবন, নারীত্ব, সতীত্ব সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। এখন যদি বলেন চলে যেতে হবে তাহলে বলুন —কোথায় যাব?

—তা আমি জানি না।

—তাহলে যিনি আমাদিকে নিয়ে এসে সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছেন তাঁকেই আসতে বলুন।

—তিনি আসতে পারবেন না। তাঁর শরীর খারাপ।

—তাহলে আমরাই তাঁর কাছে যাব।

—না। জমিদার বাড়ির দরজা আপনাদের জন্য খোলা হবে না।

—কেন? আমাদের পায়ের ধুলো পড়লে জমিদার বাড়ির মেয়েগুলোও আমাদের মত রাণ্ডা কসবি হয়ে যাবে নাকি?

চঞ্চলবাবু বহুকষ্টে রাগ সামলে বললেন —কথা বাড়াবেন না। আপনাদের এসব কথার জবাব দিতে আমার অনেক চাপরাসী আছে।

চন্দনা বলল —আমাদিকে চাপরাসীর ভয় দেখাবেন না বাবু। তাদের দৌড় জানা আছে। একটা টুসকিতে গলে যাবে।

অঞ্জনা বলল —যতই হোক পুরুষ মানুষ। আপনার মত নপুংসক নয়।

উনি চমকে উঠলেন। একটা বেশ্যা বাঈজী এমন কথা বলতে পারে?

গর্জন করে উঠলেন —কি? তোমার এত স্পর্ধা যে আমাকে নপুংসক বল।

ও ঠাণ্ডা গলায় বলল —পুরুষত্বের প্রমাণ না পেলে তাই তো বলব।

তিক্ত কণ্ঠে উনি বললেন —একটা বেশ্যাকে স্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ করি। আমার পুরুষত্বের প্রমাণ আমার সন্তান।

—সে হয়ত অন্য কেউ পয়দা করে গেছে। জমিদার বাড়িতে ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ হয় তা কি জানি না?

—যে রাধাগোবিন্দ রায়ের ছেলে একটা বাউরী কামিনের জন্যে কুকুরের মত জীবন দেয় তার ভাইয়ের রক্তটা জমিদারের বটে কিনা তাই সন্দেহ হয়।

ভীষণ রাগে উনি গর্জন করে উঠলেন—চোপ। আর একটা কথা বললে চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব। পিয়ারীলাল —চাবুক লে আও।

মেয়েরা সব খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

চোদ্দ

তার জন্য কাল কখনো বসে থাকে না। শিল্পবিপ্লবের চাকা ঘুরছে ঘুরবে। চন্দনা, অঞ্জনা, রেশমী বাইদের জীবন যৌবন অবলীলায় ভেসে যাবে। কে তার গতিরোধ করবে? মহাকাল যার সারথি।

চঞ্চলবাবুর সিদ্ধান্ত অটল। তাঁর কাছে এসব অপমান তুচ্ছ। বরং তিনি ভাবছেন এরকম কানমলা খাওয়া তাঁর উচিত ছিল। নিজে না গিয়ে বাড়ি খালি করার আদেশ চাপরাসী মারফৎ পাঠাতে হত। গিয়েছিল জমিদারী খানদানের অহংকার ও মূঢ়তার অলঙ্কার, তাদের বংশের মান-সম্মান ও পাপ-ঘৃণার অংশীদারদিকে সৌজন্য দেখাতে। ওরা তার মর্যদা বোঝে না।

অতঃপর যে পিয়ারীলাল এতকাল যাবৎ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছিল তারই উপর ফরমান জারি করলেন —বেবাক রাণ্ডী কসবিকে হাটাও। নাচমহল খালি কর।

মেয়েরা সত্যিই আতান্তরে পড়ল। তাদের কোথাও যাবার স্থান নেই। কে তাদেরকে রাখবে? এমনি ভোগ করতে অনেক কাপ্তান আছে, কিন্তু বরাবরের জন্য কেউ রাখতে চায় না। জয় একটি ব্যাতিক্রম। তাও যদি কাবেরী ওর সৌভাগ্যের সোপান না তৈরি করে দিত তবে কি ঐ ভাব থাকত? কবে চটকে যেত। রূপের নেশার ক'দিন মেয়াদ? রূপোটাই আসল।

ওরা এখানে পরীর মত জীবন যাপন করেছে। কত বড় বড় রইস আদমীকে কুর্নিশ করেছে। কত বাহারী কেতায়, সুরের ঝর্ণায়, নৃত্যের মোহনীয়তায় তাদের মনোরঞ্জন করেছে। দেহ হয়ত দিয়েছে কিন্তু তার রোমাঞ্চ, শিহরণ ছিল বৈকী।

মনে বড় আঘাত পেল। সেই রাত্রেই ওরা সব একত্র হয়ে ঠিক করল —আর এই মক্ষিচোষ চামচোরের ঘরে নয়। নিজেরা স্বাধীন ব্যবসা করবে।

দিন কয়েকের মধ্যে রতনবাবু ঘরভাড়া ঠিক করে ভাড়াটিয়া ঘোড়া গাড়ি নিয়ে এলেন। তাতে মালপত্র চড়িয়ে দেওয়া হল। মেয়েরা বলল —আমরা

নাকি সুখের পায়রা। জমিদারবাবুর দুঃখের দিন শুরু হয়েছে তাই উড়ে যাচ্ছি। যাবার সময় মা দুর্গাকে প্রণাম করে যাই।

গ্রামের মধ্যখানে মা দুর্গার থান। ওরা সব হেঁটে হেঁটে সেখানে এল। দুধে-আলতায় গোলা গায়ের রঙ, মনোহারী গঠন, সুচারু প্রসাধন, সুবিন্যস্ত কবরী, দীঘল নয়নে কালো সুর্মা, পরনে অতি সুন্দর রেশমী শাড়ি, গা-ভরা গহনা। চলার ছন্দে যাদুকরী আকর্ষণ। ফুর ফুর করে ভেসে যাচ্ছে সুগন্ধী আতরের সুবাস।

দুর্গা থানে মেলা পড়ে গেল। গ্রাম ভেঙে পিল্ পিল্ করে মানুষজন ছুটে এল ওদেরকে দেখতে। এমনিতেই গ্রামের মানুষ স্বভাব কৌতুহলী। জীবনে কখনো পরী দেখেনি। আজ সেই স্বপ্ন লোকের পরীরা পথের ধুলো মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এ দৃশ্য না দেখলে জীবনটাই বৃথা।

মায়াভরা জ্যোৎস্নার জোয়ার নামত। লবঙ্গলোতিকার ফুল ফুঠত পূর্বের বাতাসে সৌরভ ছড়াত। পরীরা নেচে বেড়াত। রঙিন সরাবের ফোয়ারা ছুটত। সুরে সুরে মাতাল করে দিত। সেই রাত্রিগুলো পানমোহরা নাচমহল থেকে হারিয়ে গেল।

ওদের মধ্যে মাতৃত্ব নেই, পতিত্ব নেই। সুখও নেই দুঃখও নেই। মায়া মমতা ও ভালবাসার অনুভূতি নেই। হৃদয়প্লাবী অশ্রুজলও ফেলতে জানে না। অকৃত্রিম আনন্দে হাসতেও জানে না। জীবনধারণ করে কেমন এক স্বপ্নের মধ্যে। অবলীলায় গ্রহণ করে পাপ, তাপ ও গ্লানি। লুব্ধ কামীর কামনায় সতত জর্জর যে দেহ তার আবার শোক দুঃখ কি? জীবনটাকে ফেলে ছড়িয়ে খরচ করে দিলেই হল।

তাই যখন চলে গেল তখন কারো চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল না। হৃদয় ভেদী হাহাকারও উঠল না। কাউকে অভিশাপও দিল না। আশীর্বাদও নয়। বিদায়ের দৃশ্য যে এত বেদনাহীন হতে পারে তা ওদেরকে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

তিনখানি ঘোড়ার গাড়ি পার হয়ে গেল পানফলার ডহর। ঘোড়ার ক্ষুরের লাল ধুলো তালবীথির আড়ালে মিলিয়ে গেল।

শিল্প বিপ্লবের সর্বগ্রাসী অগ্নাশয়ে পুড়ে গেল সাজানো বাগানের সবুজ সমারোহ। মুর্শিদাবাদী আমের চারা কুলি-কামিনদের উনুনের কাঠ হল। বিরাট জামগাছটা কেটে কোয়ার্টার বানাবার জন্য কাঁইচি বর্গা তৈরি হল। খাজা কাঁঠালের গাছ কেটে চেরাই করে দরজা জানালার পাল্লা হল।

বড় বড় শিশুগাছের গুঁড়ি চেরাই করে তৈরি হল টবগাড়ির কাঠামো। আগেকার দিনে শাল কিংবা শিশুকাঠের ফ্রেম করেই টবগাড়ি তৈরি হত।

টব লাইন পাতবার জন্য স্লিপার দরকার তাও এসে গেল অত অত গাছের ডালপালা থেকে।

চঞ্চলবাবু এসব হিসেব নিকেশ কি আগেই করে রেখেছিলেন?

নাম হয়েছে বনবহাল কোলিয়ারী। বেশ জমিয়ে ফেলেছেন। ওর খাদে মুণ্ডা কুলি-কামিনদের সংখ্যাই বেশি। শক্ত পোক্ত মজবুত গঠন। কাজ করে ভাল। দুটো পয়সা পায় তাতেই নেশা ভাং করে বুঁদ হয়ে থাকে। ওদের দেশে যে বীরসা মুণ্ডা ভগবান হয়েছেন। পাহাড়ে, জঙ্গলে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করছেন। কুঠকাট্টি স্বত্ব নিয়ে জমির লড়াইয়ে, এক ছটাক লবণের জন্য জানের লড়াইয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন অত খবর রাখে না।

দেশ থেকে যারা নতুন আসে তাদের বুকে উত্তাপ থাকে। কিছুদিনের মধ্যে খাদের ভ্যাপসা গরমে নেতিয়ে যায়। কয়লা কুঠির কালো যবনিকায় একবার যে এসে পড়ল তার জীবনের ধারণাটাই বদলে গেল। এই ছিল নিয়ম।

চঞ্চলবাবুর ঘোড়া যখন কদম কদম ফরোয়ার্ড মার্চ করছে তখন ব্যারাকলউ সাহেব রীতিমত চিন্তিত। চঞ্চলবাবু ওঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন। বড লোভ ছিল পানমোহরার পুরো ত্রিশ হাজার বিঘা তলস্বত্বের উপর নিজস্ব মৌরসীপাট্টা গেড়ে দেবেন। তা আর হল না। এবং এবার তাঁকে ভূমি দখলের লড়াইয়ে নামতে হবে। উপরে যা হচ্ছে হোক খাদের নীচেই উনি দখলদারী কায়েম করবেন।

তাই পানমোহরার নকশাটি নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ডাক পড়েছে ম্যানেজার মিঃ জোন্সের, সার্ভেয়ার শিবতোষবাবুর এবং জয়ের।

সবাই এসে গেলে উনি নিজের হাতে নকশার উপর পেনসিলের দাগ টেনে বললেন—লুক হিয়ার মাই ফ্রেণ্ডস! ইসাবেলা পিট থেকে বনবহাল সিঁড়ি খাদ পাঁচ হাজার ফুট, জমিদার বাড়ি সাত হাজার ফুট। এটা কোনাকুণি বার্ড ফ্লাই ডিসটেন্স। আমি চাই খাদের মধ্যে সুড়ঙ্গ চালিয়ে বনবহালের সীমানা পার হয়ে যাব।

মিঃ জোন্স বললেন—চঞ্চলবাবুর সঙ্গে একদিন আলোচনা করে বাউণ্ডারী লাইন ঠিক করে নিলে হত না?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে উনি বললেন—ওহ! মিঃ জোন্স! ইউ আর টু ইয়াং। বাউণ্ডারী সেট্‌ল করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বাউণ্ডারী ক্রশ করা আমার উদ্দেশ্য। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?

—একটু একসপ্লেন করুন স্যার।

—লিসন্। আমাদের কোলসিম সাউথ ডিরেকশনে ডিপ। তাহলে আমরা যেভাবেই খাদ চালাই দক্ষিণে ঢালু এবং পূর্ব পশ্চিমে লেভেল সুড়ঙ্গ হবে। বনবহাল নিশ্চয়ই দক্ষিণ মুখে চলবে এবং পূর্ব পশ্চিমেও লেভেল চালানো হবে।

এবার আমরা যদি আমাদের পশ্চিমদিকের সুড়ঙ্গকে চার পাঁচ হাজার ফুট চালিয়ে দিতে পারি তাহলেই বনবহাল থেকে চালানো সুড়ঙ্গের সঙ্গে জয়েন হয়ে যাবে। সেই পয়েন্টে আমরা চঞ্চলবাবুকে বাধা দেব। বলব এখান থেকে পশ্চিমের প্রোপার্টি তুমি দখল করতে পার। কিন্তু পূর্বদিক আমাদের দখলে। এদিকে তোমাকে আসতে দেব না।

ওঁরা তিনজনে ব্যারাকলউ সাহেবের এই আগ্রাসী পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়ে বলল — কিভাবে আমরা কাজটা ত্বরান্বিত করব বলুন।

—ইয়েস। সেই কথাটাই বলতে চাই। জয় কাল তুমি নিজে রাসমণিকে সঙ্গে নিয়ে অজয় পার হয়ে পলাশ থলি, নাড়ীর থলি, কাস্তার দিকে যাবে। দরকার হয় তাঁবু গেড়ে দু-চারদিন থাকবে। কমপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশজন মূল সুঁদ কাটার মালকাটা নিয়ে আসবে। আমি ওদের কাজ জানি। ওরা তিন ফুট চওড়া, ছ-ফুট খাড়াই সুড়ঙ্গ গাঁইতি দিয়ে কেটে দেবে। তার পাশে শাবল দিয়ে হোল করে বারুদ আওয়াজ করে সুড়ঙ্গ চওড়া ও খাড়াই করবে। প্রতি পালিতে দু-ফুট প্রোগ্রেস হবে। এইভাবে দুটি সুড়ঙ্গ নিয়ে এগিয়ে যাও। রাইট! থ্যাঙ্ক ইউ।

অর্থাৎ চঞ্চলবাবুর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হবার পথ রুদ্ধ করে দেবার পরিকল্পনা হয়ে গেল। ভবিষ্যতে যে পূর্বে বা দক্ষিণে নতুন চানক বা সিঁড়ি খাদ কাটবেন সে সম্ভাবনাকেও শেষ করে দেবেন। এমন কুটিল চক্রান্ত সাহেবদের পক্ষেই করা সম্ভব। ভারতীয়দের মাথায় এত ভাবনা আসত না।

কিসে যে কি হয় কে বলতে পারে? কোন্ যাত্রায় কি ফল তারই বা হিসেব কে দিতে পারে? নাহলে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মূল সুঁদের মালকাটা রিক্রুট করতে জয়গোপালের যাবার প্রয়োজন হয় না। এজন্য বুধনা রাসমণিই যথেষ্ট। কিন্তু সাহেবের হুকুম —ওকে নিজে যেতে হবে।

তাই সে একটা ঘোড়ার গাড়িতে রাসমণি বুধনা দুজন চাপরাসী, একজন দেশের মোহানার পাথরকাটা শ্রমিক নিয়ে ভোর ভোর রওনা হল। গাড়িতে রান্নাবান্নার সাজ-সরঞ্জাম, একটি তাঁবু, বিছানাপত্র এবং জামা-কাপড় নিয়ে বোঝাটি নেহাৎ মন্দ হল না। কচোয়ান হায়দর আলী ভীষণ বিরক্ত। তবে গাড়িটি তো আর ভাড়ার নয়। খোদ মালিক তার সওয়ার।

কিন্তু সেখানে যে ওর আরো একটি প্রাণের টান আছে তা ও জানত না। সে ওর প্রথমা স্ত্রী জয়ন্তী। সুবল সখা মিত্র ঠাকুরের মেয়ে। বাপের ঘরে লাথি ঝাঁটা খেয়ে কুচিলা বীজ খেয়ে মরতে গিয়েছিল। ভাগ্যিস সে সময় তার এক পিসীমা ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেন ও তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। তারপর তাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখেন।

জয়ন্তীর পিসেমশাই সম্পন্ন চাষী। জয়ের পরিচয় পেয়ে ওকে নিমন্ত্রণ করে:

বাড়িতে নিয়ে গেলেন। জয়ন্তীকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—এই তোমার প্রথমা স্ত্রী। একদিন অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করেছিলে। আজ কি তাকে পরিত্যাগ করবে, না গ্রহণ করবে?

বড় কঠিন প্রশ্ন। জয় কেমন হক্‌চকিয়ে গেল। কোন উত্তর জোগাল না। দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। জয়ন্তীর মুখ ঘোমটায় ঢাকা। ওর পিসেমশাই বললেন—কিছু একটা জবাব দাও বাবাজী। তোমার উত্তরের উপর একটা মেয়ের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। তার বাপে তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার জন্য তোমার স্ত্রী দায়ী নয়। সে মনে প্রাণে তোমাকেই স্বামী বলে মানে। তুমি ওকে গ্রহণ না করলে হয়ত আত্মঘাতী হবে।

জয় ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল। আকস্মিকভাবে এমন সমস্যার যে সৃষ্টি হবে, পুরনো দিনের ইতিহাস যে কথা কয়ে উঠবে—তা ওর ধারণাতে ছিল না। এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এই তার প্রথমা স্ত্রী!

একটু থেমে দম নিয়ে বলল—আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর পরিচয় তো আপনা-দের অচেনা নয়। তারপরও কি সেই সতীনের সঙ্গে ঘরকন্না করতে পারবে?

জয়ন্তীর পিসেমশাই বললেন—বল জয়ন্তী। এ কথার উত্তর তুই দে।

সবরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে জয়ন্তী বলল—হ্যাঁ, পারব।

—বেশ। তবে আমাকে দিনকয়েক সময় দিন। ভালভাবে ভেবে দেখি এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।

—সে তো ভালকথা বাবাজী। সবদিক বজায় রেখে কাজ করাই ভাল।

উনি উঠে পড়লেন। জয় উঠবার তোড়জোড় করছে। জয়ন্তী তখনো দাঁড়িয়ে। জয় বলল—কিছু বলবে?

—প্রণাম করব।

বলতে বলতেই মাথা নিচু করে জয়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ওতেই জয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল—এই আমার প্রথমা স্ত্রী। আমার ধর্ম-পত্নী। একে ত্যাগ করলে ধর্মের দুয়ারে কি কৈফিয়ৎ দেব?

একেই বলে ভাগ্য। তিনি যখন সুপ্রসন্ন হন তখন ধুলোমুঠি সোনা হয়ে যায়। জয়ন্তীকে ঘরে তুললে কাবেরী হয়ত অনর্থ বাধাবে এমন একটা আশঙ্কা জয়ের মনে ছিল। কিন্তু তা অমূলক।

বরং সে এই ব্যাপারটাকে এমন স্নিগ্ধ ভালবাসায় ভরে দিল যে জয়-জয়ন্তী দুজনেই অবাক। নতুন বৌয়ের স্বামীর ঘরে আসা সার্থক হল। সেই উপলক্ষে কাবেরী একটা ভোজ লাগিয়ে দিল। সমাজ পরিত্যক্ত জয়ের ঘরে সমাজপতিরা কেউ এলেন না, জয়ের ভাইরাও এল না কিন্তু কয়লা কুঠির অজস্র বাবু ভেইয়া কুলি-কামিন পাড়া গেড়ে ভোজ খেয়ে গেল পরম আনন্দে।

শিল্পবিপ্লবের এই এক মহান আশীর্বাদ। সমাজের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলে আর তাকে একঘরে হয়ে থাকতে হয় না।

পনেরো

মিঃ ব্যারাকলউ চিঠি লিখছেন—

মাই ডারলিং, এবার তোমাকে একটা ভাল খবর দেব। দেউলটিতে চানক কাটাইয়ের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। দুটো চানকেই কয়লা স্তর পেয়েছি। যত শীঘ্র সম্ভব উৎপাদনের কাজ শুরু করে দেবার প্রস্তুতি চলছে।

দেউলটির কয়লা স্তর খুব ভাল জাতের। মেটালার্জিক্যাল কোল।

আশা করি এই কলিয়ারীটিতে আমাদের কোম্পানীর ভাগ্য খুলে যাবে। সেজন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে লংওয়াল মাইনিং চালু কবার প্ল্যান করেছি।

ওদিকে আর একটা ক্ষেত্রে ভাগ্যের হাতছানি দেখতে পাচ্ছি। কথাটা তোমাকে খুলেই বলি। চঞ্চলবাবু বনবহাল কলিয়ারী করে দশ হাজার বিঘা কোল প্রপার্টির স্বত্ব তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। আমি সেজন্য খাদের ভিতরে লম্বা সুড়ঙ্গ চালিয়ে ওর পূর্বদিকে এগিয়ে আসার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছি। ওকে ব্যারিয়ার ছাড়তে হবে। তাহলে পাঁচ-ছ' হাজার বিঘার বেশি জায়গা ও পাবে না। বেশ কোণঠাসা অবস্থা।

অতঃপর ও একদিন এল দেওয়ান বাহাদুর অফ মহারাজা বার্ডোয়ান-এর একটা ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে। দেওয়ান বাহাদুর যেমন আমার বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি তেমনি রাধাগোবিন্দ বাবুরও অভিভাবক স্থানীয়।

চঞ্চলবাবু ওর বাবাকেও নিয়ে এসেছিলেন। খুব অনুরোধ করলেন পুরো দশ হাজার বিঘা নির্বিবাদে কাজ করার জন্য। দেওয়ান বাহাদুরও সেইমত অনুরোধ করেছেন এবং আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন নওরঙ্গীতে জমিদারী সমেত আটান্ন হাজার বিঘা কোল প্রপার্টির স্বত্ব গ্রহণ করার জন্য। মিঃ আগাবগ ওই অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধান করে সাতটি স্তরে একশো ফুটের উপর কয়লা পেয়েছেন।

ব্যাপারটি লোভনীয়। তবুও জমিদারবাবুকে একটা সর্ত দিলাম, তা হচ্ছে আমাদের মূল চুক্তি মোতাবেক বছরে লাখ টাকা রয়্যালটি দেবার যে ধারাটি আছে তা সংশোধন করতে। হয় লাম্পসাম কিছু টাকা নিয়ে পুরো স্বত্ব দিয়ে দিতে না হয় টন প্রতি চার আনা রয়্যালটি নিতে।

উনি দ্বিতীয় সর্তটা মেনেছেন। আমিও দেওয়ান বাহাদুরের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আর বনবহাল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। চঞ্চলবাবুকে ছেড়ে দিলাম। আমাকে আবার নতুন ভেন্‌চিওর করতে হবে।

বাই দ্যা বাই, তুমি তিনজন ভাল ফার্স্টক্লাস কোলিয়ারী ম্যানেজার রিক্রুট করে পাঠাবে। মিঃ জোন্সকে এজেন্টের প্রমোশন দেব। ওর এটা সিকসথ ইয়ার শেষ হতে চলেছে। গত বছর ওকে দু মাসের ছুটিতে হোমে যেতে দিয়েছিলাম, তবু ওর হোম সিকনেস যাচ্ছে না।

সম্ভবত সিসিল ওকে চিঠিপত্র দেয়নি। অথচ ও খুব আশা করে আছে যে সিসিল ওর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট কনফার্ম করবে। তুমি সিসিলকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে ওর মনের খবর কি? যদি রাজী থাকে তবে জানিও। বাকি ব্যবস্থাটা করে দেবার দায়িত্ব আমাদের।

চিঠিটা শেষ করে উনি বেশ হালকা বোধ করলেন। মানুষ যত বড়ই হোন না কেন নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য ভাবনা কারো কম থাকে না। সবাই চান নিজে বর্তমান থেকে তাঁদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিতে।

সিসিলের সঙ্গে মিঃ জোন্সের প্লেটোনিক ব্যাপারটা উনি জানতেন। পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় তাও জানেন। সিসিলের যেদিন চিঠি আসে সেদিন মিঃ জোন্স খুব খুশী থাকেন ও তাঁর কাজের এনার্জি ডবল হয়ে যায়। আবার বেশ কিছুদিন যাবৎ চিঠি না এলে উনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন তাও লক্ষ্য করেছেন। মিঃ জোন্সকে উনি পাত্র হিসেবে অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন না। বরং ওদের বিয়ে-থা হলে সুখী হবেন। কারণ দুটো মেয়ের মধ্যে একটারও যদি কোন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয় তাহলে সে জামাই যে ভবিষ্যতে ভারতে তাঁর কোল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটার হবেন এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সেজন্য উনি মিঃ জোন্স সম্পর্কে আশাবাদী ও আস্থাশীল।

কিন্তু সিসিলকেই উনি বুঝতে পারেন না। মেয়েটির বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ এবং ব্যক্তিত্ব এত প্রখর যে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে কেমন কেমন লাগে। তাই তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ব্যাপারটা উল্লেখ করতে পেরেছেন বলে মনের ভারটা কেটে গেছে।

ডাক দিলেন—চিলি!

চিলি ছুটে এল। উনি বললেন—ডিনার দিতে বল। ক'দিন ভাল ঘুম হয়নি। আজ একটু সকাল সকাল শোব।

যথসময়ে সিসিলের মনের খবর নিয়ে দুটো চিঠি বিলেত থেকে উড়ে এল। একটি মিঃ জোন্সকে লেখা সিসিলের চিঠি। অন্যটি মিসেস ব্যারাকলউয়ের লেখা তাঁর স্বামীকে।

সিসিল লিখেছেন—ডিয়ার মিঃ জোন্স!

আপনার সুন্দর সুন্দর চিঠিগুলি আমি সযত্নে সংরক্ষিত করে রেখেছি। সত্যিই আপনার মত হৃদয়বান পেন ফ্রেণ্ড আমার আর কেউ নেই।

যদিও আপনার চিঠিতে কখনো তীব্র উচ্ছ্বাস ও হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে এবং একটি বাসনাও ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তবু আমি কিছু মনে করিনি।

সম্প্রতি মাম্মীকে লেখা ড্যাডীর একটা চিঠিতে আমার কাছে স্পষ্ট মতামত দাবি করা হয়েছে। সেজন্য আমি খুব বিব্রতবোধ করছি। আমাদের পরস্পরের সম্পর্কের সীমারেখাটা নিয়ে যেন কিছু ভুল বোঝাবুঝির সূচনা হয়েছে। এটা থাকা ঠিক নয়।

আমি আপনাকে অনেস্ট ফ্রেণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং আশা রাখি এই বন্ধুত্ব অম্লান থাকবে।

আপনার সুখী, সৌন্দর্যময় ও সমুন্নত জীবন কামনা করি।

এমন সুন্দর মিছরির ছুরি ব্রিটিশ মহিলারাই মারতে পারেন। মিঃ জোন্স নিজে ব্রিটিশ যুবক হয়েও তাঁর স্বদেশবাসিনী মহিলা সম্পর্কে ঠিক এই রকমই একটা ধারণা করে বসলেন।

উঃ! কি সাংঘাতিক মেয়ে! আজ ছটা বছর তাঁকে ল্যাজে খেলিয়ে অবশেষে ল্যাজে-গোবরে করে দিলেন। এই ছটা বছর যাবৎ কত চিঠি আদান প্রদান হয়েছে। হৃদয় দেওয়া নেওয়ার কত বাকবিস্তার হয়েছে। ছুটিতে যখন হোমে গিয়েছিলেন তখন ঐ ঠোঁটে তাঁর ঠোঁট মিলিত হয়েছে। সমুদ্র সৈকতে নগ্ন স্নান ও নাইট ক্লাবে নগ্ন নৃত্য কিছুই বাদ যায়নি। কতবার কত বিভঙ্গে তাঁদের দুটো শরীর একসঙ্গে জুড়ে গেছে। তারপর উনি বললেন কিনা অনেস্ট ফ্রেণ্ড!

লর্ড যীশাস ক্রাইস্ট? এরকম কত সফিস্টিকেটেড ভিলেন চরিত্রের মেয়ে তাঁদের হোমে আছেন?

ওহ্! জীবনের ছটা বছর খরচ হয়ে গেল একটা আলেয়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে। এলাস!

উনি এখন নিজেকে খুব বোকা মনে করছেন। একটা প্রেম ছ-বছরেও পরিণত হল না। অথচ ইণ্ডিয়ান উওম্যানরা প্রেমের ব্যাপারে কত সিরিয়াস। এই তো হাতের কাছে তাঁদের ঠিকাদারবাবু জয়গোপালের দুটো ওয়াইফ। কিন্তু কি সুন্দর সংসার? জেনুইন লাভ যাকে বলে।

হায়! উনি ইণ্ডিয়ান হলেন না কেন? তাহলে তাঁর লাইফ পার্টনারের কাছ থেকে জেনুইন লাভ পেতেন।

এ যে বেরাক লস্ হে!

মিসেস ব্যারাকলউয়ের যে চিঠিটা এসেছিল তার বক্তব্য—সিসিল মিঃ অসবোর্ণ নামে একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে এনগেজড্। আনুষ্ঠানিকভাবে আংটি বদল পর্ব সমাপ্ত। এবার চার্চে গিয়ে আমরা পরস্পরের প্রতি সৎ থাকব এই মর্মে শুভকামনা দিলেই শুভ বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হবে। সেই

অনুষ্ঠানে মিঃ ব্যারাকলউয়ের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি যেন অবিলম্বে হুইট হোমের দিকে যাত্রা করেন।

মিঃ অসবোর্ণ ব্যারন পরিবারের ছেলে। তাঁর বাবার বিরাট বিত্ত ও ব্যবসা আছে। দেখতে হ্যাণ্ডসাম। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মেধাবী ছাত্র। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ আর্মিতে ভাল পজিশন তৈরি করে নিয়েছেন।

চিঠিটা পড়তে পড়তে মিঃ ব্যারাকলউ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একি হল? মিঃ জোন্সকে এবার কি বলবেন? সে বেচারী কত আশা করে বসে আছে। এমন রূঢ় প্রত্যাখ্যানের খবরটা তাকে দেবেন কি করে?

মাই গড! সিসিল যে লাইফের প্রোগ্রামটাই ভেস্তে দিল। স্বগতোক্তি করে হুইস্কির গ্লাসটা মুখে তুললেন। ক্রমে ক্রমে মদটা একটু বেশিই খেয়ে ফেললেন। ডিনারে বসতে পারলেন না। রাত্রেও ভাল ঘুম হল না। ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে সকাল হল।

ইহ বাহ্য! নিজের মেয়ের বিয়ে। প্রাণ টন্ টন্ করে বৈকী! সে যদি নিজের মনমত ছেলেকে লাইফ পার্টনার করে সুখী হয় তবে তাঁর কি বলার আছে? তিনি তাঁর নিজের লাইফের প্রোগ্রাম আবার ঢেলে সাজাবেন। মেয়ে সুখী হোক।

বেশ কিছু ভাবনা চিন্তার পর মিঃ জোন্সকে ডেকে পাঠালেন। একটু হাল্কা পানাহারের পর বললেন—মিঃ জোন্স! আমাদের কোম্পানির কাছে এটা খুব ক্রুসিয়ল পিরিয়ড। চারিদিকে কাজ। এ সময়ে আমার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। তবু একটা বিশেষ কাজে মাস তিনেকের জন্য হোমে যাব। আশা করি তুমি এদিকটা সামলে নিতে পারবে।

পানমোহরা কোল কোম্পানি, মিঃ ব্যারাকলউ এবং নিজের চাকরির উন্নতি ইত্যাদির উপর মিঃ জোন্সের আর কোন মমতা নেই।

বললেন প্লিজ এক্সকিউজ মিঃ স্যার। আমি আর বোঝা টানতে পারব না। আমি খুব টায়ার্ড।

—সেকি! ইয়ং ম্যান। আমি তোমার প্রমোশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনজন ইওরোপিয়ান ম্যানেজার অ্যাপয়েন্ট করছি। তারা মাস তিনচারের মধ্যে এসে পড়বে। তিনটি কলিয়ারীতে তিনজন ম্যানেজার হবে। তুমি তাদের উপরওলা হবে। পানমোহরা কোল কোম্পানির এজেন্ট হবে।

—সো কাইণ্ড অফ ইউ স্যার। কিন্তু আমি খুব দুঃখিত।

—হোয়াট মেকস ইউ সো মাচ ফ্রাসট্রেটেড মিঃ জোন্স?

—ইয়োর ডটার—মিস্ সিসিল ব্যারাকলউ!

—মাইগড! তার সঙ্গে তোমার সার্ভিসের কি সম্পর্ক?

—এরকম একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিল না কি, আমাদের বিয়ে হবে?

সে কথার খেলাপ হয়েছে স্যার।

মিঃ ব্যারাকলউ একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন —তোমার ডিউটির সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। আমার মেয়েকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলো না। তার দায়িত্ব আমি নেবো না। কারণ সে সাবালিকা এবং নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেবার অধিকার তার আছে।

—অবশ্যই আছে। তবে অন্যের জীবনের ছটা বছর নষ্ট করে দেবার অধিকার হয়ত নেই।

—এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে আমি আগ্রহী নই মিঃ জোন্স।

—ধন্যবাদ স্যার! দয়া করে আমার রেজিগনেশানটা গ্রহণ করে আমাকে ছেড়ে দিন।

উনি তাঁর পদত্যাগপত্রটি দাখিল করলেন। মিঃ ব্যারাকলউ সেটা হাতে নিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে তা হয়ত ওঁর হিসেবের মধ্যে ছিল না।

বললেন —কিন্তু তোমার চুক্তি মোতাবেক আরো দু'বছর থাকতে হবে।

—জবর-দস্তি করলে অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু হুইপিং করে একটা লেবারকে কাজ করানো যায় বাট নট এ ম্যানেজার। আমার শরীর মন দুইই খারাপ। গত ছ'বছর যাবৎ আপনাকে সততার সঙ্গে সার্ভিস দেওয়ার পরি-প্রেক্ষিতে এই অবস্থাটা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ ব্যারাকলউ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন— আমি তোমার জন্য দুঃখবোধ করছি মিঃ জোন্স। জীবনে উন্নতির পথে তুমি যখন একটা শক্ত ধাপ পার হয়ে যাচ্ছো তখনি সেন্টিমেন্টের শিকার হয়ে পড়লে। অথচ এই মানসিক দুর্বলতা যদি কাটিয়ে উঠতে পারতে তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হয়ে যেতে।

উনি বললেন —আপনার কোম্পানীতে আমি আর কিছুই করতে পারবো না স্যার। দয়া করে ছেড়ে দিন। অন্যত্র গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবো।

—উইশ ইউ গুড লাক্‌।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। গুডবাই।

মিঃ জোন্স গট্ গট্ করে চলে গেলেন।

ষোলো

মিঃ ব্যারাকলউয়ের রগ দুটো দপ দপ করছে। ভিজরটা মুচড়ে উঠছে। ওহ্! মাই গড! আমার মেয়ের বিয়ে, আমি যেতে পারবো না। যাকে জন্ম

দিয়েছি, লালন পালন করেছি, স্নেহ ভালবাসার নিবিড় বন্ধনে পাকে পাকে জড়িয়ে আছি তার জীবনের পরম শুভলগ্নটিতে উপস্থিত থাকতে পারবো না। হোয়াট এ ব্যাড লাক!

মিঃ জোন্স তাকে সাহায্য করতে পারতেন। মাস তিনেক কাজকর্ম চালিয়ে দিলেই হত। কিন্তু যে চোট তার হৃদয়ে লেগেছে তারপর কিছু করতে পারবে না। অনেক ভেবেচিন্তে মিসেসকে চিঠি লিখলেন—মিঃ জোন্স যথার্থই সিসিলকে ভালবাসত। কিন্তু ওর সিদ্ধান্তে তিনি এত আঘাত পেয়েছেন যে রিজাইন করে চলে গেছেন। আমিও তাকে ছেড়ে দিয়েছি একজন ব্যথিত মানুষকে কষ্ট দিতে মন চাইল না বলে।

কিন্তু যে বিরাট কর্মযজ্ঞ সুরু করেছি তার দায়িত্ব নেবার কোন সুযোগ্য ব্যক্তি না থাকার জন্য আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তুমি সিসিলের বিয়েটা সেরে ফেল। তারপর মেয়ে জামাইকে হনিমুন করার জন্য ইণ্ডিয়াতে পাঠিও। আমি ওদেরকে স্বাগত জানাবার জন্য ভীষণ উৎকণ্ঠায় রইলাম। ওদের সুখী ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমেন!

মনটা বড়ই চঞ্চল। অকারণেই ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ালেন। তারপর বিকেল বেলায় এলেন দেউলটিতে। খাদেই নামলেন। জয় খাদে ছিল। সসম্ভ্রমে সেলাম দিল। উনি নড করলেন।

দেউলটির দুটি চানকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যে সুড়ঙ্গটা চলছে সেটা তার একটু আগে জয়েন হয়েছে। এখন ফুর ফুর করে বাতাস বইছে। জয় সেই কাজ তদারক করার জন্যই খাদে এসেছিল।

সাহেবকে খবর পাঠাবার আগে তিনি নিজেই এসেছেন, অতঃপর সবিস্তারে বর্ণনা করল। কর্মের সাফল্যে সাহেবের ভারাক্রান্ত মনটা প্রসন্ন হল। তিনি সস্নেহে ওর পিঠ চাপড়ে সাবাস দিলেন।

জয় বলল,—স্যার। আপনি আমাকে বাংলো দিলেন কিন্তু কোনদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি। আজ যদি পায়ের ধুলো দেন তবে ধন্য হব।—ওহ। মাই বয়। আমি গেলে তোমার ওয়াইফরা বিব্রত হয়ে পড়বে। বিগলিত কণ্ঠে জয় বলল—কি বলছেন স্যার? আপনি গেলে কাবেরী যে কত খুশী হবে তা ভাবা যায় না। চলুন স্যার। জাস্ট এ সিপ অফ হুইস্কি!

ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে কাবেরী নামটারই এক প্রবল আকর্ষণ। বললেন—ওকে। তোমার সাধটাই পূরণ করে দিইগে।

জয়ের বাংলোটার দক্ষিণ-মুখী টানা বারান্দা। পশ্চিম-মুখী বাউণ্ডারির গেট পেরিয়ে মোরাম দেওয়া রাস্তায় এসে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ছুটো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। রাস্তার দুপাশে কচি দেবদারুর চারা। একটি সবুজ বাগান

ও লাল-হলুদ ফুলে ঢাকা একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ।

জয়ন্তী তখন ন'মাসের পোয়াতি। শরীরটা ভারী। বিকশিত লাবণ্যে গাল দুটি টসটস করে। বারান্দার সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার পিছনে বসে কাবেরী ওর খোঁপা বাঁধছে।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে গেটের দিকে তাকাতেই ব্যারাকলউ সাহেবকে দেখেই আঁতকে উঠল। ও দিদি —সায়েব! বলতে বলতেই এমনভাবে ছুটে সে ঘরে ঢুকল যে পড়ে গেলেই কুমড়ো পটাস্।

—আহা! ছুটছিস কেন? পড়ে গেলে যে বিপদ হবে। বলতে বলতে কাবেরী ওর পিছনে ছুটল। ব্যারাকলউ সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, আমি গেলে তোমার ওয়াইফরা বিব্রত হয়ে পড়বে।

কাবেরীর মেয়ে সরিতা তখন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে একটা নাদুস-নুদুস কুকুর বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে। হাতে পায়ে ধুলো লেগেছে। এক মাথা সোনালী চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। গায়ের রঙটি সাদা খড়ির মত। প্রতিমার ছাঁদে গড়া মুখ। টানা টানা দুটি নীল চোখ। সাহেব ঘোড়সওয়ার দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ব্যারাকলউ সাহেবের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। তাবৎ স্নায়ুজাল আশ্চর্য মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রকৃতির উদার প্রেক্ষাপটে আপন খেয়ালে খেলায় মত্ত এই শিশুটি যে তাঁরই ঔরসজাত সন্তান তা কাউকে বলে দিতে হল না।

ঘোড়ার লাগাম টেনে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। তারপরই ঘোড়া থেকে নেমে ওর কাছে এলেন। ভীষণ ব্যগ্রভাবে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে অজস্র চুমোয় ভরে দিলেন।

কাবেরী বাইরে-এসে পিতৃস্নেহের বাঁধ ভাঙা প্রস্রবিনী ধারার কোমল মধুর দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল। ওরও বুকটা টনটন করে উঠল। চোখ ফেটে জল এল। পায়ে পায়ে ওদের কাছে গিয়ে ঈষৎ অভিমানের স্বরে বলল— এতদিন পরে মেয়েটিকে মনে পড়ল সাহেব?

উনি কাবেরীর একটা হাত ধরে চুমু খেলেন। বললেন —ওহ মাই ডারলিং! একে যে কোল থেকে নামাতে ইচ্ছা করছে না।

জয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মনে হচ্ছিল কোন যাত্রা থিয়েটারের মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখছে। ভুলেই গিয়েছিল যে ঐ যুবতী তার স্ত্রী। ঐ সাহেব তার মালিক।

ঘটনাটা এইভাবে ঘটবে তা ওদের-হিসেবের বাইরে ছিল। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যেত যে ব্যারাকলউ সাহেবও তো মানুষ। তার হৃদয়েও কিছু আবেগ অনুভূতি আছে এবং তার আউট বার্স্ট হয়।

সামনে নিতে একটু সময় লাগল। তারপর কাবেরীর পিছনে পিছনে ড্রয়িংরুমে ঢুকে একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

স্কচ হুইস্কির একটা বোতল জয়ের কাছে রাখা ছিল। ঠিকাদারী করতে হলে এসব মজুত রাখতে হয়। কখন কোন্ সাহেবের কি ভাব চাগিয়ে উঠবে কে জানে? তখন জোগান দিতে পারলে তিনি প্রসন্ন। তিনি প্রসন্ন হলেই জগৎ প্রসন্ন।

কাবেরী একটা ট্রেতে করে বোতল, গ্লাস, জল, কাজুবাদাম এনে দিল। সাহেব নিজের হাতেই পরিমাণ মত জল ও হুইস্কি মিলিয়ে নিলেন। সরিতাকে ছাড়েননি। পাশেই বসিয়ে রেখেছেন। ওর মুখে কাজুবাদাম পুরে দিয়ে বললেন —খাও।

দু গ্লাস খাওয়ার পরই ওর মনের আগল খুলে গেল। বলতে শুরু করলেন— এই যে এত কুলি-কামিন, বাবু চাপরাসী এরা কি মনে করে? সাহেব বহুত মউজ আর ফূর্তিসে সরাব খায়। খুবসুরৎ জানানা নিয়ে মাতোয়ারা হয়। তার জীবনে থাক্ থাক্ সুখের পসরা। কিন্তু সত্যি কি তাই? বল কাবেরী, তুমি তো আমাকে খুব কাছে থেকে দেখেছো। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনেছ।

কাবেরী বলল —হ্যাঁ সাহেব! আমি সব জানি।

—না। এখনো তুমি সব জান না। এই মাসে আমার বড় মেয়ে সিসিলের বিয়ে। আমি যেতে পারলাম না। কি বলবে আমার মেয়ে? এ সেক্স ম্যানিয়াক ম্যান ইণ্ডিয়াতে গিয়ে যতসব র' উওম্যানের সেক্স নিয়ে মেতে আছে। নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য কিসের মাথা ব্যথা। ওঃ! কি যে দুঃখের কথা!

সাহেবের গলা ভেঙে গেল। জয় কেমন অভিভূত। সরিতা ওর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে। কাবেরীর বুকটা মুচড়ে উঠল। বলল —কিন্তু সে তা নাও ভাবতে পারে সাহেব। তুমি যে এত বড় কোল কোম্পানী গড়েছো তা তো সবাই জানে। তোমার মেমসাহেবও তো উলটো বুঝেছিলেন। নিজের চোখে দেখার পর সব ভুল ভেঙে গেল।

—ঠিক বলেছো। আমার মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী। সে নিশ্চয় বুঝবে। ওঃ কাবেরী! আমার ভাবনাটা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তুমি তার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। ধন্যবাদ। আমি উঠি।

গ্লাসটা শেষ করে জয়কে বলল —তোমার আতিথেয়তায় আমি খুশী হয়েছি। আরো খুশী হব তুমি যদি মেয়েটিকে মাঝে মধ্যে আমার কাছে পাঠাও। ওকে দেখে আমি খুব আনন্দ পাব।

জয় বলল —তাই হবে স্যার। আমি নিজে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। না হলে ওর মা যাবে।

সাহেব আবার সরিতাকে কোলে তুলে নিলেন। অনেক আদর করে চুমু খেয়ে বললেন —রোজ সন্ধ্যায় যেও। হ্যাঁ। আমি তোমাকে খুব ভালবাসব।

সরিতা ঘাড় নেড়ে বলল —হ্যাঁ।

ওকে কোল থেকে নামিয়ে বললেন —বল কাবেরী। তোমার মেয়ের জন্য কি করতে পারি?

কাবেরী একটু হেসে বলল—অনেক কিছুই করতে পারো সাহেব। ভালভাবে লেখাপড়া শেখাতে পারো। বড় হলে ভাল করে বিয়ে দিতে পারো।

—অল রাইট! আই প্রমিস ইউ। গুড বাই!

তামাম দুনিয়ার তাবৎ অশান্তির মূলে জড়, জমিন্, যোনী।

জড় হচ্ছে বংশধারা ও তার শিকড়-বাকড়। জমিনের ব্যাপক অর্থ বিষয় সম্পত্তি। তিনটি কারণের মধ্যে যে কোন একটা বিগড়ে গেলেই মানুষের জিন্দেগী কয়লা হতে দেরী লাগে না। ব্যারাকলউ সাহেবের জীবনে তিনটিই প্রবল। নিজের মনের মধ্যে হরদম লড়াই চলে।

যন্ত্রণা ছাড়া আবার জীবনের তাৎপর্য কি? ওটা থাকবে পুরনো বাত শ্লেষ্মার মত। ঋতু ভেদে কমবেশি। সে সব সয়ে নিতে হয়।

ব্যারাকলউ সাহেবের দিন কাটছে রৌদ্র ও মেঘের লুকোচুরি খেলার মধ্যে। তখনি হাসিখুশী তখনি গম্ভীর। বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ খরা। রোজ সন্ধ্যায় সরিতা আসে। খরার বুকে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। সারাদিনে এই একটুখানি আনন্দের জন্য ব্যারাকলউ সাহেব কলিয়ারীর হাজার কাজ ফেলে ছুটে আসেন বাংলায়। তার জন্য কলকাতার হগ্ মার্কেট থেকে আনা হয় সেরা জামা কাপড়। কত রকমারি খেলনা, ছবি, মূর্তি।

সাহেব কোঠিতে সে যেন রাজকন্যা। সহিস, কচোয়ান, বাবু, চাপরাসী, আয়া, মালি, বাবুর্চি, খানসামা সবাই ওর খিদমতে ব্যস্ত।

কাল বড় বলবান। তারই অমোঘ আবর্তনে ঋতুচক্রের আবর্তন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্র ও ভীষণ তাপ প্রবাহের পর আষাঢ়ের আকাশে মেঘ ডম্বরু বাজছে। পুবের আকাশে জমেছে কালো মেঘ। বৃষ্টি নামবে। বহু আকাঙ্ক্ষিত বর্ষার বৃষ্টি।

স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসেছেন সিসিল অসবোর্ণ। তিনজন নতুন ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজার ডিউটিতে জয়েন করেছেন। সেই সঙ্গে ডেপুটি চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছেন মিঃ ট্রুম্যান। হু হু করে উৎপাদন বাড়ছে। আর কোন ভাবনা নেই। কেটে গেছে সময়ের ফের।

কাবেরী এখন ছাপামারা গৃহবধূ। সিঁথিতে ডগ্‌ডগে সিঁদুর। জয়ন্তীর একটি ছেলে হয়েছে। সরিতা কলকাতার সাহেব স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বোর্ডিংয়ে থাকে।

বিশ হাজার বিঘা কোল প্রোপার্টি। তিনটি কলিয়ারীর তিন জোড়া হেড গীয়ার উদ্ধত অহমিকায় দাঁড়িয়ে। বন্‌বন্‌ করে পুলি চাকা ঘুরছে। হস্‌ হস্‌ শব্দে ষ্টীম ইঞ্জিন চলছে। আকাশ ছোঁয়া ইটের চিমনী দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নীল আকাশের বুকে এঁকে যাচ্ছে একটির পর একটি শিল্পবিপ্লবের ছবি। কুলি ধাওড়ায় মাদল বাজছে। বাতাসে ভেসে আসছে ধেনো মদের গন্ধ।

এইখানেই উনি থামতে পারতেন। অনায়াসে বসে বসে মুনাফা ভোগ করতে পারতেন। মিয়ামী বিচে মেমসাহেবকে নিয়ে নগ্ন সমুদ্র স্নান বা রৌদ্র স্নান করতে পারতেন। রেসের ঘোড়ায় বাজী ধরতে পারতেন। তাঁর বিরাট সংগ্রহশালাটি নিয়ে লণ্ডনে একটা যাদুঘরও খুলে দিতে পারতেন।

অথবা মাইনিং টেকনোলজির উপর টেকস্ট বই লিখতে পারতেন। কিংবা উপন্যাস!

প্রেমপত্র লিখে লিখে যেভাবে হাত মস্ক করেছেন এবং বিভিন্ন রকম জনমানুষের সংশ্রবে ও নারী সম্ভোগে যত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাতে অনায়াসে উৎরে দিতে পারেন রগরগে যৌন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। নাম হতে পারে — সেক্স অফ ট্রাইবেল উওম্যান। লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরুতে পারে —এ গ্যালাণ্ট সেক্স সাগা।

কিন্তু না। তিনি ওসব কর্মের লোক নন। তাঁর জীবনে অবসর যাপনের বিলাসিতা নেই। ঘোড়ায় জিন পরানোই থাকে। তিনি ছুটে চলেন দামোদর উপত্যকা থেকে অজয়ের অববাহিকায়। সেখানে মোরাম গ্রাভেলসের ডাঙা, বিস্তীর্ণ কাশবন। শাল, মহুয়া, পিয়াল, পলাশ, বহড়া, হরিতকী, শিঁয়াকুল ও বনকুলের ঘন অরণ্য। বাঘমুড়ি পাহাড়। সীতানালা জোড়। ছাপান্নটি মৌজার নওরঙ্গী জমিন্‌দারী। আটান্ন হাজার বিঘা কোল প্রোপার্টি।

তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তিনি কদম কদম এগিয়ে যান রাঙা মাটির ডহরে।

সতেরো

বঙ্গভঙ্গের কারণে দেশে যখন দুর্বার গণ-আন্দোলন কয়লা কুঠির কুলি-কামিনরা তখন মালিক, ম্যানেজার, সরদার, ঠিকাদার ও চাপরাসীর ডাণ্ডায় বেবাক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। খাদের অন্ধকারে বুকফাটা কান্নার বারোমাস্যা নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। সেক্স ও লিকারটাই তাদের জীবনের শেষ প্রমোদ উপকরণ। জীবন ধারণের অবলম্বন।

জুয়ো খেলে যন্ত্রণা পেতে। গ্যালন গ্যালন ঘাম ফেলে যে পয়সার উপার্জন

তা অবলীলায় হেরে দেয় তিনপাত্তি, কাঠপাত্তি তাসের রহস্যময় খেলায়। অথবা কড়গুঠির চালে।

সংগ্রামের নাম শোনেনি। সিধু-কানু চাঁদ-ভৈরবের নাম জানে না। দামিনী, গোড্ডা, জামতাড়া সাঁইথিয়ার রক্তলহান লাশগুলোর স্মৃতিও মনে রাখে না। ভগবান বীরসা মুণ্ডাকেও দেখেনি। খুটকাট্টি স্বত্ব ও অরণ্যের অধিকার যে কি তা ওর া বোঝে না। সিপাহী বিদ্রোহ তো বিস্মৃতির ইতিহাস। নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, মঙ্গল পাণ্ডে, ঝাঁসির রাণী সেই ইতিহাসের পাতাতেই থাকুন।

সে সময়ে গান্ধীবাবা দেশের মানব জমিন আবাদ করতে লেগেছেন। কিন্তু কয়লাকুঠির দেশ অনাবাদীই রয়ে গেল।

এইসব জুয়াখোর, রাণ্ডীখোর, অজ্ঞ, মূঢ় মদমাতালের বিশাল বাহিনী শ্রম, স্বেদ ও অশ্রু ঢেলে সাহেবদের শিল্পবিপ্লবের নামে মুনাফা লোটার কলিয়ারী কারখানা অনবরত চালু রাখত। বিনিময়ে পেত দু'গণ্ডা পয়সা, এক বোতল মদ অথবা একটি মেয়ে। তাতেই ওরা ভাবে গদ গদ। সাহেব ছাওতা হায়।

লর্ড কার্জন এসেছিলেন বর্ধমানে। তাঁর বিপুল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ব্যারাকলউ সাহেবও গিয়েছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর অফ মহারাজা বার্ডোয়ান তাঁকে খুব খাতির করে রাজবাড়ির বিলাসবহুল গেস্ট হাউসে থাকতে দিয়েছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তাঁরা বসেছিলেন বৈষয়িক আলোচনার টেবিলে।

নওরঙ্গীর তৎকালীন জমিদারবংশ শরিকি সংঘর্ষ, আত্ম-কলহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও মামলা মোকদ্দমার কারণে ক্ষতবিক্ষত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের বদান্যতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফায়দা লুটতে যিনি তহশীলদার থেকে জমিদারে প্রমোশন পেয়েছিলেন একশ বছরের মধ্যেই খাজনা অনাদায়ের দরুন সে জমিদারী লাটে উঠে গেল। বর্ধমান রাজ সেই জমিদারী নীলামে তুলে দিয়েছিলেন।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে দেওয়ান বাহাদুরের বন্ধুত্ব ছিল। আবার চঞ্চলবাবুর শ্বশুর বংশের সুবাদে পানমোহররা জমিদারের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি বনবহাল কলিয়ারীর সেটেলমেণ্টে হস্তক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন —মিঃ ব্যারাকলউ। নওরঙ্গী জমিন্দারী নীলামে ডেকে নিন। ব্যাচারী চঞ্চল বহু কষ্টে একটা কলিয়ারী করেছে ওকে কাজ করতে দিন।

মিঃ ব্যারাকলউ সে প্রস্তাবে রাজী।

অতঃপর জমিদারীর পাট্টা পেতে অর্থব্যয় ছাড়া অন্যকিছু অসুবিধা হয়নি। দেওয়ান বাহাদুর নিজে এসে তাঁর দখলকায়েম করে দিয়েছিলেন। যাবার

সময় এক কলসি রুপোর টাকা সেলামি নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরেছিলেন।

বনের কাঠ, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল, জমির ধান, প্রজাদের খাজনা নিয়ে জমিদারী করার মতলব ওঁর ছিল না। ওঁর দৃষ্টি ছিল মাটির নিচে। পরপর সাতটি স্তরে একশ কুড়ি ফুট মোটা কয়লা স্তরের দিকে।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে স্বনামধন্য মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আগাবেগেরও দৃষ্টি ছিল সেই কয়লার দিকেই। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে তিনি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রচুর কয়লার অস্তিত্ব পেয়েছিলেন। খাদও খুলেছিলেন। কিন্তু কয়লার গুণগত উৎকর্ষ না থাকার জন্য তা বাজারের চাহিদা মেটাতে পারেনি তাছাড়া কয়লা পরিবহনের যানবাহনও ছিল না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী তখন দেশের প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজে ব্যস্ত। নওরঙ্গীর বনজঙ্গল, রুখুডাঙা ও ধান ক্ষেতে রেললাইন পাতবার উৎসাহ পায়নি।

সাহেবদের পারস্পরিক মেলামেশার স্থান ছিল গীর্জা, ইউয়োপীয়ান ক্লাব ও বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানের আসরগুলি। গীর্জাগুলিতে পাদ্রীসাহেবদের আধিপত্য। সেখানে তাঁরা ন্যাড়া বেঁধে রাখতেন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ ও শোক পালনের।

ইউরোপীয়ান ক্লাবগুলি ছিল খোলা-বাজার। খাও-দাও স্ফূর্তি করো। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকত না। আদি পাপের চর্চা যেমনই হোক সাহেবদের তালে ভুল হবার জো নেই।

কাজেই কোল কোম্পানী, রেল কোম্পানী, কারখানা কোম্পানী পুলিশ প্রশাসন ও সিভিল সার্ভিসের অফিসাররা যখন সেখানে জমায়েত হতেন তখন শেরী শ্যাম্পেন, স্কচ হুইস্কীর গ্লাস হাতে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের আলোচনাও করতেন।

মিঃ ব্যারাকলউ তেমনি এক পানভোজনের আসরে রেল কোম্পানীর বড় কর্তার সঙ্গে অণ্ডাল-নওরঙ্গী লুপ লাইন স্থাপন নিয়ে আলোচনা করে-ছিলেন। সিদ্ধান্তও হয়ে গিয়েছিল।

তারপর প্রস্তাব, অনুসন্ধান, সুপারিশ, মঞ্জুর ইত্যাদি ছিল নিয়ম রক্ষার ব্যাপার।

শুরু হয়ে গেল বিশাল কর্মোদ্যোগ।

জয়গোপালের তো হাঁফ ফেলবার অবকাশ নেই। সাহেবও ছুটে বেড়াতে লাগলেন কালো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে। হাঁসাপাথরেব ভাঙা অনাবদী ভূমির উপর তৈরি হল কুলি-ধাওড়া, বাবু কোয়ার্টার। সাহেবের জন্য নওরঙ্গী হাউসের কাজও শুরু হয়ে গেল।

আঠারো

বিবিবাথানে সন্ধ্যা নামে ধোঁয়ার মেঘ বেয়ে। ঘরে ঘরে উনুন জ্বলে। কাঁচা কয়লার আগুন লাল হলুদ শীষের সঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে দেয়। তখন ওদের রান্না হয়। সারাদিনে একবার। যাদের দিন-পালি ডিউটি তারা সন্ধ্যায় রান্না করে গরম ভাত খায়। সকালে বাসিভাত খেয়ে ডিউটি যায়। যাদের রাতপালি ডিউটি দিনে তাদের রান্না হয়।

এইভাবেই তাদের জীবন পরিক্রমা চলে। বয়স বাড়ে। ক্রমশ বৃদ্ধ হয়। অশক্ত ও দুর্বল হয়। রোগ বাসা বাঁধে। জবু-থবু হয়ে কালের ঘণ্টা শোনে। তাদের ছেলে-মেয়েদের কেউ বুড়ো বাপ-মাকে খেতে পরতে দেয় না। এ যাতনা নিত্য-কালের।

মনসারাম এব্যাপারটা নিয়েও ভাবে। অসহনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও সে সোজা হয়ে থাকে। একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করে। কথায় কথায় লাঠি ভাঙা আর বিবিবাথানের মেয়ে ধরে ফুর্তি করার খোয়াব সে ঘুচিয়ে দিয়েছে। পেটে গুঁতো মেরে, গলায় বাঁশ দিয়ে সুদ আদায় ও টবগাড়ির হিসেবে কারচুপি করার কলাকৌশল সে বন্ধ করে দিয়েছে।

সেজন্য তার শত্রুর শেষ ছিল না। স্বার্থপর চরিত্রগুলি নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছিল তাকে খতম করার। খুঁজে বেড়াচ্ছিল ছল-ছুতো।

বৈশাখীর বয়স বারোতে পড়ল। মাসখানেক হল দ্বিরাগমন হয়েছে। কিন্তু ওর মা ওকে রাত্রিবাস করতে দেয় না। স্বামী সহবাসে বাধা নেই কিন্তু বিপদ আছে। সে যে নিতান্তই কচি।

মনসারাম ওর বালিকা বধূটিকে বড়োই ভালবাসে। সে মনে করে বৈশাখী একটি ফুলের কুঁড়ি। তাকে জল দিয়ে, বাতাস দিয়ে, আলতো ছোঁয়া দিয়ে আদর করতে হয়। ছিঁড়ে ফেলতে নেই।

তাই করে ও। আদর করে, চুমু খায়, গল্প করে কিন্তু কদাচ তাকে দেহগত বাসনার আঁচ লাগতে দেয় না। সেও প্রত্যাশা করে কবে বৈশাখী বড় হবে, যুবতী হবে তারপর স্বামী-স্ত্রীর মিলন হবে। এ নিয়ে স্বপ্নও দেখে।

ফাল্গুন মাস এসে পড়ল। চারিদিকে বিয়ের পরব। আবার সামনেই হোলি উৎসব। পশ্চিমা ধাওড়াগুলির চবুতরায় ঢোলক করতাল বাজে রাত দুপুর তক্। হোলির গান হয়। কোন কোনদিন সেও তাদের সঙ্গে হোলির গানে মজে যায়। তার বন্ধু বান্ধব ও অনুরাগীর সংখ্যা তাদের মধ্যেও নেহাৎ কম নয়।

আগে ঢালুদাস ও ছলনা দাসীর একটাই শোবার ঘর ছিল। রাগিনী আসার পর আরো একটা পেল। তারপর ছেলেমেয়েগুলি শালকোঁড়ার মত বেড়ে উঠল। বিয়ে হল। বউ এল। তখন যে তাদের জন্য চার দেওয়ালের আড়াল ও মাথার উপর ছাউনি না হলেই নয়।

ঢালু দাস সাহেবদের হাতে পায়ে ধরে খড়, বাঁশ, দড়ি, পেরেক ইত্যাদি মঞ্জুর করিয়েছিল। গৌর নিতাই নিজেরাই ছোটখাট কুঁড়ে ঘর বানিয়ে নিয়েছিল। কাজেই মনসারাম ওর মায়ের ঘরটাই পেয়ে গেল। জামাই কুটুম এলে সে ঘর ছেড়ে দিয়ে চঞ্চলার কাছে থাকে।

জবা ও তার জামাই বেশ কিছুদিন এখানে ছিল। ছাওয়াল হবার জন্যই এসেছিল ও। মনসার ঘরটি দখল করে রয়ে গেল। যাবার সময় একটি চাঁদপানা বেটা নিয়ে গেল। মনসার তাতে বড় আহ্লাদ। সে এখন শান্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

মাঝে মধ্যে টিপ্পনী কাটে —ভোজী! তুর কবে ব্যাটা হবেক।

সেও এখন পূর্ণগর্ভা। আসন্ন মাতৃত্বের পুলকে রীতিমত গর্বিতা। এত যে অভাব অনটন তব ওদের নতুনকে বরণ করে নেবার সহজাত প্রবণতা দেখার মত।

শান্তি জবাব দেয় —ক্যেনে? তুর অত তাগাদা কিসের?

—ঘরটি লিপাপুঁছা করতে হবেক ত।

—তুর ঘর তুঁই লিপাপুঁছা করে রাখ। তুর বউ তো আসবার লেগে লুকুর-পুকুর করছে। একদিন জোড় লাগাঞে দে। আমরা সেদিন দমে হাঁড়িয়া খাব আর লাচব।

এমন তরল রসিকতার মধ্যে ওরা মনসা ও বৈশাখীর মিথুন লগ্নটির জন্যই প্রতীক্ষা করে।

সেদিনও দিনপালি ডিউটি করে সন্ধ্যার মুখে বিবিবাঁধে স্নান সেরে ঘরে ফিরেছিল। উঠোনে রান্না হচ্ছিল। গৌর নিতাইয়ের একপাত্র হাঁড়িয়া না হলে রাত্রে ঘুম হয় না। মনসার ওসব নেশা নেই। সে উঠোনে বসে বৌদিদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিল। হাসিঠাট্টার ফাঁকে ফাঁকে রান্নার কাজ চলছিল।

টিনের থালায় মাড়ভাত বেড়ে রেখেছিল। গৌর নিতাই এলেই সবাই মিলে বসবে। বেশ একটা খুশীর সন্ধ্যা। বিবিবাথানের ঘরে ঘরে প্রায় একই দৃশ্য। সারাদিন খাটা-খাটুনির পর রাত্রের খাবার খাওয়ার আগের মুহূর্ত।

হঠাৎ যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। খট্ খট্ শব্দে ঘোড়সওয়ার ছুটে এল। একযোগে দশ বারোটি ঘর চাপরাসীর লাঠিতে থরহরি কম্পমান হল। গোটা পাড়াটা ঘিরে ফেলল বন্দুকওলা আদমী। হাঁড়িকুড়ি ভেঙেচুরে, মেয়েদিকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে ঘরে তল্লাসী শুরু হল।

এবার আর শুধু চাপরাসী দল নয় তাদের সঙ্গে পুলিশও। রীতিমত বন্দুক-ধারী। মনসারাম উঠে দাঁড়াবারও অবসর পেল না। পুলিসের লাঠি খেয়ে ঝামরে পড়ল।

হারকু পাশী হুঙ্কার দিয়ে বলল—এহি শ্যালে খুনী হ্যায়।

পুলিশ ওকে ঝটপট বেঁধে ফেলল। শাস্তি ও মালতী কোনরকমে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। তাদেরকে টেনে এনে কাপড় চোপড় খুলে উদোম করে দিল।

মনসা বলল—ইয়ে ক্যা হ্যায়? হামলোগকো আওরৎকো কাহে বেইজ্জত করতা? উন্ লোগকো ছোড় দেও।

হাতে বাঁধন থাকা সত্ত্বেও এক ঝটকায় দুজন পুলিসকে ফেলে দিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছলনা একটা কাটারী নিয়ে একটা চাপরাসীকে চোট দিয়ে দিল। ওদিকে ঢালুদাস ছুটে এল টাঙ্গি নিয়ে।

চারজন লোকে মনসাকে ধরে হিঁচড়ে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল। গোটা বিবিবাথান জুড়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার, কানফাটা আর্তনাদ। দেখতে দেখতে ঢিল, ফাবড়, লাঠি, টাঙ্গি, রক্তলহান জোয়ান মরদের প্রাণ-কাঁপানো হুঙ্কার, লজ্জা সরম ত্যাগ করে উদোম যুবতীদের রণরঙ্গিনী মূর্তি বিবিবাথানের ঘর উঠোন, রাস্তা ঘাট থর থর করে কাঁপিয়ে দিল।

শাস্তি ও মালতীর গায়ে যতক্ষণ কাপড় ছিল ততক্ষণই লজ্জা ঢাকবার প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মরক্ষা করে যাচ্ছিল। সে আবরণ খুলে যাবার পর তারাই হয়ে উঠল ভয়ঙ্করী। তখন ওদের মহড়া নেয় কে?

ঢালু দাসের ঘরটিকে ঘিরেই দাঙ্গা হাঙ্গামা চরমে উঠল। ততক্ষণে গৌর নিতাইও ছুটে এসেছে। কালো বাউরা তরোয়াল হাতে ফরি খেলে বেড়াতে লাগল। সে আবার মালতীর দাদা। বোনের বেইজ্জতির বদলা নিতে এলোপাতাড়ি তরোয়াল চালিয়ে চার-পাঁচজন চাপরাসীকে ঘায়েল করে পুলিসের হাতে ধরা পড়ল।

অর্ডার হল —ফায়ার!

দুম্‌দাম্ গুলি চলল। যেখানে সেখানে লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখন আবার পালাবার তাড়া পড়ে গেল। বাচ্চা, বুতরু, বুড়ো-বুড়ি প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগল। পুলিস ও চাপরাসী একযোগে শুয়োর ঠেঙানো করে জোয়ান মরদগুলিকে ঠেঙাতে লাগল। তেড়ে তেড়ে নিয়ে যায় আর ঠেঙায়। হাতিয়ার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেই বন্দুকবাজরা গুলি করে। সে এক বীভৎস অত্যাচার।

তারই মধ্যে বন্দী হল মনসারাম, কালো বাউরী, শিবু ডোম, আবদুম, মোহিত, নটবর, গোবিন্দের মত রোখালো ছোকরাদের একটা দল। আর বন্দিনী হল মালতি, সুমি, সাবিত্রী, সুন্দরী, রাধি, সুরথিদের সঙ্গে বৈশাখীও। ছোকরাদিকে চালান করা হল থানার হাজতে। মেয়েদিকে নিয়ে গেল কাঁচা নারী-মাংস দিয়ে ভোজ বানাতে।

একঘণ্টার মধ্যে সারা বিবিবাথান ঠাণ্ডা। ঘরে ঘরে শুধু কান্না আর কান্না। কারো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে কারো বউকে। কারো ছেলে রক্ত লহান

হয়ে পড়ে আছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে। বিবিবাথানের মাটি রক্তে কাদা। চলতে ফিরতে পায়ে লাগে চ্যাপ্‌ চ্যাপ্‌ করে।

সেই বীভৎস ও ভয়ার্ত রাত্রের আকাশ চিরে ধ্বনিত হচ্ছে বৈশাখীর মায়ের বিলাপ —হায় হায় মা-ঈ-কি হল ? ঐ টুস্‌টি কচি বিটি ছিলা গো, উয়ার যে ফুল খসে নাই গো, তার কপালে ক্যেনে তেঁতুল গুলে দিলে ঠাকুর। মাটিতে থাপ্‌সি গেড়ে বসে দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে আর মাটিতে মাথা ঠুকছে। ছলনা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। তার দুটি বেটাকে মেরে মেরে আদা খেঁৎলা করে দিয়েছে। ঢালুদাস পড়ে আছে চিৎপটাং দিয়ে। তার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

তার চেয়েও মর্মান্তিক অবস্থা বড় বৌ শান্তির। তার পেটে লাথি মেরেছে। দশ মাসের পোয়াতি। রক্তে বানভাসি হয়ে গেছে সারা ঘর। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বাঁচবে না মরবে—তা ঈশ্বর জানেন।

এত যে অত্যাচার, রক্তপাত, নারী নির্যাতন তার যে কি কারণ তা-ওরা জানে না। কে যে খুন হয়েছে ? কেন যে মনসারামকে খুনী বলে ধরে নিয়ে গেল তাও ওরা জানে না। ওদের শরীরের রক্ত এবং বিবিবাঁধের জল যেন একই। ঝরে গেলে অত্যাচারীর কি এসে যায় ?

কিন্তু তবু ওরা মরে না। আশ্চর্য ওদের জীবনীশক্তি।

ভোরের দিকে একটি দুটি করে ঘরে ফিরে এল ধর্ষিতা মেয়েরা। বৈশাখীকে ধরে ধরে নিয়ে এল মালতী। লজ্জা, অপমান, নির্যাতন তাদের বুকের ভিতর ঘোল মইছে। চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। রাগ তাদের মাথায় শন্‌ শন্‌ করে চড়ছে। পারলে চিবিয়ে খেয়ে দেবে হারকু পাশী ও তার সাকরেদ্‌দিকে।

ছলনা অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—মনসাকে আমি কি জবাব দিব রে ?

সেই কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই সঙ্গে ডুকরে উঠল মালতী ও বৈশাখী। ঢালুদাসের ঘরটা হয়ে গেল যন্ত্রণার সাগর।

উনিশ

হাজত ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে মনসারাম গুম্‌ হয়ে বসে আছে। তার সঙ্গে আরো আট-দশজন আছে। তাদেরও কারো মুখে রা নেই। সেই কালো রাত-টির স্মৃতি তাদের বুকে ছাপ মেরে গেছে। যেন পাথরে খোদাই করা শিলালিপি।

বড় দারোগাবাবু তিন দিন ধরে ওদেরকে জেরায় জেরায় জেরবার করে দিয়েছেন। দাঙ্গার দিনে চোট-ঘাট খেয়েই তো ওদের হাড়-মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে, তারপরে চলেছে দারোগাবাবুর রকমারি ডিগ্রীর ট্রিটমেণ্ট। সেসব

অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে। তবু কেউ ব্রজলালের নাম করেনি। অবশ্য তারা জানেও না যে, রঘুনাথের আসল হত্যাকারী কে ?

ঘটনার দিন রাত্রি বারোটা-একটার সময় তাকে খুন করে লাশটা বন্ধ সুরঙ্গে ফেলে দিয়ে ব্রজলাল বাসমতিকে নিয়ে পালিয়ে পানমোহরায় উঠেছিল। এখন সে নিরাপদ আশ্রয়ে।

ওদিকে রঘুনাথ ডিউটির পরেও বাসায় না ফেরার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনেরা খুঁজতে-খুঁজতে বেলা তিনটে নাগাদ ওর লাশ উদ্ধার করেছিল সালুঙ্কী খাদ থেকে। হরদেও ও বরমদেও ধরেই নিয়েছিল এমন বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড বিবিবাথানের লোক ছাড়া করতেই পারে না। আর বিবিবাথান মানেই মনসারাম।

কোম্পানীর আর্মি-ফোর্স চাপরাসী দিয়ে যে বিবিবাথানকে জব্দ করা যাবে না তা ওরা ভালোই বুঝত। কুটস সাহেবকে খবরটা দিতেই উনি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে এমন এ্যাকশন করে দিলেন নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতায় যা ছিল স্মৃতিরও অতীত। এর পূর্বেও কুলি-ধাওড়ায় অত্যাচার ও নির্যাতন অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু তা হয়েছে একতরফা। প্রতিরোধ সংগ্রাম হওয়া মাত্রই তা হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর।

দারোগাবাবু নিজেও এতটা আন্দাজ করেননি। বিবিবাথান যে বারুদে ঠাসা হয়েছিল তা উনি জানতেন না। এখন উনিও চিন্তিত। মনসারাম যে হত্যাকারী তারও প্রমাণ পাচ্ছেন না। কে হতে পারে তাও বুঝতে পারছেন না। দাঙ্গার রাত্রে পাহারা থাকা সত্বেও বহু কুলি-কামিন পালিয়ে গেছে। কাজেই ধাওড়ায় ধাওড়ায় অনুপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিলেন না।

যারা হাজত বাস করছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে রোজই বিবিবাথান থেকে লোকজন আসে। তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখ চুন করে রাস্তার ধারে বসে থাকে। উনি সাক্ষাৎ করতে দেন না। ছাড়বার তো কোন প্রশ্নই নেই।

কিন্তু সেদিন উনি ঢালুদাস ও ছলনা দাসীকে মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিলেন।

মনসার মুখোমুখি হতেই ছলনা ডুকরে কেঁদে উঠল। ঢালুদাস অনেক কষ্টে ওকে থামাল। মনসা বলল —কেঁদে কি করবি মা? উসব কান্নাকাটি ভুলে যা।

ছলনা মুখ বিকৃত করে বলল —যে আঁটকুড়ির বিটি তুকে প্যেটে ধরেছিল সে মরে দিলেক ক্যেনে ? বেঁচে থেকে দেখত তার ব্যাটা-বৌয়ের দশা।

—মা। উসব কথা ছাড় ত। কি হঞেছে বল?

—কি হতে বাকী আছে ? তুর বড় ভোজীর প্যেটে এমন লাথ মারলেক

যে তার গুটি ভস্‌কে গেল। সারারাত লহু বিরাল। সকাল বেলায় খেপী দাই এসে একটি মরা ছ্যেলা বাহার করলেক।

মনসারামের বুক ফেটে গেল। ছলনার কথা তখনো শেষ হয়নি। সে বলল —মাঝলা বৌ আর ছুটু বৌকে ধরে নিঞে গেল। বেইজ্জত করে ভোর বেলাতে ছেড়ে দিলেক।

শুধু স্ত্রীর সতীত্ব নাশ নয় একটি ভালবাসার ফুলকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ধূলায় ফেলে দেবার মর্মান্তিক সংবাদ মনসারামের হাড়-পাঁজরে ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দে বাজনা বাজাতে লাগল।

লর্ড যীশাস ক্রাইস্ট!

ভেঙে পড়তে পড়তেও সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কঠিন মুখে বলল— মনসারামের বৌয়ের সতীত্ব থাকতে নেই মা। ওটা মস্তবড় পিছুটান। বৌকে বলে দিবি—সতীত্ব দিঞেই তার জীবনের লড়াই লাগু হল।

কি দুঃখ! দশ বছর বয়সেই যে স্বামীকে চিনেছিল। বুকভরা ভালবাসা তার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। সোহাগ বাসরের পূর্বেই সে ধর্ষিতা হয়ে গেল।

মনসারাম পাথর হয়ে সে খবর শুনল।

ওদের কথা শেষ হতে পেল না। একজন পুলিশ এসে ঢালুদাসকে ঠ্যালা মেরে বের করে দিল।

একটি রঘুনাথ মুনশীর লাশ হরদেওদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ। এই ছুতোটি নিয়ে গোটা বিবিবাথানকে জব্দ করে ফেলল। শুধু মনসা নয়। বাছাই বাছাই ছোকরাগুলিকে হাজতে পুরে দেবার পর ওদের বুকের বল শতগুণে বেড়ে গেল। ভীতি ও সন্ত্রাশের রাজ কায়েম করে দিল।

তিনদিন ধরে বিবিবাথানে কারো ঘরে ভাতের হাঁড়ি চড়েনি। উনুনের ধোঁয়া ওঠেনি। ছেলেপুলেরা কেঁদে কেঁদে নেতিয়ে গেছে। মেয়েরা চুল ছিঁড়ে মাথা ঠুকে কাঁদতে কাঁদতে বোবা বনে গেছে। আহত ও ক্ষতবিক্ষত জোয়ান মরদগুলি চোট ঘাটের টন্‌টনে ব্যথায় আর্তনাদ করছে। কারো বা ঘা বিষিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে চাপরাসী লাঠি নাচাচ্ছে —চল শ্যালা —খাদে চল।

কিছু কুলি-কামিন পালাবার চেষ্টা করেছিল। তাদেরকে বেধড়ক পিটিয়ে আবার ধাওড়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। যারা পালাতে পেরেছে তারা বেঁচে গেছে। এখন বিবিবাথানের চারিদিকে কড়া পাহারা। ওদের মেয়েদের পুকুরঘাটে যাবারও জো নেই।

এত যে কাণ্ড ঘটছে তাতে শেরগড় কোল কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন মাথা ব্যথা নেই। কয়েকদিন প্রোডাকশন মার খেয়েছে সেজন্য ম্যানেজারের কাছে চিঠি এসেছে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে—যাতে

প্রোডাকশন পুরো হয় এবং গত কয়েকদিন যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা হয়।

সাত আটদিন হাজতবাসের পর মনসারাম সহ দশ-বারোজন শ্রমিককে আদালতে হাজির করা হল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং রঘুনাথ মুনশীর হত্যাকাণ্ড।

ফৌজদারী মামলার আসামী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা মনসারামের সেই প্রথম। তার আগে যতবার দাঙ্গা ফৌজদারী হয়েছে তার একতরফা বিচার হয়ে গেছে সাহেবদের ডাণ্ডার মুখেই। কিন্তু এবার ব্যাপারটা যে আদালত পর্যন্ত এল তারও তাৎপর্য গভীর। শেরগড় কোল কোম্পানীর নিজস্ব চাপরাসী বাহিনী যে ওদেরকে দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে এটাই তার প্রমাণ।

আদালতে ওদেরকে জামিন নেবারও কেউ নেই। তাই হাতে পায়ে বেড়ী পরে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এবং হাজিরা দেওয়া ছাড়া কিই বা করার আছে?

দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা রোদে বসে থাকার পর ওদের ডাক পড়ল। তখন দেখা গেল কালো কোট পরা একজন উকিল তাদের জামিনের জন্য আবেদন করেছেন। মনসারাম অবাক হয়ে গেল। কে এমন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে যে তাদের জামিন নেবে? প্রশ্নটা মনের মধ্যেই উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

আবেদনকারী উকিল কয়লাকুঠির শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচারের এক একটি খতিয়ান তুলে ধরে বেশ মন ভেজানো বক্তৃতা দিলেন। কোম্পানীর তরফে যে উকিল ছিলেন তিনি মনসারাম ও কালো বাউরী ছাড়া অন্যান্যদের জামিনের ব্যাপারে বিশেষ কিছু প্রতিবাদ করলেন না। ফলত ওরা জামিন পেল এবং মনসারামের সঙ্গে কালো বাউরীকে থানার লকআপ থেকে জেল হাজতে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানেই শুরু হল তার জীবনপাঠের নান্দীপাঠ।

শুরু হল বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয়।

কোর্ট-কাছারি, থানা-পুলিস, উকিল-হাকিম, জেল-হাজতের অভিজ্ঞতা হাতে কলমে না হলে কোন বিদ্রোহী সত্তা পূর্ণতা পায় না। তাই মনসারামের জীবনে কয়লাকুলির সীমাবদ্ধ গণ্ডি অতিক্রম করে যাবার একটা সুযোগ এল।

সে সময় দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল নগরে নগরে। জাগরণের বাঁশি বাজছিল। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মানুষের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল। কত মানুষ সেই অপরাধে বৃটিশের কারাগারে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। ওরা সব রাজদ্রোহী।

মনসারাম তাঁদের সংস্পর্শে এল। দেশাত্মবোধের চর্চা শুনত মন দিয়ে। মনে হত অমৃতকথা। অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকার অপর নাম যে মুক্তি এই বোধটা তার মধ্যে সতত ক্রিয়া করলেও সচেতন মনের পর্দা খুলে

তার স্বরূপটিকে চিনে নেবার মত শিক্ষা তার ছিল না। সেটাই সে বুঝল। পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মাকে যেন সে প্রত্যক্ষ করল। শুধু কয়লাকুলি নয়, সারা ভারতের শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে সর্বব্যাপী সংগ্রামের ডাক সেই ধ্বনি তার কানে বাজতে লাগল।

বেঁচে গেল ব্রজলাল।

বিবিবাথানে যে এত কাণ্ড ঘটে গেল তার ছিটে ফোঁটা গায়ে লাগল না। সম্ভবত ব্যারাকলউ সাহেব তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন বলেই।

তবু ওর মন সদাই শঙ্কিত থাকত। সর্বদা ভাবত এই বুঝি হরদেও গোমস্তার লোকজন এসে তাকে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলল। এই বুঝি বাসমতিকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলল।

কিন্তু একবারও মনে জাগল না—বাসমতিকে নয় বৈশাখীকে ছিঁড়ে খেল। তাকে নয় মনসারামকে জেল হাজতে পাঠাল। নিজের প্রাণ বেঁচে গেছে। আবার কি?

অযাচিতভাবে পেয়ে গেছে ব্যারাকলউ সাহেবের আনুকূল্য। এবার তার জীবন অন্য স্রোতে বয়ে গেলে বলবার কি আছে?

কুড়ি

দিন কয়েক পর একখানা ঘোড়ার গাড়ী তুলকি চালে যাচ্ছে নওরঙ্গীর দিকে। সদাই শঙ্কাকুল দুই আরোহী ব্রজলাল ও বাসমতি। শেরগড়ের দুঃস্বপ্ন এখনো তাদের মনে।

ব্রজলাল বিবিবাথানের জারজ সন্তান। বাসমতি সালুঙ্কীর। বাল্যকালেই বিয়ে হয়েছিল। যৌবনে পৌঁছে যখন বউকে দ্বিরাগমনে আনবার জন্য তৎপর হল তখন দেখল সুদের দায়ে বাসমতি বন্দক পড়ে আছে। ওর মা বাবার সাধ্য নেই যে মেয়ে পাঠায়। যদিও ওদের ভাব ভালবাসা হয়েছে।

কারণ হরদেও গোমস্তার নজর লেগেছে ওর ওপরে। সে একটা প্রাইভেট রাণ্ডিখানা চালু করেছে, সেখানেই ওকে তুলতে চায়। খবর শুনেই তো ব্রজর মাথায় হাত। মনসারামকে সেকথা জানাল। ও তাকে পরামর্শ দিল—কোন রকমে ওকে বিবিবাথানে এনে তোল, তারপর দেখব হরদেও কত বড় মরদ।

সদর রাস্তাতে ওকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, দিনের বেলাতে তো নয়ই। মেয়ে জামাইয়ের ঘর বাঁধার চেয়ে হরদেওয়ের হুকুমের বেশী জোর। ওর মা বাবা আসতে দেবে না। ব্রজ ওর বউয়ের জন্য মরীয়া।

ওরা খাদের পোকা। তাই খবরাখবর নিয়ে বাসমতি যখন খাদে তখন সে বন্ধ সিঁড়ি খাদের মুখ দিয়ে শৃগালের মত ঢুকল সালুঙ্কী খাদে। ওঁৎ পেতে

বসে রইল। ও যখন ঝোড়া ভর্তি কয়লা মাথায় নিয়ে টব গাড়ী ভরতে লাগল তখন ফাঁকা বুঝে ওকে ইশারা করল। সেও তার জবাব দিল। তারপর দুজনে মিলিত হল একটা বন্ধ শুড়ঙ্গে।

ব্রজ ওর হাত ধরে বলল —বউ। খাদের ভিতর দিঞেই পালাতে হবেক।

—ঈ-বাব্বাঃ। মা-বাবাকে না বলেই।

—উয়াদিকে বললে হবেক নাই। তাহলে যেতে দিবেক নাই। আমি ঈ-খাদে এসেছি এই খবর যদি হরদেও পায় তবে তোকে রাণ্ডিখানা পাঠাতে একদিনও লাগবেক নাই। যদি আমার সাথে ঘর করতে চাস তবে এখনি চল।

হরদেওকে ভয় এবং ব্রজর প্রতি অনুরাগ বাসমতিকেও মরীয়া করে তুলল। কিন্তু যাদের দশটা চোখ হরদম নিজের শিকারকে পাহারা দেয় সে কি পালাব বললেই পালাতে পারে?

ট্রামলাইনটা পার হয়ে হাওয়া রাস্তার দিকে যাওয়ার মুখেই দেখল সম্মুখে শমন। খোলা গুপ্তি হাতে দাঁড়িয়ে আছে রঘুনাথ সিং মুনশী। ভয়ে ওদের প্রাণ উড়ে গেল।

রঘুনাথ সিং বলল —কি মনে করেছিস রে শ্যালা, তোকে কেউ দেখতে পাবেক নাই। বউ ফুসলাঞে নিঞে যাবি। এত মরদ।

ব্রজ তখন ধাত ফিরে পেয়েছে। সে বিবিবাথানের ছেলে। অত সহজে দমবার নয়। শিকারী নেউলের মতই সেই বিশাল ফনার সামনে দাঁড়াল সুযোগের অপেক্ষায়। রঘুনাথের প্রয়োজন বাসমতিকে। তাই সে তাকেই ধরল এবং ঝটকা মেরে কাপড়টা খুলে দিতে চাইল যাতে উদোম হলেই পালাবার মতলব ভেস্তে যাবে। নারীর সহজাত প্রতিরোধ প্রবণতার কারণে কাপড় ধরে টানাটানি শুরু হল। পুরনো কাপড় চড় চড় শব্দে ছিঁড়ছে আর সে পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে। ব্রজলাল তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ওর গুপ্তি ধরা হাতটা ধরে মোচড় দিল। বাসমতিকে ছেড়ে ওর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। বলশালী পুরুষ। সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সেই সময়ে বাসমতি একমুঠো কয়লাগুঁড়ো নিয়ে ওর মুখে ছুঁড়ে মারল। ক্ষণকালের জন্য চোখ বন্ধ হল। ব্রজ ওর গুপ্তিটা কেড়ে নিয়েই পেটে ঢুকিয়ে দিল।

বিকট চিৎকার করে পড়ে গেল সে। ব্রজ তৎক্ষণাৎ ওর গলাটিও কেটে দিল। রক্তের বানভাসি। তবু ওদের নার্ভ ফেল হয়নি। দুজনে টেনে একটা বন্ধ সুড়ঙ্গে ফেলে দিয়েই পালাল।

আর পিছনে ফেরার কোন অবকাশ নেই। দামোদরে এসে গায়ের রক্ত ধুল। গুপ্তিটা সঙ্গে এনেছিল যদি আবার কেউ এসে পড়ে। সেটাকে সেখানে পুঁতে দিয়ে নদীর ধারে ধারে হাঁটতে লাগল।

দম নিল পানমোহরায় এসে। এখানেই আছে তার জন্মদাতা পিতা

ব্যারাকলউ সাহেব। তার তখন প্রাতঃরাশের সময়। ওরা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিবিবাথানের লোকজনের জন্য ওঁর বাংলোর গেট খোলা থাকত। সব শোনার পর তাদেরকে দিলেন নিরাপদ আশ্রয়।

এখন চালান করছেন নওরঙ্গীতে। দামোদরের উপত্যকা থেকে অজয়ের অববাহিকায়। সেখানে তাঁর নূতন কলিয়ারী হচ্ছে। নূতন বাংলো এবং সারিবদ্ধ টালির চালের কোয়ার্টার। তারই একটাতে নূতন সংসার পাতল ব্রজ ও বাসমতি।

বিরাট নওরঙ্গী বাংলো। পুবের বারান্দা প্রভাত সূর্যের আলোতে ভেসে যায়। পশ্চিমের বারান্দায় পড়ে অস্তসূর্যের লালরশ্মি। দূরে বাঘমুড়ি পাহাড়, সীতানালা জোড়, ঘনবন, শ্যামল উপবন।

বাংলোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেই সঙ্গে চলছে বাগান তৈরির কাজ। একদা গাছপালার সবুজ বন ও প্রান্তর আজ সাজানো বাগান, বড় বড় শাল, মহুয়া, পলাশ, শিশু ও শিরীষ গাছ প্ল্যান মাফিক রেখে দিয়েছেন বাদবাকী ছাঁটাই করে লাগাচ্ছেন দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, ঝাউ, সেই সঙ্গে গোলাপ, চামেলি, বেলী ও রজনীগন্ধার বাগান। নূতন চারাগাছগুলির চিকন মসৃণ পাতা রোদ লেগে ঝক্ ঝক্ করছে।

আর তার পূর্বের কলমী বহালে তৈরি হচ্ছে কলমী সায়ের। মাঝে একটি দুশো ফুট ব্যাসের বাগান রেখে চারিদিকে মাটি খনন করে তৈরি হয়েছে স্বপ্নদ্বীপ।

উনি বলেন—শীতকালের পিকনিক স্পট। সুইমিং পুল তো হবেই। পানসি ভাসিয়ে যাতায়াত। জ্যোৎস্না রাতে গার্লফ্রেণ্ড বা ট্রাইবেল উওম্যান নিয়ে এনজয় করা যাবে। নওরঙ্গীতে পাওয়ার হাউস চালু হলে এটাকে আলোকমালায় সাজিয়ে দেওয়া হবে।

সেই কলমী সায়ের ও স্বপ্নদ্বীপ দেখাশোনার কাজ পেল ব্রজ। কোথায় খাদে গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটত, গ্যালন গ্যালন ঘাম ঝরাতো, সুদের দায়ে ঘরগুষ্টি বন্ধক থাকত সে হল সুপারভাইজার, জন্মদাতা পিতা ছাড়া এত সুখের ঘরকন্না কে দেবে?

ওদিকে পানমোহরা কোলফিল্ডে তখন বাম্পার প্রোডাকসন। তিনটি কলিয়ারী গম গম শব্দে চলছে। ঠন্ ঠন্ শব্দে টাকা বাজছে। দেউলটির কয়লাটি আবার মেটালার্জিক্যাল কোল। প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ ফিকস্‌ড কার্বন। ষ্টীল ইনডাসট্রীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

চটকল, বস্ত্রকল, ফাউনড্রী ওয়ার্কস, গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিকস্, ইট কারখানা

জাহাজ ও রেলওয়ে বড় খরিদ্দার। এসব কলকারখানা যত বাড়ছে কয়লার চাহিদাও তত বাড়ছে।

ফলত মাইনিং মুন্সী থেকে ম্যানেজার তক সবারই মুখে রেজিংয়ের গল্প। এত এত লোকের কি যে আশ্চর্য কৌশলে মগজ ধোলাই হয়েছে এবং তা প্রবহমান ধারার মত বয়ে চলেছে তা ভাবতেও বিস্ময়।

দেউলটির খাদে উনি লংওয়াল সিস্টেমে মাইনিং করছেন। প্রক্রিয়াটি জটিল। সেজন্য সব চেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ম্যানেজার সেখানেই।

খাদের মধ্যে একটা অফিস। তার লাগোয়া বেডরুম। উনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে সেখানে বিশ্রাম নিতে পারেন। তাঁর জন্য টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার উপর থেকে পাঠানো হতে পারে। এমন কি সম্ভোগের জন্য নারীও। কোন বাধা নেই, বরং ব্যারাকলউ সাহেব খুশী হন। তিনি মনে করেন এত বিপজ্জনক কাজে এত দায়িত্ব নিয়ে যিনি থাকবেন তাঁর জীবনে যদি চার্ম না থাকে তাহলে কাজটা করবেন কি করে?

ওহো! কি উদার দৃষ্টিভঙ্গি। আদমীকে জাহান্নামের মুশাফির বানাবার কি আদিম কৌশল!

এই খাদে, রাসমণি-বুধনা, মুগী-লক্ষা, চিলি-নানকু, কালো কোঁড়া, ন্যাবা বাউরী, বুটা মুণ্ডার কোন স্থান নেই। তারা সব পানমোহরা আলো করে থাক।

সাতঘরিয়ায় এসেছিল চমনলাল সাহু ও বানারসী সাহু। দু'ভাই। বেনারসে বাড়ি। দেশগাঁয়ে জমি-জিরেত, গেঁহু মকাই আছে। গাই ভঁয়িষ, সুদ ও দুধের কারবার আছে।

তারপর এল হারকু সিং, বাগে সিং, লটুরাম, রামখেলাওন।

তাদের শ্রমিক হল রাম, সৎনামী, সুরযবংশী, চামার, হরিজন, মুচি চণ্ডাল, যাদব, বিদ, বিন, ধোবী, ক্যাওট, মশহর, পাশী, সাহু প্রভৃতি।

তারা সব লম্বা লম্বা ব্যারাকের মত ঘরে সারি সারি খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে কাঁসি, বাঁশি, দো-তারা একতারার মিউজিক হয়। কখনো কখনো বা নাকের ডাকে ঢোলও বাজে। চিৎপাত দিয়ে পড়ে থাকে। কোমরের লুঙ্গি বুকে উঠে। অনাবৃত পুরুষাঙ্গ ভার্টিক্যাল চিমনীর মত ভূমির সঙ্গে লম্ব রচনা করে। এইসব আখাম্বা পুরুষদের পাশে মুগী লক্ষা, চিলি-নানকুর ধাওড়ায় ধাওড়ায় যেসব কামিনরা থাকে তাদের দশা প্রাকৃতিক কারণেই ছলচাতুরী ও ছিনালীর সুরে বাঁধা।

এরই মধ্যে নানকু দুশাদের নয়া আমদানি সতী মণ্ডলের নতুন বৌ যমুনা দাসী। চিলিকে বে-দখল করে নানকুর উপর দখল কায়েম করে বসেছে। যদিও সে চিলির ভয়ে থরহরি কম্পমান। তবু সোয়ামীর মন তার আঁচলেই বাঁধা। কারণ এইসব পীরিতের ঢোলে আলাদা বোল।

কাজেই চিলির মনে সুখ ছিল না। কিন্তু সে সর্দারনি। সেখানে তার অখণ্ড প্রতাপ। সাহেবের ভয়ে কুলি-কামিনরা নানকুর চেয়ে চিলিকেই বেশি রেয়াৎ করে। চিলিও যমুনা দাসীর মাথায় ঝোড়া চাপিয়ে দিয়ে বলে — বসে খাবার জো নাই লো ছুঁড়ি। খেটে খা।

তাতেই বা আপত্তি কি? মেহনতী চাষীর ঘরেরই তো মেয়ে। কয়লা-কুঠির ওয়াগন বোঝাই করতে তার কষ্ট হয় না।

তবু চিলির মনে সুখ এলো না। কারণ সাহেব ওকে পোঁছেন না। একদিন খলবলে যৌবনের পসরা নিয়ে যখন এসেছিল তখন সাহেবের নজরে পড়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। আজ সেই কলাগাছের অনেক বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে। কিন্তু সে হয়েছে এঁটো পাতার মতই নোংরা আবর্জনা।

সাহেব-বাংলোতে থাকে। আয়ার কাজ করে। মন-গুমানে থাকতে থাকতে একদিন পেয়ে গেল মনের মানুষ। তার নাম লক্ষা ধোবী। বর্ষীয়সী মহিলার প্রতি যার আকর্ষণ যৌবনের শুরু থেকেই।

তাই তার জন্মদাতা পিতার রক্ষিতাকেই নিজের বুকে চেপে ধরল। পাপ অনায়াসে প্রবেশ করল মেহনতী মজুরের সংসারে।

এলো দুবে, চৌবে, পাণ্ডে, সিং, লালা।

কয়লাকুঠিতে নাকি বাতাসে ভর করে পয়সা উড়ে বেড়ায়। সেই রব শুনে তারা সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মুনাফা লুটবার জন্যে। আপন আপন দেশগাঁয়ের জোতদার, ব্যবসাদার-কুসীদজীবীগণ কয়লাকুঠির দেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তারের কাজে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠল। ব্যারাকলউ সাহেবরা তাদের জন্য নতুন ভূখণ্ড রচনা করে চলেছেন। মিছিরবাবুরা তাদের জন্য পথের নিশানা রেখে গেছেন। আর কি বসে থাকা যায়?

কয়লাকুঠিতে এসে কোনরকমে একটা ডেরা-ডাণ্ডা পেতে বসতে পারলেই হল। বিশ পঁচিশ জন কুলি-কামিন যোগাড় করতে পারলেই হল। সাহেবদের কাছ পর্যন্তও যেতে হবে না। জয়গোপালদের কাছে গেলেই হবে। তারাই সর্দারি দেবে। পেটি ঠিকাদারীও তাদের হাতে।

তাছাড়া সুদ, দুধ, গাই, ভঁয়িষ, বখরী, ছাগল, গাঁজা, সিদ্ধি আফিম, দোকানদারি, ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তা তো খোলা।

মদ দোকান প্রত্যেক কলিয়ারীতে। লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদারের মাটির দেওয়াল খড়ের ছাউনি লম্বা ঘরের চৌকাঠে সাইন-বোর্ড ঝোলে— দেশী মদের দোকান। বিকেল বেলায় মাতালে ঠাস লেগে যায়।

রাসমণিরা নিজেই মদ তৈরি করে। ভাত পচিয়ে ধেনো মদ অথবা মহুয়ার রসে ফটকা মদ। আগে তা নিজেদেরই ভোগ্যপণ্য ছিল। এখন তা ব্যবসায়ে পরিণত। এমনি কত ফন্দি-ফিকির।

সেইসব নিয়েই গড়ে ওঠে কয়লাকুঠির সমাজ। শোষণ, শাসন, বঞ্চনা, লোভ, পাপ, হিংসা ও রিরংসার পাদপীঠে কুলি-কামিন, সর্দার, মহাজন, ঠিকাদার, চাপরাসী, বাবুসাহেব সব কলিয়ারীর চানকটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তার পরিধি কখনো ছোট, কখনো বড়। কিন্তু ঘোরার বিরাম নেই।

তেমনি ঘুরছে হেডগীয়ারের মাথায় পুলি-চাকা। অনবরত ডুলি চলছে। খালি লোল —বোঝাই হাবিস। ঘণ্টাওলা ঘণ্টা মারে —ঘটাং ঘট। ইঞ্জিন খালাসী ষ্টিম লিভার খুলে ব্রেকে পা দেয়। বয়লার খালাসী ঠেসে কয়লা জ্বাল দেয় ফার্ণেসে। চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। শিল্প বিপ্লবের রথ চলে। টগ বগ করে ছুটে যায় মহাকালের ঘোড়া।

একুশ

এক বছর এক মাস বারোদিন পর মনসারাম জামিনে ছাড়া পেল। চৈত্রের অপরাহ্নে আদালতের ছায়াটা দীর্ঘতর হয়ে পথের উপর পড়েছিল। সেখানেই সে একগুচ্ছ আসামীর সঙ্গে বসেছিল। সেই উকিল ভদ্রলোক ওর দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত থাকতে বললেন। দোকানের একটা ছেলে মাটির ভাঁড়ে করে চা দিয়ে গেল। এই ছেলেটিই দুপুরে একসের মুড়ি ও ছোলা ভাজা দিয়েছিল।

মনসারামকে যতবার কোর্টে হাজিরা দেবার জন্য নিয়ে আসা হয় ততবার এই ছেলেটিই ওকে কিছু না কিছু খাবার দেয়। মনসা ভাবে ওর কাছে ঋণ জমছে। যদি কোনদিন ছাড়া পায় তবে সুদে-মূলে উশুল করে দেব।

কিছুক্ষণ পরই ওর ডাক পড়ল এবং মিনিট দশ পনেরো উকিলের সঙ্গে হাকিমের সওয়াল জবাবের পরই জামিন মঞ্জুর হয়ে গেল। কালো বাউরী অনেক আগেই ছাড়া পেয়েছে। কাজেই ও একা।

আদালতের বাইরে বেরিয়ে উকিলবাবুকে প্রণাম করে বলল—হুজুর! আপনার দয়া কোনদিন ভুলব না।'

উনি ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—দয়া আমার নয় রে। পাঁচু মাস্টারের।

এঁ্যা! মনসারাম আকাশ থেকে পড়ল।

—হ্যাঁ। উনিই আমাকে তোদের মামলা চালাতে দিয়েছিলেন। টাকা-কড়িও উনি দিতেন। আজও দিয়েছেন।

এই বিশাল পৃথিবীতে কে যে কার জন্য স্নেহের আসন পেতে রাখে তা কে বলতে পারে? মনসারাম কি স্বপ্নেও কোনদিন ভেবেছে সামান্য একটা পাঠশালার মাস্টার তাদের জন্য এত করছেন? অলস ও অবসন্ন শরীরটা কেমন চনমন করে উঠল। হতাশ ভাবটা গেল। উকিলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হন হন করে চলতে লাগল সালুঙ্কীর দিকে।

পথ অনেকটা। প্রায় আট ক্রোশ। এক নাগাড়ে হাঁটতে হাঁটতে এক প্রহর রাত অতিক্রম করে পাঁচু মাস্টারের আটচালাতে পৌঁছাল। উনি দাওয়ায় বসেছিলেন খুঁটি ঠেস দিয়ে। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না পড়েছিল ওঁর মুখে। ছোটখাট মানুষটির কেশ বিরল মাথা দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল।

মনসা ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই ওর মাথায় সস্নেহে হাত দিয়ে বললেন —মনসা! এলি! তোর জন্যই বসেছিলাম রে। জানতাম আজ তুই আসবি।

মনসার চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছিল। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—স্যার! আপনি যে ভিতরে ভিতরে আমার মামলার তদ্‌বির করছেন তা বুঝতে পারিনি।

—জানতে দিই নে রে। ব্যাপারটা গোপন রেখেছি। তুইও কাউকে বলিস না। যা পুকুর ঘাটে গা ধুয়ে আয়। তোর জন্য ভাত রেঁধে রেখেছি।

—স্যার!

—এত অবাক হচ্ছিস কেন? উকিলবাবু আমার বন্ধু। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন উনি বললেন—হাকিম সাহেবকে অনেক করে বোঝানো হয়েছে। উনি জামিন মঞ্জুর করার আশ্বাস দিয়েছেন, তোদের মামলাও ডিস্‌মিস্‌ হয়ে যাবে। মিথ্যার আয়ু চিরকাল নয়। সত্যটাই চিরন্তন।

মনসারাম সেই রাত্রে পুকুরে স্নান করে মনে করল তার শরীর থেকে পাপের ময়লা ধুয়ে গেছে। মাস্টার মশাই রেঁধে রেখেছিলেন ভাত, ডাল, কলাই বাটা। তারই অমৃতসম আস্বাদন।

মাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—জেলে কিছু শিখলি?

—হ্যাঁ স্যার। জীবন সত্যকে উপলব্ধি করার এমন পাঠশালা বুঝি আর দুটি নেই। জেল খাটার জন্য দুঃখ করছি না স্যার।

—ভাল। এইভাবেই পোড় খেতে খেতে একদিন তোর পথ খুঁজে পাবি।

কথায় কথায় রাত বাড়ল। এঁটো বাসন কোসন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখল ও। তারপর আটচালাতে শুয়ে পড়ল।

মাস্টার মশাই বললেন—তোদের ধাওড়াতে যাসনি?

—না স্যার। সোজা এখানে এসেছি।

—এখানে শুয়ে পড়লি যে। যাবি না?

—আর পারছি না স্যার। পা-দুটো অসাড় হয়ে গেছে।

—বেশ। ঘুমো তাহলে।

—বিবিবাথানের খবর কি স্যার?

—নতুন আর কি? যেমন ছিল তেমনি আছে। সেই একই রকম শাসন শোষণ নির্যাতন।

—এর কি বদল হবে না স্যার?

—হবে। না হলে কি আশা নিয়ে বেঁচে থাকব ? আমি যে সর্বস্ব হারিয়ে নতুন দিনের প্রতীক্ষায় বসে আছি রে। তোরাই তো এনে দিবি সেই নতুন প্রভাত।

কথা প্রসঙ্গে মাস্টার মশাই জানালেন আরো একটি নেপথ্যচারিণীর কথা যিনি তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তার নাম কাবেরী।

—মা!

তখনো ভাল করে সকাল হয়নি। সূর্য ওঠেনি। পূব আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে মাত্র। পাখপাখালি ডাকছে এবং দুটি একটি লোকজন প্রাকৃতিক কারণে বিবিবাঁধের দিকে যাচ্ছে।

তখন মনসারাম উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক দিল—মা!

ছলনাদাসীর বুকটা উছলে উঠল। কেমন এক বিকৃত কণ্ঠস্বর ডাকল—মনসা!

এই একটি ডাক গোটা বিবিবাথানকে জাগিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। ঘরে ঘরে ফিস্ ফাস্ আলোচনা শুরু হয়ে গেল—মনসা এসেছে।

—জেল থেকে ছাড়া পেঞেছে।

—না-না। মামলা চলছে।

—বে-কসুর খালাস হঞে যাবেক।

—নাও তো হতে পারে ? যদি জেহেল হঞে যায়।

—তবে ত জানব দুনিয়ার বেবাক ঝুটা।

—লেকিন হিম্মৎ আছে বলতে হবেক।

—কিন্তুক আবার না গণ্ডগোল হয়। মনসার নাম শুনলেই সাহেব গোমস্তা বেবাক খাপ্পা হঞে যায়।

—আরে লড়নে অলা আদমীর জিন্দেগী হামেশা খতরাতে থাকে।

এমন ধারা কত রকমের কথাবার্তায় সারা বিবিবাথান তোলপাড় হয়ে গেল। কেমন ঝিমিয়ে পড়া, ম্যাদা মারা, ড্যাম্প লাগা মানুষগুলো নাড়া খেয়ে গেল। আর ঢালু দাসের ঘরে কান্নাহাসির হাট বসে গেল। ছলনাদাসী একাই হেসে কেঁদে মাৎ করে দিল।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ ?

কলিয়ারীর বয়লার হাউস থেকে বেজে উঠল বাঁশি-ভো-ও-ও—

কুলি-কামিনদের কাজে যাবার ডাক। আর কারু ঘরে থাকবার জো নেই। সবাইকে যেতে হবে। বিবিবাথানের কুলি-কামিনরা গাঁইতি কাঁধে ঝোড়া মাথায় চলল পাতালপুরীতে কয়লা কাটতে।

উনুনে ভাত ফুটছিল। শান্তি তা নামিয়ে থালায় ঢেলে দিল!

সবাই খাওয়া দাওয়া করে চলে গেল। ওর জন্য খাবার রেখে দিয়ে গেল।

টালুদাস তখনো আসেনি। সাহেবদের ব্রেকফাস্টের জন্ত ব্যস্ত। মনসারাম একা। তার মুখটা আপাত গম্ভীর। ভিতরটা কুল কুল করছে বউকে দেখার জন্ত। সে তো এঘরে নেই। পাশের ঘরে আছে। এখন সে বড় হয়েছে। জীবনে এক চরম দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আর ত না ডাকতেই হুট হাট আসতে পারবে না। অথচ এলে কত ভাল হত।

খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে সেই কথা ভাবছিল। ওর বন্ধু বান্ধবরাও একটি ছুটি করে দেখা সাক্ষাৎ করে চলে যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় কিছুক্ষণ চলার পর বেলা দশটা এগারোটার সময় একা হয়ে পড়ল।

তখন সে গায়ে পিরানটি চড়িয়ে শ্বশুর ঘরের দিকেই পা বাড়াল। মাত্র কয়েকটি ঘর পরেই তো ওদের বাসা। সেখানে পা দিতেই গা-টা কেঁপে উঠল। একজন বুড়ী বলল—ও মা? জামাই এসেছে যে গো! মনসা আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখল দুয়ার হাট করে খোলা। কেউ কোথাও নেই। বৈশাখীর বাবা মা হয়তো কাজে গেছে কিন্তু ছেলে পুলেরা কোথায়?

বেশ ধাঁধা লেগে গেল। ছোট শালার নাম ধরে ডাকল। তখন ঘর থেকে জবাব এল—উয়ারা খেলতে গেইছে। এ কণ্ঠস্বর বৈশাখীর। মনসা বলল—তবে তুঁই আয় ক্যেনে?

—আমি এখন যেতে লারব।

—ক্যেনেরে?

—আছে। কারণ আছে।

—কি কাবণে রে?

—অত কি বিচারে বলতে পারি?

তুঁই ত আচ্ছা ম্যেয়া। এতদিন পরে এলম ত দেখাও করবি নাই?

—তবে তুমিই এসো—নিজের চখেই দেখে যাও।

মনসা ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না। একটু পরে চোখ যখন সয়ে গেল তখন দেখল বৈশাখী খালি গায়ে ফ্যানাড়ি পরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। দুই হাঁটুর মধ্যে বুক চেপে লজ্জা নিবারণ করছে। মনসার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল।

বৈশাখী বলল—কি করে ঘর থেকে বাইরে বিড়াব? উকলি ঝুকলি ছেঁড়া একটি শাড়ি আছে। সেইটি পরে মা খাদে গেইছে। আমি অন্ধকারে বসে আছি। না হলে তুমি এসেছ শুনেও কি আমি ঘরে বসে থাকতে পারি?

ওঃ। কি বেদনা!

নারীত্ব, সতীত্ব, লজ্জা, অপমান সব একসঙ্গে হাতুড়ি পিটতে লাগল ওর মাথায়। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত দিয়ে বলল—আমি এক অক্ষম স্বামী। আমাকে বিয়া করে তুর আজ এই দুর্গতি।

—অমন করে বলো না ত।

—জেলে থেকেই আমি তুর খবর পেঞেছি। কি যে কষ্ট হঞেছে সে তুকে কি বলব? বুক আমার ফেটে গেইছিল।

বৈশাখী মুগ্ধ দৃষ্টিতে মনসার দিকে তাকাল। ঘুপচি অন্ধকারে খোলার চালের ফুটো দিয়ে যে এক-দু ঝলকি আলো এসে পড়ছিল তাতেই ওকে দেবপুরুষের মত দেখাচ্ছিল। নিজেই নিজের মনকে বারবার বলতে লাগল—এই আমার স্বামী। আমার দেবতা। আমার উপরে কত ভালবাসা! আমার যে মান ইজ্জত লুটে লিলেক—এঁটো করে দিলেক কই তার জন্যে ত ঘৃণা করে নাই। রাগ করে নাই। কত ভাল মানুষ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সারা গা থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাস ফাস করা একরকমের শ্বাস বইতে লাগল।

মনসারাম বলল—তুই কাঁদছিস ক্যোনে?

—কাঁদব ক্যোনে? তুমি এসেছো আর ক্যোনে কাঁদব?

—তুর যে একটি পরবার কাপড় নাই ত মাকে বলিস নাই ক্যোনে?

—মাকে বলে কি করব? উয়াদেরও ত সেই একই দশা।

—তা ক্যোনে হবেক? ধার দেনা শোধ হঞে গেইছে। পাঁচজনে কাজ করছে। পুরা হাজরি পেছে।

তুমি জেলে যাবার পর আবার সব লুটপাট হঞে গেইছে।

—তবে আব কি করে বাঁচব?

—ঈখেনে থাকলে বাঁচব নাই গো। চল কুথাওকে পালাই।

—না পালাব ক্যোনে? পালালে আমরা দুজন বাঁচব। কিন্তুক বাকী সব? যেতে হলে সবাইকে নিঞেই যাব। তুই ঈসব ভাবিস না। আমি যাই। তুর জন্যে কাপড় চুপড় নিঞে আসি।

বৈশাখীর আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল। লজ্জা, ভয় ও সঙ্কোচের বেড়া টপকে স্বাভাবিক ভাবে মনসারামের দিকে মুখ করে বসেছিল। মনসা উঠে দাঁড়াতে সেও দাঁড়াল। নগ্নিকা কিশোরীর ত্বক, মাংস, পেশী এবং কোমল স্তনের দ্যুতিতে মনসার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে বেড়িয়ে পড়ল।

বাইশ

মাথার উপরে চৈত্র মাসের চড়া রোদ। পায়ের নীচে মাটি গরম। তাতেই মনসারাম হেঁটে যাচ্ছে খালি পায়ে, রুখু মাথায়। বিকেল নাগাদ সে গিয়ে পৌছাল জয়বাবুর বাংলোতে।

ও তখন বাড়িতেই ছিল। কলিয়ারী যাবার জন্য তৈরি ছিল। ওকে বলল—মনসারাম! কবে ছাড়া পেলে?

—কাল।

—কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ বুঝি?

—হঁ। কাকা।

—আচ্ছা! তুমি বোস। আমাকে বেরুতে হবে। বারকুলি সাহেব নওরঙ্গী যেতে বলছে।

বলতে বলতেই বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়া তৈরিই ছিল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। কাবেবী বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল। মনসারামকে বলল—খুব কষ্ট পেলি মনসা?

তা প্রথম প্রথম কষ্ট লাগতো বৈকী! পরে সঞে গেল। জনাকয়েক তাজা বন্দী ছিলেন। খুব বিদ্যান লোক। দেশ প্রেমিক। জীবন তাঁদের কাছে তুচ্ছ। কি বলব কাকিমা ঐসব মানুষদের পায়ের তলায় বসে কথা শুনতে শুনতে রাত যে কখন ভোর হয়ে যেত বুঝতে পারতাম না।

কাবেরী একটু হেসে বলল—তাহলে জেলে ভালই ছিলি?

—হঁ কাকিমা। জেলটা বিবিবাথানের চেঞে ভাল জায়গা।

—তোর বৌ কেমন আছে?

—অন্ধকার ঘরে উদাম হঞে বসে আছে।

সে কি রে?

—কি বলব কাকিমা ইসব দেখে আমার ভিতরটা জলে যেছে। বেচারীর একটি পরবার কাপড় নাই। একটি ছেঁড়া শাড়ির অর্ধেকটা ফ্যানাডীর মতন করে পরে ঘর ভিতরে বসে আছে। বাইরে বিরাবার জ্যো নাই। জুয়ান বিটিছিলেব কি দুগ্‌গতি।

—বিবিবাথান তুরা ছেড়ে দেগা মনসা।

—ছেড়ে দিব বললেই ত হয় না।

—ক্যোনে হয় না? তোরা দুজনে চলে আয়। বাবুকে বলে তোর একটা কিছু কাজ করে দিব। তোর বৌ আমার কাছে থাকবেক। ফাই ফরমাস খাটবেক।

—আমি নিজের কথা ভাবি না কাকিমা। পুরো বিবিবাথান যদি তুলে নিঞে যেতে পারি তবে যাব। না হলে একার দুখের জন্যে কুথাও যাব নাই।

ধন্য রে মনসা। তোর এই জিদ যেন চিরকাল বজায় থাকে।

তারপর ওকে খাইয়ে-দাইয়ে একটা মোটে চাল, ডাল, চিঁড়ে, তেল, মশলা ইত্যাদি বেঁধে দিল। গোটা কয়েক নতুন, পুরনো শাড়ি, ব্লাউজ, শায়া এবং দশটি টাকা দিয়ে বলল—দরকার হলেই আসবি, মনসা। কোন সঙ্কোচ

করিস না।

মনসা বলল—বৌয়ের লজ্জা ঢাকতে ছুটো ছেঁড়া কাপড় মাগতে এলেছিলাম কাকিমা তার বদলে তুমি এতসব দিয়া-থুয়া করলে। আমাকে জেল থেকে ছাড়ালে। এত ঋণ কি করে শোধ করব ?

—আমাকে একটি প্রণাম কর তবেই শোধ হয়ে যাবে।

মনসা ঝুপ করে প্রণাম করল। কাবেরী ওর মাথায় হাত দিয়ে ভারী গলায় বলল—হেরে যাস না মনসা। জীবনের কোন দুঃখেই ভেঙে পড়িস না। সময় আসবেই। এমন দুঃখ চিরকাল থাকবে না।

—আচ্ছা কাকিমা। আসি তাহলে।

মোটটি ঘাড়ে নিয়ে মনসারাম চলল বিবিবাথানের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যাকালে যখন পৌঁছাল তখন অনেকেই ওর খোঁজ নিয়ে ফিরে গেছে। আবার একটি দুটি করে লোক জমতে শুরু করল।

মোটটি শান্তির জিম্মায় দিয়ে বলল—ভোজী! বউকে ডেকে আন। ইয়াতে কাপড়-চুপড় আছে। তুরা তিনজনে ভাগ করে লে। মায়ের লেগে একটি শাড়ি রেখে দৈ। রাঁধা-বাড়া কর।

বিবিবাথানের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পীঠস্থান সেই তেঁতুল গাছটির নীচে জনা-বিশেক ছোকরা বসল যারা একসঙ্গে দাঙ্গা লড়ে, পুলিশের লাঠি খায়, জেল খাটে, বিবিবাথানকে বারুদখানা বানিয়ে রাখে তারাই।

সেই সভায় মনসারাম বলল—আমাদের পেটে ভাত, পরনে কাপড় নাই, বৌবিটিদের মানসম্মান নাই। বারো বছরের বিটিছ্যিলা বেইজ্জত হয়। সতীত্ব একবার হারাঞে গেলে মেয়্যা লোকের আর কি বা হারাবার ভয় থাকে ? আমাদের নতুন করে হারাবার কিছু নাই। বরং লড়াই করে পেতে হবেক মানসম্মান, পেটের ভাত, পরনের কাপড়। নিজের ঘর। ছোলাপিলার লেখাপড়া। আমরা মরে যাই ত যাব। ছোলাপিলারা ত বাঁচবেক।

জন্ম জন্ম ধরে মার খেতে খেতে ওদের মন প্রাণ এমন তিক্ত, বিষাক্ত ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে মনসার কথায় ওরা নতুন করে প্রাণের স্পন্দন ফিরে পেল।

গভীর রাত্রে যখন ঘরে ফিরল তখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে। একা শান্তি ভাতের থালা নিয়ে ওর জন্য বসে আছে। গর্ভস্রাবের অতবড় ধকল কাটিয়ে সে যে এখনো সোজা হয়ে আছে এটা কম কথা নয়। মনসা বলল—ভোজী! হাজত ঘরে বসে তুদের দুঃখের কথা শুনে আমার বুক ফেটে গেইছিল।

—সে জানি। কিন্তুক মনসা, ছুটু বৌয়ের ইজ্জত যে লুটে লিলেক তার বদলা তুই লে।

—লোকগুলিকে চিনিস ?

—হঁ। একজনকে চিনি। হরদেও গোমস্তার আপনা আদমী হারকু পাশী। সঙ্গে আরো দু'জন ছিল। তবে উয়েই বেশি অত্যাচার করেছে।

—হঁ। মনসা অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে পাতের ভাতগুলো শেষ করে উঠল।

ভিতরটা ওর জ্বলছে। এই অপমানের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত এ জ্বালা মিটবে না।

তালপাতার তালাইয়ের উপর কাঁথাকানি বিছিয়ে একটি বিছানা। চটের থলির ভিতর খড়কাটা ঢুকিয়ে তৈরি বালিশ। একঘটি জল ও একটি লম্ফবাতি। এই মাত্র তার শয়নকক্ষের উপকরণ।

মনসা বলল—এত গরমে ঘরে কি করে শুব ভোজী? উঠানে কিছু পেতে দে।

—ঘরেই শু। উঠানে যেতে হবেক নাই।

মনসার শরীর ক্লান্ত ছিল। বেশি কথা না বলে শুয়ে পড়ল। একটি বিড়ি ধরিয়ে আয়েস করে টানল। উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী একটু একটু করে শিথিল হয়ে এল এবং দু'চোখ জুড়ে তন্দ্রা নেমে এল।

কার যেন পায়ের শব্দ। তারপর চুড়ির ঠিন্ ঠিন্ শব্দ। তালযন্ত্রের লঘু লহরার মত কান থেকে মগজ পর্যন্ত স্পন্দন তুলে দিল। পায়ের উপর কোমল স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়ে রইল। এই তার বৌ। বৈশাখী। নিরাবরণা কিশোরীর অন্ধকারে ঢাকা মূর্তিটিই বস্ত্র আবরণে সুসজ্জিতা।

বড ভাল লাগল ওকে দেখে। বলল—বৌ! তুঁই এসেছিস?

সে মুচকি হেসে বলল—হঁ ত।

—আয়। কাছে আয়।

ওকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বলল—তুই আমার ভালবাসা।

সেই তাদের জীবনের প্রথম সোহাগ বাসর। আবেগ, অনুরাগ ভালবাসার পুঞ্জীভূত সমুদ্র অবলীলায় মন্থিত হয়ে উঠল। হাসি, অশ্রু, বেদনার টইটম্বুর হৃদয় উদ্বেলিত স্রোত মন্দাকিনীর মত প্রবাহিত হল। কথায় কথায় ফুরিয়ে গেল রাত।

এত সুখের রাত ওরা জীবনে কখনো পায়নি। আবার এত দুঃখেরও নয়। বউয়ের সতীত্ব হারানোর ক্ষোভ ও বেদনার মর্মদাহী হাহাকারে মনসার ভিতরে এক অপরিসীম জ্বালা ঝন্ ঝন্ করে বাজল। সে মনে মনে একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসল।

বিবিবাথানের নূতন প্রজন্ম স্বভাবে উগ্র এবং হিংস্র। মার খেতে এবং মার দিতে তারো পিছপা নয়। তবু তারা দমে থাকে তাদের আত্মীয় পরিজনের জন্য। কেউ কিছু করলেই তার প্রতিক্রিয়া হয় মা-বাবা-ভাই বোন-

স্ত্রী-কন্যার উপর। বাল্য বিবাহের কারণে সবাই বিবাহিত। সবারই দুর্বলতার মূল কেন্দ্র ঐখানে। তাই তাদের হাতে পায়ে বেড়ী।

একথা মনসারাম খুব ভালো জানে। তাকে ত চরম মূল্য দিতে হয়েছে। তারপর সে জেলে যাবার পর নেতৃত্বহীন বিবিবাথানের মানুষজনক ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে। ফিরে এসে থেকে সে শুধু ভঙনেরই ইতিহাস শুনছে।

যেমনভাবে লক্কা-মুগী, ব্রজলাল-বাসমতি পালিয়েছে তেমনিভাবে আরো অনেকেই পালিয়ে গেছে। মনসারাম তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দু'চারটি করে আরো ছেলেমেয়েকে স্থানান্তরে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছে। ওর ধারণা ওরা যখন কাজের লায়েক হবে তখন বিবিবাথানের জড় নিয়ে অন্যত্র একটি গাছ তৈরি হবে।

তারই সঙ্গে সে ভাবছে বিবিবাথানের ষাট-সত্তরটি পরিবারকে জড় শিকড় সমেত তুলে নিয়ে গিয়ে যদি অন্যত্র বাসা বাঁধা যায়। কিন্তু তেমন জায়গা কোথায় পাবে?

এই নিয়ে সে একদিন কাবেরীর সঙ্গে আলোচনা করছিল। ওকে সে স্বর্গের দেবী মনে করে। সে ওকে একটা পুরনো কথা বলল।

ব্যারাকলউ সাহেব যখন শেরগড় কোল কোম্পানী ছেড়ে চলে আসেন তখন বিবিবাথানের কুলি-কামিনদের নামে কিছু জমিজমার বন্দোবস্ত দিয়েছেন। সে নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখল—কথা সত্যি। কিন্তু জমি জমা হরদেও বরমদেও ও জারকু পাশীদের দখলভুক্ত হয়ে আছে। এমন কি ওর মা রাগিনী দাসীর নামে যে জমি তাও জাবুক পাশী ভোগ করছে। কি করে দখল নেবে? ভেবে কূল কিনারা পায় না।

শ্রাবণ মাসে বিবিবাঁধ জলে টই-টম্বুর। পাড়ের উপর ছলকে পড়ছে। উকান দিয়ে বইছে। চালুনী বহালে মাছ খলবল করেছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে মরদরা জাল, খালুই, ঘুগি নিয়ে ধরছে। চাপরাসীরা তাদের ভাগ আদায় করছে।

মনসারাম মাছ ধরে না কিন্তু ওর বৌ মাছ ধরে ফিরছে। ভিজে গায়ে একছিটে কাপড়ে তার যৌবন ঝলক দিচ্ছে। মনসারাম গর্জন করে উঠল—মাড় ভাত মুখে রুচছে নাই। চাপরাসীদিকে ভিজাগায়ের চেক্‌নাই দেখাতে গেইছিলি।

ভয়ে পালিয়ে গেল। এখন সে ভরাট যুবতী। গত মাসে মাসিক বন্ধ হয়েছে। ছেলের মা হল বলে।

কিছুটা ক্রোধ, অনেকখানি অভিমান এবং বিপুল পরিমাণ হতাশা নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে বিধিবাঁধের পাড়ে। বাতাসে ঢেউ দিচ্ছে জলে। সন্ধ্যাবেলার

লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে তার উপর। ঢেউ নাচছে আপন খেয়ালে। প্রকৃতি সেখানে রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ সেই রূপ লাবণ্যময় জলরাশির মধ্যখানটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। পরক্ষণেই চারিদিক থেকে ঢেউ আছড়ে পড়ল সেখানে। পায়ের তলে মাটিও কেঁপে উঠল এবং গোটা পুকুর উদ্দাম নাচে মেতে উঠল।

ঘটনাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটতে সময় নিল পাঁচ থেকে সাত মিনিট। কিন্তু তার তাৎপর্য বিরাট। দৃশ্যটি অলৌকিক। যারা আশেপাশে ছিল সবাই অবাক এবং ভীতও।

মনসারাম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলল—বাবারে! মাহাদানা!

সেই কথাটিই চালু হয়ে গেল। বিবিবাঁধে মহাদানা এসেছে। সে যখন নড়াচড়া করে তখন বিবিবাঁধ তোলপাড় হয়ে যায়। বেবাক জল ফেটে যায়।

সাংঘাতিক ব্যাপারে।

এরপর আরো দু-চারবার এমন ঘটনা ঘটল। সবাই বলল—মাহাদানা ক্ষেপে গেইছে।

কিন্তু মনসারাম এসব দত্যি-দানব ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না। বেবাক বিবিবাথান মায় শেরগড় কলিয়ারীর কুলি-কামিন বাবু ভেইয়ারা যখন মহাদানা সংক্রান্ত দৃশ্যাবলীর ভয়ংকর বর্ণনা ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনায় সরগরম হয়ে আছে তখন মনসারাম ভাবছে—ব্যাপারটির সঙ্গে খাদের কোন যোগসূত্র নেই তো? এখন যেখানে চাওনী চলছে সে স্থান নাকি বিবিবাথানের নিচেই। তবে কি তারই কোন প্রতিক্রিয়া?

খনি বিজ্ঞানের বিবিধ কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সে যা ভাবতে পারছিল মিঃ কুটস্ দু'চার রিম কাগজের কেতাব পড়েও তার গুরুত্ব দিলেন না।

বরং মনসারামের এবম্বিধ সন্দেহের কথা শোনামাত্র তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। ওকে বললেন—ফাকিন্ বাস্টার্ড। আলতু ফালতু বাৎ করে তুমি আমার লেবারদিকে ভড়কি দিচ্ছো? ফের যদি ঈ-বাৎ শুনি—তাহলে আই শ্যল পুস্ দিস স্টিক ষ্ট্রেইট টু ইয়োর রেক্টাম।

তারপর সেই কথাটার হিন্দী খিস্তি দিয়ে অনুবাদ করে দিলেন। যা শুনে মনসারামের মুখটা জন্তুর মত হয়ে গেল। তাহলে ব্যাপারটি এই দাঁড়াল যে বিবিবাঁধে মহাদানা বিরাজ করুক। তার যে বিজ্ঞান-সম্মত কারণ আছে সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশও চলবে না।

শ্রাবণ সক্রান্তিতে মনসাপূজা। বাউরী, বাগদী, ডোম মুচিদের আরাধ্যা দেবী মা মনসা। তার পুজো বিবিবাথানেও হয়। ঘরে ঘরে উপবাসী ব্রতী থাকে! পাঁঠা বলিতে মনসা থানে থান থান রক্ত জমে যায়। হাঁড়ি ভর্তি

ধেনো মদ আসে। বিষম ঢাকী বাজে গুড় গুড় শব্দে। মনসার ঝাঁপান হয়। মা বিষহরীর বন্দনা গান।

সেদিন কার সাধ্যি খাদে লোক আনে? মালকাটা যদি বা আসে টালোয়ান আসে না। সাহেবরা লাঠি নাচান আর চীৎকার করেন—হোয়ের ইজ দ্যা বাউরী গ্যাং?

বাউরীরা টালোয়ানের কাজে বড়ই তুখোড়। কিন্তু মনসা পূজা, ভাদু পরবে ঢোলাঠুকা করে মদ খেয়ে বে-শোর। ধাওড়ায় ধাওড়ায় সাহেবদের লাঠি টুপি ঘোরে। হম্বি তম্বি গাল বাখান মারধোর ত চলেই। মাতালের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আছাড় পিছাড় খেয়ে একসময় তার নেশা ছুটে তখন সে কয়লা কাটে।

তেইশ

সেদিন আকাশেও মেঘ ডম্বরু বাজছে। গুরু গুরু মেঘ ডাকার সঙ্গে রমঝম বৃষ্টি। ওদিকে বিবিবাঁধে মহাদানাও ক্ষেপে উঠেছে।

মনসাদের ছিল রাত পালি ডিউটি। নিতাই কোন ফাঁকে পালিয়ে গেছে মদ খেতে। গোউর ঘরেই লুটোপুটি খাচ্ছে। মনসারাম জানে চাপরাসীর মার ঠেকানো যাবে না। তাই সে তার মা, বৌ, শান্তি ভাবীকে নিয়ে বাতিঘরে চলে গেছে। চাপরাসীরা কতকগুলো মাতালের সঙ্গে গোউরকে ধরে নিয়ে এল। হারকু মদে টং হয়ে লাঠি হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে। ওদের দিকে কটকট করে তাকিয়ে বলল—আবে শ্যালা! আউর এক আদমী কাঁহা?

মনসা বলল—থোড়া বাদ আয়েগা।

তিনটি মেয়ে ও একটি মাতাল নিয়ে খাদে যেতে যেতে মনসার মনে বড় কু ডাকছিল। একুশ নম্বর গোলাইয়ে গিয়ে বুকটা ছম্ করে উঠল। ছাদ থেকে এত জল টপ টপ করে পড়ছে যেন শ্রাবণের ধারা। ছুটো ষ্টিম পাম্প হম্ হম্ শব্দে চলছে। তার নির্গত বাষ্প ভ্যাপসা গরমে ও ধোঁয়ার মত অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত চলছে না। ডিবরী বাতির এককোঁটা হলুদ আলো জোনাকির মত দেখাচ্ছে। পট করে একটা শব্দ উঠল। গোলাইয়ের খুটোটা ভেঙে গেল। চাওনী আয়তনে বাষ্প নেই। কিন্তু মাথার উপরে ছাদটা ঝুলে গেছে। কাঠ খুঁটো ভেঙেছে এবং লম্বালম্বি একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। মনসারাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলল—মা। ঈ-খেনে আর এক মিনিটও লয়। চল জলদি চল।

সবাইকে টানতে টানতে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। আরো একটা দল ওই আয়তনে কাজ করছিল তাদেরকেও সাবধান করে দিল ও। অবস্থা বে-

গতিক দেখে তারাও বেরিয়ে পড়ল।

কুড়ি নম্বর লেভেলে বেশ কয়েকজন কুলি-কামিন মুখ গোঁজ করে বসে আছে। তাদের সামনে একজন মুনশী ও একজন মাইনিং লাঠি নাচাচ্ছে—শ্যালারা খাদে এসে বসে আছিস। এখনো এক গাড়ি কয়লা কাটিস নাই। কি মনে করেছিস কি ?

মনসা বলল—চাণ্ডনীতে চাল খারাপ আছে বাবু।

—এঃ শ্যালা! বিলাইতে মাইনিং পাশ করে এসেছে। চল বলছি। ভালো চাস তো আয়তনে চল।

জনকয়েক ওদের তড়পানিতে ভয় পেয়ে ভিতরে গেল। তারপর এলো হারকু পাশী। ওকে দেখেই সবাই সুড় সুড় করে চলে গেল। রয়ে গেল মনসারাম ও তার গুষ্ঠির মেয়েরা। তাদের সামনে হারকু। মেয়েদিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে মনসা। হারকু বলল—ক্যা বে—তু নহী গয়া ?

—হম নহী যায়েগা।

—নহী যায়েগা ? শ্যালা ভষড়ি বলানহী যায়েগা ? লম্বা চওড়া হাতের একটা পাঞ্জা সপাটে বসে গেল ওর গালে। সমতালে গর্জন করে উঠল—যাও—

পুঞ্জীভূত আক্রোশ, সীমাহীন ক্রোধ এতদিন এমনি একটি স্ফুলিঙ্গের জন্য অপেক্ষা করেছিল। আর তা পাবামাত্রই ঘটে গেল ভয়ংকর বিস্ফোরণ।

চড় খেয়ে যেন টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছে তেমনি এক ভঙ্গিতে পড়তে পড়তে তুলে নিল কয়লা কাটার গাঁইতিটা এবং চোখের পলকে নিরেট কয়লার বুকে যেমন করে চোট দেয় তেমনি ভাবে চোট দিল এক লাহাঙ্গা-নমুষ্যদেহে।

ঠিক তখুনই ভিতরের গরম চাণ্ডনী ভয়ংকর শব্দে ভেঙে পড়ল। চাল পড়ছে, হুড়-মুড় শব্দে। ভেসে আসছে ভয়ার্ত চীৎকার এবং আর্তনাদ।

মনসারাম মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে কাটা মুরগার মত ঝটপট করা হারকুর শরীরটাকে ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে ঢালের মুখে ঠেলে দিল।

কাছিমের মত জীবন হারকুর। হোস পাইপের মুখে জল পড়ার মত রক্ত পড়ছে পেট থেকে। গাঁইতিটা টেনে বের করার সময়ে নাড়ি ভূড়িও বেরিয়ে এসেছে তবু বিকট চীৎকারে খাদের বাতাস ফাটিয়ে দিচ্ছে। ষ্টিম পাম্পের গর্জন ছাপিয়ে সে শব্দ কানের পাতা ছিঁড়ে দিচ্ছে। উঠে দাঁড়ারার চেষ্টা করছে।

গোউরের নেশা ছুটে গেছে। সেও মনসার সঙ্গে হাত লাগিয়ে ওকে ধাক্কা দিতে দিতে একুশ নম্বর গোলাই পার করে দিল। তখন সে একটা মুর্দা লাশ।

ভিতর থেকে তখনো মরণ আর্তনাদ ভেসে আসছে। পটাং শব্দে ভেঙে গেল একুশ নম্বর গোলাইয়ের খুঁটো।

মনসা বলল—জলদি ভাগ দাদা ! ঈ-চালটিও পড়বেক। আহা ভিতরের লোকগুলো সব মরে গেল রে।

ওদের হাতে বাতি ছিল না। মেয়েগুলি কুড়ি নম্বর গোলাইয়ে বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই একজন ছুটে এল আলো নিয়ে। ওরা কুড়ি নম্বরে পৌছে কুকুরের মত হাঁফাতে লাগল।

ছলনা বলল—কি করলি বেটা ?

—ঠিক করেছি মা। বহুত পাপের পরাচিত্তি করেছি। বহুত অপমানের শোধ নিয়েছি।

—ঈ-বারে কি হবেক ?

—আমাদের কিছুই হবেক নাই। চাল পড়ে বেবাক ঢাকুন হঞে যাবেক। তারপরে কে জানবেক যে উয়াকে আমিই খতম করেছি। এখন তাড়াতাড়ি চল।

ওরা হলেজ রাস্তার ট্রামলাইন ধরে উটছে। হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে কানফাটা শব্দ। যেন ওদের পিছনেই শতখানেক বাজ পড়ল। তারপর গুড় গুড় শব্দে পাথর ভাঙছে·তো ভাঙছেই। সেই সঙ্গে জল প্রপাতের শব্দ। যেন দামোদর ঢুকে গেল খাদে।

বাতাসের ঝটকাতে সব বাতি নিভে গেছে। ভয়ংকর অন্ধকারে মনসারাম ভাবছে তারাও বুঝি মারা যাবে। কিন্তু বিপদে মাথা ঠিক রাখার মত মাথা তার আছে। তাই সে চকমকি ঠুকে আগুন জেলে দুটো বাতি জেলে নিল। ঐটুকু সময়ের মধ্যে জল এসে গেল পায়ের পাতায়। ওরা আরো ভয় পেয়ে গেল। থর থর করে কেঁপে উঠল।

মনসা ও গৌর আপন আপন বৌকে শক্ত হাতে ধরেছে। ওদের মা মনসার কোমরের কষি ধরেছে। চড়াই ভেঙে দৌড়চ্ছে প্রাণ বাঁচানোর তাড়নাতে। জলও ওদের পিছনে তাড়া করছে।

ততক্ষণে খাদে বিভিন্ন সেকশানে শোরগোল উঠে গেছে। সবাই পালাচ্ছে প্রাণের দায়ে। মনসার গায়ে হারকু পাশীর কাঁচা রক্ত স্রেফ ঘামের স্রোতে ভেসে গেছে। পরনে তো নেংটা মাত্র। কাজেই রক্তমাখা জামা-কাপড়ের বালাই-ই নেই। ভীত ত্রস্ত পলায়ন পর কুলি-কামিনদের দলে মিশে গেল ওরা।

তখন বিবিবাথানের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হয়ে একটা তিন ফুট চওড়া ফাটল বিবিবাথানের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। তার দু'পাশে আরো আরো অনেক ছোট বড় ফাটল। ক্রমশই তা বেড়ে যাচ্ছে। ঘর-দুয়ার ভেঙেচুরে তছনছ। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। বিবিবাঁধ জলশূন্য। এ সেই বহু আনাড়ী লোকের কপোল কল্পিত মহাদানা।

বিবিবাথান অঞ্চলের নীচে চাঙনী অর্থাৎ পিলার কাটিং হচ্ছে অনেকদিন

থেকেই। খাদের প্রথম অধ্যায়ে সুড়ঙ্গ পথ চালানো হওয়ার পর কয়লার যে স্তম্ভগুলি ছিল তাই পর্যায়ক্রমে নীচের দিকে থেকে কেটে আনা হচ্ছে। ফলতঃ সে স্থান হচ্ছে শূন্য। প্রকৃতির রাজত্বে শূন্য স্থান থাকে না। কাজেই উপরিস্থিত শিলাস্তরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পাথর ভেঙে পড়ে।, বিবিবাঁধের বিশাল জলাধারের নীচে ফাঁকা চাঙনীর উপর যখন পাথর ভাঙার প্রক্রিয়া চলছিল তখন তার শব্দে বিবিবাঁধের জল তোলপাড় হত। এটা মিঃ কুটসের বোঝা উচিত ছিল কিন্তু উনি তা বুঝতে চাননি, তাই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কত যে খাদের নীচে সমাধিস্থ হয়েছে, আর কতইবা বিবিবাথানের মানুষজন ধ্বসের ফাটলে তলিয়ে গেছে সে হিসেব করা সাধ্যের অতীত।

মনসারামরা ঘরে এসেও ঘরে ঢুকতে পায় না। তাদের ঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তার ভিতর থেকে গোঙানীর শব্দ ভেসে আসছে।

ছলনা বলল—ঈ বাবাঃ! কে চাপা পড়েছে রে? তুর বাপ না নিতাই?

মনসা বলল—দেখছি

খড়ের চাল হাতেহাতে সরিয়ে ফেলল ওরা। ভিতরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ঢালু দাস। চালের একটি কাঁইচি পড়ে তার কোমর ভেঙে দিয়েছে। মনসা ও গোউর টেনেটুনে ওকে বের করে বাইরে নিয়ে এল।

সারা পাড়া জুড়ে চলছে চেঁচামেচি, কান্না, আর্তনাদ। কে কাকে দেখে? এখন আর সাহেবদের চাপরাসী নেই। মনসারাম জনকয়েক জোয়ান ছোকরা সঙ্গে নিয়ে চাল চাপা পড়া দেওয়াল ধ্বসে পড়া আহত ও ক্ষত-বিক্ষত মানুষগুলোকে উদ্ধারের কাজে লেগে পড়ল। যারা অক্ষত ছিল তাদেরকে উদ্ধারের কাজে লাগাল এবং আহত, মৃত, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিল। সারারাত ধরে চলল উদ্ধারের কাজ। সকালের আলো ফুটলে দেখা গেল এক ধ্বংসস্তূপ। গতকাল সন্ধ্যাতেও যা ছিল কলরব-মুখরিত জনপদ তাই হয়েছে ভগ্ন ও বিধ্বস্ত-খড়, বাঁশ, টালি, খোলা, ইঁট ও মাটির পুঞ্জ পুঞ্জ স্তূপ। রাশি রাশি আবর্জনা।

সকাল থেকে কারো পেটে দানাপানি নেই। বিবিবাঁধ শূন্য। একটি কুয়ো ছিল তা অতল গহ্বরে। দামোদরে ঘোলাটে কাদাজলের দু'কানা বান। এতগুলো মানুষ খাবার জল কোথায় পায় তাই এক দুর্ভাবনা। আবার দূর থেকে যে জল আনবে তার জন্যও কোন হাঁড়ি কুঁড়ি নেই। সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

সে যুগে ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি গাল-ভরা শব্দগুলির জন্মই হয়নি। প্রধানমন্ত্রীই ছিল না তার আবার ত্রাণ তহবিল! এখন যে ঝাড়ে পাতে সেবা প্রতিষ্ঠান তাই বা কোথায় ছিল? মিশনারী সাহেবরা কিছু দান খয়রাৎ করতেন। তাও এসে পৌছবার আগে আধা আদমী মরে হেজে যেত।

সেই পটভূমিতে বিবিবাথানের ষাট-সত্তরটি পরিবার বাচ্চা-কাচ্চা আহত নিহত আপন আপন মানুষজন নিয়ে আতান্তরে পড়ে আছে। সাত-আটটি মৃতদেহও আছে। তাদের সৎকার না করলেই নয়। পচে দুর্গন্ধ উঠতে শুরু করেছে।

কখনো উচ্চকণ্ঠে, কখনো নিম্নকণ্ঠে বিলাপ ও রোদন অব্যাহত আছে। তার মধ্যেই আপন আপন গৃহ-সামগ্রী উদ্ধারের ধ্বংসস্তূপ উকুটে বেড়াচ্ছে। একটি একটি করে নিয়ে এসে জড় করছে।

মনসারাম জনকয়েক ছোকরাকে পাশাপাশি ধাওড়াতে পাঠিয়েছে কিছু চাল, ডাল যদি ভিক্ষা পায় সেজন্য।

মাস্টারমশাই এলেন বেলা দশটা-এগারটা নাগাদ। মনসারাম ওঁর কাছে কেঁদে পড়ল—কি করবো স্যার ?

উনি বললেন—ঘাবড়াস না মনসা। বড় বিপর্যয় থেকেই মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা আসে। তুইও ব্যাপারটা সেইভাবে গ্রহণ কর। এটার প্রয়োজন ছিল। না হলে বিবিবাথানের জড় শিকড় উপড়ে অন্যত্র যেতে পারতিস না। ভালোই হয়েছে এই পাপের আস্তানা প্রকৃতির খেয়ালেই ধ্বংস হয়েছে। এবার তুই এই শিকড় উপড়ানো মানুষগুলো নিয়ে জাগালির ডাঙায় চলে যা।

মনসারাম অভিভূত কণ্ঠে বলল—স্যার।

—হ্যাঁ। সেখানে তোরা নিজস্ব বসতি কর। তোর স্বপ্ন সার্থক হবে।

—কিন্তু জমিদারবাবু যে সেখানে ঢুকতে দেবে না।

—একবার তো ডেরা ডাণ্ডা পুঁতে ফেল। তারপরে যদি উচ্ছেদ করতে আসে তাহলে হবে একটা ফৌজদারী। গড় লায়েক পতিত ডাঙা, তাও তোদের নামে কবুলতি পাট্টা আছে—জমিদার ফৌজদারী করতে এলে আইন আদালতে তারই হার হবে।

দৃঢ়কণ্ঠে মনসা বলল—ঠিক আছে স্যার আজ রাতের মধ্যেই ডাণ্ডা পুঁতে দেব। তারপর যা আছে কপালে।

মনসার সামনে এখন নতুন কর্মোদ্যোগের হাতছানি। ভয় ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে শুরু করে দিল প্রস্তুতি। আট-দশটি পরিবার এককথায় রাজী। বাকী সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

মনসা বলল—ঠিক আছে। তোরা থাক। আমরা যাবই।

চব্বিশ

যে মহাজনরা এতকাল যাবৎ বিবিবাথানের কুলি-কামিনদিকে শোষণ করেই এসেছে তারা বিবিবাথানের এই আপৎকালে সেখানে পা মাড়াতেও আসেনি। জনকয়েক কুলি হরদেও গোমস্তার কাছে গিয়েছিল। ও তাদেরকে

বলেছে—মনসারাম তোদের নতুন বাপ হয়েছে তার কাছেই যা। শ্যালা টাকা লিবি উশুল দিবি না, সুদ দিবি না কে তুদের দেখভাল করবেক রে। অভি হামার কাছে টাকায় চার আনা সুদ দিবার কড়ার কর, কাগজে টিপছাপ মার হাওলাৎ থোড়া বহুৎ দিব।

ওরে শ্যালা চশমখোর! আমাদের জান বিরাঞে যেছে আর তুর সুদ ডবলের ডবল হচ্ছে। সুদ কখন দিই না রে? শ্যালা সারাজীবন তো আমাদিকে চুষে খেঞেছিস। তবু পেট ভরল নাই।

এবম্বিধ ভাবনা মনসাই শিখিয়েছে ওদেরকে। তাই হরদেও গোমস্তার কাগজে টিপছাপ দিয়ে কড়ার না করে ফিরে এল।

ওদিকে শেরগড়ের অফিসে সাহেব সুবোর ভিড়ে ছেয়ে গেছে। কি করে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল? কত কুলি-কামিনের প্রাণ গেল? মাইনস সেফটি ডিপার্টমেণ্টে কি কৈফিয়ৎ দেবে? হাজরি খাতা কি করে লোপাট করবে? কেমন করে সাজিয়ে গুজিয়ে ইন্সপেক্টার সাহেবকে বোঝাবে যে দুর্ঘটনার সময় খাদ থেকে সমস্ত লোকজন তুলে দেওয়া হয়েছে এবং একটিও লোক মরেনি—ইত্যাদি ব্যাপারের সঙ্গে যত শীঘ্র খাদ চালু করা যাবে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মিঃ কুটসের ওপরওলারা ওকে তুলোধুনো করে ছেড়েছেন। অবশ্য তা দুর্ঘটনায় লোকজন মরার জন্য নয়, খাদ বন্ধ হয়ে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার জন্য।

চাপরাসীরা খাড়া দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছে এবং হরদেও ওবরম দেওয়ের টাট্টি পেশাব বন্ধ হয়ে গেছে সাহেবদের হুকুম তামিল করতে। সাহেবরাও ঘেমে নেয়ে একশা। দলে দলে খাদে যাচ্ছেন আবার উঠে আসছেন নতুন মুসাবিদা ফাঁদার জন্য।

ওদেরও দিন ফুরালো সন্ধ্যা হল। এবং একটি লোকের জন্য অভাববোধ হল। সে ঢালুদাস। মদের ভিয়েনে তার পটুত্ব সংশয়াতীত। সেই লোক কোমর ভেঙে পড়ে আছে অসহায়ভাবে।

ধাওড়ায় ধাওড়ায় ভিক্ষা করে যেটুকু শস্যদানা পেয়েছিল তাই সিদ্ধ করে লবণ মাখিয়ে এক হাতা করে বিলি হল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারাদিন পর ঐ সামন্য অন্নজল গ্রহণ করেই ওরা বোঁচকা বুঁচকি ঠিক করে নিল।

একটা খাট বানিয়ে তার ওপরে ঢালুদাসকে চড়াল। কাঁথাখানি যা ছিল তাও খাটেই লোড করল। ছলনা, শান্তি, নিতাইয়ের বৌ এবং বৈশাখীর মাথায় মোট ঘাট। নিতাইয়ের কাঁধে বাঁক। মনসা ও গৌউর খাটটিকে তুলে নিল কাঁধে। একহাতে খাট ধরেছে অন্য হাতে বল্লম। হেঁটে যাচ্ছে শূন্যগর্ভ বিবিবাঁধের পাড় দিয়ে, শেরগড়ের সাহেব কোঠিকে পাশ কাটিয়ে।

কলিয়ারীর মধ্য দিয়ে গেলে পথ অনেকটা কম হত। কিন্তু তা ওরা করল

না! তাকে বাঁ পাশে রেখে আল গহন ভেঙে ধ্বস্ত, বিপর্যস্ত মানুষের মিছিল প্রাণের দায়ে চলতে লাগল নতুন বসতির সন্ধানে।

অন্ধকারে মিশে গেছে ওরা তবু প্রতি নিয়ত ভয় পাচ্ছে চাপরাসীর দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের যাত্রা ভণ্ডুল করে দেয়। এতগুলি পিঁজরার পাখী একরাতে উড়ে যাবে তা কি ওরা প্রাণ থাকতে সহ্য করতে পারে?

অবশ্য মনসারামও মরীয়া হয়ে আছে। এখনো তার গা থেকে হারকু পাশীর কাঁচা রক্ত ধোয়া হয়নি। দরকার হলে আরো রক্ত ঝরিয়ে দেবে সে প্রতিজ্ঞা ওর মনে আছে। পথে যখন নেমেছে তখন পথটাই হবে রণক্ষেত্র। সেজন্য ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক মোতায়েন রেখেছে কোন আক্রমণ হলে তার সংকেত পাঠাতে এবং ওদের মিছিলের কাছ পর্যন্ত আসার আগেই সে আক্রমণ প্রতিহত করতে।

কিন্তু না। কোন বাধা পেল না। ওদের সাহেব ও গোমস্তারা ভাবতেই পারেনি যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া সারাদিন হ্যাপা ত কম হয়নি। হারকু পাশীর কাছ থেকেও কোন রিপোর্ট আসেনি। সেখানে কিছু গণ্ডগোল হলে সেই সামলাবে। দরকার হলে খবর দেবে।

সে যে পরপারে চলে গেছে এই খবরটাই তখনো তাদের জানা হয়নি। অতঃপর বেশ নিশ্চিন্তেই আছে।

একটা বৃহদাকার কাছিমের খোল যদি উপুড় করে দেওয়া হয় তবে সেটা দেখতে যেমন হবে তেমনি প্রাকৃতিক গঠন ছিল জাগালির ডাঙার। গোল গোল নুড়ি পাথর ও ঘুসিক চূনে ভর্তি। মাঝে মাঝে খুরুষ পাথরের চাতাল। রুখু শুখু মাটিতে কাশ ছাড়া অন্য কিছু হয় না। শরৎকালে সেই ডাঙা সাদা মেঘের মত দেখায়। এছাড়া তার কোন সৌন্দর্য ছিল না। বরং এক বিভীষিকা তিন চার মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম বা কলিয়ারী নেই। মানুষ জন সে পথে যেতেও ভয় পায়। কেমন বুক ছম্ ছম্ করে। দিনের বেলায় মানুষ মেরে ফেলে দিলেও শিয়াল শকুনি ছাড়া কেউ উদ্দেশ পাবে না।

প্রায় অর্ধ চন্দ্রাকৃতিভাবে এর উত্তর সীমানা বরাবর বয়ে গেছে চঞ্চলা-জোড়। তারই পাশে একটি ডুমুর গাছ এবং সেখানেই জাগালির শ্মশান। দিনের বেলাতেই ভূত নাচে। রাত্রি বেলায় প্রেত-প্রেতিনী, ডাকিনী-যোগিনী, পিশাচ-পিশাচী, শাঁকচুন্নী কত কি ভীতিপ্রদ রটনা ও কিংবদন্তীতে বিভীষিকাময় সেই শ্মশান ভূমি।

ব্যারাকলউ সাহেব যখন পান মোহরার ম্যানেজার ছিলেন তখন এই জমিই বিবিবাথানের কুলি-কামিনদের নামে পাট্টা দিয়ে গেছেন। আবার জমিদার চন্দন বাবুও দখলদারী কায়েম রেখেছেন। এতই লিটিগেটেড ল্যাণ্ড।

মুমূর্ষু ঢালুদাসকে কাঁধে বয়ে এনে সেখানেই থামল ওরা। তাদের পিছনে মেয়েগুলিও এসে দাঁড়াল। তারপর এক একটি পরিবারের এক একটি দল এসে জুটতে লাগল। যারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না তারাও ভোর নাগাদ এসে গেল।

তখন কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঠেছে। চরাচর ব্যাপ্ত অন্ধকার ঈষৎ আলোর রোশনী পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে। একটা পাথর চাতালে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে মনসারাম। তার বুকের কাছে বসে বৈশাখী। ওর গায়ে হাত রেখে ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

মনসার মনে হল স্বপ্ন ও বাস্তব একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু না। স্বপ্নের ঘোরে থাকলে চলবে না সকাল হলেই ছুটে আসবে জমিদারের লাঠিয়াল এবং হরদেও গোমস্তার পালোয়ানরা। তাদের মোকাবিলা করতে হবে লাঠির মুখে। তার আগে একটা খুঁটি চাই।

সেই রাত্রেই দৌড়াল স্যাতখরিয়ায় জয়বাবুর বাংলোতে।

কাকিমা-কাকিমা বলে বারকয়েক ডাকতেই কাবেরীর সাড়া পেল। জানালায় মুখ বাড়িয়ে বলল—কে রে? মনসা?

—হ্যাঁ কাকিমা।

—কি ব্যাপার রে? এত রাত্রে?

—রাতভোর হয়ে গেছে কাকিমা। বিপদে পড়ে এসেছি।

—দাঁড়া। দরজা খুলছি।

কাপড় চোপড় ঠিক করে জয়ন্তীকে ডাকল। জয় ওর ঘরেই ছিল। ওকে তুলে দিতে বলল। তারপর দরজা খুলে বাইরে এল। নিজের হাতেই গেটের তালা খুলে মনসাকে ভিতরে ডেকে আনল।

—কি হল রে? এত হাঁফাচ্ছিস কেন?

—একঘটি জল দাও কাকিমা। তারপরে সব বলছি।

জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে সব ঘটনা বলল।

জয় বলল—করেছিস কি রে? একেবারে কেল্লা ফতে।

—কিন্তু কালকেই চন্দনবাবু ঝাঁপিয়ে পড়বে কাকু।

—চন্দনবাবুর মাজা ভেঙে দিয়েছি রে। ওর জন্যে তোদের ভয় নেই। কাবেরী বলল—তোর কাকু ওদের জমিদারীর তিন অংশের এক অংশ কিনে নিয়েছে। এক লপ্তে চারশো বিঘা জমির দলিল আছে। চন্দনবাবুর দাঁত খিঁচুনি সার। যদি বাড়াবাড়ি করতে যায় তবে জাগালি শ্মশানে বলি দিয়ে দিবি।

জয় বলল—আর কি মদৎ চাস বল?

—ঘরদুয়ার বানাবার জন্যে কিছু খড় বাঁশ।

—আচ্ছা। সকাল হোক গরুগাড়িতে করে পাঠিয়ে দেব।

—ওঃ। কাকু আপনি আমাদিকে বাঁচালেন।

—থাক। আর বলতে হবে না। লম্বাকে নিয়ে যা। জন পঞ্চাশেক লোক নিয়ে তৈরি হয়ে যাক। আমি বলে দেবো। বলা যায় না। দাঙ্গা ফৌজদারী যদি হয় তবে তৈরি থাকতে হবে তো।

যখন কিছু হয় তখন এমনি করেই হয়।

এর আগে চন্দনবাবু যখন মনসারামকে জাগালি শ্মশানের ত্রিসীমানায় পা দিতে বারণ করেছিলেন তখন তাঁর জমিদারী প্রতাপ ছিল অখণ্ড। এক অংশ বিক্রী হয়ে যাবার পর তাঁরও প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হয়ে গেছে। চঞ্চলবাবু জমিদারীর চেয়ে কলিয়ারীটাকেই বেশি পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি কোন বাধা সৃষ্টি করলেন না।

কিন্তু ফৌজদারী একটা হতে যাচ্ছিল শেরগড় কোল কোম্পানীর গোমস্তা হরদেও, বরমদেওয়ের সঙ্গে। হতে পেল না জয়ের দূরদর্শিতায়। সে যে লম্বাকে জন পঞ্চাশেক লোক নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পাঠিয়ে ছিল সেই কারণেই বেশিদূর গড়াল না।

জাগালি শ্মশানে সেদিন একটা লাল রঙের সূর্য উঠল যা ছিল অত্যাচারিত লাঞ্ছিত কুলি-কামিনদের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই জমি, এই মাটি ওদের নিজের সম্পদ। এখানে ওরা বাসা বাঁধবে। কোন কোল কোম্পানীর চাপরাসী এসে তাদের উপর ঘোড়া দৌড়াতে পারবে না, লাঠি হাতে তেড়ে আসবে না, বৌ-বিটিদের ইজ্জত কানাকড়িতে বিকাবে না। আঃ কি স্বস্তি!

কুলি-কামিনরা এক জায়গায় জড় হয়ে ঘর দুয়ার বানাবার পরিকল্পনা করছিল। তখন এলেন মাস্টার মশাই। সবাইকে লট বাই লট জায়গা ভাগ করে দিয়ে রুক্ষ কর্কশ ডাঙার উপর নতুন বসতি নির্মাণের নক্‌শা করে দিলেন।

উনি তার নাম দিলেন—কুলি বাথান।

পঁচিশ

একটা সরস্বতী প্রতিমাকে যদি ময়ূরকণ্ঠী নীল রঙের ঝালর দেওয়া ফ্রক পরিয়ে দেওয়া হয়, তার মাথায় ববছাঁট সোনালী চুল থাকে এবং পায়ে সাদা মোজা ও হিল উঁচু কালো জুতো তবে তাকে দেখতে যেমন হবে সরিতাকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে।

টক্ টক্ শব্দে চটুল ভঙ্গিতে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াল। ঘোড়ার গাড়ি তৈরি বাক্‌সো বোডিং চড়িয়ে জয় সেখানে দাঁড়িয়ে। জয়ন্তীর তিনটি ছেলে রূপময়, গুণময়, আনন্দময় যথাক্রমে পাঁচ, তিন ও এক বছর বয়সের শিশুরা বারান্দায় কিলবিল করছে।

সরিতা ওদেরকে আদর করে চুমু খেয়ে মুখ মুছল। কাবেরীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সে ওর চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেল। এতক্ষণ সব ঠিক-ঠাক চলছিল। কিন্তু জয়ন্তীর কাছে যাবামাত্র ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সরিতাকে জাপটে ধরে এমন কান্নার হাট বসিয়ে দিল যে বেচারীর অত সাধের সাজসজ্জা আলুথালু হয়ে গেল।

কাবেরীর চোখের পাতা ভিজে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। ভারী গলায় বলল —ওকে ছেড়ে দে ছোট বৌ। অমন করে কাঁদিস না।

সরিতা নিজেকে সামলে নিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসল। জয় উঠতে যাচ্ছিল। কাবেরী জিজ্ঞাসা করল —সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাবে ত?

জয় বলল —হ্যাঁ। সে ত যেতেই হবে। উনি হয়ত ভোরে উঠে বাগানে পায়চারি করছেন।

—তুমি কাল ফিরতে পারবে?

—চেষ্টা করবো।

ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে দিল। সরস্বতী পুজোর সময় দিনকয়েকের জন্য এসেছিল। আজ সে কলকাতা গেল। গরমের ছুটিতে আবার আসবে।

ঘোড়ার গাড়িটা যতক্ষণ না দৃষ্টির অন্তরালে গেল ততক্ষণ সরিতা মুখ বাড়িয়ে সাদা রুমাল ওড়াচ্ছিল। আর জয়ন্তী ও কাবেরী চোখে জল ও দাঁতের ফাঁকে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সরিতা এবছর তেরো পার হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দিনগুলো কেমন কেটে যাচ্ছে। এই তো সেদিন সাদা ফ্রক পরে বাগানে নেচে বেড়াতো। এরই মধ্যে তেরো পার হয়ে গেল। এই বয়সে ওর নথমোচন হয়েছিল। তখনই সে বুঝেছিল নারীজীবনের তাৎপর্য কোথায়? এই দেহটার বিশেষত্ব কি? তার মেয়ে কি তা বোঝে?

আজ না বুঝলেও কাল বুঝবে। মায়ের আসল পরিচয় পাবে। কে জানে তখন সে তাকে ঘৃণা করবে না ভালবাসবে? সে মেয়ের কি ঘর সংসার হবে? স্বামীর সোহাগ বা সন্তানের মা ডাক শুনবে?

হে ঠাকুর! আমার জীবনের গ্লানি যেন তাকে স্পর্শ না করে। আমি স্বৈরিণী, আমি বারাঙ্গনা কিন্তু আমার ভালবাসা তো মেকী নয়। যখন যে আধারে থেকেছি তখন তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি। একি নটীর ধর্ম? না চিরন্তনী নারীর ধর্ম?

এমন সব প্রশ্নের মীমাংসা ওর জানা নেই। খুঁজতে গিয়েও তল পায় না। অযথা হাতড়ে মরে। চোখ থেকে ঘুম উবে যায়। ঘুমোবার জন্য সাধ্য সাধনা করে। মনে করতে চায় এক সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। চোখের সামনে

ভেসে ওঠে ল্যাদা আমের গাছ। টলটলে কালো দীঘির জল। এই গাছে চড়ে ওরা ঝরুল ঝাঁপ খেলতো। সেই নাচমহলে এখন কলিয়ারী হয়েছে। ওর বন্ধুরা সব অর্জুন পট্টিতে গিয়ে দেহব্যবসা করছে। ওঃ কি দুর্ভাগ্য !

সরিতাকে কেন্দ্র করে কাবেরীর মনোজগতে দুটি একটি ঢেউ প্রায়ই উঠত। আবার মিলিয়ে যেত। কিন্তু ওর তেরো বছর বয়স পার হয়ে যাবার পর ভিতরে ভিতরে বড়ই উতলা হয়ে পড়েছিল।

আর ভাবনা ছিল জয়কে নিয়ে। সে আজও জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত। হাজার হাজার টাকার মালিক। চারশো বিঘা ধানজমি। পুকুর বাগান, হাল বলদ খামার বাড়ি কত কি ? দু'দুটো কোল কোম্পানীর ঠিকাদার গোমস্তা। তার অধীনে অমন বিশজন ঠিকাদার আছে। হাজার বারোশো কুলিকামিন। দশটা মুনশী। দুটো বাবু।

পানমোহরা থেকে নওরঙ্গী পর্যন্ত তার ঘোড়া ছোটে টগবগ করে। ব্যারাকলউ সাহেবের বিপুল কর্মোদ্যোগে সেই হয়েছে এক নম্বর হাতিয়ার। অত যে বিলিতী সাহেব আছেন তাঁরাও জয়ের মত প্রাধান্য পায় না।

অথচ সে থাকে ভিজে বেড়ালটির মত। সব সাহেবকেই স্যার স্যার বলে তোয়াজ করে। তাঁদের খিদমদ খাটে এবং যখন যা দরকার তারই যোগান দেয়। তবে না সে জয়বাবু। সে সবারই প্রিয়।

এত গুণ থাকতেও সে স্বজাতি কুটুম্বের ঘৃণা বয়ে বেড়াচ্ছে শুধু তারই জন্য এই ভাবনাটাও তাকে কুরে কুরে খায়। তাহলে সে তাকে কি ভালবাসল ? ভালবাসা কাউকে নীচে নামায় না, উপরেই টেনে তোলে। কাবেরী তার নিজের মত করেই এসব কথা ভাবে। একদিন জয়কে বলেছিল —আমার জন্যই তুমি আজও জাতে উঠতে পারলে না।

জয় বলেছিল আমি জাত নিয়ে ভাবি না। কারণ কি জানো যে সব সমাজপতিরা আমাকে একদিন জাতিচ্যুত করেছিলেন তাঁরা অমন বিশবার আমার কাছে দরবার করতে এসেছিলেন তাঁদের ছেলে বা আত্মীয় স্বজনকে একটা বাবুর চাকরী করে দেবার জন্য। দু'চারজনকে চাকরী করেও দিয়েছি। তুমি যদি দেখতে চাও তো বল ওদেরকে দিয়ে তোমার এঁটো ভাত পরিষ্কার করিয়ে দিতে পারি।

এটা তার আস্ফালন নয়। নিখাদ সত্যি। দুনিয়ার সবটাই টাকার গোলাম। পানমোহরা গ্রামের বহু ছেলে ছোকরা ওর অধীনে চাকরী করে। আর সাহেব আমলে যারা চাকরী করত তারা সার্থক অর্থেই চাকর। সমাজ-পতিদের বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছিল।

জমিদার বাড়িও ভেঙে পড়েছিল। রাধাগোবিন্দবাবু মরার আগে তার বিষয় সম্পত্তি তিনভাগে ভাগ করে উইল করেছিলেন। চম্পকবাবুর স্ত্রী

তাঁর ছেলেদের অংশ বিক্রি করে বাপের বাড়িতে আছেন। চঞ্চলবাবুও নিজের অংশ বিক্রি করে সেই টাকায় আরেকটা কলিয়ারী করেছেন। আসানসোলে বাড়ি করে বাস করছেন। পানমোহরায় আছেন একা চন্দনবাবু। তিনি ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। জয়ের সঙ্গে শত্রুতা তো দূরের কথা, জয়বাবু বলে সম্বোধন করেন। কোন বৈষয়িক ব্যাপারে পরস্পরের সাক্ষাৎ হলে রীতিমত খাতির করে কথা বলেন। কারণ তিনি বেচারাম আর জয় কেনারাম।

এটা জয়ের কম জিৎ নয়।

ফাল্গুনের দুপুরে হা হা করে বাতাস বইছে। জয় তখনো ফেরেনি। জয়ন্তী রান্নাঘরে।

এই একটি ব্যাপারে সে কাবেরীকে টেক্কা দেয়। তার হাতের রান্নাটা সত্যিই ভালো। এই বিদ্যায় কাবেরীর দক্ষতা নেই বললেই চলে। মা সরস্বতী সবাইকে তো সব বিদ্যা দেন না। তাই রান্নাঘরটি জয়ন্তীর দখলে। কাবেরীর দখলে জয়ন্তীর ছানাপোনাগুলি। কাল যে ছেলেটির মুখে বুলি ফুটেছে সেও বড মা বলতে অজ্ঞান।

বেশ একটা স্থিতাবস্থা এসেছিল। জয়কে কেন্দ্র করে দুই সতীনের সংসার বেশ সুখেই কেটে যেতে পারত। কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে অন্তরের গুপ্ত প্রকোষ্ঠগুলিতে এক-আধটু আঁধার জমেছিল।

হতেই পারে। পুরুষ একটি নারী দুটি। জয় চরিত্রটিও নারীর চেয়ে অর্থের প্রতিই বেশি আগ্রহী। সে চায় বিষয় বৈভব ঐশ্বর্য। ঈশ্বর তাকে দিয়েও যাচ্ছেন দু'হাতে তুলে। যত পাচ্ছে তত চাইছে। তারই আগ্রাসী ক্ষুধায় সে জর জর। দুটি নারীর নারীত্বের দাবি মেটানোর দিকে তার বিশেষ মনোযোগ নেই। তার জীবনে দুটি নারীই যে নারীরত্ন সে মূল্যায়নও করতে পারেনি।

অতঃপর দুটি নারীর ভিতরেই না পাওয়ার ব্যথা ছিল। কাবেরী নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারত কিন্তু জয়ন্তী পারত না। সে রাগ অভিমান করত। ছেলেদের উপর ঝাল ঝাড়ত। উপোস দিত।

কাবেরী ভাবত এসব তার জন্যেই হচ্ছে।

স্বামী সোহাগের অংশ কোন মেয়েই সইতে পারে না। ঘরে সতীন এলে তা সইতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে কলহ করার প্রবৃত্তি কাবেরীর ছিল না। ভিতরটা শুধু দগ্ধ হত।

জয়ের মা কিংবা সৎমা কখনো এ বাড়িতে পা দেয়নি। তার ভাইরা মাঝে মাঝে আসত। জয়ন্তীর আত্মীয় স্বজনরাও আসত। তাদের ব্যবহারে কাবেরীর প্রতি কিরকম অবজ্ঞা ফুটে উঠত। ওর হাতে কেউ খেতে চাইত না।

ওর বাড়িতে কুলি-কামিন বাবু সাহেবদের হরদম যাতায়াত ছিল। তাদের সবারই খাওয়া-দাওয়া আপ্যায়ন করত কাবেরী। কিন্তু আত্মীয়রা এলেই তার মনে কিছু না কিছু ক্ষত সৃষ্টি করে যেত।

কাবেরী সেজন্য ক্রমশঃই উদাস হয়ে পড়ছিল। তার সেই স্বভাব চপল হাসি, হাল্কা সুরে গভীর ও গম্ভীর বিষয়কে রসিকতায় মুড়ে দেওয়ার যে সরল বাকভঙ্গী ছিল তার উপরে যেন কিছু বিষণ্ণতার মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

জয় ওকে হুকুম চালাত না। বড় বলে মানত। বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করত। আর কথাবার্তায় বড় বেশি টাকার গন্ধ। যেটা কাবেরীর পছন্দ হত না।

সে স্বেচ্ছাধীনা। তাই তার জীবনের ভাবনা চিন্তা নিয়ে সে নিজেই পুড়ে মরে কাউকেই শরিক করতে চায় না।

ঢাউস পালঙ্কে এলোপাথাড়ি তিনটি শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাবেরী তাদের পায়ের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। বাঁ হাতটা পালঙ্কের বাহুর উপর। কোলের উপর একটি বেহালা আড়াআড়ি পড়ে আছে। ডানহাতে ছড়টা নিয়ে বসে আছে। দু'চোখে উদাস দৃষ্টি। ঠিক যেন একটি ছবি। সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে সুরের মূর্ছনা। শিল্পী তন্ময় হয়ে গেছে।

কলিয়ারী থেকে ফিরে এসে জয় হুড়মুড় করে ঢুকতে যাচ্ছিল। জয়ন্তী ঠোঁটের উপর তর্জনী তুলে নিষেধ করল। পর্দার ফাঁকে এক পলকের জন্য সে দৃশ্য দেখে ও অন্যঘরে চলে গেল।

স্নান করে খেতে বসে বলল —কি হয়েছে তোমার দিদির ? এমন দৈবভাব কেন ?

—সেকথা তুমি যদি জানতে না পারো তবে কি আমি জানবো ?

—কেন জিজ্ঞাসা করতে পারো না ?

— তুমিই করবে।

জয় একটু বিব্রত হল। কাবেরীর পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আজ সে মনে মনে স্থির করল যে ওকে সেকথা জিজ্ঞাসা করতে হবে।

আবার সন্ধ্যায় তিনটি অমনোযোগী শিশু শ্রোতার সামনে করুণ রাগিণীতে বেহালা বাজাচ্ছে। কোনবারই শেষ করতে পারছে না। কারণ শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে যা খুশি ছটোপুটি করছে। কখনো বা শিল্পীর গায়েও ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এটা কাবেরীর রেওয়াজের সময়। কোনদিনই ঠিকমত রেওয়াজ করতে পারে না। ওরা ওকে বিরক্ত করবেই এবং ও তাদেরকে সুর শোনাবেই।

জয়ন্তী যদি ওদেরকে বকাঝকা করে তবে সেই বকুনি খাবে। এই বিচিত্র ব্যাপারটির ব্যাখ্যা জয়ন্তী খুঁজে পায় না।

জয়ের ফিরতে রাত হল। রোজই হয়। এটা কোন ব্যাপার নয়। জয়ন্তীকে ইশারা করে বলল —বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাও। আজ একটু গান শুনি। অনেকদিন থেকে বসতে পায়নি।

কাবেরী একটু মুচকি হেসে বলল —সত্যিই তুমি গান শুনবে ?

—হ্যাঁ গো।

ও আবার হেসে বলল —আমার কি ভাগ্য যে স্বামীকে গান শোনাবো। অর্থাৎ জয় গান-ফানের ধার ধারে না। জয় খোঁচাটা হজম করে নিল।

কাবেরী সত্যিই গান শুরু করল —কাঁদে বিরহিনী রাধা—

হৃদয় মুচড়ানো করুণ সুর। গান শেষ করে সে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে। দু'এক ফোঁটা বেহালার তারে পড়ে আলোতে ঝিক্‌মিক্ করছে।

জয় বলল —এত করুণ সুরের গান তুমি আমাকে কেন শোনালে কাবেরী ? আমি তো বিরহের গান শুনতে চাইনি।

—আচ্ছা। এবার একটা মিলনের সুর ধরছি।

—না। আগে বল তোমার এত কিসের দুঃখ যে এমন করুণ সুরে গান করছো। জানো না ওতে আমি কত ব্যথা পাই।

—কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে বিরহটাই সত্যি হয়ে গেল। তখন কি করবে ?

—তোমার কথাটা বড় হেঁয়ালির মত লাগছে।

—এটা কি আমার কথার উত্তর হল ?

—তোমার কথার উত্তর আমার জানা নেই।

—আমি জানতাম তুমি এই কথা বলবে। কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে ভেবে দেখতে বলছি। এই যে ফুলের মত শিশুগুলি, এরা যখন বড় হবে তখন ওরা আমাকে কি চোখে দেখবে ?

—সন্তানেরা মাকে যে চোখে দেখে।

—নাও তো হতে পারে।

—তোমার আশঙ্কার মধ্যে যুক্তি নেই।

—বরং তোমার ধারণার মধ্যে যুক্তি নেই।

জয় কেমন ঘাবড়ে গেল। কাবেরীর কণ্ঠস্বরে স্থির প্রত্যয়। সে কি বলতে চাইছে ? কি করতে চাইছে ? কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

জয়ন্তী ডাকল —এসো গো। খাবার দিয়েছি।

তারপর এক অশ্রুভারাক্রান্ত প্রভাতে কাবেরী তার কাবেরী কুটিরে চলে গেল। কোন উপরোধ অনুরোধেও ওর মন টলল না। জয় কত করে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। হাতে ধরে অনুরোধ করেছিল। অবশেষে ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে দরবার করেছিল। জয়ন্তী কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল। ওর পায়ে আছড়ে পড়েছিল। বাচ্চাগুলোকে ওর কোলে ফেলে দিয়ে কান্না বিকৃত কণ্ঠে বলেছিল—তুমি একটি পাষাণী। এরা কি দোষ করেছে যে ফেলে দিয়ে চলে যাবে?

কিন্তু না। এমনিতে ও কত সহজ সরল। কত মমতাময়ী। কিন্তু জীবনের একটা চরম ক্ষণে স্নেহ ভালবাসার মোহ কত সহজেই না পাশ কাটিয়ে ছিল।

কারো সঙ্গে তর্কবিতর্ক নয়, যুক্তিজালের বিস্তারও নয়। ওর যেটা মনে হয়েছে সেইটাই শেষ কথা।

এই গোঁয়াতুর্মির কাছে জয় একদিন ফেটে পড়েছিল—তোমার জন্য একদিন আমার মা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। সেকথা তুমি ভুলে গেলে? আজ তোমার যৌবনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাই আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছো।

টপ্ টপ্ করে চোখের জল ফেলে কাবেরী বলেছিল—তুমি রাগ করছো কেন গো? আমি তো তোমারই আছি—তোমারই থাকবো। যখন খুশি আসবে। তখন দেখবে কাবেরী ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু দোহাই তোমার—এই সংসারে আমাকে থাকতে বোলো না। স্বামী ও সন্তানের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই মোহ আমাকে ত্যাগ করতেই হবে।

তারপর সে একা। মাসেদশে জয় সেখানে গেলে তার মনে খুশির হাওয়া বয়। সরিতা ছুটিতে এলে কাবেরী কুটির আনন্দের হাসিতে ভরে যায়। চলে গেলেই মৌন গম্ভীর।

তখন সে বিষাদ প্রতিমা। নিশীথ রাতে বেহালার ছড়ে করুণ রাগিণী বাজে। আকাশ বাতাস কেমন এক আশ্চর্য মায়ায় আচ্ছন্ন হয়। ঘুম ভেঙে যায় টুসী ও মতি সিংয়ের।

ওরা পরস্পরকে বলে—দেখো—আমাদের মাল্‌কান্ জীবন ভর শুধু ভালবেসেই গেল। পেল না কিছুই।

ছাব্বিশ

মিসেস ব্যারাকলউয়ের একটা চিঠি এসেছে। সেটা পড়ে মিঃ ব্যারাকলউ বিমর্ষ ও বিরক্ত। সেই চিঠিতে উনি কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন,—

যেমন নওরঙ্গী নিয়ে এত মাতামাতি করছ কেন ? ওখানে এত টাকা ঢেলে কি হবে। যে পরিমাণ কয়লা রেজিং কর তার অর্ধেকও ডেসপ্যাচ হয় না। তাহলে রেজিং বাড়িয়ে লাভ কি ?

উনি তড়িঘড়ি জবাব লিখতে শুরু করে দিলেন।

ভারতে শিল্পবিপ্লবের চাকা ঘুরছে। বহু আয়রণ ওয়ার্কস, পটারী ও রিফ্র্যাক্টরীজ খুলছে। রেলের কাজ বাড়ছে। জাহাজ বাড়ছে। ইঁট দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। তাদেরকে একদিন এই কয়লা নিতেই হবে। তখন ডবল দামে বিক্রি হবে। কয়লা তো মজুত হচ্ছে। আমি তো আর হোম থেকে টাকা এনে নওরঙ্গীতে লগ্নী করছি না। এমন কি পানমোহরার টাকাও নয়। এখানকার টাকা এখানেই লাগাচ্ছি। এ নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিয়ো না।

চিঠিটা বেশ চড়া-সুরের হয়ে গেছে। সেজন্য উনি মনে মনে একটা আনন্দ বোধ করলেন। মিসেস এবার বুঝবেন যে তাঁকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। উনি এসব পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। যা শুরু করেছেন তা শেষ করবেন এটাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

ব্রজলালের বাসাটিকে ঘিরে কুলি-ধাওড়া গড়ে উঠছে। ও যখন এসেছিল তখন এক সারিতে আটটি করে মুখোমুখি দু' সারি কোয়ার্টার ছিল। ওর পাশের কোয়ার্টারে থাকত আবদুল গফুর ফিটার মিস্ত্রী। মাস খানেক পর মইদুল হোসেন সহিস পানমোহরা থেকে বদলি হয়ে এল। সাতঘরিয়া থেকে এল ইরশাদ মোল্লা মাইনিং সরদার।

চানক কাটাই, সিঁড়ি খাদ কাটাই, পাথর কাটাই ইত্যাদি কাজের জন্য একদল জোলা মুসলমানের বস্তি তার পাশেই বসে গেল। পূর্বদিকের ডাঙাতে বসল একটা মুণ্ডা পল্লী। ওরা সব রাঁচি, হাজারিবাগ থেকে কলমীসায়ের কাটবার জন্য এসেছিল। সে কাজ শেষ হবার পর খাদে মাল কাটার কাজে লেগে গেছে।

ওর আশপাশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকায় সেখানে কাওয়ালীর আসর বসে যেত রোজ সন্ধ্যায়। মইদুল হোসেন কাওয়াল, পাখোয়াজে সঙ্গত করত কালু জোলা। সে মালকাটা হয়ে এসেছিল, পরে টালোয়ান হয়। সম্প্রতি বয়লার ফায়ারম্যানের কাজ করছে।

টালোয়ান, বয়লার ফায়ারম্যান, হলেজ খালাসী, পাম্প খালাসী, ফিটার মিস্ত্রী, বিজলী মিস্ত্রীর কাজে তাদের এক স্বভাব-দক্ষতা ছিল। সেজন্য সাহেবরা খুব পছন্দ করতেন।

ওরা খুবই আনন্দেই থাকত। ওদের মেয়েরা খাদে কাজ করত না। তবে বস্তি আলো করে দু চারটি খুব সুরৎ আওরৎ থাকত। তারা সব চাকরী-

বালাদের বিবি। বাইরে বেরুলে বোরখা পরত। নাকাবে মুখ ঢাকত।

সেই নিয়ে মইদুল হোসেন কাওয়ালী গাইত—

দিল চাহতা হ্যায় লাগা দু' আগ তেরে নাকাব মে—

কালু ঠেকা দিত—ক্যায়া ?

মইদুল এক পাত্র মহুয়া টেনে দিল সাফ করে নিয়ে ধরত—

আয়ে তো হুসনোবালী
আঁখসে বিজলী গিরা
চাঁদনীকা রোশনী গিরা
মেরে দিল তড়প গিরা
আ-তো-গিরা—আ-তো-গিরা—
হুসনোবালী—

বহুত মজাদার মাইফেল! ব্রজলালের হামেশা সওগাত হত। সে ওদের দলে মিশে যেত। মেয়েরা সব নাকাব তুলে ওর রূপ দেখত। বাসমতির তাতে বড় আহ্লাদ। সে এখন ঘরণী, গৃহিণী, সন্তানের জননী। খুঁটে খুঁটে কত জিনিস যোগাড় করেছে তার ঘর সাজাতে।

ব্রজলাল তখন কলমীসায়ের তদারক করত। জেলেরা মাছ চাষ করত, মালিরা বাগান করত। সাহেব মেম-সাহেবেরা সুরা পান করে নৃত্যগীত করতেন ও সাঁতার কাটতেন। তার আবার তদারক কি হে ?

হুঁ হুঁ বাবা! ঐটাই তো আসল কাজ।

ইউরোপীয়ান ক্লাবে রমঝম করে বাদ্য বাজত। সাহেব মেম-সাহেবরা সেখানেই দু'পাত্র চড়িয়ে নৌকা করে ড্রিম আইল্যাণ্ডে আসতেন। চাঁদনী-রাতে জলের উপর জ্যোৎস্না ঝিক্‌মিক্‌ করত। ওরা সব ক'টি মাত্র কস্টিউম পরে টপাটপ লাফিয়ে পড়ে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় জোড়ায় জোড়ায় পুকুর তোলপাড় করে বেড়াতেন। কেউ কেউ ঐ ড্রেসেই পুকুর পার হয়ে শাল মহুয়ার বনে চলে যেতেন আদিম কামনার জোয়ারে।

শনি-রবিবারের দুপুর রাতে একটি দুটি করে এলিয়ে পড়া বডিগুলোকে নৌকায় লোড করে ক্লাবের গেস্টরুমে পৌছে দিতে হত।

কোন কোন মেমসাহেব আবেগ-ভরে ওকে চুমু খেয়ে বলতেন —হোয়াট এ চার্মিং বিউটি! আই লাভ ইউ বরজলাল!

তখন মাতোয়ালী মেমসাহেবকে তার হাজব্যাণ্ড অথবা বয় ফ্রেণ্ডের কাছে জিম্মা করে দিত। সঙ্গীছাড়া হিরোইনও কেউ কেউ থাকতেন। তাকে নিয়ে বড় হ্যাপা পোয়াতে হত বেচারী বরজলালকে!

সরিতা তখন এক স্বপ্নকুমারী। বয়স চলছে মধ্য টিন এজ। দেখতে ঠিক এলিজার মত। অন্তত ব্যারাকলউ সাহেব তাই মনে করেন। সেই পান-

মোহরায় সিসিল ও এলিজা সারারাত নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে মঞ্চের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। সূর্যের প্রথম রশ্মি পড়েছিল তাদের কোমল পেলব সরল সুন্দর মুখে। ব্যারাকলউ সাহেবের স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে আছে সেই আশ্চর্য সুন্দর ছবিটি।

এখন ওরা পরিণত বয়সের যুবতী। দুজনেরই বিয়ে-থা হয়েছে। দুজনেই সন্তানের জননী। সিসিলের দুটি ছেলে। এলিজার দুটি মেয়ে। কিন্তু ব্যারাকলউ সাহেব তাঁদের দুজনকেই যেন দেখতে পান সরিতার মধ্যে।

বছরে তিনবার স্কুলের বড় ছুটি। সরিতা সেই সময় তার মায়ের কাছে আসে। সে যেন কল্লোলিনী ঝর্ণাধারা। নাচে, গান করে। অজয়, বরাকর ও দামোদর নদের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অবলীলায় ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। পরনে শার্ট ফুলপ্যাণ্ট, ববছাঁট চুল, মাথায় টুপি। বাঁ হাতে লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠে যখন সে যায় তখন পথের পথিকরাও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে —এ কোন রূপকথার রূপকুমারী সেই বিস্ময় নিয়ে।

ব্যারাকলউ সাহেব তার পিতৃত্ব অস্বীকার করেও এক অন্তর্প্রাবী মমতায় তাকে দেখবার জন্য ছটু ফটু করেন। সরিতাও তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এ বুঝি রক্তের টান!

কাবেরী সদা সর্বদাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। যখন তার বয়সটা তেরো বছর পার হয়েছিল তখনই যে ভয়টা মনে ঢুকেছে ক্রমে ক্রমে তা বেড়েই যাচ্ছে।

সরিতার শিক্ষা সংস্কৃতি সবই পাশ্চাত্য ভাবধারায়। তার চালচলন কথা-বার্তা দেখে কে বলবে যে এর মা বাঙালী? বরং ও যদি কারো সঙ্গে বাংলায় কথা বলে তবে লোকে ভাবে —বাঃ মেমসাহেব তো সুন্দর বাংলা বলতে পারে।

মিঃ ব্যারাকলউ একদিন তাকে নওরঙ্গীর স্বপ্নদ্বীপে নিয়ে এলেন একটা পার্টিতে। সাদা ফ্রক পরা সেই অপূর্ব সুন্দরী তরুণীর দিকে তাকিয়ে ছোকরা সাহেবদের মাথা ঘুরে গেছে। ওর বাপের বয়সী সাহেবরা ওর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছেন। বিলিতি সুন্দরীদের বিউটি ফিউজ হয়ে গেছে।

সবারই চোখে মুখে জিজ্ঞাসা —এ সুন্দরী এতদিন কোথায় ছিল?

মিঃ ব্যারাকলউ পরিচয় করিয়ে দিলেন —মিস্ সরিতা সরকার। এ বিউটি কুইন। নাচে গানে আনপ্যারালাল। আজ ওর প্রোগ্রাম হবে।

—এন্‌কোর —এন্‌কোর! শতকণ্ঠে ধ্বনিত হল।

ছোকরারা সব ওকে ছেঁকে ধরল। ওর ঠোঁটের কাছে এক গ্লাস হুইস্কি তুলে দেবার জন্য সে কি ব্যাকুলতা। সরিতা তাদেরকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন —ওহ্ নো-নো! ওকে ডিসটার্ব করো না। প্রোগ্রাম শুরু হতে দাও।

অর্কেষ্ট্রা পার্টি আগে থেকেই তৈরি ছিল। তারা মিউজিক শুরু করল। রক্ত নাচানো স্বর। সরিতা মাতাল করা স্বরে গান ধরল। সেই সঙ্গে নাচ। কাবেরীর মেয়ে সে। মায়ের গুণ তো পেয়েইছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার শিক্ষা ও অনিন্দ্যসুন্দর যৌবন হিল্লোল।

এক একটা গান শেষ হয় আর অভিনন্দনের বাণ ডেকে যায়। সরিতা দারুণ উৎসাহ বোধ করে। সে নিজেকে উজাড় করে গান গেয়ে যায়।

রবার্ট টেলার সান অফ বব টেলার জেনারেল ম্যানেজার পানমোহরা কোল কোম্পানী লিমিটেড ইণ্ডিয়াতে এসেছিল কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে যেতে। চৌকশ ছোকরা। উঠতি শিল্পী। গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ভারি সুন্দর রোমাণ্টিক চেহারা। একজোড়া প্রেমঘন চোখ। নীল মণি। বড় বড় সোনালী চুল। দাড়িটা এই সবে তৈরি হচ্ছে। পরণে টাইট প্যাণ্ট ও নীল রঙের গেঞ্জী। টিন এজেড গার্লসরা তাকেই টারগেট করে বসে আছে।

ইউরোপীয়ান সোসাইটির সেই পরম রত্নটি হঠাৎ একটি গ্লাস নিয়ে টলটলে পায়ে এগিয়ে এল সরিতার দিকে। তাকে বাও করে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল —মিস্ সরকার। জাস্ট এ সিপ। আমি হাইলি ওবলাইজড হব।

সরিতা ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে গ্লাসটা ডান হাতে ধরে বলল — থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ—

—মিঃ টেলার। জুনিয়ার।

সরিতা একটু হেসে গ্লাসে চুমুক দিল। চারিদিক থেকে হাততালি পড়ল। টিন এজেড ইউরোপীয়ান গার্লসদের মুখ চুন হয়ে গেল।

দর্শকদের মধ্যে থেকে প্রস্তাব এল —ডুয়েট প্রোগ্রাম হোক।

মিঃ ব্যারাকলউ ও মিসেস কুপার একান্তে বসে মদ্য পান করছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে উনি স্বগতোক্তির মত বললেন —মাই সুইট চাইল্ড।

মিসেস কুপার বললেন—রিয়্যেলী ভেরি চার্মিং।

মিঃ ব্যারাকলউ উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। তা দেখে ব্রজলাল তার কাছে এসে হাজির হল। উনি ওর কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন —তুম ড্রিঙ্ক করেছো?

—না স্যার।

—অলরাইট। আজ তুমি ড্রিঙ্ক করবে না। সব সময়ে সরিতার দিকে নজর রাখবে! ওর কাছাকাছি থাকবে। ও ড্রিঙ্ক শুরু করেছে। অভ্যাস নেই। আউট হয়ে যেতে পারে। দেখবে ওকে যেন কেউ ঘায়েল করতে না পারে। এটা তোমার ডিউটি।

—ও. কে. স্যার।

—মাইণ্ড ইট —সি ইজ ভারজিন!

উনি চেয়ারে বসলেন।

রাত প্রায় দুটো আড়াইটা। সবাই ফ্ল্যাট। সরিতাও আউট। রবার্ট ওকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কিন্তু সে মাতাল। ব্রজ তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিতাকে নিল।

সরিতা নেশার ঝোঁকে বলল —তুমি কে?

—আমি তোমার দাদা।

সরিতা চিৎকার করে উঠল —আমার কোন দাদা নেই। তুমি শঠ। তুমি স্কাউন্ড্রেল। বলতে বলতে ওর গায়েই বমি করে দিল।

ব্রজ খুব কোমল স্বরে বলল – সিস্টার। তোমার খুব নেশা হয়ে গেছে। চল তোমাকে বাংলোতে পৌছে দিই।

সরিতা কেঁদে ফেলল —তুমি সত্যি আমার দাদা তো? তাহলে আমাকে বাঁচাও। আমি আর বাঁচবো না দাদা।

আবার বমি। ব্রজলাল বলল —এসব কেন খেলে সিস্টার?

—আর কখনো খাবো না দাদা। এইবারটি বাঁচাও। মাকে যেন বলে দিওনা। তাহলে আমাকে ঘৃণা করবে।

—না-না। কাউকে বলব না! চল।

ব্রজ ওকে বহুকষ্টে বহু যত্নে নওরঙ্গী হাউসে পৌছে দিল।

সাতাশ

টুসীর চোখে ঘুম নেই। ভীষণ উৎকণ্ঠায় বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। কাবেরী সরিতাকে একা ছাড়তে সাহস পায়নি। তাই ওকে সঙ্গে দিয়েছে। ব্রজর কাঁধে এলিয়ে পড়া সরিতাকে দেখে চমকে উঠল। যা ভয় করেছিল তাই হল। মেয়ে মাতাল হয়ে ফিরছে। আরো কি কাণ্ড করেছে কে জানে?

কড়া গলায় সরিতা বলে ডাকতেই ও মাসী বলে এক বিচিত্র ডাক ছেড়ে ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তবু টুসীর রাগ কমল না। টেনে বাথরুমে নিয়ে গেল। সাদা ঝলমলে ফ্রকটা বমিতে ধুলোতে মাখা-মাখি হয়ে নোংরা হয়ে গেছে। সেসব টান মেরে খুলে দিল। ইজার গারটার খুলে ওর সর্বাঙ্গ পাতি পাতি করে খুঁজল কোথাও কোন কামনার দাগ আছে কি না?

সরিতা মাতালের হাসি হেসে বলল—ওহ মাসী! তুমি কি খুঁজছো জানি। বিশ্বাস করো —আমি কোন খারাপ কাজ করিনি।

টুসী আশ্বস্ত হল কিন্তু মুখ তখনো গম্ভীর। ওকে একটা কোলের বাচ্চার

মত তুলে বাথটবে ডুবিয়ে দিয়ে বলল—মুখপুড়ি। মদ খেয়েছিস কেন? কেন? তোর মা শুনতে পেলে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে তা জানিস না?

সরিতার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠল। বুকের ভিতর কিরকম যেন টন্ টনে ব্যথা। টুসীর হাতে ধরে বলল—এইবারটি দোষ হয়ে গেছে মাসী। আর কখনো খাব না। তোমার দিব্যি রইল।

টুসী তখনো সন্তুষ্ট নয়। বলল—ব্রজ না থাকলে আজ তোর কি হত?

—কি হত মাসী?

—আঃ। ন্যাকা! বুঝিস না যেন। সাহেব খাল ভরাদের রীত তো জানিস না। তোর ঐ ফুলের মত শরীরটিকে ছিঁড়ে খেয়ে নিত। সারা জীবন কেঁদে কুল পেতিস নাই।

স্নানের একটা আনন্দ আছে। ঘাম নোংরা সাবান জলে ধুয়ে যাবার পর কেমন ঝর ঝরে হয়ে গেল। নেশার আমেজটা আছে মাদকতা নেই। বরং লজ্জা বোধ করছে?

—থাক। তোকে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

হাত ধরে টেনে তুলল। ওর ভীষণ লজ্জা করছে। কিন্তু সে টুসীর কাছে রেহাই পাবে কি করে? অকৃত্রিম স্নেহের শাসন কি ঠেলে দেবার?

তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে হাল্কা নীল রঙের একটি পাজামা ও খালি গায়ের উপরে জামা পরিয়ে বাথরুম থেকে বের করল। যত্ন করে চুল আঁচড়ে দিল। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল—খাবার দাবার তো সব বমি হয়ে উঠে গেছে। আর কিছু খাবি?

হঠাৎ সরিতা ওর গলা জড়িয়ে বলল—মাসী! তুমি খুব ভালো!

টুসীর চোখে কৌতুক। সরিতা বলল—মাসী! মাকে একথা বলবে না তো?

টুসীর মুখে হাসি ফুটল। বলল—এই বারটি না হয় বলব না। কিন্তু ফের যদি খাস তাহলে?

—বলছি তো আর খাবো না। পালঙ্কে বসে পা আছড়ালো।

—বেশ। শুয়ে পড়।

সরিতা শুয়ে পড়ল। ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে টুসী বলল—তোর জন্যে তোর মায়ের কত ভাবনা। হেই মা—তোকে আমার দিব্যি রইল সাহেবদের সঙ্গে সব সময়ে একটা দূরত্ব রেখে চলবি।

সরিতার চোখ জুড়ে গিয়েছিল। জড়িত কণ্ঠে বলল—তাই হবে মাসী।

জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল ঘরের মেঝেতে। চোখের সামনে সেই রোদটা কেমন ঝিল মিল করছিল। সরিতা আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল। মাথাটা তখনো ঝিম্ ঝিম্ করছে। কপালের রগ দুটো টিপ টিপ

করছে। কেমন হাল্কা বোধ হচ্ছে। ও তো জানে না খোয়ারী কাকে বলে।

স্কুলের হোস্টেলে মাদার ও সিস্টারদের কড়া শাসনে থাকত। বাড়িতে এসে মায়ের পাল্লায় পড়ত। টুসীর কাছে কুমারীত্বের পরীক্ষা দিতে হত। এই বছর কলেজে ভর্তি হবে, তখন যদি কিছু স্বাধীনতা পায়।

ওকে নওরঙ্গী হাউসে নিয়ে আসবার জন্য ব্যারাকল্‌উ সাহেব নিজে গিয়েছিলেন কাবেরী কুটিরে। সাহেবের কথা না বলতে পারে নি ওর মা। তাই পাঠিয়েছে। অবশ্য উনিও কথা দিয়ে এসেছেন তোমার মেয়ের কোন ক্ষতি হতে দেব না। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

ক্ষুণ্ণ মনেই কাবেরী বলেছিল —বেশ। তোমার উপরে ভরসা করেই জীবন কাটল। এখন অবিশ্বাস করব কি করে ? কিন্তু সাহেব তুমি তো জানো আমার কি দুঃখ ?

সাহেব বলেছিলেন —কাবেরী। কতদিন ওকে আঁচল চাপা দিয়ে রাখবে ? ওকে বাইরে আসতে দাও। ক্লাবে, পার্টিতে যেতে দাও। সাহেব সুবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে দাও। মনে কোর না তোমাদের হিন্দু সোস্যাইটি কোনদিন ওকে গৃহবধূ করে নেবে। ওর ভাগ্য ওকে নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে।

—সব বুঝি সাহেব। তবু তো আমি বাঙালী। হিন্দু।

টাইট ফুলপ্যাণ্ট ও গেঞ্জী পরে সরিতা যখন ব্রেকফাস্টের জন্য ডাইনিং হলে এল তখন বেশ কয়েকজন সাহেব ও মেমসাহেব সেখানে ছিলেন। জন কয়েক টিন এজেড গার্লসও ছিল। রবার্ট এসে ওর পাশেই বসল।

সরিতা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। রবার্ট বলল —গুডমর্নিং মিস্! কাল তোমার চমৎকার প্রোগ্রাম হয়েছে।

এই কথায় অনেকেই সায় দিলেন। সরিতা বলল —আপনারা খুশী হয়েছেন ?

—সিওর।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন —ওর মাদার হাইলি কন্‌জারভেটিভ উওম্যান। কিছুতেই আসতে দিতে চায় না। আমি জোর করে নিয়ে এসেছি। আফটার অল ইণ্ডিয়ান উওম্যান তো! ওদের সেন্স অফ চ্যাসটিটা খুব প্রবল।

—তা ঠিক। কেউ কেউ ঘাড় নাড়লেন।

রবার্ট সরিতাকে জিজ্ঞাসা করল —তুমি ইণ্ডিয়ান ?

—হ্যাঁ

—মাইগড! আমি ভেবেছিলাম ইউরোপীয়ান।

—কেন সাহেব ? আগে জানলে কি আমার সঙ্গে কথা বলতে না ?

—নো-নো। তা নয়। এটা একটা কৌতুহল।

ব্রেকফাস্টের আয়োজন বিরাট। রাত্রের খোঁয়াড়ি কেটে যাবার পর সবারই পেটে ক্ষিদে চন্ চন্ করছে। রুটি, মাখন, ফল, দুধ, ডিম সিদ্ধ সেঁটে মেরে দিলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর রবার্ট বলল—এরপর তোমার কি প্রোগ্রাম মিস্?

সরিতা হেসে বলল —কি আবার? বাগানে ঘুরে বেড়াবো

—নাইস আইডিয়া! চল-না, বাগানে গিয়ে তোমার একটা ছবি আঁকি। সরিতা ডাগর চোখে ওর দিকে তাকাল। বলল —তুমি ছবি আঁকতে জানো?

—এক-আধটু।

রবার্টের ছবি আঁকার হাতটি ভাল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সরিতার একটা দারুণ স্কেচ এঁকে ফেলল। সরিতা অবাক। ছবিতে যে তাকে এত সুন্দর দেখায় —এই ধারণাটাই তার ছিল না।

কেমন বিগলিত কণ্ঠে বলল —ওহ্ লাভলি!

রবার্ট বলল —দাঁড়াও! এখনো তো ফিনিশিং টাচ দিইনি। এটাকে রঙ করে তোমাকে দেখাবো।

তারপর রবার্ট সারা দুপুর ঐ ছবিটা নিয়েই ডুবে রইল। কত যত্ন করে রঙ করল। তখন সেটা বাস্তবিকই চোখ ধাঁদানো ছবি। সরিতা ভাবতেই পারেনি ছবিটা এত সুন্দর হবে। অভিভূত হয়ে বলল —তুমি একটি আশ্চর্য শিল্পী!

রবার্টের চোখদুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সরিতা বলল —ছবিটা আমাকে দেবে ত?

—নো—নো। এটা আমার কাছে থাকবে।

—আমার ছবি তুমি কেন রাখবে?

রবার্ট ছবিটার উপর আলতো চুমু খেয়ে বলল —দিস ইজ মাই হার্ট। বুকে চেপে ধরল।

সরিতা কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়ল। এ সাহেব বাচ্চাটা করে কী? তার ছবির উপরে চুমু খায় তারই সামনে। মাথায় ছিট নেই তো?

বলল —একি করছো সাহেব?

রবার্ট পাল্টা প্রশ্ন রাখল —কেন? আমি কি কিছু খারাপ কাজ করেছি?

—যা করেছো তা নিয়ে আর কচকচি কেন? আমার ছবিটা আমাকেই দাও।

—আমি অনেক যত্ন, অনেক মেহনত্ করে এঁকেছি।

—কেন সাহেব? চুমু খাবার জন্য? তোমার পিছনে তো অনেক মেয়ে ঘুর ঘুর করে। তাদেরই কারো ছবি এঁকে চুমু খেতে পারো। আমি মডেল গার্ল নই।

—তুমি রাগ করছো ?

—না। রাগ করিনি। আমার ছবিতে তুমি কামনার দাগ বসাচ্ছো সেজন্য দুঃখবোধ করছি।

রবার্ট কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল —আমাকে ক্ষমা কর মিস্ সরকার। ছবিটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

সরিতা ছবিটা হাতে নিয়ে বলল —ধন্যবাদ সাহেব।

ও চলে গেল। রবার্ট সেদিকে একটু তাকিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

কিছুটা রাগ কিছুটা অভিমান নিয়ে ও ছবিটা নিয়ে এল বটে কিন্তু মনের ভিতর যা ঘটবার তা ঘটে গেল। নিজের ঘরে দরজা লাগিয়ে আলোর সামনে ছবিটা ধরল। তারপর নিজেরই অজান্তে তার উপরে ঠোঁট চেপে ধরল। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। রবার্ট এর উপরে চুমু খেয়েছে। সেই স্পর্শ যেন এখনো লেগে আছে।

আচ্ছা! রবার্ট যদি ওর ছবির বদলে ওকেই চুমু খেত তাহলে ?

ওহ্ মাই গড!

কি সুন্দর রোমান্স!

ওর ভিতরটা আনন্দে কুল কুল করছে। রবার্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য দুর্বার আকর্ষণ বোধ করছে। ওকে ভুলবে কী করে ?

ছবিটা মুড়ে যত্ন করে ওর স্যুটকেশে রেখে দিল। সাজ পোশাক বদল করে শাড়ি পরল। টুসী কোথাও গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে বলল—শাড়ি পরেছিস ? কোথাও যাবি ?

—হ্যাঁ মাসী।

—আজ তো যাওয়া হল না। তোর মা কত ভাববে।

—একটু ভাবুক না। রোজ রোজ কি আসতে পাবো ? নাকি কলমী-সায়েরের ড্রীম আইল্যাণ্ডে হাওয়া খেতে পাবো ?

—দোহাই মা লক্ষ্মী! আজ যেন কিছু খেয়ে এসো না।

—না মাসী। আর খাবো না।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। কলমী সায়েরের ঘাটে নৌকা নিয়ে ব্রজলাল দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই বলল —গুড ইভনিং সিস্টার। ওখানে যাবে ?

—হ্যাঁ যাব।

—এস। নৌকায় উঠে পড়।

ওকে নৌকায় তুলে লগি ঠেলে দিল। সরিতা মাঝ বরাবর এসে দেখল রবার্ট একটা ঘোড়ায় চড়ে বনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর মুখটা ম্লান

হয়ে গেল। ভেবেছিল রবার্ট আসবে। কিন্তু ওর ঘোড়ার চাল দেখে তো তা মনে হয় না। তাহলে কার জন্য স্বপ্নদ্বীপ ?

সন্ধ্যা নামল। পশ্চিম আকাশের লালিমা জলের বুকেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখল। নানারকমের ফুলগাছ দেখল। গন্ধ শুঁকল। এক গোছা ফুল তুলল। তারপর ব্রজকে বলল —চল। আমাকে পার করে দাও।

নৌকায় যেতে যেতে বলল —আচ্ছা। কাল আমার খুব নেশা হয়েছিল, তাই না ?

—হ্যাঁ সিস্টার।

—আচ্ছা! আমি তোমার সিস্টার হলাম কি করে ?

— একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে।

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ। তারপর নিজের হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে বলল — দ্যাখো— তোমার আর আমার গায়ের রং প্রায় একরকম। রক্তটাও বোধহয় তাই।

—সো হোয়াট ?

—আমরা একই পিতার সন্তান।

আটাশ

রবার্টের জন্য ওর মনে বেশ কিছু উদ্বেগ ও সংশয় সঞ্চিত হয়ে উঠল। দু'তিনবার খবর নিল ও ফিরেছে কি না ? সব বারেই না উত্তর।

রাত্রি সাড়ে নটার ডিনার। মিঃ ব্যারাকলউ ওকে নিজের পাশে বসিয়ে ডিনার শুরু করলেন। তাতে ও খুব খুশি।

উনিই জিজ্ঞাসা করলেন —রবার্টকে দেখছি না ? ও কোথায় গেল ?

সরিতা বলল —ওতো ঘোড়ায় চড়ে বনের দিকে বেড়াতে গেছে।

—আই সী! আর্টিস্ট ছোকরা তো। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা ভাল লেগেছে। তারপরে কিছু গালগল্প। ডিনার শেষ হল।

বিছানায় শুয়েও সরিতার ঘুম আসছিল না। কেন যেন মনে হচ্ছিল রবার্টের সঙ্গে ও ভাল ব্যবহার করেনি। ওর এত সাধের আঁকা ছবিটা এভাবে নেওয়া উচিত হয়নি। সেজন্য ও দুঃখ পেয়েছে। তাই বুঝি বনে জঙ্গলে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। যাক্‌গে — কাল ওকে ছবিটা দিয়ে দেবে।

এই সিদ্ধান্তে পৌছে যাবার পর দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল। সকালে ঝর ঝরে মন নিয়ে ঘুমিয়ে উঠল।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে রবার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ও একটু নড করে বলল— গুড মর্নিং মিস্ সরকার।

—গুড মর্নিং! দুষ্টু কোথাকার। কাল সন্ধ্যায় কোথায় ছিলে?

—ওহ্! দ্যাটস এ ফাইন অ্যাডভেন্চার। ঘুরতে ঘুরতে একটা সাঁওতাল পল্লীতে পৌঁছে গেলাম। ওয়ান ট্রাইবেল উওম্যান—তার নাম মঙ্গলি। খয়ের কানালীর লেবার সর্দারনি। ওর মাদার পানমোহরার সর্দারনি। আমাকে খুব খাতির করেছিল। ট্রাইবেল ড্যান্স দেখলাম।

সরিতা হাসতে হাসতে বলল—মহুয়া খেতে দেয়নি?

—অফকোর্স! ফাইন মহুয়া। থ্রি আওয়ার্স চার্মড হয়েছিলাম। আমি ওদের নাচের ছবি আঁকবো।

—তুমি খুব দুষ্টু। সন্ধ্যাবেলাটা আমার কত কষ্টে কাটল। আর তুমি একাই আনন্দ করে এলে। আমার বুঝি ট্রাইবেল ড্যান্স দেখতে ইচ্ছে হয় না?

—আরে তুমি নিজেই তো সুপার্ব ড্যান্সার। তোমার সঙ্গে কি ওদের তুলনা হয়?

—সে হোক। আজ আমাকে নিয়ে চল! ওদের নাচ দেখতে যাব।

—তুমি যাবে? রবার্ট যেন আশ্চর্য হয়ে গেল।

—সিওর।

—অলরাইট। আমি প্রোগ্রাম করছি।

—কিন্তু দোহাই তোমার। ডিনারের আগে ফিরতে হবে। আর মহুয়া চলবে না।

—আচ্ছা! আচ্ছা!

যাক্ ওদের ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। সাহেবরা সব ব্রেকফাস্ট সেরে কাজে বেরিয়ে গেলেন। রবার্ট ও সরিতা বাংলোতে রয়ে গেল। দু'জনের ভাব জমে গেছে। কাজেই বাগানে বেড়াতে দোষ কি?

মালতীলতার দোলনায় বসে সরিতা বলল—রবার্ট! তোমার আঁকা সেই ছবিটা আমি নিয়ে নিলাম বলে রাগ করনি ত?

—যদি না বলি তবে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।

—আমি তা বুঝেছি। ছবিটা তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।

—সত্যি? রবার্টের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল!

—সত্যি। কিন্তু বিনিময়ে তোমার একটা ছবি আমাকে দিতে হবে।

—মাই গড! আমার ছবি নিয়ে তুমি কি করবে?

—তুমি আমার ছবি নিয়ে যা করবে আমিও তাই করব।

—হা-হা-হা—রবার্ট খুব হাসল। বলল—তুমি এক আশ্চর্য বিউটি! তোমার ছবি আমি হোমে নিয়ে যাব। আমার বন্ধুদের দেখাব।

তোমার দেশে বিউটিফুল মেয়ে নেই নাকি যে আমার ছবির প্রদর্শনী করবে?

—আছে। তবে তোমার মত একটাও দেখিনি।

সরিতা খিল্‌খিল্ করে হাসল। বলল —ওহ্ সাহেব! তুমি আমার রূপের মোহে পড়লে নাকি? এ ত ভালো লক্ষণ নয়। মনে রেখো —আমি কুমারী। আমাদের হিন্দু-ধর্মে কৌমার্য এক অতি পবিত্র ব্রত।

—আই পে ফুল রিগার্ড টু ইয়োর ভারজিনিটি। রবার্ট নাটকীয়ভাবে বাউ করল। সরিতা আরো হেসে উঠল।

হাসি আনন্দে ফুস করে সময় কেটে গেল। বিকেলবেলায় দু'জনে দুটি ঘোড়ায় চড়ে সাঁওতাল নাচ দেখতে ওদের পল্লীতে গেল। মঙ্গলি খুব খুশী। দুটি মাচুলি দিল ওদের বসতে। ক্রমে সন্ধ্যা নামল। মহুয়া গাছের ডালে লম্ফবাতি ঝুলিয়ে নাচ শুরু করে দিল। সারিবদ্ধ যুথনৃত্যের সঙ্গে টানাটানা সুরের গান—

আগু-পিছু ভাবিস না মনের দুয়ার বাঁধিস না।
ডুব দে মহুয়া নেশায় ডুব দে ভালবাসায়
আকাশ এসে ধরা দিবেক হাতের মুঠোতে।
চাঁদের দেশে ভেসে যাবি ভালবাসাতে।

সেড! সেড়!! সেড়! সেড়!!

বাজনদাররা কসে তেহাই ঠুকল।

সরিতা খিল্‌খিল্ শব্দে হাসল। ওর মনে হল —ওরা ওদেরকে পথ দেখিয়ে ভালোবাসার জগতে নিয়ে যাচ্ছে।

রবার্টের হোমে ফিরবার ডাক এসেছে। কারণ আসন্ন যুদ্ধের ভয়ে ভীত মিঃ বব টেলার তাঁর ছেলেকে ইণ্ডিয়াতে আটকে রাখতে চান না। তাছাড়া দেউলটি খাদে মিথেন গ্যাস বেরুনোর জন্য মিঃ ব্যারাকলউ ডিবরী বাতির পরিবর্তে ডেভিস ফ্লেম সেফটি ল্যাম্প ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মিঃ. ক্রিগ বিলেত যাচ্ছেন সেই বাতি আনতে। রবার্ট ওর সঙ্গে চলে যাক।

ওদিকে টুসীর ক্রমাগত তাগাদায় সরিতাকেও কাবেরী কুটিরে ফিরবার তাড়া পড়েছে। অথচ গত কয়েকদিনে ওরা পরস্পরের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ফেলছে। এখন ছাড়তে বড় কষ্ট।

রবার্ট বলল —ডিয়ার সরিতা। হোমে ফিরে গিয়ে আমি মাইনিং পড়ব, ফার্স্ট ক্লাশ পাশ করে ইণ্ডিয়াতে আসার পথ তুমি খোলা রাখবে।

—কিভাবে রবার্ট?

—আমরা যদি শপথ করি পরস্পরকে সৎভাবে ভালবাসবো তাহলে সেই ভালবাসার টানে আবার সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে ফিরবো।

—রবার্ট। তুমি ইউরোপীয়ান। তোমার ধর্ম আলাদা—জগৎ আলাদা। তোমরা শাসক। আমরা শাসিত। এতবড় প্রভেদ থাকতেও ভালবাসবো

বলে কথা দিয়ে তা রাখতে পারবে ?

—নিশ্চয় পারবো।

—আই অ্যাডমায়ার ইউ। কিন্তু তুমি কি আমার আইডেনটিটি জানো ?

—না। তা জানি না।

—আমার মা ছিলেন জমিদারের নাচমহলে ড্যান্সগার্ল। সেখান থেকে পালিয়ে মিঃ ব্যারাকলউয়ের আশ্রয়ে আসেন। তিনিই আমার জন্মদাতা। পরে তিনি ফিল করেন আমার একটা লিগ্যাল ফাদারের দরকার। তখন জয়গোপাল সরকারের সঙ্গে মায়ের বিয়ে দেন। ওঁরা এখনো স্বামী স্ত্রী এবং সেই কারণে আমি মিস সরকার। এই গ্লানির ইতিহাস শোনার পরেও তুমি আমাকে ভালবাসবে ?

রবার্ট আহত হল। কিন্তু অবিলম্বেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল আই ডোণ্ট কেয়ার। আমার ভালবাসা তোমার সঙ্গে। তুমি তো ভারজিন ?

—সিওর। হানড্রেড পারসেণ্ট।

—আমার ভালবাসার অনারে তোমার ভারজিনিটি বহাল থাকবে ?

—সিওর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

—হোয়াট মোর ? আই লাভ ইউ।

ওর হাতটা তুলে ধরে চুম্বন করল। আশ্চর্য তড়িৎ শিহরণে সরিতা কেঁপে উঠল। পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তখন তাদের সারা অঙ্গ জুড়ে অনাস্বাদিত সুখ ও যন্ত্রণার ব্যাকুল আর্তি।

শুরু হল বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ।

হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে কয়লার বাজার। পানমোহরা, সাতঘরিয়া ও দেউলটির ডিপো সাফ। ওখানে ত্রিশ শতাংশ উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। যে নওরঙ্গীর কয়লা বিক্রী হত না বলে মিসেস ব্যারাকলউ লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন তার ধুলোও পড়ে থাকে না। দিনে চল্লিশ ওয়াগন যাচ্ছে। আরো বিশ ওয়াগন যাবে। চালতা, চয়নপুর, নওরঙ্গী, নূতনহাট ও খয়ের কানালীর পুরনো স্টক শেষ। নূতন করে রেজিং বাড়ানোর কাজ হচ্ছে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। যেন মিঃ ব্যারাকলউদের ফয়দা লুটবার জন্তই যুদ্ধটা শুরু হয়েছে। দ্বিগুণ বেড়ে গেছে তাঁর কর্মের উদ্যম।

কয়লা কুঠির মালিক থেকে ম্যানেজার পর্যন্ত সব সাহেবেরই পোয়া বারো। আনন্দে উল্লাসে তাথৈ তাথৈ নাচছে। পাগল করা দিনরাত্রি। ক্রেজী ম্যান, ক্রেজী উওম্যান, ক্রেজী সেক্স, ক্রেজ ফর মানি। থাকে থাকে নোট জমা হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেনের লয়েড ব্যাঙ্কে।

এই সময়ে এলেন সিসিল মেমসাহেব। যুদ্ধের কারণে তাঁর স্বামী মিঃ. অসবোর্ণ মেজর জেনারেল হয়েছেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন। স্ত্রী সম্ভাষণের সময় নেই।

সিসিল কমার্সের ছাত্রী। চৌকশ একাউণ্টেণ্ট। এতদিন স্বামী, সন্তান ও মায়ের কোম্পানীর একাউণ্টস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এখন কিছুদিন বাইরে আসার মত অবস্থা হয়েছে।

তাছাড়া মিঃ. ব্যারাকলউ অনেকদিন থেকেই তাঁকে চাইছিলেন তাঁর কোম্পানীতে একটা আঁটো সাঁটো একাউণ্টসের বাঁধন তৈরী করতে। তাই চীফ একাউণ্টেণ্ট করে নিয়ে এলেন।

নওরঙ্গী হাউসে বিরাট ডিনার পার্টির আয়োজন করলেন তাঁর কোম্পানীর অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। কলমীশায়েরের স্বপ্নদ্বীপ উজ্জ্বল আলোর ঝর্ণায় বিবাহ মণ্ডপ বনে গেল। সাহেব মেমসাহেবরা প্রচুর মদ্যপান করে পানসি ভাসিয়ে দিলেন। ব্রজলালের হ্যাঁপা বাড়ল। সিসিল অভিভূত হলেন। মিঃ ব্যারাকলউ মিসেস কুপারের কোমর ধরে নাচলেন।

উনত্রিশ

মিঃ. বব টেলার পানমোহরায় ফিরে এসে জয়গোপালকে ডেকে পাঠালেন। জয়ের সঙ্গে ওঁর একটা গোপন আঁতাত ছিল। ওর মারফৎ বেশ কিছু বড় বড় লেনদেন হয়ে গেছে। এখন যদি থরো চেকিং হয় তাহলে বেরিয়ে পড়তে পারে। ব্যারাকলউ সাহেব যে ভিতরে ভিতরে তার মেয়েকে চীফ-একাউনটেণ্ট করে নিয়ে আসবেন এটা আগে কেউ জানতে পারেননি। এখন তা দেখে ওদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে।

সে খবর শুনে জয় আঁৎকে উঠল।

ডুটো কোল কোম্পানীর বড় বড় ঠিকাগুলি তার। বিশেষ করে চানক কাটাই, সিঁড়ি কাটাই, সিভিল ওয়ার্ক ও খাদের নানা কাজকর্ম। তাছাড়া টালোয়ানি, সর্দারি, গোমস্তাগিরি ইত্যাদি কাজ তো আছেই। মুনশী ও বাবু-দিকে কাজের ভার দেওয়া আছে। কাজ চলে তার ইঙ্গিতে। বিলবাবু, হাজরি-বাবু, খাজাঞ্চীবাবু, গুদামবাবু, কম্পাসবাবু, লোডিংবাবু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বাবুকে খুশী রাখতেই হয়। সাহেবদের কথা ত আলাদা। তাঁরা যখন যা ফরমাস করেন তাই তাকে যোগাতে হয়।

যদিও তার যাবতীয় উন্নতির ভিত তৈরি করে দিয়েছেন মিঃ. ব্যারাকলউ তবু সে অন্য কাউকেই চটাতে চায় না। যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট তাকে তাই দিয়ে পুজো করে। তাই সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঠিকাদার। না হলে অন্যান্য

সাহেবরা যদি তার উপরে চটে থাকেন তবে ব্যারাকলউ সাহেব আর কতদিন পুষে রাখবেন।

কিন্তু এই করতে গিয়ে তাকে হিসেবের বাইরেও অনেক কিছু করতে হয়। সেজন্যই সিসিলকে এত ভয়। ওর নাম শুনেই হৃৎকম্প হচ্ছে।

সিসিল এসে সব কলিয়ারীর প্ল্যান্টস, মেসিনারী, স্টোরস, কয়লার স্টক ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা ও তালিকা প্রস্তুতের কাজ শুরু করেছেন। এটা একবার হয়ে গেলে এক মুরগা ছু'বার জবাই অথবা ঐ কাটিং চোরা ফিলিং ডোবার ফাঁদ একেবারে ফর্দাফাঁক হয়ে যাবে।

ম্যান পাওয়ার ও ওয়েজেস নিয়ে হাজরি খাতার সঙ্গে মিল করা হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে। হাজরিও চেক্ হচ্ছে কাউকে কিছু না জানিয়ে।

ক্যাশখাতা ও ক্যাশের চাবি তাঁর হাতে। শুধু ক্যাশিয়ারদিকে কাজ চালানোর মত টাকা রাখতে দেওয়া হয়। ওঁর বিনা অনুমতিতে যা খুশী পেমেণ্ট করা চলে না।

অর্থাৎ সবদিকে একটা নিয়ন্ত্রণের বেড়া-জাল তৈরি করে ফেলেছেন। তাতেই সব ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। তাছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে তদন্ত ত আছেই। ওঁর কোথাও খট্‌কা লাগলেই তদন্ত করে ফেলেন।

তেমনি একটা তদন্তের সূত্রেই ব্রজলালের সঙ্গে সিসিলের আলাপ। একটা ভাউচারে ওর নামে পাঁচশো টাকা পেমেণ্ট দেওয়া ছিল ছুটো লেবার ধাওড়া তৈরি করা বাবদ।

সিসিলের খটকা লাগল – ছুটো ধাওড়া তৈরির জন্য পাঁচশো টাকা কি করে খরচ হবে ?

সিসিলের চেম্বারে ওর ডাক পড়ল। ও এমনিতে বেশ স্মার্ট। শরীরটা যেন ঈষৎ হলদে সাদা রঙের মেটামরফিক পাথরে খোদাই করে তৈরি। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। গোঁফ দাড়ি কেয়ারী করে কাটা। পরণে টাইট গেঞ্জী ও কালো রঙের হাফপ্যাণ্ট। পায়ে বুটজুতো।

অফিসে ঢুকে মাথার টুপি খুলে গুডমর্নিং ম্যাডাম বলে বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়াল। সিসিল ওর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল।

এমন দারুন রূপবান ছোকরা এখানে কি করে এল ? চোখে পলক পড়ে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। ব্রজলালের খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বলল —আমি ব্রজলাল ডশ। আমাকে ডেকেছিলেন ?

—ইয়েস। বোস। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

ব্রজ সাহেব মেমসাহেবদের সামনে চেয়ারে বসতে বড় সঙ্কোচ বোধ করে। বলল —থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আমি ঠিক আছি।

উনি বললেন —তুমি কি কাজ কর ?

—সাহেব যা বলেন। আমি তাঁর ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট।

—বুঝতে পারছি। মাস তিনেক আগে ছুটো ধাওড়া তৈরির জন্য পাঁচশো টাকা বিল করেছো?

ব্রজ আকাশ থেকে পড়ল। পাঁচশো টাকার কোন বিল করার কথা তো তার জানা নেই। বলল—না ম্যাডাম।

—এই তো ভাউচার। তুমি উল্টোপিঠে নাম সই করে টাকা নিয়েছো।

—মাইগড! তা কি করে হয়? ও খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

সিসিল ওর মনের ভাষাটি তখনি পড়ে নিলেন। এ যে সারল্যের প্রতিমূর্তি। কলমের ডগায় চুরির কৌশল তার জানার কথা নয়। অতঃপর তদন্ত এগিয়ে চলল, ওকে সঙ্গে নিয়ে ধাওড়া পরিদর্শন করলেন এবং এমন ধাওড়া তৈরি করতে পঞ্চাশ টাকার বেশী খরচ হয় না সেকথা ব্রজ নিজ মুখে স্বীকার করল।

ডাক পড়ল মহীতোষ বাবুর। কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। পুরনো জমিদার গোষ্ঠীকে নিলামে তুলে দিয়ে সাহেবের ঘরে সিঁদ কাটছিলেন। পঞ্চাশ টাকা পাঁচশো টাকা হল কি করে সে প্রশ্নের জবাব দিতে তার কালঘাম ছুটে গেল।

একটা পাশ করা ভাউচারের অঙ্কের ডাইনে শূন্য বসালে দশ টাকা হয় একশ টাকা, একশো টাকা হয় হাজার টাকা। ক্যাশ খাতায় সেইভাবে এন্ট্রি করে দিলেই হয়।

অতঃপর সিসিল নিয়ম করে দিলেন—প্রতিটি বিলে, ভাউচারে অঙ্কের পাশে তা কথায় লিখতে হবে।

এখানেই শেষ নয়। একদিন প্রভাতে তিনি যখন সিল্কের জামার পকেটে ধুতির কোঁচাটি পুরে জর্দা পান চিবুতে চিবুতে অফিস এলেন তখন সেখানে মজুত মিঃ. ক্রীগ ও সিসিল মেমসাহেব।

ওর হাত থেকে ক্যাশের চাবি নিয়ে টাকা গোনা হল, ক্যাশ খাতা আপ্ টু ডেট হল, তারপর ওর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটি চিঠি—ইয়োর সারভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার...

ওর সর্ব অঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। পায়ে পা লাগল। খবর রটে গেল খাজাঞ্চীবাবু বরখাস্ত হয়ে গেছেন।

মেমসাহেবের পেটে কত বিদ্যে আছে যে মহীতোষ বাবুর মত ধুরন্ধর খাজাঞ্চীর চুরি ধরে ফেললেন। এক দৃষ্টান্তেই সবাই ঠাণ্ডা। সিসিল হয়ে উঠল একটা ত্রাস।

জয়গোপাল ভেবে পায় না তার এত সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রাখবে? মেমসাহেব যদি হিসেব খোঁজেন তার কি জবাব দেবে?

ও-হো-হো! মুখে ভাত রুচে না হে! মুখ শুকিয়ে আমসি। জয়ন্তীর যৌবন বিস্বাদ। ছেলেদের কলকাকলি বিরক্তিকর। অনেক ভেবে চিন্তে কাবেরীর কাছে গেল সাহেবের কাছে তদবির সুপারিশ করতে।

সিসিলের ডাক পেয়ে ব্রজ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর চেম্বারে গুড মর্নিং করে দাঁড়াল। উনি ওকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে দিয়ে বললেন —বরজোও! তুমি আমার কাছে সহজ হও। আমি তোমাকে শাসন করতে ডাকিনি।

ব্রজ বলল —আপনি বিশ্বাস করেছেন ত ম্যাডাম —আমি চুরি করিনি।

সিসিল চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখলেন। বললেন— বরজোও!

আমি সেইদিনই তোমার কথা হান্‌ড্রেড পারসেণ্ট বিশ্বাস করেছি। দোষীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও। সহজ হও।

ব্রজ আবেগে বিচলিত হয়ে সিসিল যে হাতটা ওর ঘাড়ে রেখেছিলেন সেটা জড়িয়ে ধরে বলল —আপনি খুব দয়ালু। ন্যায় বিচারক।

সিসিল হাত ছাড়িয়ে নিলেন না। বললেন —এবার খুশী হয়েছো ত?

—হ্যাঁ। ব্রজর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল সিসিলের হাতে।

—ওহ্! ইয়ংম্যান! কাঁদছো কেন? বোস। কথা আছে।'

আবার উনি বসলেন। কৌতুক জড়িত স্বরে বললেন —এবার আশাকরি বাসায় ফিরে তোমার ওয়াইফকে ডবল কিস্ দেবে।

ব্রজ লজ্জা পেল। মাথাটা নীচু করল। সাহেব মেমসাহেবরা যত সহজে এসব কথা বলতে পারেন ও তত সহজে তা হজম করতে পারে না। কারণ দশটা মাস তাকে ভারতীয় রমণীর পেটে থাকতে হয়েছিল। সেজন্য যত সঙ্কোচ।

সিসিল বললেন—শোন তোমাকে যে জন্য ডেকেছি। কাল সকালে আমি পানমোহরায় যাবো। দিনকয়েক থাকতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। তোমার ওয়াইফকে বলে যেও যে ফিরতে দেরি হতে পারে!

—ও. কে. ম্যাডাম। কিন্তু সাহেবের পারমিশন?

—সে আমি বলে দেবো। সাহেবের জন্য তোমার ভাবনা নেই।

—থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।

—যাও। রেডি হওগে। ওখানে তোমাকে ভাল শ্যাম্পেন খাওয়াবো।

বাকিংহাম কর্ডের দুটি ফুলপ্যাণ্ট ও একজোড়া ফুলশার্ট ছিল ওর। কোন সাহেবের দেওয়া একটা নেকটাইও ছিল। সেগুলোকে কেচেকুচে কড়া

মাণ্ডা দিয়ে ইস্তিরি করল ও। জুতোতে পালিশ দিল। চুলে সাবান দিল। টুপিটা সাফ করল।

ওর প্রস্তুতি দেখে বাসমতি হেসেই অস্থির। অনেকদিন পর ওদের বুক থেকে একটা বোঝার ভার নেমে গেছে। তাই বড় খুশী।

ব্রজলাল গদ গদ কণ্ঠে সিসিলের প্রশংসা করছিল —হ্যাঁ, ম্যাডাম জানেন দুষ্টের দমন কেমন করে করতে হয়। উনি বোঝেন কার কথা সত্যি কার কথা মিথ্যা। মেমসাহেব আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে মনের ভয় কাটিয়ে দিলেন। সত্যের মার নেই রে বাসমতি।

পরদিন সকালে ফিটফাট ড্রেস করে একসেট পোশাক ব্যাগে ভরে নওরঙ্গী হাউসে সিসিল মেমসাহেবকে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

সিসিল বললেন —ওহ্ নাইস! ইউ আর এ লাভলি ইয়ংম্যান।

মিঃ. রজার নামে একটা পর্তুগীজ ড্রাইভার ছিল। উর্দি পরে গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরল। ব্রজ ওর পাশে সামনের সিটে বসল। পিছনের সিটে সিসিল।

মিঃ. ব্যারকলউ চুরুট মুখে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সিসিল গাড়ির কাঁচ নামিয়ে বললেন —ড্যাডি! সাবধানে থাকবে। লিকার খাবে না বলে দিচ্ছি। ফিরে এসে যদি শুনি তবে ভীষণ রাগ করবো।

উনি হেসে বললেন —ঠিক আছে। তাই হবে।

গাড়ি স্টার্ট দিল। উনি হাত তুললেন। সিসিলও হাত তুললো। গাড়ি ছুটে চলল মোরাম রাস্তার উপর।

ত্রিশ

রাস্তার দু'পাশে সবুজ ধানের মাঠ। ভাদ্র মাসের জল ভরা পুকুরে ফুটন্ত শালুক ফুল। কোথাও কোথাও ঘন তালবীথি। সবুজ ঘাসের ডাঙায় একটি-দুটি করে শাল মহুয়ার গাছ। কোথাও ঘন ঝোপ ঝাড়, কোথাও বা শ্যামল বনবীথিকা।

পথের সৌন্দর্যে সিসিল মুগ্ধ।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন রাঢ়বঙ্গের প্রকৃতি যৌবন সুষমায় টলমল করে। তা দেখে কার না মন ভরে যায়? ওদের যাত্রা বড়ই আনন্দের হয়ে উঠল।

পানমোহরায় ঢুকবার আগে চঞ্চলা জোড়ের ব্রিজ দিয়ে যখন গাড়ি যাচ্ছে তখন দামোদরে দু'কানা বান ডাকছে। ওপারে বাঁকুড়া জেলার গাছগাছালি ভরা শ্যামল দিগন্ত। নীল আকাশ ও সাদা জলস্রোতের মাঝে আদিগন্ত শ্যামল তটভূমি যেন এক স্বপ্নের ছবি।

সিসিল বললেন —লাভলি সিনারি! বরজোও! আমরা ওখানে যেতে পারি না?

—কেন পারবো না ম্যাডাম ? নদীর ঘাটে আমাদের কোম্পানীর নৌকা আছে। যেখানে খুশী নিয়ে যাবে।

—ওহ্! ভেরি নাইস! আমরা একদিন যাবো। পিক্‌নিক করবো। খুব আনন্দ হবে।

— সিওর।

গাড়ি ঢুকে গেল পানমোহরা বাংলোর গেটে।

ওঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পানমোহরা তৈরি হয়েই ছিল। যত সব বেয়ারা, বাবুর্চি, খানসামা, আর্দালি, সহিস, কচোয়ান, মালি তাঁকে সেলাম দিল। চিলি ছিল সেই বাংলোর আয়া। একদা ব্যারাকলউ সাহেবের রক্ষিতা, বর্তমানে পানমোহরা বাংলোর যত্নকারিণী। তার হাঁকডাকে চাকর-বাকররা তটস্থ।

সে এখন সামান্যা নয়। তার নিজের সর্দারিতে এক-দেড়শো কুলি-কামিন। নিজে সাহেবের সেবাদাসী এবং তার ছেলে রাঁচির মিশনারী স্কুলে ইংরেজী মিডিয়ামে লেখাপড়া শেখে। সাহেব নিজে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। খরচ-খরচাও কোম্পানী দেয়। যেমন সরিতার যাবতীয় খরচ বহন করে পানমোহরা কোল কোম্পানী।

সিসিল ওর বাপের এসব কীর্তি-কাহিনীর কথা জানেন। কিছু মনে করেন না। ওয়াইন এণ্ড উওম্যান এসেনসিয়াল কমোডিটিজ। তাঁর বাপ এসব উপভোগ করে ভালোই করেছেন। নাহলে একদিন ক্লান্ত হয়ে হোমে ফিরে যেতেন। বৃদ্ধদের হোস্টেলে জীবন কাটাতেন। এ বেশ হয়েছে। দুটো বড় বড় কোল কোম্পানী, একটা জমিদারী। ঠাটে-বাটে জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর কর্মের উদ্যমে ভাটা পড়েনি। লয়েড ব্যাঙ্কে প্রতি মাসে ছয় অঙ্কের চেক জমা পড়ছে। ইংল্যাণ্ডের ব্যারন ও নাইটরাও এমন জীবন-যাপন করতে পেলে গর্ববোধ করবেন।

চিলি তো তাঁর সেবায় প্রাণ ঢেলে দিল। পা থেকে জুতো-মোজা পর্যন্ত খুলে দিল। স্নানের সময় নিজের হাতে সাবান মাখিয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে আবার পোশাক-আশাক পরিয়ে চুল ব্রাশ করে দিল।

এ তো সরিতা নয় যে নিজের নগ্নমূর্তি—এমন কি নেশার ঘোরেও মাতৃতুল্যা দাসীর কাছে দেখাতে লজ্জায় কুঁকড়ে যাবে। এ সিসিল। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন সেবা-যত্নের পারিপাট্য।

সন্ধ্যায় তাঁর অনারে ডিনার পার্টি। রাজকন্যার মত সাজপোশাক পরে ডিনার পার্টিতে যোগ দিলেন। কোম্পানীর সব ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার ও সাহেব-সুবোরা এসেছিলেন। তাঁদের মেমসাহেবদেরও সঙ্গে এনেছিলেন। অবশ্য যাঁদের আছে। মিঃ. টেলার সকলের সঙ্গে তাঁকে আরেকবার পরিচয়

করিয়ে দিলেন। যদিও নওরঙ্গীতে একবার আলাপ হয়েছিল। তবু তো সবাইকে মনে রাখা সম্ভব নয়।

ইওরোপীয়ান অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থা ছিল। বিরাট বলরুমে নাচ-গান হল। লীকারও চলল। খানাপিনার এলাহি ব্যবস্থা। রাত প্রায় বারোটার সময় পার্টি শেষ হল। তখন ভাদ্রের আকাশ-ভরা মেঘ। রিম্‌ঝিম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। সাহেবরা তারই মধ্যে চলে গেলেন। বেয়ারা খানসামার দল এঁটো পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

ব্রজ একটা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চিলি মদের নেশায় চিৎপাত দিয়ে পড়ে আছে। সিসিল তখনো স্ট্রং। আসলে উনি অন্যকে মদ-খাইয়েছেন, নিজে বেশি খাননি।

ব্রজর হাত ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলে মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বললেন—ইউ ইয়াংম্যান! তোমার এত টায়ার্ড হওয়া সাজে না।

ব্রজ লজ্জাবোধ করল। বস্তুত ওর নেশা এমন কিছু হয়নি। খাটা-খাটুনিতে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কলমীশায়েরের স্বপ্নদ্বীপে নেশার ঘোরে সাহেব মেমসাহেবদের নানান কাণ্ডকারখানা ও দেখেছে কাজেই, সাহেবের দেওয়া পার্টিতে ও মাতাল হবার মত মদ খায় না।

সিসিলের পিছনে পিছনে করিডর দিয়ে এল। বাড়িটার ডিজাইন ছিল দক্ষিণমুখী। বারান্দার পর টানা বলরুম। তার পিছনে কিচেন, স্টোর ইত্যাদি। বলরুম থেকে মাঝামাঝি একটা পূর্বমুখী ও একটা পশ্চিমমুখী করিডর। পশ্চিমমুখী করিডরের একদিকে ব্যারাকলউ সাহেবের সংগ্রহশালা। অন্যদিকে পাশাপাশি বেডরুম। পূর্বমুখী করিডরের দু'পাশেই পর পর বেডরুম! সবকটি বেডরুমের লাগোয়া ল্যাট্রিন বাথ।

পূর্বমুখী করিডরের ডানদিকের একটি বেডরুম সিসিলের জন্য ও বাঁ পাশের একটা বেডরুম ব্রজর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল সিসিলের নির্দেশে।

সিসিল করিডর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বলরুম সংলগ্ন দরজাটি নিজের হাতে বন্ধ করে দিলেন।

ব্রজ তার নিজের বেডরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল। সিসিল হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে বললেন—ওহ্। নো নো। এঘরে এসো। একটা পেগ নাও।

—ও বাব্বাঃ। আরো? এই দুপুর রাতে?

—সো হোয়াট? রেডি কর। আমি ড্রেস বদল করে আসছি।

উনি বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। ব্রজ একটা স্কচ হুইস্কির বোতল খুলে দুটো গ্লাসে ঢালল। এক ডিশ কাজুবাদাম বের করল।

সব কিছু তৈরি করে বসে আছে। সিসিল বাথরুম থেকে বেরুলেন একটা অতি স্বচ্ছ সাদা স্লিপিং গাউন পরে। ভিতরে কিছু নেই। এমনকি ইজের,

ব্রেসিয়ারও। বিজলীর আলোতে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনকি ত্বক মাংস ও পেশীর জৌলুষে ব্রজর চোখ ঝলসে গেল। এক পলক দেখেই আর সেদিকে তাকাতে পারছিল না।

সিসিল গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললেন—চিয়ার্স বরজোও!

একটা চুমুক দিয়ে হাসলেন। কেমন বিচিত্র, রক্ত হিম করা হাসি। বললেন—তোমাকে ভাল শ্যাম্পেন খাওয়াবো বলে প্রমিস করেছিলাম। কামঅন! হ্যাভ ইট!

উনি যা ইঙ্গিত করলেন তার অর্থ—এসো। আমাকে নাও।

ব্রজর মাথায় যেন কেউ একটা ধাঁ করে থান ইট মেরে দিল। সে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সারা শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেল। নার্ভ ফিরে পাওয়ার জন্য একচুমুকে আধ-গ্লাস হুইস্কি টেনে নিল।

সিসিল ওর কাঁধে হাত রাখলেন। ওর মুখটা তুলে বললেন—বরজোও! মাই ইয়াং ফ্রেন্ড! তুমি নার্ভাস হচ্ছ কেন? তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না? আই লাইক ইউ!

ব্রজ অস্ফুট কণ্ঠে বলল—ম্যাডাম!

—নো মোর ম্যাডাম বরজোও! উই আর ফ্রেন্ড! কামঅন। তোমার জন্যই এত আয়োজন করেছি।

ব্রজ ওর পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল—ম্যাডাম! আপনি জানেন না আমরা দু'জনেই ব্যারাকলউ সাহেবের পয়দা। আপনি আমার সিস্টার—আমার বড় দিদি।

সিসিল ঝল্সে উঠলেন—হ্যাং ইয়োর সেন্টিমেন্ট! ব্লাডি ফুল। সিসিল তোমাকে চায়—এর চেয়ে বড় ভাবনা তোমার কিছু থাকবে না।

গাউনটা ফট্ করে খুলে দিলেন। ব্রজ দেখল—সাদা মারবেল পাথরে তৈরি এক নগ্নিকা যার দু'চোখে কামনার আগুন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। সারা অঙ্গ আসঙ্গ পিপাসায় কম্পমান।

এই রমণীকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ তার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে মৃতের স্তূপে ফেলে দেওয়া। অসহ্য এই জ্বালা। গ্লাসের তলানিটা এক চুমুকে শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পিতা ও মাতার ব্যভিচারী রক্তস্রোত শন্ শন্ করে বয়ে গেল তার উত্তপ্ত সুষুম্না কাণ্ড বেয়ে। আদিম রিপুর তাড়নায় তারা ভুলে গেল পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক!

মহাপাপ অন্তরীক্ষে থেকে খল্ খল্ করে হাসল।

আকাশে বাজল মেঘের দুন্দুভি।

সিসিলির চোখের তারা দুটো তখন ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। মদের নেশা

ফুরিয়ে গেছে। এক অন্যতর নেশার মাদকতায় জানালার খড়খড়িতে চোখ রেখে সিসিল ও ব্রজর সম্ভোগ দৃশ্য গিলে খাচ্ছে।

তারপর সারারাত তার চোখে ঘুম নেই। ভীষণ অস্থিরতায় ছট্ ফট্ করছে। এ সে কি দেখল? একি বিশ্বাস হয়? যে মেমসায়েবের ভয়ে তা-বড় তা-বড় সাহেব-সুবো থরহরি কম্পমান সে কিনা…

আ-হা হা —একথা কাকে বলবে? না বললে যে পেট ফুলে মরে যাবে। সাপের বিষে মানুষ যেমন জরে যায় তেমনি ও হয়ে গেল। না গিলতে পারে না পারে উগ্‌রাতে! আনন্দ না হিংসা! উত্তেজনা না বিস্ময়! জ্বালা না রিরংসা! এ যে কি অনুভূতি তাই বুঝতে পারে না। চোখের ঘুম উবে যায়। তীব্র আকর্ষণে জানালার খড়খড়িতে চোখ দুটো গেঁথে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে। বুকের ভিতর হাপর চলে। ওরা যে কদিন পানমোহরায় ছিল এই একটা নেশাতেই চিলির দিনরাত্রি কেটে গেল। মদ যেমন নতুন মাতালের পেট থেকে বমি হয়ে বেরুবার জন্য তার নাড়ীতে নাড়ীতে পাক দিয়ে সারা শরীর উথাল পাথাল করে দেয় তেমনি যন্ত্রণায় জলতে লাগল।

অবশেষে একদিন উগরে ফেলল লঙ্কার কাছে। নাগর ছাড়া কাকে বলবে? নিজের সোয়ামীর কাছে এসব কথা বলা যায় না।

লঙ্কা ও ব্রজ যেহেতু একই নর্দমার কীট, একই ব্যভিচারী রক্তপ্রবাহ তাদের শিরায় শিরায় অথচ একজনের জন্য বরাদ্দ হয় পানমোহরা বাংলোর বেডরুম অন্যজন বাস করে কুলি ধাওড়ায় সেজন্য হিংসা বিষে জর্জরিত ছিল লঙ্কার মন। এই কেলেঙ্কারীর কথা শুনে তার সর্বাঙ্গ জলে গেল। হিংসার জ্বালায় সারা অন্তর ডহ ডহ।

একত্রিশ

কি বিচিত্র এক একটি চরিত্র ব্যারাকলউ সাহেবের জারজ প্রজন্মের। তাঁর এক পুত্র ভোগ করে তাঁর রক্ষিতাকে, অন্য পুত্র কন্যাকে। আরো অনেক আছে। তারা যে কে কি অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে তা কে জানে? তবে একজনের সংবাদ লোকের মুখে মুখে ফেরে। সে মনসারাম। রাগিণীর ছেলে। সে চোর না ডাকাত না খুনী না বিপ্লবী তার মূল্যায়ন এখনো হয়নি। শেরগড় কোল কোম্পানীর বিবিবাথান ও বিবির বাঁধ খনিগর্ভে ধ্বসে যাওয়ার জন্য বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাতের পর নতুন বস্তি গড়েছে কুলি বাথান নাম দিয়ে। বেবাক বিবিবাথানের কুলি-কামিনরা সেখানে বাস করে। ভিন্ন ভিন্ন কলিয়ারীতে কাজ করে। মনসারাম তাদের নেতা। পুরাতন বিবিবাথানের যে যেখানে আছে সবারই সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ। লঙ্কা ও ব্রজ

দু'জনেই তার চেয়ে বয়সে বড়। তবু তারা ওকে মানে।

লক্ষা একবার ভাবল —সব কথা মনসাকে গিয়ে বলবে। কিন্তু থেমে গেল। না —ওকে বলা চলবে না। তাহলে বলবে কাকে? না বললে যে চিলির মত সেও জরে যাবে। এসব অপাচ্য বস্তু চিলি তার কাছে বমি করে দিয়ে নিজে হাল্কা হল। সে কার কাছে করবে?

হ্যাঁ। আছে একজন। সে জয়গোপাল। কুলি-কামিনদের হাঁড়ির খবর তাকে দেয় তবে সাহেব-সুবোরই বা দেবে না কেন?

জয়গোপাল তা আকালের মত গিলে ফেলল।

এইভাবে সিসিল ও ব্রজর অবৈধ সম্ভোগের লীলাকীর্তন কানে কানে বাজতে লাগল। যার বিন্দু বিসর্গও ওদের জানা নেই। কিন্তু পাপ তার নিজস্ব গতিপথও যেমন তৈরি করে নেয় তেমনি তা প্রকাশও করে দেয়। কথায় বলে —রীতপ্রীত চাপা থাকবার নয়।

সিসিল যে চামড়ার ব্যাগটা ব্যবহার করতেন সেটা দেখতে দেখতে বেশ ভারী হয়ে উঠল গোপনীয় কাগজপত্রে। ব্রজ সেটা বয়ে বেড়ায়।

সকাল আটটার মধ্যেই ফিট ফর ডিউটি। কড়া মাঞ্জা দেওয়া সাদা শার্ট। টাইট ফুল প্যাণ্ট। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মাথায় টুপি, খট্ খট্ জুতোর শব্দ তুলে যখন হেঁটে যান তখন মোটাসোটা বাবুদিকে পিছনে দৌড়তে হয়। তাঁর চলার সঙ্গে তাল রাখতে।

যেখানেই যান সেখানেই লোকজন সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে। অন্যের কথা কি? জাঁদরেল জেনারেল ম্যানেজার মিঃ. টেলারও জুজু বনে যান। কি তাঁর ব্যক্তিত্ব! কাছে দাঁড়ালে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। মিছে কথা বলতে গেলে জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে ছুরির ধার। যেন এক নজরেই পড়ে নিচ্ছেন মনের পাপ। যেটা ধরেন তার মধ্যে সত্যি যদি গলদ থাকে তবে বের করে ছাড়বেন এমনিই তাঁর কাজের তৎপরতা।

ব্যারাকলউ সাহেবের কাজকর্ম একেবারে দরবারী ঢঙের। খোলামেলা। যাকে যা বলার সামনা সামনিই। কেউ চুরি করে ধরা পড়লে সপাং করে বসে গেল বেত। মুখে অশ্রাব্য খিস্তি। ঘাড় ধরে বিদায়।

কেউ ভাল কাজ করলে ছুঁড়ে দিতেন বকশিশ। বানিয়ে দিতেন লেবার থেকে সর্দার। বাবু থেকে সাহেব। ওঁর দেওয়া প্রমোশনে কেউ কেউ এক লাফে গাছে চড়ে গেছে এমন দৃষ্টান্ত আকছার।

বাবু, ভেইয়া, চাপরাসী, সর্দার, ঠিকাদার নিয়ে এক পঙ্গপাল তাঁর পিছনে পিছনে ঘোরে। সেলাম দেয়। তোষামোদ করে। খিদমত খাটে। মদের জোগান দেয়। মেয়ে এনে দেয়। বকশিশ কুড়োয়।

এইভাবেই তারা অভ্যস্ত। সিসিল মেমসাহেবের ধারালো ছুরির মত

চোখের চাউনি, পেটের নাড়ী ছিঁড়ে কথা বের করা, জেরায় জেরবার হওয়া —তাদের কাছে ভীষণ ত্রাস। ভয়ে ওরা ধারে পাশে যায় না কেউ।

দুপুরে লাঞ্চ করতে বাংলোয় আসেন না। কোন খানসামা বাটলার যে লাঞ্চের আয়োজন কেতাদুরস্তভাবে অফিসে পৌঁছে দেবে তাও পছন্দ করেন না। ব্রজ ফিট্ ফাট ড্রেস পরে তাঁর অফিসের বাইরে টুলের উপর বসে থাকে। ঠিক বারোটার সময় মেমসাহেবের ঘণ্টা বাজে। ব্রজ তাঁর চেম্বারে ঢুকলেই মৃদুকণ্ঠে বলেন —তুমি লাঞ্চ সেরে এসো। আমার জন্যেও নিয়ে এসো।

ব্রজ বাংলোর দিকে ছোটে। মেমসাহেবের হুকুমে তার লাঞ্চটা সাহেব বাংলোতেই জুটে যায়। বেয়ারা রেডি করে দেয় দু'পিস পাঁউরুটি, একটু মাখন, চিকেন-রোস্ট, কারী এবং একটু স্যালাড। ব্যস্। আর বেশি কিছু পছন্দ করেন না।

অফিসের দরজা মিনিট কয়েকের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ওঁর খাওয়া হয়ে গেলে ব্রজ এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

আবার কাজ চলতে থাকে। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক যখন পাঁচটা তখন ব্রজর ডাক পড়ে। ও ব্যাগটা তুলে নিয়ে যায়। গাড়ি তৈরি। মেমসাহেব পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসলেন। গাড়ি ছুটলো বাংলোর দিকে।

কোন কোনদিন কলিয়ারী ইন্সপেকশনের প্রোগ্রাম থাকে। স্টোর, ইয়ার্ড, অফিস, ডিপো, এমন কি খাদের ভিতর পর্যন্ত। সেদিন ব্যাগ বইতে বইতে ব্রজর হাতে ব্যথা ধরে যায়।

এই কাঠখোট্টা বর্ষীয়সী মেমসাহেবের প্রাণে যে অগম্যগামিনী হবার মত আদিম রিপুর তাড়না আছে তা কারো ধারণাতেই আসবে না। ব্রজ নিজেই অবাক হয়ে যায়। সারাদিন যাঁর মুখের সামনে দাঁড়াবার সাহস হয় না, দুটো বাজে কথা শোনা যায় না, রাত্রি নামলে তিনিই কেমন বাচালিকা হয়ে যান। কত অবলীলায় তাকে বুকের উপর ধরে হাসিতে উচ্ছ্বাসে আদিরসের কথা বলেন।

তখন জয়গোপালের বাড়িতে চলে হিসেব কারচুপি করার কারখানা। হাজরীবাবু, লোডিংবাবু, খাজাঞ্চীবাবুরা আসেন। কোন কোন রাত্রে সাহেবদেরও ডাক পড়ে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে শলা পরামর্শ। খাতা সারার কাজ। লেবারদের টিপ ছাপ নেওয়া। ঠিকাদারদের বিল ভাউচার।

মহীতোষবাবু যত সহজে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন জয় তা পড়েনি। সে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে পড়েছিল। তার মাথার উপরে ছিল মিঃ. টেলারের আশীর্বাদ। উনি প্রায় সব কিছুই সামলে দিয়েছিলেন। আর এত বড়

জেনারেল ম্যানেজার যদি কোন ভাউচার পাশ করে দেন তাহলে সেটা সন্দেহাতীতভাবে চুরি বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু করার থাকে না। সেজন্য সিসিলের সন্দেহ আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল। উনি ওঁদের দু'জনকেই সন্দেহ করতেন। কিন্তু মিঃ. টেলারকে কিছু বলতে পারতেন না। জয়কে বার বার তাঁর জেরার মুখে পড়তে হত।

যেহেতু জয় অতি সতর্ক এবং অতিশয় চালাক সেজন্য তার বর্তমানের কাজকর্মে দু'নম্বরী ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল ও অতীতের কাজগুলির খাতাপত্র, বিল, ভাউচার, সই-সাবুদ সব করিয়ে নিয়েছিল। সে হাতে-নাতে ধরা পড়েনি। একেবারে সতী তুলসী ঠিকাদার কাম গোমস্তা হয়ে কাজ করত। গোপন পাপের বোঝা বইত সঙ্গোপনে।

একদিন সিসিল মেমসাহেব প্রশ্ন করলেন—মিঃ. সরকার! আপনি এত বিষয়-সম্পত্তি কিভাবে করলেন?

জয় অনেকদিন থেকেই এই প্রশ্নটির মুখোমুখি হবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। কারণ ও জানতো একদিন না একদিন তাকে এর জবাব দিতে হবে। বলল —সবই মিঃ. ব্যারাকলউয়ের দয়াতে পেয়েছি ম্যাডাম।

—এটা ঠিক প্রশ্নের উত্তর হল না। আমি আরো স্পেসিফায়েড উত্তর চাই। তোমার বর্তমান সম্পদ কত?

জয় একটু ভেবে বলল —তাতো হিসেব করিনি ম্যাডাম।

—কেন করেননি? আমাকে আইটেম বাই আইটেম সম্পদের তালিকা করে তার বর্তমান মূল্য ধার্য করে দেবেন।

—ঠিক আছে ম্যাডাম। আমাকে তাহলে কিছু সময় দিন।

—কত সময় চান?

—এক মাস।

—আচ্ছা।

ঠিক একমাস পরে ওর ডাক পড়ল। জয় বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে একটা তালিকা প্রস্তুত করে তার জন্য কৈফিয়ৎও ঠিক করে রেখেছিল। সেটা তাঁর কাছে পেশ করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

উনি বললেন —বসুন।

জয় বসল। তালিকায় চোখ বুলোতে উনি বললেন —জমি সাড়ে চারশো বিঘে! মাইগড। এত জমি কি করে কিনলেন?

জয় বলল —এটা সাহেবের দান। পানমোহরা জমিদারীর দুটো অংশ যখন বিক্রি হয় তখন ওঁরা জমিগুলো লট বাই লট বিক্রি করেছিলেন। সাহেব আমাকে বললেন —জয় একদিন তুমি জমিদারের জুতো খেয়েছো। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ। তুমি ওদের অংশ কিনে নাও।

বললাম—স্যার। অত টাকা কোথায় পাবো? উনি বললেন—নিজে যতটা পারো সংগ্রহ কর। বাদবাকী আমার ক্যাশ থেকে নিও।

সিসিল বললেন—সাহেব কত টাকা দান করেছিলেন?

—তা বলতে পারবো না ম্যাডাম। কতদিনের ঘটনা। দফে দফে টাকা নিয়েছি। কিছু শোধও করেছি। কিছু বিল ভাউচারে এডজাস্ট হয়েছে। সব কাগজপত্র তো গুছিয়ে রাখিনি।

—আচ্ছা! এতে ওঁর লাভ?

—উনি বলেছিলেন—আমার কলিয়ারীর জন্য যা জমির দরকার হবে তা ছেড়ে দিও।

—মাইগড!

সিসিল সেদিনের মত আর জেরা করলেন না। কিন্তু মিঃ. ব্যারাকলউকে জিজ্ঞাসা করতেও ছাড়লেন না। উনি এক কথাতেই সেরে দিলেন—

—হ্যাঁ! পানমোহরা জমিদারের জমি-জমা কেনার সময় জয়কে আমি সাহায্য করেছিলাম।

—তাই বলে এত টাকা!

—হ্যাঁ। ওরা আমার বশংবদ ভৃত্য!

এরপর কথা চলে না সিসিল মনে মনে ক্ষুব্ধ। ওঁর ভাবনার জগতে তখন একটাই কৈফিয়ৎ তা কাবেরী বালা দাসীর প্রভাব। সাহেব ওর কাছে চড়া দামে সুখ কিনেছেন। অতঃপর জয়কে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করে উনি একটা রিপোর্ট তৈরি করলেন। জয়ের দেওয়া বিষয় সম্পত্তিব তালিকাটি তাতে সংযুক্ত করে লিখলেন—জয় যে তালিকা দিয়েছে তার সম্পদ তার চেয়ে অনেক বেশি। লাখ টাকার উপর তার ব্যবসায়ের ক্যাপিট্যাল। এ ছাড়া সোনা আছে প্রায় দুশো ভরি। এসবই তার জানা তথ্যের উপর নির্ভর করে লেখা। জয় যেমন চালাক চতুর মানুষ তাতে এই জানার বাইরেও সমপরিমাণ না হলেও পঞ্চাশ শতাংশ তো বটেই তার বিষয় সম্পত্তি আছে।

একটা মানুষ পনেরো বছরের মধ্যে এত সম্পদ করে কী করে? অবশ্যই তার পিছনে বড় রকমের দুর্নীতি আছে। আমাদের কোম্পানীর বড় বড় অফিসারদের সহযোগিতা আছে। সর্বোপরি আমার বাবার প্রশ্রয় আছে। শেষের কারণটাই সবচেয়ে ক্ষতিকর। না হলে একটা নেটিভ ইণ্ডিয়ান এতটা বাড়তে পেতো না।

ঐ রিপোর্টের সঙ্গে সুপারিশ ছিল একই লোককে ঠিকাদারি ও গোমস্তাগিরি না দিয়ে প্রত্যেক কলিয়ারীর জন্য আলাদা আলাদা ঠিকাদার ও গোমস্তা দুই

ভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে একজনের প্রভাব খর্ব করে দেওয়া।

অফিসারদিকেও অদল বদল করা। বিশেষ করে মিঃ. টেলারকে ত পানমোহরা থেকে সরানো একান্ত প্রয়োজন।

এই রিপোর্টের কপি উনি মিসেস ব্যারাকলউকে পাঠিয়ে দিলেন। মিঃ. ব্যারাকলউকেও দিলেন।

এইসব করতে ওঁর চার পাঁচ মাস সময় লেগেছিল। ততদিনে শরৎ ও হেমন্ত পার হয়ে গেছে। শীতের মধ্যসময়। উনি প্রতি সপ্তাহে দু'তিনদিন পানমোহরায় থাকতেন। বাকি সময় নওরঙ্গীতে। কোন কোন উইক এণ্ডে ব্রজকে নিয়ে পিক্‌নিক্ করতে যেতেন। সীতানালা জোড়, বাঘমুড়ি পাহাড়, দামোদর পেরিয়ে বাঁকুড়া ও মানভূমে অজয় পার হয়ে সাঁওতাল পরগণার, কল্যাণেশ্বরী ও মায়ের থানে ঘুরে বেড়াতেন গাড়িতে অথবা ঘোড়াতে। কামদেবও পুষ্পধনু হাতে তাঁদের পেছনে ফিরতেন। কখন যে কোন বান গাছতলে কিংবা জোড়খাসালের পাথর চাতালে তাদের বুকে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়ে দেবেন তার আবার দিনক্ষণ কি?

অথচ লোকে ভাবত মেমসাহেব বেড়াতে বের হয়েছেন সঙ্গে একজন আর্দালী থাকবে বৈকি! এতে সন্দেহের কিছু নেই।

প্রতি রবিবারে গীর্জায় যেতেন প্রার্থনা করতে। ফিরে এসে মিঃ. অসবোর্ণকে চার পাঁচ পাতার চিঠি লিখতেন। তাতে তাঁর যে যে যুদ্ধক্ষেত্রে জয় হয়েছে সেগুলির জন্য অভিনন্দন ও যেখানে পরাজয় হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আরো বেশি পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রেরণাদায়ী কথা থাকতো। দশ বারোটি চুম্বন ও তাঁর বিরহে তিনি কত কাতর তা নিয়ে দু'তিনটি অনুচ্ছেদ। পরিশেষে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে ভারতে এসে মধুযামিনী যাপন করার নিমন্ত্রণ ও লর্ড যীশাস ক্রাইস্টের কাছে তাঁর মঙ্গলকামনা করে প্রার্থনা।

ছেলেদিকে চিঠি লিখতেন তাদের কল্যাণ কামনা করে লর্ড যীশাস ক্রাইস্টের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তাদেরকে দেখবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তারা যেন ভালভাবে লেখাপড়া করে ইত্যাকার বিষয়বস্তুতে সে চিঠি ঠাসা হয়ে যেত।

অর্থাৎ জায়া ও জননীর ভূমিকায় তিনি যে কত সৎ, কত উদ্বিগ্ন তা তাঁর চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠত।

তাঁর মাকে যে চিঠি লিখতেন সেটাকে চিঠি না বলে সাপ্তাহিক অডিট রিপোর্ট বলাই ভাল। মিসেস ব্যারাকলউ আবার সেই চিঠির তথ্যগুলিতে নির্ভর করে মিঃ. ব্যারাকলউকে চিঠি লিখতেন।

সে যাইহোক, পানমোহরা ও নওরঙ্গী কোল কোম্পানীতে হিসেব মাফিক কাজকর্মের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। চুরি ও অপচয় বন্ধ হয়েছিল।

কোম্পানীর লাভও বেড়েছিল।

এমনিতেই কোম্পানী তখন লালে লাল হয়ে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে কয়লার দর ও চাহিদা দুই-ই উর্ধ্বগামী। আর যে পণ্যের উঠতি বাজার তার মুনাফার কথা কি বলতে আছে?

মিঃ. ব্যারাকলউ সারাজীবনে যা রোজগার করেছিলেন যুদ্ধের তিনটে বছরে তার দশগুণ রোজগার করেছেন। সব টাকা জমা পড়েছে বিলেতের ব্যাঙ্কে। উনি এখন অনায়াসে দেশে ফিরে গিয়ে রাজার মত জীবন যাপন করতে পারেন।

বত্রিশ

শীতের কন্‌কনে বাতাস বইছে। শাল মহুয়ার বনে শন্‌ শন্‌ শব্দ হচ্ছে।

কলমীশায়েরের স্বপ্নদ্বীপে চারদিকেই জল। তা থেকে উঠছে হিমেল কুয়াশা। চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার আবরণে জ্যোৎস্নার মায়া আরো রহস্যময় হয়ে উঠছে।

হেন সময়ের কালে হৃদয় জোড়া সমুদ্র কল্লোল না থাকলে কে বা থাকতে পারে সেখানে? ঠাণ্ডায় হাড় পাঁজরা খুলে যাবে না? অথবা হিম হয়ে যাবে না আতপ্ত নিঃশ্বাস?

কিন্তু তা হয় না। এই ঠাণ্ডাটাই বুঝি বা মধুর আবেশে শিহরিত হিল্লোলে দোল খায় হৃদয়ের পরতে পরতে। বেশ কয়েক জোড়া কপোত কপোতী ক্লাবঘরের ফায়ার প্লেস ছেড়ে স্বপ্নদ্বীপে এসেছেন নিরালায় বসে প্রেম করতে। ঝাউয়ের তলে ঝাপ্‌সা অন্ধকারে বসেও পড়েছেন গ্লাস বোতল নিয়ে। বেশ জমাটি আসর। মাথার উপর চাঁদের মায়া। নাকে লাগছে ফুলের সুবাস। ঘোলাটে চোখে কলমীশায়েরের ঢেউ খেলানো জলে চাঁদের ঝিকি-মিকি দেখছেন।

সিসিল সেইদিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দু'চোখ জোড়া স্বপ্নের আবেশ। ব্রজ পরম যত্নে গ্লাসে মদ ঢালছে।

হঠাৎ টলতে টলতে হাজির হলেন মিঃ. হবস। চৌকশ ছোকরা। এখনো ব্যাচিলার। সেই 'হর্স-স্থার' প্রহসনের নায়ক।

বললেন —গুড ইভনিং মিসেস অসবোর্ণ।

—গুড ইভনিং মিঃ. হবস। কি খবর? তোমার গার্লফ্রেণ্ডকে ছেড়ে এখানে চলে এলে কিরকম?

জড়িত কণ্ঠে উনি বললেন —আনফ্রুরচুনেটলি আমার গার্লফ্রেণ্ড আজ ম্যার্টিন বার্ণের ক্লাবে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে নাচতে গেছে।

—আফসোস! বহুত আফসোস! মিঃ. ডশ —ওঁকে লিকার দাও।

—ও. কে. মেমসাব। ব্রজ খুব তৎপরতার সঙ্গে মিঃ. হবসকে একটা হুইস্কীর গ্লাস ধরিয়ে দিল। উনি তাতে চুমুক দিয়ে বললেন —মিসেস অসবোর্ণ আপনি মিঃ. ডশকে বেশি প্রেফারেন্স দিচ্ছেন।

—আফটার অল আই নিড এ ম্যান!

—আই অ্যাম অলসো এ ম্যান!

—অফকোর্স! অফকোর্স!

—আসুন একটু নাচা যাক।

—সিওর। সিসিল ওর হাতটা ধরে উঠে পড়লেন। তারপর দুই মানব মানবী চাঁদের আলোয় নাচতে নাচতে বৃত্তের বাইরে চলে গেলেন। কখনো তাঁরা গাছের ছায়ার আড়ালে চলে যান, কখনো বা কুয়াসাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় ছায়ামূর্তির মত দেখায়। ব্রজ মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রোধ, অভিমান এবং লিকার তার মনের ভিতর ক্রিয়া করে যায়।

তখন ওরা কেমন এক আনন্দে বিভোর। এখানে কোন অর্কেষ্ট্রার মিউজিক নেই। তবে শরীরের রক্তস্রোতে যে অশ্রুত রিনিঝিনি বেজে চলেছে তাই তাদের নাচের মিউজিক। আর দূর সাঁওতাল পল্লী থেকে ভেসে আসছে নাগরার শব্দ —টিপিক্! টিপিক!

নাচতে নাচতে হঠাৎ এক প্রবল আকর্ষণে মিঃ. হবস সিসিলকে বুকে টেনে নিয়ে গালে চুম্বন দিলেন। সিসিল সানন্দেই প্রতিচুম্বন দিলেন। মিঃ. হবসের সাহস বেড়ে গেল। তিনি পট করে তাঁর ব্রেসিয়ারটা ছিঁড়ে দিলেন।

ফল হল বিপরীত। সিসিল রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরের মাংসপেশী মুহূর্তের মধ্যে টান টান শক্ত হয়ে গেল। চাপা আক্রোশে গর্জন করে উঠলেন —হোয়াটস্ দিস হবস।

—আই ওয়ান্ট উ ডারলিং!

—শ্যাট আপ! শব্দটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের এবং চড়টাও গায়ের জোরের। এক পলকে প্রলয়। মিঃ. হবসের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। সিসিলকে ঝাপটে ধরে পটাপট ছিঁড়ে দিলেন যা কিছু আবরণ। একটা বিকট হাঁ তার মুখের উপর নেমে এল। সিসিল ছটফট করতে করতে ডাক দিলেন —বরজোও!

ব্রজ তার আগেই তার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। কাছে এসে বলল —মেমসাব!

সিসিল বললেন —কিল হিম বরজোও!

আদেশ পাবামাত্র ও মিঃ. হবসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাগ তো আগেই জন্মেছিল, প্রকাশ ঘটল তার খুনেরা হাতের বজ্রমুষ্টিতে। চুল ধরে টেনে তুলে নাকের উপর একটা ঘুঁষি। মিঃ. হবস ছিটকে পড়লেন। তারপর চলতে

লাগল জুতোর ঠোক্কর। যতবার উঠতে চেষ্টা করেন ততবার তাঁকে ঘুঁষি অথবা লাথি মেরে ফেলে দেয়। অতিরিক্ত নেশার জন্য মিঃ. হবস ঠিকমত লড়তে পারছেন না।

সিসিল নিজেকে ঠিক-ঠাক করতে করতে বললেন —থ্যাঙ্ক উ বরজোও! কিল হিম।

ততক্ষণে অন্যান্য প্রেমিক প্রেমিকাদের নেশা ছুটে গেছে। তাঁরা ছুটে এসে মিঃ. হবসের প্রাণ বাঁচালেন।

মিঃ. হবস উঠে দাঁড়ালেন। একটা গুঁড়ি ধরে টাল সামলালেন। সিসিল তখনো হাঁফাচ্ছেন। রাগে আক্রোশে বুকটা ধড়ফড় করছে। কাপড় চোপড় ছিঁড়ে যাওয়ার জন্যে সাদা ডিমের মত স্তন দুটি বেরিয়ে পড়েছে। থর থর করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে ছলকে উঠছে।

মিঃ. হবস তাঁর কাটা ঠোঁট ও ফুটো নাকের রক্ত হাত দিয়ে মুছে বললেন —তুমি আমাকে একটা বাস্টার্ড সারভেন্ট দিয়ে অ্যাসাল্ট করালে?

—তুমি যে আমাকে রেপ করতে উদ্যত হয়েছিলে।

—না। রেপ করতে চাইনি। তোমাকে প্লেজার দিতে চেয়েছিলাম। সিসিল চিৎকার করে উঠলেন —ইউ লায়ার! আমার কাপড় চোপড় ছিঁড়ে একাকার করে দিয়েছো। আমার ব্রেস্ট ভীষণ ভাবে টুইস্ট করেছো। মুখের উপর কামড় বসিয়ে দিয়েছো। তারপরেও বলছো —রেপ নয়।

—সে ত চড় মারার পর। তার আগে ত প্লেজারই দিতে চেয়েছিলাম।

—না। আমি সে প্লেজার চাই না।

—তুমি সতী নও।

—কে বলেছে?

—আমি জানি তোমার চরিত্র। মিঃ. জোন্সকে তুমি ধাক্কা দিয়েছো। হোমে তোমার অনেক সেক্স কেলেঙ্কারী আছে। এখানে এসে ঐ বাস্টার্ড সারভেন্টের সঙ্গে ইললিগাল সেক্স এনজয় করছো। তুমি একটি সেক্স ম্যানিয়াক উওম্যান।

—ইউ শাট আপ!

—আমি এই কথাটা ইউরোপীয়ান সমাজে বলবো। মিঃ ব্যারাকলউকে বলবো —তোমার ডটার তোমারই বাস্টার্ড সানের সঙ্গে লিপ্ত।

—ইউ ননসেন্স! তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাও। কিন্তু মনে রেখো —আমি সিসিল অসবোর্ণ তোমাকে কেমন শিক্ষা দিতে হয় তা দেখিয়ে দেবো।

—অলরাইট! আমি তোমার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করলাম।

সব খোয়াব বরবাদ। মিঃ. হবস যে কি কুক্ষণে স্বপ্নদ্বীপে এসেছিলেন নিজের সর্বনাশের পরোয়ানা নিজেই করে ফেললেন।

সিসিল মেমসাহেব বরদাস্ত করবার মেয়ে নন। রাগে তাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলছে। উনি নওরঙ্গী হাউসে এসে মিঃ. হবসের বরখাস্ত চিঠি তৈরি করে মিঃ. ব্যারাকলউকে ঘুম থেকে তুলে বললেন —সই কর।

উনি আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন —সে কি! একজন ম্যানেজারকে হঠাৎ বরখাস্ত করলে কলিয়ারী চলবে কি করে?

—পয়সা দিলে অনেক ম্যানেজার পাওয়া যাবে।

—ওঁর সঙ্গে চার বছরের চুক্তি আছে।

—কোর্টে মামলা করে তার ক্ষতিপূরণ সে আদায় করে নেবে।

—মাই স্থইট চাইল্ড! তুমি তো কখনো এত রাগো না। কি হয়েছে বল?

—সে আমাকে অপমান করেছে। আমাকে রেপ করতে উদ্যত হয়েছে।

—তাহলে ত অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

—আগে ত এই ব্যবস্থাটা নাও। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

—ও. কে.! সই করে দিলেন।

সেই রাত্রেই চাপরাসী দৌড়াল মিঃ. হবসের বাংলোয় তাঁর চাকরী খতমের পরোয়ানা ধরিয়ে দিতে।

পরদিন সকালে উনি যাতে অফিসে ঢুকতে না পান, মিঃ. ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না পান, কোম্পানীর কোন গাড়ি, ঘোড়া, লোকজন না পান এবং ঠিক সকাল ছটায় তাঁর বাংলোয় তালাচাবি পড়ে যায় তার সব ব্যবস্থা করে সিসিল মেমসাহেব শুতে গেলেন।

তখনো তার মাথাটা রাগে দপ্ দপ্ করছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। অবশেষে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘণ্টা খানেক ঘুমোলেন।

তেত্রিশ

পরদিন সকালে নওরঙ্গী কোল কোম্পানীর সাহেব-সুবো, বাবু, চাপরাসী, লেবার প্রথম যে চাঞ্চল্যকর সংবাদটি শুনলেন —তা মিস্টার হবসের বরখাস্ত। কেউ কেউ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মিঃ. হবসের মত চলতা পুরজা ম্যানেজার হঠাৎ কেন বরখাস্ত হয়ে গেলেন —তা এক প্রশ্ন। গত রাত্রের কেলেঙ্কারীর যাঁরা সাক্ষী তাঁরা সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। একান্ত আপনজন ছাড়া মুখ খুলছেন না।

সেই যে চাপরাসী বরখাস্তের নোটিশ পৌছাতে গিয়েছিল সিসিলের হুকুমে

সে আরো একটা নাটকের দৃশ্য তৈরি করে দিয়েছিল। সব চাকর-বাকর সহিস কচোয়ানদের ডেকে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া, গাড়ি ও কোম্পানীর মালপত্র সহ সরিয়ে দিয়েছিল। এমন কি ড্রামের জলও উপুড় করে ফেলে দিয়েছিল। সেই জন্য লেবার ও বাবুদের মধ্যে কানাঘুঁষা চলছিল, সে কোন চুরির আসামী। বিশেষ সিসিল মেমসাহেব যখন এর উদ্যোগ নিয়েছেন তখন সেই ধারণাই বলবৎ হয়।

মিঃ. হবস বেশ নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। মাতাল হয়ে বাংলোয় ফিরে অপমানের জ্বালায় ছটফট করছিলেন। ব্রজর চোস্ত মারগুলির আঘাতও কম ছিল না। নাক দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছিল। মুখটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর চাপরাসীটা এসে এক লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড করে গেল। উনি তাকিয়ে দেখলেন। সকালে বাংলো ছেড়ে দিতে হবে। বেডিং বাঁধতে একটা লোক পেলেন না। বাকী রাতটা ধরে নিজেই নিজের ফার্স্ট এড করলেন। বেডিং বিছানা বাঁধা-ছাঁদা করলেন। সেসব টেনেটুনে রাস্তায় নিয়ে এলেন।

ভোরবেলাতে একজন গুদামবাবু জনকয়েক চাপরাসী নিয়ে এসে বাংলোয় তালা ঝুলিয়ে দিলেন। কতকগুলো কাঠের বাক্সো, স্টিল ট্রাঙ্ক, বেডিং ও স্যুটকেশ রাস্তার উপর ছত্রখান হয়ে পড়ে। উনি একটা বাক্সের উপর বসে সিগারেট টানছেন।

কয়েক ঘণ্টা আগেও যাঁর হুকুমে দু'হাজার শ্রমিক-কর্মচারী ওঠ-বস করত, যাঁর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেলে সব ভয়ে তটস্থ হয়ে যেত তাঁর এখন বাক্সো বইবার একটা লোক নেই। এমন কি অত প্রহসন করে যে ঘোড়াটা পেয়েছিলেন তাও কোম্পানী চুরির দায়ে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন!

অদৃষ্টের কি পরিহাস!

দিনকয়েক পর মিঃ. টেলারের বাংলোতে জয়ের ডাক পড়ল। ও এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। উনি বললেন —বোস জয়!

—ধন্যবাদ স্যার।

জয় একটা চেয়ারে বসে পড়ল। উনি বললেন —বড়ই ক্ষোভের ব্যাপার। কবে যে আমাদের চাকরী চলে যাবে কে জানে? তারপর ফুল অ্যাণ্ড ফাইন্যাল পেমেণ্ট আদায় করতে কোর্টে মামলা করগে। এটা কি সম্ভব? মিঃ. হবস কি অসুবিধাতেই না পড়েছে। জয় শুনে গেল। কারণ এসব কথার উত্তর দেওয়ার কোন মানে নেই। উনি আবার বললেন —সম্ভবত কোম্পানীতে একটা অদল বদল আসন্ন। সিসিল সেই রকমই সুপারিশ করেছে। তোমারও ঠিকাদারি এবং গোমস্তাগিরি ভাগ হয়ে যাবে। প্রত্যেক কলিয়ারীতে একজন গোমস্তা থাকবে। সব কলিয়ারীর হেড গোমস্তা বলে কিছু থাকবে না। ঠিকাদারিটা আলাদা আলাদা হয়ে যাবে।

উনি যত সহজভাবে এসব প্রশাসনিক পরিকল্পনা ব্যক্ত করছেন জয় কিন্তু তত সহজে নিতে পারছে না। সবকটি শব্দই ওর বুকে হাতুড়ি পিটছে।

বলল —এসব কি ফাইন্যাল হয়ে গেছে স্যার?

—না। সিসিল সুপারিশ পাঠিয়েছে মিসেস ব্যারাকলউয়ের কাছে। আর জানোই তো মিসেস একটা চিঠি দিলেই হল। উনি কার্যকরী করার জন্য লেগে পড়বেন।

জয় বেশ ভয় পেয়ে গেছে। বলল —তাহলে স্যার উপায়?

—উপায় আর কি? সিসিল যতদিন থাকবে ততদিন আমরা কেউ নিরাপদ নই। আচ্ছা, মিঃ. হবসকে ওভাবে তাড়ানোর কোন মানে হয়? একটা বাস্টার্ড সারভেণ্টকে দিয়ে মারধোর করানো! আরে তুই প্রশ্রয় দিয়েছিলি বলেই না ও এতটা অগ্রসর হয়েছিল। হঠাৎ যে তোর সেন্স অফ চ্যাস্‌টিটি জেগে যাবে তা কে জানে?

জয় ফস্‌ করে বলে ফেলল —ওর মোটেই চ্যাস্‌টিটি নেই স্যার।

—ইয়েস। মিঃ. হবস সেই কথা বলে। ও আরো বলে ঐ বাস্টার্ড বরজোর সঙ্গে ওর ইললিগেল অ্যাটাচমেণ্ট আছে।

—কথাটা সত্যি স্যার।

—ইজ ইট?

—হ্যাঁ স্যার।

—হতে পারে। আমিও সেইরকম আন্দাজ করেছিলাম। অনেকেই নাকি বিসদৃশ অবস্থায় ওদেরকে দেখেছে।

জয় এতদিন যাবৎ এই সংবাদটি নীলকণ্ঠের মত কণ্ঠে ধারণ করে আছে। ওগরাবার জায়গা পায়নি। অথবা স্থান ও কালের পরিবেশ রচিত হয়নি। আজ হয়েছে। সে লঙ্কা ও চিলির কাছ থেকে নিয়মিত খবর পেত। সব বমি করে দিল।

মিঃ. টেলার সব কথা মন দিয়ে শুনে বললেন —মাইগড়! তোমার কাছে এত খবর আছে আমরা জানতাম না। যাইহোক, তাহলে একটা প্ল্যান করা যেতে পারে।

উনি একটু ভেবে চিন্তে বললেন — সব ম্যাটারস নিয়ে একটা স্টোরি তৈরি করবো। তারপর তা পাঠিয়ে দেবো মিঃ. এণ্ড মিসেস ব্যারাকলউ, মিঃ. অসবোর্ণ, এবং চেনাজানা সব বিশিষ্ট লোকের কাছে। একটা সেক্স স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে পড়লে ও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

—কিন্তু স্যার, মিঃ. ব্যারাকলউ যদি জানতে পারেন তবে যে আমার রফা রফা করে ছাড়বেন।

—ভেবো না। আমরা কেউই সামনে থাকবো না। মিঃ. হবসকে দিয়ে সব

করাবো। তুমি লঙ্কা ও চিলিকে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও।

—ও কে স্যার।

তারপর মাকড়সার তৎপরতায় একটা ষড়যন্ত্রের জাল বোনা শুরু হল। তার কুশীলব মিঃ. টেলার, জয়গোপাল, লঙ্কা, চিলি ও মিঃ. হবস।

মিঃ. হবসের বিদায়টা যত লাঞ্ছনারই হোক সিসিলের বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে উনি কিন্তু হিরো বনে গিয়েছিলেন। বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে বিশেষ করে তাঁর গার্লফ্রেণ্ড মিস্ রোসিটার প্রচেষ্টায় একটা অস্থায়ী চাকরীও পেয়ে গিয়েছিলেন। এই দুঃসময়ে মিস্ রোসিটা ওর পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মতই কাজ করেছিলেন। সেজন্য মিঃ. হবস তাঁর সঙ্গে বিয়ের এনগেজমেণ্ট ফাইন্যাল করেছেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে জ্বলছে অপমানের আগুন। মিঃ. টেলার তাতে ইন্ধন যুগিয়ে দিলেন।

অতঃপর একজন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের কলম দিয়ে বেরোল একটা দুর্দান্ত সেক্স স্টোরি। ভদ্রলোকের ভালো ইমাজিনেশন ছিল। ভাষাটিও ঝরঝরে সুখপাঠ্য। লঙ্কা ও চিলির সঙ্গে পর পর কয়েকটা বৈঠকে যেসব মাল মশলা পেলেন তা দিয়ে কাঁচা কাঁচা শব্দ প্রয়োগে সিসিল ও ব্রজর নিরাবরণ দেহের বর্ণনা, তাদের ফ্রেণ্ডশিপ, সম্ভোগ ও সংলাপ ফুটিয়ে তুললেন। মিঃ. ব্যারাকলউ তা থেকে বাদ গেলেন না। তাঁরও বহু নায়িকার বিবরণ দাখিল করলেন। সে রীতিমত লাগসই রচনা। হিরোইন অ্যাজ এ ম্যাড বিচ, হিরোইন অ্যাট দ্যা ড্যান্স ফ্লোর, ইন দ্যা ইভ'স গারডেন, পিপিং থ্রু দ্যা হোল ইত্যাদি হেড-লাইনের আকর্ষণ কে বা ছাড়তে পারে? যৌন মিলনের এমন জ্বলন্ত বর্ণনাই বা কে দিতে পারে? সব যেন জীবন্ত।

সেই পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিলেন চেনাজানা বন্ধু মহলে, বড় বড় কোম্পানীর চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিনীয়ার, মালিক, ম্যানেজার, মিঃ. ও মিসেস ব্যারাকলউ, মিঃ. অসবোর্ণ এবং সিসিলের কাছেও।

একটা ইংরেজী ম্যাগাজিনে সংবাদ বেরুলো—ইউরোপীয়ান লেডী ইন লাভ উইথ হার ফাদার'স বাস্টার্ড সন।

নাম, ঠিকানা, স্থান ও সময় ধরে এমনভাবে লেখা যে পড়লে তাকে সত্যি বলেই বিশ্বাস করতে হয়। খবরের কাগজের এডিটারদের যেসব কপি পাঠিয়েছিলেন তাঁরাও তাতে সাড়া দিয়েছেন।

মিঃ. হবস সিসিল চরিত্রকে একটি সেক্স ম্যানিয়াক উওম্যান হিসেবে চিত্রিত করে দিলেন। সেজন্য উনি একবার মিঃ. হবসের বিরুদ্ধে মামলা করার কথাও ভেবেছিলেন কিন্তু তাতে কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর পাবলিসিটি আরো বেড়ে যাবে বলে সে পথে পা বাড়াননি।

কেমন গুম হয়ে গেলেন।

মিঃ, ব্যারাকলউ ঘুণাক্ষরেও জানতেন না তাঁরই অনুগ্রহপুষ্ট বশংবদ মানুষগুলি তাঁরই মেয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উনি জানতেন না যে ব্রজর সঙ্গে সিসিলের কোন দৈহিক সম্পর্ক আছে।

মিঃ. হবসের লেখা চিঠি ও পুস্তিকাটি আবছাভাবে কিছুটা পড়ে রেখে দিলেন। অল বোগাস! একি সম্ভব নাকি? ব্লাডি হবস অপমানের তাড়নায় অন্য কোন প্রতিশোধের উপায় না পেয়ে সিসিলের চরিত্রহনন করবার চেষ্টা করছে। তাতে কি হবে? ফাটা ঢোলে আর বুলি বলবে?

একটা কথাও বিশ্বাস করলেন না।

যেমন বিশ্বাস করতো না বাসমতি। ব্রজর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। অথচ তারই প্রথম টের পাওয়া উচিত ছিল। কত বিনিদ্ররজনী কেটেছে স্বামীর অপেক্ষায় বসে থেকে। সে আসেনি। যদি বা এসেছে শ্রান্ত, ক্লান্ত, নেশাগ্রস্থ হয়ে। তখন আর বাসমতিকে সোহাগ করার মত অবস্থা নেই।

তবু এই মূঢ়া রমনী খুশীতে ঝলমল করেছে ছেলেদের নতুন জামা প্যাণ্ট, নিজের শাড়ি সেমিজ উপহার পেয়ে। ভেবেছে মেমসাহেব তাদেরকে কত ভালবাসেন।

বড়দিনে সাহেবদের বাংলোয় নেটিভ ঠিকাদার ও কাস্টোমাররা ভেট পাঠাতেন। আর খোদ মেমসাহেব নেটিভ বাসমতিকে উপহার পাঠায়। এত আহ্লাদ রাখে কোথায়?

সেটা একদিক থেকে ভাল হয়েছে। অনেক যন্ত্রণার শিকার হতে বেঁচেছে। না'হলে একদিকে যেমন মিঃ. হবস অন্যদিকে তেমন বাসমতিও একটা বিরোধী চরিত্র হয়ে যেত। কাজেই ও.তার জ্ঞান ও বিশ্বাস নিয়েই থাক, বেশি জানা ভালো নয়।

চৌত্রিশ

তখন গ্রীষ্মকাল। বাতাসে আগুনের হল্কা। এদেশের মানুষরাই সহ্য করতে পারে না, সিসিল মেমসাহেব কি পারবেন? উনি সারাদিন ঘর থেকে বেরুতেন না। সন্ধ্যাকালে সুইমিং কস্টিউম পরে কলমীশায়েরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। প্রায় ঘণ্টা দুই জলে সাঁতার কাটতেন। তবু গায়ের জ্বালা যেত না। আবার মনের ভিতরেও তো কম জ্বালা নেই।

মিঃ. হবস ওঁর ভিতরটা খাক্ করে দিয়েছেন। তাঁর ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। মিঃ. অলবোর্ণ ভীষণ কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছেন। অবশ্য তিনি তার জবাবে লিখেছেন—তুমি আমাকে অত্যধিক ভালবাসো বলেই একজন অপমানিত অফিসারের মিথ্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়েছো। এটা তোমার দোষ নয়। মিঃ. হবস যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা পড়লে সব স্বামীরই রাগে

মাথায় রক্ত চড়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বাস কর সব মিথ্যা। আমি তোমারই এবং সদা সর্বদা তোমারই জন্য ব্যাকুল। এরপর সেই রাত্রের ঘটনাটাকে নিজের তরফে সাফাই গাইবার যত রকম বিশ্বাসযোগ্য পথ আছে তারই উপর আলোকপাত করে বর্ণনা করেছেন ও সেই অপরাধে মিঃ. হবসের চাকরী বরখাস্ত করা হয়েছে তাও জানিয়েছেন। পরিশেষে ডজন ডজন চুম্বন দিয়েছেন।

আশা করে আছেন তাতে মিঃ. অসবোর্ণের মন নরম হবে।

কিন্তু এমন শত্রুতা কে বা কারা করল? মিঃ. হবসের নেপথ্যে যে আরো কিছু চরিত্রের কুটিল ষড়যন্ত্র কাজ করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সেই পুস্তিকাটি বার বার মন দিয়ে পড়ে পিপিং থ্রু দ্যা হোল চ্যাপ্টারে এসে চোখ আটকে যায়। এটাতে তাঁদের প্রথম সম্ভোগ রজনীর বর্ণনা আছে। একেবারে হুবহু। অর্থাৎ কেউ আড়ি পেতে দেখেছিল। কে সে?

নিশ্চয়ই পানমোহরা বাংলোর কেউ। কিন্তু কোন পুরুষমানুষের এমন আড়ি পেতে দেখার মনোবৃত্তি হবে না। হলেও তার সুযোগ নেই। এই অদম্য কৌতুহল মেয়ে মানুষের এবং তার চরিত্রটিও ছিনালীর মত। তেমন মেয়ে পানমোহরা বাংলোতে কে আছে?

চিলি! হতেও পারে।

কিন্তু মিঃ. হবসের সঙ্গে তার যোগাযোগ হবে কী করে? কেউ তা করিয়ে দিয়েছে। কে করাবে? যার স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ।

সে ব্যক্তি কে? মিঃ টেলার! হতেও পারে।

কিন্তু চিলি একটি মামুলী আয়া। মিঃ. টেলারের কাছে এসব কথা অযাচিতভাবে বলতে পারে না। আরো কেউ আছে। যার সঙ্গে মিঃ. টেলারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক আছে। তেমন মানুষ কে? জয়গোপাল! হতে পারে। সে এমন একটা ভাইট্যাল পয়েণ্টে বসে আছে যে সবদিকে যোগাযোগ রাখতে পারে।

এইভাবে তাঁর অনুমান একটা নির্দিষ্ট গতিপথ ধরেই চলে এবং সবকিছু একটা ডায়েরীতে লিখে রাখেন। অনুমানের সমর্থনে প্রমাণ সংগ্রহের কাজও করেন।

কিন্তু এটা এমন ব্যাপার যে কারো সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারেন না। তবু মিঃ. ক্রীগকে বলেছেন —মিঃ. টেলার, জয়গোপাল ও মিঃ. হবসের মধ্যে কি যোগাযোগ আছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে।

উনি কিছু খবর এনেছেন।

এই সময়ে একদিন ডিসেরগড় হাটে মনসারামের সঙ্গে ব্রজর সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

সে হঠাৎ ব্রজর কাঁধে হাত দিয়ে বলল —শ্যালা মেমসায়েবের পেয়ারে এমন ডগমগ যে কুলি বাথানের রাস্তা ভুলে গেছিস।

ব্রজ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বলল —আরে মনসা তুই! তাই তো বলি আমার ঘাড়ে হাত দেয় এমন সাহস কার?

—শোন তোর সঙ্গে কথা আছে।

ওকে টেনে হাটের বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল —এ শ্যালা তুই কি পাপ করেছিস? সিসিল মেমসাহেব তোর দিদি হয় না?

ব্রজ দেখল এর কাছে মিথ্যা বলার চেয়ে সত্যি বলা ভালো।

বলল —ভাই! সেকথা আমি ওকে বলেছিলাম কিন্তু এমন জুলুম করল যে আমি সামলাতে পারলাম না।

—তারপরে কুত্তা বনে গেলি —তোর মাগ ছ্যেলা আছে না?

—কি করব ভাই? পেটের দায়।

—পেটের দায় নয় সুখের ভাত। বসে খাচ্ছিস —গতর বাগাচ্ছিস। খাদে মালকাটার ত কাজ করতে হয় না।

—তা যা বলেছিস। কিন্তু এত খবর তুই কি করে জানলি?

—লঙ্কা বলেছে। ও শ্যালা আরেক পাপী। মায়ের সঙ্গে পীরিত করছে।

ব্রজ কেমন অবাক কণ্ঠে বলল —মা!

হ্যাঁরে চিলি। ও তো বারকুলি সাহেবেরই আওরৎ না কি? আড়ি পেতে তোদের লীলা দেখেছে।

—হে ভগমান! এই কথাটা আমিই জানতাম না।

—কি করে জানবি? মাকে মা বলে, বোনকে বোন বলে রেয়াৎ করতে শিখবি তবে তো মানুষ হবি রে।

এ সেই রাগিনীর ছেলে মনসারাম। লাঞ্ছনা ও অপমান নিয়ে যার জন্ম। লোক সমক্ষে যে মায়ের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা পায় তার ক্রোধ প্রকাশের স্থান কোথা? এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়ায়। নিজেকে বলে কয়লাকুলি। ওর চাকরী কোথাও স্থায়ী হয় না। কোন মালিক রাখবে এই বারুদ ঠাসা বোমাটিকে। হামেশা জেলে যেতে হয় দাঙ্গা ফৌজদারীর দায়ে। তার বউ বৈশাখী কুলি বাথানের কুলি-কামিনদের সঙ্গে খাদে মালকাটার কাজ করে পেটের ভাত যোগায়। সন্তান পালন করে। সেও এক বৈশাখী ঝড়।

মনসা ব্রজকে বিদায় দেবার সময় বলল —দেখবি এসব কথা যেন সাহেবদের কানে না যায়। মেমসাহেবকে ত বলিসই না। তোকে বললাম —সাবধান করে দিতে। মেমসাহেব জানতে পারলে লঙ্কা ও চিলির জান থাকবে না। কথাটা মনে রাখিস।

ওদিকে তখন তুলকালাম কাণ্ড। মিসেস ব্যারাক লউয়ের চিঠি এসেছে।

ভীষণ কড়া চিঠি —তোমরা বাপ মেয়ে ইণ্ডিয়াতে কি করছো? এতদিন তোমার কেচ্ছা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হচ্ছিল এবার তোমার মেয়ের কেচ্ছা শুনতে হচ্ছে। সিসিলের হ্যাণ্ডব্যাগু এসেছিল একটা বাজে সেক্‌স স্টোরি নিয়ে। তা পড়া যায় না এমন বর্ণনা। আমার কাছেও এককপি এসেছে। অর্থাৎ একটা দুষ্টচক্র এসব রটনা করছে। জানি না আসল ঘটনা কি? কিন্তু এই দুষ্টচক্রকে ধরতে তোমরা ব্যর্থ হয়েছো। অথচ সিসিল তার বুদ্ধির বড়াই করে। আর তোমার বুদ্ধির উপরে আমার কোনদিন আস্থা ছিল না আজও নেই। আবেগ নিয়েই একটা জীবন কাটিয়ে দিলে। ওহ্‌ লর্ড যীশাস ক্রাইস্ট! আমি যদি এমন একটা জীবন পেতাম!

ইহ্ বাহ্! মিঃ অসবোর্ণ এখন প্রমোশন পেয়ে মেজর জেনারেল হয়েছেন। তিনি ইণ্ডিয়াতে মিলিটারী গোয়েন্দা মারফৎ খবর নেবেন। এই সেক্‌স স্টোরি যদি সত্যি হয় তবে সিসিলকে ডিভোর্স করবেন। ছেলেদুটিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছেন।

আমি কি করবো? তুমি আমাকে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দিলে না। যদি ইণ্ডিয়ান উওম্যান হতাম তাহলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম। কিন্তু তাতো পারি না। আমাকে এতবড় ব্যবসা চালাতে হয়।

মিসেসের চিঠি পেলেই ত উনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তারপরে এই কঠোর মন্তব্য। কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

বস্তুত এসব ব্যাপার ওঁর মাথায় ঢুকতো না। উনি আবেগের বশে নতুন নতুন কলিয়ারীর পরিকল্পনা করেছেন। নওরঙ্গীতে পাঁচটি কলিয়ারীর নামে আঠারোটি খাদ চলছে। আরো তিনটে খাদ নতুনভাবে করাচ্ছেন। তার চানক কাটাই চলছে। শেষ হলে পানমোহরার মত কলিয়ারী হবে। নওরঙ্গী ডাঙাতে বিরাট হাটতলা করেছেন।

এসময়ে এসব ভালো লাগবে কেন?

উনি টেবিলের উপর হাণ্টার ঠুকে বললেন —এ্যই! বরজোকো বুলাও!

ব্রজ তখন ডিসেরগড় হাটে। সন্ধ্যা নাগাদ বাসায় ফিরে সাহেবের ডাক পেয়ে ছুটে গেল। মুখটা কাঁচু-মাচু করে দাঁড়াল। সাহেবের তাৎক্ষণিক ক্রোধ তখন কিছু ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বললেন —বরজো! তোমার সম্পর্কে অনেক বাজে কথা শুনতে হচ্ছে। ফর যীশাস ক্রাইস্ট! তুমি আমার কাছে একটা ব্যাপারে কন্‌ফেশন দাও।

ভণিতা শুনেই ওর পিলে চমকে গেল। ভিতরটা হু হু করে কেঁপে উঠল। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ফৌজদারী আসামীর মত।

উনি বললেন —সিসিলের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

—মালকানের সঙ্গে চাকরের যে সম্পর্ক!

—নো। গুজব উঠেছে তার সঙ্গে তোমার সেক্স রিলেশন আছে।

ব্রজ মাথা হেঁট করল। উনি বললেন —আমার কাছে সত্যি বল বরজো।

—আমি চাকর স্যার। মালকানের হুকুম তামিল করেছি।

—তাই বলে সেক্স? ব্লাডি বাস্টার্ড! তোর লজ্জা শরম নেই? নীতি ধর্ম নেই? এমন কাজ করতে পারলি?

—হুজুর। আমার দোষ নেই। মেমসাহেব আমার উপর জুলুম করেছিলেন। আমি নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হয়ে আছি। যা শাস্তি দেবার হয় দিন।

—তোকে আমি কি শাস্তি দেবো? মনে হচ্ছে একটা গুলিতে তোর মাথাটা ছাতু করে দিই!

—তাই দিন হুজুর। আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন। মৃত্যুটাও দিন?

ব্রজ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

মিঃ ব্যারাকলউ খুব দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন —রটনার সঙ্গে ঘটনার সাদৃশ্য আছে। আর সেজন্য সিসিল দায়ী। ভীষণ যন্ত্রণায় বুকটা মুচড়ে উঠল। এখন কি করবেন? এই হতভাগাটাকে মেরে কি হবে? কিন্তু এর উপস্থিতি অসহনীয় মনে হচ্ছে। ওকে এখানে থাকতে দেওয়ার অর্থ জেনে-শুনে এই ব্যভিচার মেনে নেওয়া। তাতে তাঁর পারিবারিক মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। মিঃ. অসবোর্ণ যদি সিসিলকে ডিভোর্স করার জন্য মামলা দায়ের করেন তাহলে হাতের কাছে জলজ্যান্ত সাক্ষী পেয়ে যাবেন। তাই উনি তৎক্ষণাৎ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন।

বললেন —বরজো! আমার মনে হয় তোদের এই সম্পর্কে এই মুহূর্তেই ইতি টানা উচিত। তাই আজ রাত্রের মধ্যেই তুই তোর ছেলে-বৌ নিয়ে নওরঙ্গী ছেড়ে চলে যা। কেউ যেন একথা জানতে না পারে। সিসিলের সঙ্গে যেন কোন কারণেই সাক্ষাৎ না হয়। এই নে টাকা। এতেই তোর দেনা-পাওনা মিটে যাবে। যা।

ব্রজর পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেল। হাঁটু থেকে জানু পর্যন্ত এমন ধক্‌ধক্ করে কেঁপে উঠল যে ওখানেই বসে পড়ল।

মিঃ. ব্যারাকলউ উঠে চলে গেলেন। অর্থাৎ এই আদেশের অন্যথা হবে না। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে এল। শক্ত হয়ে দাঁড়াল। টাকাগুলো পকেটে নিয়ে আস্তে-আস্তে নওরঙ্গী হাউস থেকে বেরিয়ে গেল।

মিঃ. ব্যারাকলউ জীবনে কখনো এত বড় আঘাত পাননি। কত লড়াই, ঝগড়া, দুঃখ, বেদনা গেছে। সেই পানমোহরা করার সময় রাত্রে ঘুম হত না। শেরগড় কোল কোম্পানীতে সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। তখন যে মেয়েটি তাঁর সুখে-দুঃখে একাকার হয়ে গিয়েছিল তাকেও একদিন ত্যাগ করে এসেছিলেন সে বেদনা কি কম ছিল? তাও সহ্য করেছেন। এটাও সহ্য করতে হবে।

কিন্তু কি করল সিসিল ? ব্যারাক্লউ পরিবারের সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়েটি নিজের প্রবৃত্তি দমন করতে পারল না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ধিক্কারে ফেটে পড়লেন। খুলে ফেললেন মদের বোতল।

ডাক্তারদের নিষেধ আর মানবেন না।

পঁয়ত্রিশ

পাখীরা যেমন ঠোঁটে করে খুঁটে আনে কাঠকুটো খড় বিচালি, একটু একটু করে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, তা দেয়, বাচ্চা হয়, তেমনি ছিল ব্রজ ও বাসমতির সংসার। কত যত্ন করে একটি দুটি করে সংসারের যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল। একটি একটি করে তিনটি ছেলের জন্ম দিয়েছিল। সুখের সংসার পেতে বাস করছিল পাখীর মত। হঠাৎ ঝড়ে সে বাসা ভেঙে গেল। অথচ কত নিঃশব্দ কত কঠোর সে ঝড়ের তাড়না।

ব্রজর মুখ দেখেই বাসমতির বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাকাচ্চারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোটটি মায়ের দুধ চুষছে। বাসমতি জিজ্ঞাসা করল —কি হয়েছে গো ?

—আজ রাত্রির মধ্যেই আমাদিকে নওরঙ্গী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ও আর্তনাদ করে উঠল – এঁ্যা!

—চেঁচাস না। কেউ যেন জানতে না পারে। সাহেবের হুকুম —লোক জানাজানি হলে চলবে না।

—কি এমন অপরাধ হয়েছে গো যে এত কড়া হুকুম ?

—অপরাধ গুরুতর। সেসব পরে বলবো তোকে। এখন গা তোল।

—এতসব জিনিসপত্র নিয়ে যাবো কী করে ?

—কি দরকার ? যার পয়সায় এসব কিনেছি তার ঘরেই থাক।

—ও! তুমি ত বলছো। আমার যে বুক ফেটে কান্না আসছে গো।

—নওরঙ্গী পার হয়ে নিরিবিলিতে বসে কাঁদবি।

—ধন্য পুরুষ মানুষের প্রাণ।

গাধার পিঠে যেমন চটের বস্তার ছালা দিয়ে মাল চড়ানো হয় তেমনি একটি ছালা সেলাই করল ওরা। তাতে বিছানাপত্র ঠুসে ঠুসে ভরল। একটা টিনের বাক্সে টুকিটাকি জিনিসপত্র নিল। একটা বেডিংয়ের মত করে কাপড় জামা প্যাণ্টগুলি গুটিয়ে নিল। গাইটার পিঠে ছালা চড়িয়ে দেবে। বাসমতি বাক্সটি মাথায় নেবে। ও নিজের পিঠে নেবে বেডিংটি। কিন্তু ছেলে তিনটিকে কি করে নেবে ? মহা সমস্যা।

ওরা আবার ভাবতে বসল। অবশেষে বাঁক নেওয়াই স্থির করল। বেড়া

থেকে বাঁশ খুলে নিয়ে বাঁক তৈরি করল। দড়ি দিয়ে সিক্কা করল। তার একদিকে বেডিং অন্য দিকে কাঁথা কাঁথুড়ী দিয়ে দুটি ছেলে নিয়ে সে কাঁধে বাঁক বইবে। তার একহাতে থাকবে লণ্ঠন। বাশমতি কোলের বাচ্চাটি নিয়ে বাক্সটা বইতে পারলেই হল। অনেকদিন আগে গতর খাটালির কাজ ছেড়ে দিয়েছে। না জানি পথে কত দগদন হবে।

কিন্তু একবার যখন মনস্থির হয়ে গেছে তখন আর ভয় ভাবনা কি? ব্রজ বেশ শক্ত হয়ে গেছে। বাসমতি প্রথম দিকটায় ফিঁচ ফিঁচ করে কাঁদছিল, এখন সেও শক্ত।

অতীতে এর চেয়ে অনেক বেশী আতান্তরে তারা পড়েছিল। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জীবনের পথে পাড়ি জমিয়েছিল। এ আর কি?

তবে সাজানো ঘরকন্না ফেলে দিয়ে যাওয়ার বেদনা কার না বুকে বাজে? যখন কিছুই ছিল না তখন ত ফেলে যাবার বেদনাও ছিল না। সামনে জীবন পিছনে মৃত্যু এই ভাবনাতেই লড়ে গিয়েছিল।

সব গোছগাছ করে বলল —আজ ভাত রঁাধিস নাই?

—হুঁ ত রেঁধেছি ত। খাবার কথা মনেই নাই।

—দে। খেয়ে নি।

—খাবে কিসে? থালা বাসন তো ঢুকিয়ে দিলাম।

—শালপাতা তো আছে। তাতেই দে।

বাসমতি মাটির হাঁড়িতে ভাত রঁাধত। মাটির কড়াইয়ে তরকারী। তার নাকি আস্বাদন ভালো হয়। ছেলেদিকে আগেই খাইয়ে দিয়েছিল। অতঃপর ওরা দু'জন খেতে বসল।

খেতে খেতে বাসমতি বলল —কোথায় যাবে?

—কুলি বাথান। মনসারাম আমাদের জন্যে একটা ঠিকানা তৈরি করে রেখেছে।

—উঠবে কার ঘরে?

—মনসারাম বলেছে আমরা কয়লা কুলি। যার ঘরে উঠব সেই আমাদের ভাইবোন।

—আমার দাদারা তো আছে।

—আমারো ভাইরা আছে। অত ভাবনার কিছু নাইরে বাসমতি। আমাদের জড় ঝাড় নির্বংশ হবে না।

বাসমতি অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। একটু পর বলল —একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে আনতে পারলে ভাল হত।

—এখানে কোথায় পাবি? নওরঙ্গী হাটে গিয়ে দেখবো। ওখানে ভাড়ার গাড়ি চলে। যদি পেয়ে যাই তো ভাল। এখানে ডেকে আনলে

লোক জানাজানি হয়ে যাবে। চল বেরিয়ে পড়ি।

একটা দড়িতে গাইবাছুর বেঁধে গাইটার পিঠে ছালাটা চড়িয়ে দিল। কাঁধে বাঁক হাতে লণ্ঠন নিয়ে গাইয়ের দড়িটি ধরে আগে আগে চলল। বুকে বাচ্চা ও মাথায় বাক্স নিয়ে বাসমতি চলল গাইবাছুরের পিছনে।

তখনো আকাশে শুকতারা ওঠেনি। জ্যৈষ্ঠের মরা চাঁদ কলমীশায়েরে ঝিক্ মিক্ করছে। তার পাশ দিয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছে।

ব্রজর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই কলমীশায়েরে তার কত মেহনত পড়ে আছে। কত স্মৃতি। কত আনন্দের পসরা।

যাক্। সব যাক্। না হলে ব্রজলাল একটা ক্ষুদ্র জগতে অতি ক্ষুদ্র চাকর হয়েই জীবন কাটাতো। পৃথিবীতে আরো যে অনেক বড় কাজ আছে, বড় অভিজ্ঞতা আছে তার হদিস ও পেতো না।

ওর ভবিতব্য ওকে সুখের নীড় ছাড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিন্নতর জগতের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে। মনসারাম তার জন্য একটা ঠিকানা তৈরি করে রেখেছে। কয়লাকু লর শক্ত মাটি।

সে কথা পরে।

সিসিল মেমসাহেব এত সবের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। উনি সন্ধ্যা থেকে স্বপ্নদ্বীপে বসে ব্রজর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। রাত্রি দশটার পর রাগে গস্ গস্ করতে করতে বাসায় ফিরেছিলেন। মিঃ. ব্যারাকলউ তখন মদে চুর হয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সিসিল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একা একা ডিনার সেরে বেডরুমে এলেন। তখনো ওর রাগ কমেনি। কাল সকালে ব্রজকে আচ্ছাসে ধমক দেবেন। আমার সঙ্গে ডেট অ্যাণ্ড টাইম ঠিক করে তা ফেল করার মজা বুঝিয়ে দেবেন।

কিন্তু ওতো ফেল করে না। ভীষণ অনুগত। তাহলে কি বিপদ আপদ হল? ওহো—এদিকটা তো চিন্তা করেননি। যাক্, কাল সকালে খবর নেবেন। তেমন বড় কিছু হলে ওঁকে খবর দিত।

এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ঘুমটা ভেঙে গেল। অহেতুক চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

আজ প্রায় দেড়টা বছর ধরে শুধু ভূতের বেগার খাটছেন। কোম্পানীতে চুরিটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু চোরদের শাস্তি হয়নি। মিঃ. টেলার, মিঃ ব্রাউন, জয়গোপাল তেমনি আছেন। ওঁদের কারচুপিগুলি ধরে এত খাটাখাটুনী করে রিপোর্ট তৈরি করলেন। কড়া ব্যবস্থা নেবার সুপারিশ করলেন। কিন্তু যার জন্য করলেন সেই মিঃ. ব্যারাকলউ-কোন গা করলেন না। কেমন পাশ কাটিয়ে গেলেন।

এখন ঐসব ঘুঘু মালগুলি তাঁর পিছনে লেগেছেন। না হলে মিঃ হবস কোথায় পেলেন --পিপিং গ্রু ছ্যা হেল লিখবার রগরগে বিবরণ। ওদের একান্ত গোপন সুখের প্রহরটি অন্যের কলমে ধরা পড়বে কী করে? নিশ্চয় কেউ আড়ি পেতে শুনেছে। এবং সে চিলি ছাড়া কেউ না।

ওহ্! এই ছিনাল মেয়েটা তার বাপের বারোটা বাজিয়ে এখন ওর পিছনে লেগেছে। ওকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে।

উনি ঠিক আন্দাজ করে নিয়েছেন। কে বা কারা নেপথ্যে থেকে তার নামে কেচ্ছা ছড়িয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এখুনি ব্যবস্থা নেওয়া যেত যদি তাঁর বাবা সহায়তা করতেন। এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তাহলেও ওদের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ তো রিপোর্টে লিখে দিয়েছেন। সেজন্যও তো ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারতো।

এইসব ভাবতে ভাবতে গ্রীষ্মের ছোট রাত ফুরিয়ে গেল। পুবের জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকতেই উঠে পড়লেন। ব্রজর উপর তখন আর রাগ নেই। বরং দেখা হলে বলতেন—হ্যাল্লো বরজোও! কাল সন্ধ্যায় কোথায় ছিলে?

কিন্তু ও এলো না। অন্য একজন আরদালী ওঁর ব্যাগটা গাড়িতে চড়িয়ে দিল। উনি অফিসে চাপরাসী পাঠালেন ব্রজকে ডাকতে।

সে ফিরে এসে জানালো—বরজকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কি?

—হ্যাঁ মেমসাব।

—ওর বউকে জিজ্ঞাসা করলে?

—ওর বাসায় কেউ নেই মেমসাব। বালবাচ্চা জরুগরু কিছু নেই। জিনিসপত্র পড়ে আছে। মনে হচ্ছে রাত্রে ও কোথাও চলে গেছে।

—আশ্চর্য!

ওঁর খটকা লাগল। ব্রজ তার বউ বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবে? তার ত কোথাও যাবার কথা নেই। তা থাকলে বলতো। কোথাও যেতে হলে টাকার দরকার হত। তাও ত চায়নি। তাহলে?

এই প্রশ্নটাই তাঁর মনে খচ্‌খচ্‌ করে সারাদিন ঘুরে ঘুরে এলো। সন্ধ্যায় স্বপ্নদ্বীপে গেলেন। কলমীসায়রে সাঁতার কাটলেন। কিন্তু কোথাও ভাল লাগলো না। সব কেমন ফাঁকা। মনটা দুর্ভার ভাবনায় ভারাক্রান্ত।

নওরঙ্গী হাউসে ফিরে এসে দেখলেন মিঃ ব্যারাকলউ বারান্দায় বসে ঢক্ ঢক্ করে মদ খাচ্ছেন। উনি রেগেমেগে গ্লাস বোতল তুলে নিয়ে বললেন—এত মদ খাচ্ছ কেন?

—তাতে তোর কি? ওঁর বেশ নেশা হয়ে গেছে।

—আমার আবার কি ? অসুখে পড়লে সবাইকে ভোগাবে।

তারপর উনি চাকর বাকরদিকে বকাঝকা করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ডিনার টেবিলে আবার মিঃ ব্যারাকলউয়ের মুখোমুখি হলেন। তখন উনি তাঁর আদরের মেয়ে সিসিল। যত্ন করে ডিনারের প্লেট সাজিয়ে দিলেন। ছুরি দিয়ে মাংসের পিস কেটে দিলেন। চামচে স্যুপ নিয়ে ওর মুখে দিলেন।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ মাই সুইট চাইল্ড! দু'জনে বেশ ভালভাবেই ডিনার খাচ্ছিলেন। এটা সেটা খোশগল্পও হচ্ছিল। হঠাৎ সিসিল জিজ্ঞাসা করলেন—বরজোও তার বউ বাচ্চা নিয়ে কোথায় গেছে জানো ?

উনি কেমন উদাসীন কণ্ঠে বললেন—না ত!

—তুমি কোথাও পাঠাওনি ?

উনি জবাব দিলেন না।

সিসিল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন—কি হল ? বলছো না কেন ?

উনি একটু থেমে বললেন—আমার মনে হয়, বরজো সম্পর্কে তোমার আগ্রহ না থাকাই উচিত।

—তার মানে ?

—ওর জন্য তোমার বদনাম রটছে।

—তাতে কি হয়েছে ?

তোমার ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে। মিঃ অসবোর্ণ এটা পছন্দ করেন না।

—সো হোয়াট ? তুমি কি মনে কর ? আমি ইণ্ডিয়ার কনে বৌ ?

—না। তা মনে করি না। তবে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো।

—তোমার চেয়ে বেশি নয়।

—হোয়াট ? মিঃ ব্যারাকলউ চিৎকার করে উঠলেন।

—চিৎকার করছো কেন ?

—একশোবার করবো। ইউ ন্যাষ্টি গার্ল—একটা বাস্টার্ড সারভেণ্টের সঙ্গে তোমার সেক্স অ্যাফেয়ার্স সাজে না। আমি এজন্য খুব মর্মাহত।

—তাই ওকে সরিয়ে দিয়েছো ?

—হ্যাঁ।

করর্ শব্দে ডাইনিং চেয়ার পিছনে সরিয়ে সিসিল উঠে পড়লেন। তর্জনী তুলে বললেন—আমি তোমার কোম্পানীর বছরে তিন লাখ টাকার চুরি বন্ধ করে দিয়েছি। তুমি সারাজীবন বাজে উওম্যান নিয়ে কেলেঙ্কারি করেছো আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখনো তোমার বাস্টার্ড ইস্যুগুলোকে সহ্য করছি। আর তুমি আমার একটা দুর্বলতা সহ্য করতে পারলে না ?

—না।

—তাহলে আমিই বা কেন সহ্য করবো ? তোমাকে শেষ কথা বলে দিচ্ছি —ওকে যেখানে সরিয়েছো সেখান থেকে নিয়ে এসো। আমি তাকে চাই। সাতদিন সময় দিলাম। এরমধ্যে যদি না আনো তবে আমি ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবো।

খট্ খট্ —খট্-খট্ ! জুতোর আওয়াজ তুলে চলে গেলেন।

মিঃ ব্যারাকলউ থ' হয়ে বসে রইলেন।

ছত্রিশ

মেজর জেনারেল অসবোর্ণের ওয়াইফ হিসেবে সিসিলের যে পরিচয় তা ভারতে ব্রিটিশ আর্মির কাছে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। পানাগড়ে একটা মিলিটারী ক্যাম্প ও অফিস ছিল। উনি সেখানে গিয়ে অফিসারটির কাছে নিজের পরিচয় দেবামাত্র উনি হুকুম তামিলের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

উনি সেই মিলিটারী মারফৎ ম্যাসেজ পাঠালেন —অবিলম্বে হোমে ফিরে যেতে চাই। রাস্তাঘাটের অবস্থা কি এবং কিভাবে যাব ?

দিনকয়েক পর সেই অফিসারটি নওরঙ্গী হাউসেই তার উত্তর নিয়ে এলেন।

"তোমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসার জন্য কোন চিন্তা নেই। ব্রিটিশ আর্মি সে ব্যবস্থা করে দেবে।"

উত্তরটা পেয়ে ওঁর মনটা হাল্কা হল। যাক তাহলে ওর মন গলানো চিঠিটায় কাজ হয়েছে। নাহলে উনি বড় ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

বস্তুত এখন তাঁর প্রতি মিঃ অসবোর্ণের ধারণা কেমন তা আঁচ করে নেওয়ার দরকার ছিল। তা না হলে সিসিলের মত মেয়ে কিভাবে বিলেত যাবেন সে পরামর্শ করার জন্য মিলিটারী অফিসারদের কাছে দৌড়বার দরকার ছিল না। অবশ্য তাতে ওঁর ভালই হল। বিলেত যাত্রায় মিলিটারী অফিসারদের সক্রিয় সহযোগিতা পাবেন। মনস্থির করে ফেললেন।

মিঃ ব্যারাকলউকে রাগের বশে যে কথা বলেছিলেন তাই সত্যি হতে চলল। সাতদিন পার হয়ে গেছে। ব্রজসম্পর্কে কেউ আর উচ্চ-বাচ্য করেননি। খোজ খবরও নেননি। বাপ-মেয়ের আচরণে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। ডিনার টেবিলে ওঁদের দেখা হতই। একজন অন্যজনের জন্য অপেক্ষা করতেন।

তখন নানা বিষয়ে কথা হত। একদিন সিসিল বললেন —ড্যাডী ! তুমি প্যানমোহরায় ঘুঘুর বাসাটিকে ভাঙো। বিশেষ করে মিস্টার টেলার ও জয়গোপাল সরকারের আঁতাত।

—কিন্তু ওরা তো দারুণ কাজের লোক।

—তা সত্যি। তবে হাড় শয়তানও।

—তুমি একাউণ্টসের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঠিকই বিচার করেছ। তবে আমি তো আরো কিছু ভাবি। কারণ এমন কিছু কাজ আছে —যা হিসেবের পয়সা দিয়ে করানো যায় না। ওরা সেই জাতের মানুষ। বিশেষ করে জয়। জানো, শেরগড় কোলিয়ারী বন্ধ হয়ে গেছে। একটা জয় থাকলে তা হত না।

—আমি ওসব ব্যাপার বুঝি না। তুমি ভেবে দেখবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আমি তোমার রিপোর্টটা নিয়ে চিন্তা করছি।

সিসিল হাসলেন। তবু ভাল যে তাঁর রিপোর্টের কানাকড়ি গুরুত্ব উনি দিচ্ছেন। বললেন—আরো একটা কথা ভাববে ড্যাডী। তোমার বাংলোতে কাজ করা লোকজনদের সম্পর্কে আরো খোঁজ-খবর নেবে। আমার মনে হয় ওরা আমাদের গোপন খবর বাইরে চালান করে।

—তুমি কাকে মীন করছো ?

চিলি ! ত্থাট আয়া !

—ওহ ! ওটা তো ব্লাণ্ট উওম্যান।

এসব কথার মধ্যে সিসিল যে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তা উনি বুঝতে পারেন না। বরং খুশীই ব্রজর জন্য ওঁর ব্যাকুলতা নেই দেখে। যেসব ঘটনা ঘটেছে তা সাময়িক।

আহা ! মেয়েটা এতদিন ছেলে ও স্বামীকে ছেড়ে আছে।

সিসিল মেমসাব যাবার দিন-ক্ষণ স্থির করে ফেলেছেন। সেজন্য ক'দিন থেকে ভীষণ ব্যস্ত। সব ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ক্যাশ গুণে সেফ ভল্টে রেখেছেন। ক্যাশ খাতা আপ-টু-ডেট করে সই করেছেন। স্টোরস, ডেসপ্যাচ ব্যাঙ্ক একাউণ্টস মিলিয়ে ক্লোজিং ব্যালেন্স টেনে দিয়েছেন। লাভ-ক্ষতির ব্যালেন্সশীটও তৈরি করেছেন। সব স্টেটমেণ্টের একটা করে কপি নিজের ফাইলে রেখে বাকী সব যেখানে যা পাঠাবার তা ব্যবস্থা করে চিঠি লিখতে বসেছেন।

পানমোহরা ও নওরঙ্গীর সব সাহেবদের নামে নামে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তাঁদের পরিবারের শুভ কামনা করলেন। তাঁরা যেন মিঃ ব্যারাকলউয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর শিল্প-বিপ্লবের আদর্শ সম্প্রসারণে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন সেই আশা পোষণ করে চিঠি শেষ করলেন।

প্রত্যেকের চিঠি খামে সীল করে পাঠাবার জন্য একটা পিওনকে দিলেন। উনি চলে যাবার পর যাতে কাবেরীকে দিনকয়েকের জন্য নওরঙ্গী বাংলোতে আনা হয় তার নির্দেশ দিয়ে ড্রাইভারকে একটা চিঠি ও পাঁচ টাকা বকশিশ দিলেন।

সে তা হাতে নিয়ে সেলাম করতে করতে চলে গেল

সব কাজ শেষ করে এক গোছা চাবি হাতে ডিনার টেবিলে গেলেন। মুখটা থমথমে। চাবির গোছাটা মিঃ ব্যারাকলউকে দিয়ে বললেন —এগুলো তোমার কাছে রাখো ড্যাডী। ভুল করে কাউকে যেন দিয়ে দিও না। বড় আলমারিতে হিসেবের খাতাগুলো আপ-টু-ডেট করা আছে। দেখে নিও।

উনি বললেন —ও. কে.!

সিসিল বুঝলেন উনি এখনো তাঁর কথার অর্থ বোঝেননি। তাই বললেন এবং বেশ ভারাক্রান্ত কণ্ঠেই —ড্যাডী! ইণ্ডিয়াতে তোমার সঙ্গে আমার লাস্ট ডিনার। সেজন্য মনে খুব কষ্ট হচ্ছে।

—তার মানে?

—আমি আজ রাত্রেই হোমে চলে যাচ্ছি।

—কি? কি বলছো তুমি সিসিল? করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন।

সিসিলের বুকটা মুচড়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বললেন—হ্যাঁ ড্যাডী!

ব্যারাকলউ সাহেব ওর হাত ধরে অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন —মাই সুইট চাইল্ড! তুমি আমার উপর রাগ করে যেও না। আমাকে একটা দিন সময় দাও।

বরজোকে নিশ্চয় তোমার কাছে এনে দেবো।

—না ড্যাডী! ওর দুঃখের ভার আর বাড়িও না। মিঃ অসবোর্ণের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। উনি আমার প্রতীক্ষায় আছেন।

—ওহ্! মাই গড! কি ভুল করেছি? আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমারই মেয়ে। আমারই মত গোঁয়ার। আমারই মত নিষ্ঠুর! আমারই মত ক্রেজী!

—ড্যাডী! তুমি এত উত্তেজিত হয়ো না। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। না হলে মিঃ অসবোর্ণ ভুল বুঝবেন। ছেলেরা ভুল বুঝবে। সেটা কি ভাল হবে ড্যাডী?

—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তারপর বিশেষ কিছু কথাবার্তা হল না। নিঃশব্দে ডিনার সেরে উঠে পড়লেন।

মিঃ ব্যারাকলউ হাতে ছড়িটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কলমীসায়রের দিকে। জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিরাট পুকুর। কালো জল টল্‌টল্‌ করছে। ঢেউ ভাঙছে। চাঁদের আলোতে ঝিক্‌মিক্ করছে। ড্রিম আইল্যাণ্ডের সবুজ গাছ-গাছালি কালো ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে।

একবার ভাবলেন —ওখানে গিয়ে বসবেন।

তারপরই মত বদলে ফেললেন। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা নৌকার দড়িটা নিজের হাতে খুলে নৌকায় বসে হালটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। চুপচাপ বসে আছেন। পুকুরের জলে আবার ঢেউ কি? নৌকা একটু একটু নড়ছে। মাঝে মাঝে বৈঠা নেড়ে দিচ্ছেন ওতেই একটু চলছে।

মন বড়ই অশান্ত। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছে। সারাটা জীবন একা কাটিয়ে মেয়ের উপরে বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এখন ওঁর পুরনো দিনগুলো স্মরণে এলে অবাক হয়ে ভাবেন—কি করে একা কাটিয়েছেন?

সময় বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ওঁর খেয়াল হল—ওহো! সিসিল তো আজ রাত্রে চলে যাবে। এই কথাটা এতবার ওঁর মাথায় আঘাত করেছে যে ঐ ভাবনাতেই ভুলে গেছেন—সিসিল আজ চলে যাবে।

তাড়াতাড়ি পাড়ের কাছে এসে লাফ দিয়ে নামলেন। বড় বড় পা ফেলে বাংলোর দিকে চললেন।

সিসিল তখন তৈরি হয়ে বারান্দায় বসে আছেন। একটা মিলিটারী জীপ এসে গেছে। ড্রাইভারের সঙ্গে সেই অফিসারটিও এসেছেন। মিঃ ব্যারাকলউ কেমন সঙ্কুচিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন। অফিসারের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিলিটারী জীপে মালপত্র চড়িয়ে সিসিল বললেন—ড্যাডী। আর তো দেরি করা চলবে না।

—ও. কে. মাই চাইল্ড। কিন্তু তুমি আমার কথাটা বুঝলে না। আমার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছো।

—নো ড্যাডী! ফর গড সেক্। তুমি এরকম ভেবো না। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। গভীর শ্রদ্ধা করি। ড্যাডী তুমি বলো—আমার উপরে তোমার ভুল ধারণা চলে গেছে।

সাদা গাল বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে এবং চোখগুলো জলে ভরে আছে। মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর দিকে তাকিয়ে গভীর মমতায় দুহাত বাড়িয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। সস্নেহে চুম্বন করে বললেন—ইয়েস! আমার ভুল হয়েছে।

সিসিল একটু হাসলেন। দাঁত দুটো ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠল।

বললেন—শরীরের উপর যত্ন নেবে ত?

—সিওর।

—ও. কে. ড্যাডী! গুড বাই!

—গুড বাই!

জীপটা চলে গেল আর মিঃ ব্যারাকলউয়ের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। কি যে অব্যক্ত যন্ত্রণা। তার বুঝি পরিমাপ হয় না।

সাঁইত্রিশ

সিসিল মেমসাহেব যতটা ভেবেছিলেন ব্যারাকলউ সাহেব ততটা ভারসাম্য হারাননি। উনি চলে যাবার পর দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কাবেরী যখন এলো তখনো উনি বিছানায় শুয়ে।

কাবেরী সরাসরি বেডরুমে ঢুকে ওঁর কপালে হাত রাখল। ওর চুড়িতে ঠিন্ ঠিন্ শব্দ হয়েছিল। তাতেই সাহেবের তন্দ্রা কেটে গেল। উষ্ণ কোমল হাতের স্পর্শে সুখবোধ করলেন।

ওর হাতটা নিজের হাতে চেপে ধরে বললেন — কাবেরী!

--হ্যাঁ সাহেব!

--সিসিল বিলেত চলে গেল! কি আশ্চর্য অবসন্ন সেই কণ্ঠস্বর।

—জানি সাহেব।

—আমার উপর খুব রাগ করে গেল।

—কেন সাহেব?

—সে অনেক কথা। পরে বলবো তোমাকে। কিন্তু তুমি কি করে এলে?

—আমাকে আনতে তোমার গাড়ি গিয়েছিল। এই ছাখো, সিসিলের চিঠি। চিঠিটা খুলে ওঁকে দিল। উনি হাত বাড়িয়ে চশমা খুঁজলেন। কাবেরী একটা চশমা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিল।

উনি চিঠিটা পড়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কাঁপা গলায় বললেন —

—দেখো! আমার মেয়ে আমার জন্য কত ভাবে। ঠিক এই সময়ে কাকে কাছে পেলে মনের দুঃখ ভুলতে পারবো তা ও জানে। কাবেরী! আমি সত্যিই তোমার কাছে অব্লাইজড!

বিকেলে সাহেবরা এসেছিলেন। জয়ও এসেছিল। সিসিল মেমসাহেব চলে যাওয়ার জন্য ওদের মনে খুশি খুশি ভাব। বড় বড় কথা বলে সিসিলের প্রশংসা করলেন। ওঁর বিলেত যাওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যুক্তি দেখালেন—ইউরোপের মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ সময়ে যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতি মিঃ অসবোর্ণ তাঁর স্ত্রীকে কাছে পেলে যে উদ্দীপিত ভূমিকায় বাকি যুদ্ধটাকেও কাবার করে দেবেন এবং দেশের জন্য এতবড় যুদ্ধ জয়ে তিনি যে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাবেন সে বিষয়ে উচ্চ আশা পোষণ করলেন।

এসব কথাবার্তার বেশ একটা প্রেরণাদায়ী ক্ষমতা আছে। মিঃ ব্যারাকলউয়ের মনের ভার অনেকটা কেটে গেল। তিনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ হলেন এবং সিসিলের যাত্রা যাতে শুভ হয় সেই কামনা করে সকলকে স্বাস্থ্যপানের আহ্বান জানালেন। সাহেবরা বাধিত হলেন। বহু শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

জয় কাবেরীকে একান্তে ডেকে বলল —ঈশ্বরের অপার করুণা, আমাদের মাথার উপর থেকে একটা রাহু চলে গেল। তুমি সাহেবকে দেখো। দরকার হলে দিনকয়েক থেকো।

কাবেরী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

স্বপ্নদ্বীপের স্বপ্ন মায়ায় তুটো দিন কাটল। নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার মত ত্ু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়ালেন। কাবেরীর গানের সুরে কলমীসায়েরের জলজ উদ্ভিদগুলিও কৌতুহলে মাথা তুলে দাঁড়ালো। সাহেব খুব খুশি।

তৃতীয়দিন সকালে চা-টা খেয়ে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। খনি বিজ্ঞানের এই ম্যাগাজিনটির বিশ্বজোড়া নাম। এর প্রত্যেকটি পাতা ছাত্ররা গিলে খায়। অভিজ্ঞরাও তাঁদের অভিজ্ঞতা ঝালিয়ে নেন। অনেক কিছু নতুন জিনিসও পান।

এই ম্যাগাজিনে মিঃ. ব্যারাকলউয়ের একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ বের হচ্ছিল। মানুষ যখন বড় হন, বয়োঃজ্যেষ্ঠ হন তখন তাঁকে অনেক সভা সমিতিতে সভাপতিত্ব করতে হয়। সেমিনারে যোগ দিতে হয়। বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠও করতে হয়।

এত কাজের মধ্যেও ব্যারাকলউ সাহেবকেও তা করতে হত। বিভিন্ন প্রকারের পাথর, মাটি, ফসিল ও উদ্ভিদ দিয়ে তাঁর যে সংগ্রহশালা এবং ঐসব বক্তৃতা ও প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে তিনি 'গণ্ডোয়ানা ডিপোজিশন' নামে ভূতত্ত্বের উপর এই রচনাটি লিখেছিলেন। এর পূর্বেও তাঁর অনেক মননশীল রচনা ঐ ম্যাগাজিনে বেরিয়ে গেছে। তাই তাঁর ভালো নাম আছে। আর এমনিতেও তো তিনি যখন শেরগড় কোল কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন তখনই বিশিষ্ট মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। একটা মাইন প্ল্যান তৈরি করে তিনি গর্বভরে বলতে পারতেন এরকম প্ল্যান ভারতের ত্ু'পাঁচটি ম্যানেজারেই করতে পারে।

কাবেরী এসে ওঁর পাশে বসে পড়ল। উনি চোখ থেকে চশমা খুলে ভুরু নাচিয়ে বললেন —কি ?

কাবেরী বলল —তুমি আজ অফিস যাবে ?

—হ্যাঁ।

—ড্রাইভারকে বলে দাওনা —তোমাকে অফিসে পৌঁছে দেবার পর আমাকে যেন নিয়ে যায়।

—তুমি কোথায় যাবে ?

—বাঃ রে! আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না ?

—না। সাহেব খুব গম্ভীর ভাবে কথাটা বলে আবার বইটা হাতে নিলেন।

—বাঃ রে! তুমি তো বেশ একটি না বলেই খালাস। আমার ঠাকুরের পায়ে আজ দু'দিন ফুলজল পড়েনি, সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া হয়নি।

সাহেব কেমন উষ্ণ কণ্ঠেই বললেন —ওসব কুসংস্কার ছাড়ো ত।

—এঃ মা। তুমি একে কুসংস্কার বলছো? ঠাকুর পুজো কি তা জানো?

—তাহলে তোমার ঠাকুরকে এখানেই নিয়ে এসো। আমি তার মন্দির গড়িয়ে দেবো। কিন্তু তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি আমার কাছেই থাকবে।

কাবেরীর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল —তা কি করে হবে সাহেব?

—কেন হবে না?

—তুমি আমার বিয়ে দিয়েছো সাহেব। আমি পরের বউ।

—তুমি তো আর ছাপমারা গৃহবধূ হয়ে জয়ের গলা জড়িয়ে থাকো না। ওকে আমি বলে দেবো —কোন আপত্তি করবে না।

কাবেরী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল —জিদ্ করো না সাহেব। ও হয়ত আপত্তি করবে না। কিন্তু আমার মেয়ে বড় হয়েছে। তার কাছে মুখ দেখাবো কি করে? আমাকে এত ছোট করে দিওনা সাহেব।

সাহেব চিন্তিত মুখে বললেন —সরিতা বুঝি এবার বি এ পাশ করবে? ওকে আমার কাছে রেখে দাও। ও তো আমার মেয়ে।

—সে স্বত্ব তো তুমি ছেড়ে দিয়েছো সাহেব। ও এখন মিঃ সরকারের মেয়ে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন উনি। চিৎকার করে বললেন —তবে কি কেউ আমার আপনজন নেই?

—রাগ করছো কেন সাহেব? তোমার স্ত্রী আছেন। মেয়ে জামাই নাতি-নাতনী আছে।

—না। ওরা কেউ আমার আপন নয়। আমি সারাজীবন একাই লড়ে গেলাম। ভারতে থেকে এতবড় ব্যবসা গড়ে তুললাম। তাতে তারা কতটুকু সাহায্য করেছে? এখন যে রোগে ব্যাধিতে জরাজীর্ণ হয়ে গেছি, কে দেখতে আসছে?

উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কথাগুলো বলে উনি হাঁফাতে লাগলেন। কাবেরী মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে আছে। ওর মনে ভয় ঢুকে গেছে। এখন সাহেবের মাথা গরম হয়ে গেলে সামলানো দায় হয়ে উঠবে।

সাহেব আবার বললেন —এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমি বৃদ্ধ হয়েছি। এখন আমি চাই একটু স্নেহ, ভালবাসা। এই সময়েই তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে। ছিলে নাচমহলের নাচগার্ল। ছাখ গে তোমার বন্ধুরা অর্জুন পল্লীতে বেশ্যাগিরি করছে। আর তুমি পূজারিণী বনে গেছো। তোমার সিঁথিতে

সিঁদুর চড়া করিয়ে দিয়েছি। একটা ডেফিনিট স্ট্যাটাস দিয়েছি। তাই তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছো ?

শুনতে শুনতে কাবেরীর অন্তর ছিঁড়ে যাচ্ছিল। দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বলল —ভুল বুঝো না সাহেব। তোমার উপর প্রতিশোধ নেবো আমি ? এত অকৃতজ্ঞ ভাবছো ?

সাহেব জবাব দিলেন না। কাবেরী আবার বলল —যখন আমাকে কাবেরী কুটিরে রেখে দিয়ে এলে সরিতা তখন আমার পেটে। চোখের জলে দিন কেটেছিল। শুধু গানটুকু সম্বল করে জীবন কাটছিল। তবু কখনো তোমার অমঙ্গল চিন্তা করিনি। আর আজ তো তোমার দয়ার দানে আমার সংসার ভরে গেছে। এ সময়ে কেন তুমি এমন অন্তর ছেঁড়া কথা বলছো সাহেব ? বলো —কখনও আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি। যখনই চেয়েছো তখনই তোমার কাছে এসেছি। যা চেয়েছো তাই দিয়েছি। স্বামীর কথাও ভাবিনি।

সাহেব কেমন নিষ্ঠুরভাবে বললেন —ওসব তোমার প্রেমের অভিনয়। তুমি তো রঙ্গনটী। কার সাধ্য বোঝে কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল।

কাবেরী চিৎকার করে উঠল —সাহেব ! তাহলে বুক ফেটে মরে যাবো। গলায় দড়ি দিয়ে কড়িকাঠে ঝুলে পড়বো।

সহসা সাহেব এক বিজাতীয় কণ্ঠে চিৎকার করে কাবেরীকে চেপে ধরলেন —নো-নো-নো। ইউ কান্‌ট !

চোখ দুটো কেমন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। সারা গা কাঁপছে। আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছেন। কাবেরীর কেমন সন্দেহ হল। এটা তো স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। তাড়াতাড়ি কলিং বেল টিপে দিল। হুড় মুড় করে ঘরে ঢুকল বেয়ারা, খানসামা।

কাবেরী তখন চিৎকার করে ডাকছে —সাহেব ! সাহেব !

উনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। চোখ দুটো কচলে বললেন —তোমরা কেন ?

কাবেরী বলল —আমি ডেকেছি।

—কেন ?

—তুমি কেমন চিৎকার করে উঠেছিলে।

—দ্যাটস্‌ নাথিং। ওদেরকে হাতের ইশারায় বাইরে যেতে বললেন।

—আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সাহেব। কেন অমন করে উঠলে ?

—একটা দুঃস্বপ্ন ! এ পীস অফ এ ড্রেডফুল ড্রীম !

—কি এমন দুঃস্বপ্ন সাহেব ?

—একটা মেয়ে। বিউটিফুল উওম্যান। গলায় কাপড় বেঁধে বিম থেকে ঝুলছে। জানো সেই মেয়েটি কে ?

—না সাহেব।

—অহল্যা ! সিস্টার অফ ইয়োর ফাদার-ইন-ল।

—হে ভগবান ! আমার সেই নিরুদ্দিষ্টা পিসশাশুড়ী।

– নিরুদ্দিষ্টা নয়। মৃতা। এ স্যাকৃরেড সতী। আই রিগার্ড হার সোল। আমেন !

বুকে ক্রশ চিহ্ন এঁকে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

কাবেরী কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল—ওঠ সাহেব। এখানেই তোমার ব্রেকফাস্ট দিতে বলছি।

—ওঃ ইয়েস। তুমি রেডী হও। অফিসে গিয়ে তোমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

উনি বাথরুমে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর অফিসের পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন। ব্রেকফাস্ট তৈরিই ছিল। নিঃশব্দে খেয়ে ন্যাপ্‌কিনে হাত মুছে বেরুলেন। কাবেরী ওঁর পিছনে এসে বারান্দায় দাঁড়াল।

সাহেব গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন—ও. কে.। পৌছে গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাই—

গাড়ী ছেড়ে দিল।

কাবেরীর আর তৈরি হবার কি আছে ? বাথরুমে মুখ হাত ধুয়ে একটু হাল্কা প্রসাধন করে নিল। শাড়িটা বদল করে নিল।

রাস্তায় যেতে যেতে কত কথা মনে এসে ভিড় করতে লাগল। সাহেব কোন দিনই ওকে রূঢ় কথা বলেননি। আজ কি হল ? এত ক্ষেপে গেলেন কেন ? উনি তো জানেনই কাবেরীর পক্ষে পুনরায় সাহেব বাংলোতে এসে রক্ষিতার পরিচয়ে থাকা সম্ভব নয়। ওঁর প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যাত হবেই তা জেনেও তাকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেবার কি মানে হয় ?

তারপরে যা হল তাতে এতদিনের সম্পর্কে চিড় খেয়ে যাবে না তো ? সেজন্য জয়ের উপরে কোন আঘাত আসবে না তো ?

এলেই বা কি হবে ?

একটা অশুভ ইঙ্গিত মনের মধ্যে উঁকি দিতেই বুকটা মুচড়ে উঠল। দু'চোখ ভরে জল এলো। সারা জীবন দিয়েই এলাম তবু কারো মন পেলাম না। আমি যে রঙ্গনটী। আমার ভালবাসা আসল না নকল তা ওঁরা কি করে বুঝবেন ? আজ ব্যারাকলউ সাহেব যে কথাটা বললেন কাল জয়ও সে কথাটা বলবে।

হে ঠাকুর ! তুমি তো সব জানো। আমি সতী নই বলে কি সৎভাবে ভালবাসারও দাম নেই ?

কাঁদতে কাঁদতেই রাস্তাটা ফুরিয়ে গেল। বাড়ির কাছে নেমে কেমন স্খলিত পায়ে চলতে শুরু করল। ড্রাইভার যে সেলাম করল তাও তাকিয়ে দেখল না।

কি মর্মান্তিক তার হৃদয় বেদনা !

আটত্রিশ

বিবিবাথান থেকে কুলি বাথানে এসেই যে মনসারামের সব মুস্কিল আসান হয়ে গিয়েছিল তা নয়। শেরগড় কোল কোম্পানীর সাহেব, গোমস্তা ও চাপরাসীর দল আগুনের মত গরম হয়ে গিয়েছিলেন।

একসঙ্গে ষাট-সত্তরটি পরিবার ডেরা-ডাণ্ডা নিয়ে যে একরাতের মধ্যে চলে যেতে পারে এটা তাদের কাছে আশ্চর্য ঠেকলেও ঘটনা তাই ঘটেছিল। নেহাৎ বিবিবাঁধ কোলাপস হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁদের উপরওলারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং মাইনস ডিপার্টমেণ্টের অফিসাররা ব্যাপারটার তদন্ত করতে লেগেছিলেন তাই তখুনি কোন অ্যাকশন করতে পারেননি।

কিন্তু রাগ পোষা ছিল। ছল ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

কুলি বাথানের মানুষজন খড়কুটো সংগ্রহ করে আপন আপন ঝুপড়ি তৈরি করতেই বছর খানেক লাগিয়ে দিয়েছিল। তত দিন তারা ক্ষেতে খামারে জন-মজুর খেটেছিল, চঞ্চলবাবুর বনবহাল, ব্যারাকলউ সাহেবের পানমোহরা, সাতঘরিয়া ও মার্টিনের রঘুনাথ চক প্রভৃতি কলিয়ারীতে কয়লা কুলির কাজ করেছিল। তারপর একটু একটু কার থিতু হয়ে সবাই কয়লা কুলির কাজ করছিল।

সে সময়ে চঞ্চলবাবু ওদেরকে খুব মদৎ দিয়েছিলেন। না দেবেন বা কেন ? জনশক্তির তো একটা দাম আছেই। ওরা যেমন কঠিন কঠিন কাজ করে বনবহাল কলিয়ারীর আয় উন্নতি বাড়িয়েছিল তেমনি আবার বহু গড়লায়েক পতিত ডাঙা হাসিল করে বাবুর জমিদারি সেরেস্তায় কর ও সেলামীর উপার্জন বাড়িয়েছিল। যে লোকগুলি শেরগড় কোল কোম্পানীর বিদ্রোহী শ্রমিক তারাই বনবহালের অনুগত কর্মী। চন্দনবাবুর সঙ্গেও সমঝোতা করে নিয়েছিল।

কিন্তু বছরখানেক পর চঞ্চলাজোড়ের কিনারায় একটা ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। সেটি ছিল হরদেও গোমস্তার কোন আপনজনের লাশ। কে বা কারা খুন করেছেকেন করেছে এসব যদিও রহস্যাবৃত তবু হরদেও গোমস্তা পুলিশের কাছে নালিশ করল যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে কুলি বাথানে। তার সঙ্গে একটা লাগসই গল্পও জুড়ে দিল এইভাবে যে মৃত ব্যক্তিটির মনসারামের বউ বৈশাখীর সঙ্গে গোপন প্রণয় ছিল। সেই কারণে বৈশাখীর পক্ষে টোপ দিয়ে ওকে কুলি বাথানে নিয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। এবং ও তা করেছিল। তারপর মনসারাম ও তার দলবল তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে চঞ্চলাজোড়ের ধারে ফেলে দিয়েছে।

এমন একটা কাহিনী পুলিশের কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা বিচার সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু রূপচাঁদের তো একটা মহিমা আছে। তারই বলে কুলি বাথানে পুলিশ নেমে পড়ল অতর্কিতভাবে।

বৈশাখী কোন রকমে মনসারামকে পালিয়ে যাবার পথ করে দিয়ে নিজেকে জলাঞ্জলি দিল।

যে পুলিশটি তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিল তারও উপরওলা ওর ঘরে এসে মনসারামকে না পেয়ে বললেন—তুই যৌবনের ঠমক দেখিয়ে পুলিশকে বশ করলি আর নিজের মরদকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলি। এত শিয়ান তুই। ঠিক আছে—এমন দাগ দেগে দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে কোন পুরুষ তোর জোয়ানী দেখে ভুলবে না।

সেইদিনই উনি ওর গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিলেন। দুটি গাল পুড়িয়ে প্রেতমূর্তি বানিয়ে দিলেন।

ব্যাস্। আর কোন পিছুটান রইল না। রূপ, যৌবন, সতীত্ব, সব খুইয়ে বৈশাখী হয়ে গেল অত্যাচারিতার মডেল।

কোর্ট কাছারি অনেক হল। তবে তখন মাস্টারবাবু ছিলেন, তিনি সামাল দিয়েছিলেন। জমিদারদেরও অনুগ্রহ ছিল। তাই মনসারাম সে যাত্রা বেঁচে গেল।

কিন্তু এক যাত্রা বাঁচলেই তো হয় না। আবার ঝামেলা হয়। আর যেখানেই কোন ঝামেলা হয় মনসারামই যেন তার জন্য দায়ী। দু'পাঁচটা ফৌজদারি মামলা হরদম ওর নামে ঝোলে। সে তো দাগী আসামী।

বনবহাল কোলিয়ারীতে টালোয়ানের কাজ করে। ওর বউ করে মাল কাটার কাজ। নিতাই, গোউর, শান্তি ও মালতীর সঙ্গে বৈশাখীর মা-বাবাও একসঙ্গে কাজ করে।

তবে ওদের সংসার পৃথক হয়ে গেছে। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে ঢালুদাস ও ছলনাদাসী মারা গিয়েছিল। ফৌজদারি মামলার দায়ে মনসারাম কখনো পালিয়ে বেড়ায়, কখনো হাজতবাস করে, কখনো অন্য কোলিয়ারীর কুলি-কামিনদের দায় ঠেকাতে যায়। সেজন্য ওর হাজিরা কাটা যায়। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে।

মনসারামের পুরো হাজিরা থাকলে সংসারটা একটু স্বচ্ছলভাবে চলে। তখন ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন করে জামা-কাপড়, বৈশাখীর জন্য কাঁচের চুড়ি হাট থেকে কিনে আনে। বউয়ের পোড়া গালে চুমু খেয়ে সোহাগ করে। না হলে মাড়-ভাত খায়। তবু মুখের হাসিটি মলিন হয় না।

এমনি সব সুখ-দুঃখের সংসার। কিন্তু তাদের মনে একটা প্রতিজ্ঞা আছে বিবিবাথানের মানুষ কুলি বাথানে এসেও খুন দিয়ে যাচ্ছে। এই জমানা তারা

বদল করবে। তাদের জড় ঝাড় যে যেখানে আছে তাদের বিপদ-আপদের সামিল হবেই।

সেই সুবাদে ব্রজলাল ওদের আপনজন। সে যখন বউ বাচ্চা মোটরি গাঁঠরি নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর সওয়ার হয়ে কুলি বাথানে পৌছেছিল তখন মনসারাম ওকে ভালভাবেই গ্রহণ করেছিল।

ওর কুলি বাথানে বাস করতে আসার যে কারণ তা একমাত্র মনসারাম ছাড়া কেউ জানে না। ব্রজ ওর কাছে কোন কথা লুকোয়নি। মনসারাম বলেছিল —তোকে আমি চেতাবনী দিয়েছিলাম রে। তখন শুনিসনি। শেষ পর্যন্ত এই দশা হল। শালা সাহেবদের জন্যে তুই জীবন দিঞে দিলে উয়াদের মন পাবি নাই। যাক্ গা যা হবার হঞেছে চল তুকে চঞ্চলবাবুর কাছে নিঞে যাই।

চঞ্চলবাবুর কাছে গিয়ে পেয়ে গেল মালকাটার চাকরি।

এখন ও নতুন পরিবেশে থাপ খাইয়ে নিয়েছে। সুখ পেয়ে পেয়ে শরীরগুলো বে-জুত হয়ে গিয়েছিল, এক ধাক্কাতেই ঠিক হয়ে গেছে। বউকে নিয়ে দিব্যি কয়লা কাটছে, গাড়ি ভরছে, হাজরি পাচ্ছে। কুলি বাথানের কুলি-কামিনদের সঙ্গে মিশে গেছে।

নেহাৎ অসময়ের আশ্রয়দাতা বলেই চঞ্চলবাবুর প্রতি মনসারামের আনুগত্য, না হলে মালিক শ্রেণীর মধ্যে কোন ফারাক ও বোঝে না। সুদ ও মহাজনী কারবার সর্বত্রই সমান। তবে কি সাহেবদের কুঠিতে গোমস্তাবাবুদের যে বাড়তি খাঁইয়ের দরুণ অত্যাচার সেটা চঞ্চলবাবুর খাদে নেই। উনি নিজেই সবকিছু দেখা-শুনা করেন। তাই খয়ের খাঁদের উৎপাতটা কম। শুধু এইটুকুর জন্যই মনসারামরা বাধিত। না হলে উনি বেতন এক পয়সা করে কম দেন।

ব্যারাকলউ সাহেব যে মনসারামের জন্মদাতা তার জন্য ওর প্রতি কোন শ্রদ্ধা ওঁর ছিল না। বরং ঘৃণাই করত।

ব্রজকে বলত —সাহেবরা নিজের সুখের জন্য কিনা করতে পারে? একদিন আমাদের মা-দিকে চুষে খেঞেছিল। গুচ্ছেক বেজন্ম ছ্যোলা-পিলা পয়দা করে নর্দমায় ফেলে দিঞেছিল। আজকে যদি তার ব্যাটা থাকত তবে আমাদের বউ বিটিগুলিনকে তেমনি করত। বিটি আছে বলে তুকে কুকুর বেনাঞে দিলেক। আমি থাকলে আমাকেও তাই করত। ই-সব যখন ভাবি তখন আমার হাড়-পাঁজরে আগুন জলে। আমার বউয়ের দুগ্গতির কথা যখন মনে হয় তখন আগুনের তেজে মগজটি ফেটে যায়। তুরা ত উয়ার পুড়া গাল দুটিই দেখেছিস। আর কিছু দেখাবার লয় বলেই দেখতে পাস না। উঃ সে কি অত্যাচাররে ব্রজ।

ব্যথায় বেদনায় ভিতরটা টন্ টন্ করে। বৈশাখীকে ও অদ্ভুত ভালবাসে। তার পোড়া অঙ্গগুলিকে চোখের জলে ভিজিয়ে দেয়।

বৈশাখী বলে —তুমার মতন মানুষকে কাঁদতে নাই।

দিন পনেরোর মধ্যে বর্ষা নামল। আকাশ জোড়া কালো মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ রেখায় মেঘ ছিঁড়ে ফালা ফালা। সন্ধ্যা নামলেই জগৎ অন্ধকার।

মিঃ ব্যারাকলউ নওরঙ্গী হাউসের বারান্দায় বসে চুরুট মুখে দিয়ে মেঘ ও বিদ্যুতের খেলা দেখছেন। পা দুটি টেবিলের উপর চড়ানো। একটি গ্লাসে হুইস্কিও আছে। মনটা ভারাক্রান্ত।

মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চমকালে মনে হয়, এই বুঝি সিসিলের মুখটা উঁকি দেবে। ওঁর চলে যাওয়াটা তাঁর কাছে ক্ষতিকর কিন্তু ওঁর নিজের কাছে তো লাভজনক। স্বামী-স্ত্রীর একটা বিরোধ বেধে যেতে পারতো। তা থেকে রেহাই পাবে।

কিন্তু ব্যাচারী কাবেরী?

সেদিন ওকে বড্ড কড়া কথা বলে দিয়েছেন। কাঁদতে কাঁদতে গেছে। ড্রাইভার লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখেছে সারা রাস্তা মেম সাহেবের চোখ দিয়ে জল পড়েছে। ফিরে এসে সেকথা ও তাঁকে বলেছে। চাকর, বাকর, ড্রাইভার, কচোয়ান সবাই ওকে ভালবাসে। তারা হয়ত মনে মনে সাহেবকে ধিক্কার দিচ্ছে।

বেয়ারা একটা ফাইল দিয়ে গেল। উনি খুলে দেখলেন কিছু বিল ভাউচার তাঁর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেসব বন্ধ করে দিয়ে বেয়ারাকে বললেন —এ ফাইলটা কাল সকালে মিঃ ক্রিগকে দিও।

সিসিল থাকতে এসব ব্যাপারে ওঁকে মাথা গলাতে হত না। বুকের ভিতরটা কিরকম ফাঁকা মনে হল। বেয়ারাকে ডেকে বললেন —সিসিল মেমসাহেবের ঘরটা খুলে দে তো?

বেয়ারা ঘর খুলে আলো জ্বালিয়ে দিল।

সাহেব ঘরে ঢুকলেন। কি সুন্দর সুগন্ধ। সিসিল যে পারফিউম ব্যবহার করতেন তারই গন্ধ ছড়িয়ে আছে এখনো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর ছিমছাম সাজানো। যেদিকেই তাকান রুচি এবং আভিজাত্যের ছাপ। দুটো কাঁচের আলমারি ভর্তি বই। তেমনি লেখার টেবিলে কালি, কলম, কাগজ ও রাইটিং প্যাড। একটা ইংরেজি ক্যালেণ্ডার। যীশাস ক্রাইস্টের ছোট্ট মূর্তি। সিসিল ও মিঃ অসবোর্ণের ছবি। সব নিখুঁতভাবে সাজানো। এমন মেয়ে কি করে যে সেক্স স্ক্যাণ্ডালের শিকার হতে পারে তাই ধারণা করা যায় না। অথচ ঘটনাটা মিথ্যেও নয়।

একটা আলমারি খুললেন। সেটাতে বইয়ের একপাশে কয়েকটা ফাইল। উনি সেটা খুলে বসলেন।

মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারের ফাইল যে বাপে পড়তে বসবেন এটা বোধহয় সিসিল মেমসাহেবের হিসেবের বাইরে ছিল। সে যাইহোক উনি পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মিঃ হবসের সেক্স স্টোরীটার যেখানে সেখানে লাল ও কালো কালির দাগ। জায়গায় জায়গায় জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কোথাও বা মার্জিনে লেখা ফল্‌স, বোগাস এইসব জাতীয় শব্দ। পিপিং থ্রু দ্যা হোল চ্যাপ্টারে প্রশ্ন হাউ হি কুড নো?

আরো পাতা উল্টে যান। ডায়েরীর ছেঁড়া পাতাগুলি একসঙ্গে পিন্ দিয়ে গাঁথা। তাতে চিন্তা ভাবনা ও অনুমানের আলেখ্য।

মিঃ ক্রিগ যে রিপোর্টটা তৈরি করে দিয়েছিলেন জয়, মিঃ টেলার ও মিঃ হবসের যোগাযোগের ব্যাপারে, তাতেও কয়েকটি জায়গায় লাল কালির দাগ। কয়েকটি প্রশ্ন বিস্ময় সূচক চিহ্ন।

তারপর একটি পাতায় একটি ছক। সিসিলের নিজের হাতের লেখা। তাতে পানমোহরা বাংলো এবং তার লোকজন—তার সঙ্গে—জয় ও সংশ্লিষ্ট লোকজন, মিঃ টেলার, মিঃ হবস ও আরো অনেক সাহেব মেমসাহেবের নাম।

পানমোহরা বাংলোর চিলি নামটাকে লাল কালিতে গোল করে দাগ দেওয়া। সেখান থেকে একটা তীর চিহ্ন ক্রমান্বয়ে লঙ্কা, জয়, মিঃ টেলার ও মিঃ হবসকে ছুঁয়ে গেছে।

প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ সবকটি পাতা মন দিয়ে পড়লেন। কোন কোন জায়গা ঘুরে ফিরে। অবশেষে তিনিও ঐ ছকটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হলেন।

তারপর সেসব বন্ধ করে ডিনার টেবিলে বসলেন। তখন রাত প্রায় এগারোটা।

শুতে গিয়েও ঘুম এলো না। পুনঃ পুনঃ মাথার মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে — ওঃ! সিসিলের বিরুদ্ধে এত বড় ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে। অথচ তিনি এর বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। তাই বুঝি সিসিল বার বার মিঃ টেলার ও জয়গোপালের পারস্পরিক আঁতাতের কথা বলতেন।

মেয়েটা কত খেটেছিল। ষড়যন্ত্রের রহস্য ঠিক ভেদ করে ফেলেছিল। তাঁর সহায়তা পেলেই সবাইকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে পারতো তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার ফল কী হতে পারে?

আর বার বার ঘুরে ফিরে আসছিল —জয় তুমিও!

আফসোস! বহুত আফসোস! এ জগতে বিশ্বাস করাটাই পাপ!

সেই মধ্যরাত্রে টেনে বের করলেন সিসিলের সুপারিশ ফাইলটা। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন —দু'দুটো কোল কোম্পানীতে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার পুঁজি ও পঁচিশ ত্রিশ হাজার শ্রমিক খাটছে, সেখানে একটা লোকের হাতে ঠিকাদারি, গোমস্তাগিরি এবং মহাজনী বৃত্তি চলতে দেওয়া উচিত হয়নি। সে ত অনায়াসে আমাদের কোম্পানীর অফিসার ও বাবুদিকে দুর্নীতি চক্রে জড়িয়ে ফেলতে পারে এবং তাই হয়েছে। কোল কোম্পানীর প্যারালাল আর একটা কোম্পানী রান করছে। মিঃ ব্যারাকলউ এত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়েও কেন যে তাকে এতটা প্রশ্রয় দিয়েছেন সেটা ভাবার বিষয়।

নিশ্চয়ই ভাবার বিষয় এবং এখন উনি তাই ভাবছেন। তাঁর মেয়ে তাঁর সম্পর্কে যে কটাক্ষ করেছেন তার অর্থও তিনি ধরতে পেরেছেন।

কাজেই আর নয়। এবার শক্ত হতে হবে!

উনচল্লিশ

সেদিন উনি সকালেই এলেন পানমোহরায়। অফিসের নানা কাজ-কর্মে দুপুর হয়ে গেল। লাঞ্চের জন্য বাংলোয় এলেন। লোকজনরা সব সেলাম দিতে এলো। উনি সকলকে স্মিত হাসি উপহার দিয়ে রাজার মত বসলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর চিলির ডাক পড়ল। অনেকদিন পর সাহেব এসেছেন তাই সে সেজে-গুজে তৈরি হয়েই এসেছে। সাহেব তখন সিরিফ আণ্ডার ওয়্যার পরে বিছানায় শুয়ে আছেন। ওকে কাছে ডেকে গালে টুসকি দিয়ে বললেন —বাঃ। তোকে যে বেশ টুসটুসে দেখাচ্ছে রে। মনেই হয় না যে বয়েস হয়েছে।

সাত ভাতারী কসবির মুখেও সলজ্জ কুণ্ঠিত হাসি। মিশিতে ধোওয়া কালো দাঁত এবং পান খাওয়া লাল জিভ সেই হাসিতে ঝলসে উঠল।

সাবেহ ওকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন —কেমন আছিস রে চিলি?

চিলি অভিমান করে বলল —তুমি আমাকে ভুলেই গেছো।

—না রে ভুলবো কেন? ছাখ তোর জন্য কি এনেছি।

একটি মদের বোতল বের করে দিলেন —খা। তবে ত গা-টি গরম হবেক রে।

—তুমি খাবে নাই?

—লোভ তো হয় রে। কিন্তু ডাক্তারের বারণ। তুই খা।

চিলি বোতল খুলে গ্লাসে ঢালল। জল মিশিয়ে খেতে খেতে সাহেবের সঙ্গে কত গল্প যেন সেই পুরনো দিনের প্রণয়ঘন প্রহর আবার ফিরে এসেছে।

নেশাটা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন সাহেব বললেন —আমার মেয়েটা এমনিতে ভালোই ছিল রে। কিন্তু কি করে যে বরজোর সঙ্গে লটর-পটর করে ফেলল কে জানে? শুনলাম ওরা নাকি এই বাংলোতে এসে দমে ফুর্তি করত।

চিলি নেশার ঘোরে বলল —হঁ ত।

—তুই দেখেছিস?

—হঁ ত।

—কি করে দেখলি?

—জানালার খড়খড়িতে ফাঁক আছে ত। আর ঘরে বাতিও জ্বলত।

—তুই দাঁড়িয়ে দেখতিস?

—হঁ ত।

—লঙ্কাকেও ডেকে এনে দেখালি?

—হঁ। উ দুবার দেখেছিল।

—তাহলে জয়বাবু জানলো কি করে?

—লঙ্কা বলেছে।

—আর টেলার সাহেব?

—উয়াকে জয়বাবু বলেছে।

—তোরা বলিসনি?

—না। আমরা ক্যেনে বলতে যাব।

—তবে তোরা আর কাকে বলেছিলি?

—হব সাহেবকে।

চিলি তখন সাহেবের বুকে। ওর শরীরটা পুরোপুরি অনাবৃত। সাহেবের আঙুলগুলি ওর গলাতে। ভিতরে এমন একটা রাগ শন্ শন্ করছিল যে আঙুলগুলো সাঁড়াশির মত সেই গলাটাকে চেপে ধরার জন্য নিসপিস করে উঠল। মুহূর্ত মধ্যে সামলে নিলেন। বরং সেই গলাতেই একটা চুমু খেয়ে বললেন —হবস সাহেব তুদেদিকে খুব মদ খাইয়েছিল। তাই না রে?

—হঁ ত।

—কে কে ছিলি?

—আমি, লঙ্কা, জয়বাবু, টেলার সাহেব, হব সাহেব।

সাহেব ওকে ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন — এই গ্যাখ তোর জন্য একটা জিনিস এনেছি। দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

একটা নতুন শাড়ি ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন। চিলি তো খুব খুশি।

সাহেব বললেন —পর। দেখি কেমন মানাচ্ছে। লঙ্কাকে দেখাবি।

চিলির নতুন শাড়ি পরা শেষ হবার পরই খানসামা খুশীলাল এসে জানাল —লঙ্কা এসেছে।

—ওকে এখানে পাঠিয়ে দে।

লঙ্কা ভুরু ভুরু বুকে সেলাম করে দাঁড়াল। উনি প্রফুল্ল হাসিতে তাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন —আয় লঙ্কা। দ্যাখ তো চিলির শাড়িটা কেমন ?

—খুব ভাল সাহেব।

-দেব। তোকেও দেব। পকেট থেকে পাঁচটি টাকা বের করে দিলেন।

লঙ্কার মুখ হাসিতে ভরে গেল। সাহেব ওকে মদের বোতলও ধরিয়ে দিয়ে বললেন —খা। দমে খা। আজ আমার খুব আনন্দ হয়েছে। লাখ টাকার বাজী জিতেছি। তোদেরকে খাওয়াবো না তো কি ?

খানিক পর ওরা দু'জন নেশায় লুটোপুটি খেতে লাগল আর সাহেব অতি কৌশলে জেরায় জেরায় সব কথা বের করে নিলেন। ওরাও ক্ষয় রোগীর রক্ত-বমির মত সিসিল ও ব্রজর রতিরঙ্গের বিভিন্ন কাহিনী বলে ফেলল।

বিকাল পাঁচটার পর সাহেব বললেন —এবার যা তোরা। আমাকে অফিস যেতে হবে।

স্খলিত পায়ে সাহেবকে ঘুরে ফিরে সেলাম দিতে দিতে চলে গেল। তখন ওরা টপ ভুজঙ্গ। পরস্পরকে ধরাধরি করে বারান্দা থেকে নিচে নামল। তারপর সারভেন্টস কোয়ার্টারে ঢুকল।

সাহেব শুধু মনে মনে বললেন —কালসাপ ! ডেভিল !

তারপর ডাক পড়ল জয়বাবুর। সাহেব তখন ড্রেস করে তৈরি। নিজের বাংলোর কন্‌ফারেন্স রুমে বসে আছেন। সামনে কতকগুলো খোলা চিঠি — সেদিনের ডাক।

জয় ওঁকে সেলাম করে দাঁড়াল। উনি পেনসিলটা তুলে বসবার ইঙ্গিত করলেন। কাজকর্ম সম্পর্কে দু'চারটে জিজ্ঞাসাবাদের পর বললেন —দ্যাখো জয়, সিসিলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা তোমার উচিত হয়নি।

জয় পাঁকাল মাছের মত পিছলে যাবার জন্য অতিশয় বিনয়ের ভঙ্গীতে বলল —স্যার। একি কথা বলছেন ? তাই কি করতে পারি ?

সাহেব গর্জন করে উঠলেন —ইউ লায়ার। কি মনে করেছো আমি কিছু জানি না ? ব্লাডি স্কাউন্‌ড্রেল !

টেবিল থেকে হাণ্টার তুলে সপ্‌ সপ্‌ বসিয়ে দিলেন। জয় লম্বা হয়ে ওঁর পায়ে পড়ে বলতে লাগল —আমাকে ক্ষমা করুন স্যার ! না স্যার। দোষ হয়ে গেছে —ক্ষমা করুন।

সাহেব বললেন — ক্ষমা ! অকৃতজ্ঞ ! বেইমান ! তোমাকে আমি বেগার থেকে ক্যাপিট্যালিস্ট বানিয়েছি। তা তুমি ভুলে গেলে ? ব্লাডি চোর !

জয় তখন ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে।

সাহেব বললেন —তোমাকে আমি কি না দিয়েছি। টাকা-কড়ি, জমি জায়গা, ঘর-বাড়ি, এতবড় ঠিকাদারী। তবু মন ভরল না। শেষে চোর হলে —বেইমান হলে!

জয় তেমনি কাঁপতে কাঁপতে বলল —আমার চরম শিক্ষা হয়ে গেছে স্যার। শেষবারের মত ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা! ব্লাডি সোয়াইন। আমার নিজের কলিজা ছিঁড়ে কাবেরীর মত মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি আর তুমিই কি না আমার মেয়ের সেক্স অ্যাফেয়ার্স নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছো?

—ভুল করেছি স্যার। কিন্তু কাবেরীকে আপনি যখন খুশি নিয়ে নিতে পারেন।

—না। তার নিজস্ব একটা ধ্যান-ধারণা আছে। কাজেই সে আসবে না।

—কেন যাবে না স্যার? আমি তাকে পাঠিয়ে দেবো।

—কাবেরীকে তুমি সেই মেয়ে পেয়েছো? আমার প্রস্তাবকে যে রিজেক্ট করতে পারে, সে শুনবে তোমার কথা? যাও। ওকে ডিসটার্ব করো না।

জয় কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল।

উনি মনে মনে বললেন —আজ বিশ বছর ধরে আমি একটা চোর ও বেইমান পুষে রেখেছি!

গাড়ী ছুটল নওরঙ্গী হাউসের দিকে। মনটা ভীষণ বিক্ষিপ্ত। সিসিল যা অনুমান করেছিলেন উনি তাকে প্রমাণিত সত্যের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেবার পরেও, স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্রকারীদের পুরো পরিচয় পেয়ে যাবার পরেও একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। কি আফসোস!

মনে পড়ে সেদিনের কথা। যখন উনি শেরগড় কোল কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন, তখন যদি কোথাও এতটুকু ষড়যন্ত্রের আভাস পেতেন তাহলেই অ্যাকশন। আর আজ?

একি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বলতা?

প্রশ্নটা ধাঁই করে ওর বুকেই লাগল। তাহলে কি সত্যিই উনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন? সেই দুরন্ত ঘোড়সওয়ার যার ভয়ে কুলি-কামিন বাবুভেইয়াদের রক্ত জল হয়ে যেত সেই প্রতাপ গেল কোথায়?

একটা তীব্র উত্তেজনার স্রোত শন্ শন্ করে মাথার উপর উঠে গেল। নওরঙ্গী হাউসে পৌঁছে নিজের অফিসঘরে ঢুকে গেলেন। ডাক দিলেন —খানসামা!

—জী হুজুর! হন্তদন্ত হয়ে একজন খানসামা ছুটে এসে সেলাম দিল।

—সরাব লে আও।

দ্বিতীয় পেগ্ খেতে না খেতেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে এলো। কাগজ কলম নিয়ে ভাবছেন — সবারই জীবন আছে। সেই জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে দিন যাপনের প্রয়াস আছে। শুধু তিনিই ফুরিয়ে গেছেন।

গাঢ় অবসাদে ডুবে যাওয়া এক কর্মযোগী পুরুষ করুণ ভাষায় চিঠি লিখতে বসলেন তাঁর স্ত্রীকে।

মাই ডারলিং!

আজ আমার পাশে কেউ নেই। সেক্স এণ্ড লিকারটাও জীবন থেকে বাদ পড়ে গেছে! অনেকদিন পর সামান্য জল মেশানো হুইস্কি খেলাম। ওতেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। রঙীন গ্লাসেব উপর ছবি ভেসে উঠছে — তোমার, সিসিলের, এলিজাব। কিন্তু তোমরা সবাই আমাকে খারিজ করে দিয়েছো। আমি এখন প্রেমহীন, ভালবাসাহীন এক জীবন্ত যন্ত্র। যে শুধু কলিয়ারী করে আর টাকা কামায়। যার জীবনটা পুড়ে পুড়ে কয়লার কালো আঙার হয়ে যায়।

সিসিল আমাকে বুঝল না। বড় ব্যথা দিয়ে চলে গেল। তুমি ত এলেই না। চিঠিতেই বড় বড় হুকুম জারি করে সারাজীবন আমার উপর খবরদারি করে গেলে। একবারও ভাবলে না — এই মানুষটা কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? আমি কি তোমাদের এক ফোঁটা করুণাও পেতে পারি না?

হঠাৎ তাঁর অহঙ্কার ভীষণভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল — আমি মিঃ ব্যারাকলউ! ভারতের প্রথম সারির মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। প্রথম সারির কলিয়ারী ওনার। নিজের হিম্মতে এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। কে জয় গোপাল? কে মিঃ টেলার? একটা ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

কলিং বেলটা চেপে ধরলেন। ক্রিং রিং রিং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। একজন আরদালী ঘরে ঢুকল। উনি বললেন — ক্রীগ সাহেবকো বোলাও।

মিঃ ক্রীগ তাঁর সেক্রেটারী হয়ে বছর তিনেক আগে এসেছিলেন। লম্বা মুখ। তীক্ষ্ণ নাসা। কমার্সের ছাত্র। বিয়ে করেছেন একজন স্যাক্সন লেডীকে। খুব দক্ষ ছোকরা। সিসিল তাঁর কাজের প্রশংসা করতেন। উনি চলে যাবার পর মিঃ ব্যারাকলউ ক্যাশের চাবি তাঁর হাতেই দিয়েছেন।

ডাক পেয়েই ছুটে এলেন। মিঃ ব্যারাকলউ বললেন — কয়েকটা চিঠি তৈরি করুন।

— বলুন স্যার। কাগজ পেনসিল বাগিয়ে বসলেন।

— নাম্বার ওয়ান। মিঃ বব টেলারকে নোটিশ দিন তাঁর সার্ভিসের চুক্তি টারমিনেট করা হল। আইন মোতাবেক যা পাওনা হয় তা নিয়ে একদিনের মধ্যে আমার বাংলো খালি করুন।

—ও. কে. স্যার!

—নাম্বার টু। মিঃ ব্রাউনকে অবিলম্বে মিঃ টেলারের কাছ থেকে পানমোহরা কোল কোম্পানীর চার্জ বুঝে নিতে বলুন। নওরঙ্গীর ম্যানেজার মিঃ কিং কে ডেপুটি চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের প্রমোশন দিয়ে নওরঙ্গী কোল কোম্পানীর চার্জ বুঝে নিতে বলুন। মিঃ বারমান সাতথরিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারকে প্রমোশন দিয়ে নওরঙ্গীতে অ্যাক্ত ম্যানেজার পোস্ট করুন। সব অর্ডার একদিনের মধ্যে যেন একজিকিউট হয়।

—ও. কে. স্যার।

—নাম্বার থ্রি। জয়গোপাল সরকারকে নোটিশ দিন—তার সার্ভিসে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সমস্ত ঠিকাদারী ও গোমস্তাগিরির কাজ এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া হল। সেই চিঠির কপি সমস্ত ম্যানেজার ও সি. এম.ই. দিকে দিয়ে তাতে মন্তব্য লিখবেন—যে সব জরুরী কাজ করা একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচনা করবেন তা যেন সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারের নিজের দায়িত্বে করা হয়। জয়গোপালের বাংলো যেন একদিনের মধ্যে খালি করা হয়।

মিঃ ক্রীগ একটু হেসে বললেন—এত কড়া অ্যাকশন কখনো নিতে দেখিনি স্যার।

—প্রয়োজন হয়েছে। এসব আজ রাত্রের মধ্যেই তৈরি করে আমাকে সই করিয়ে নেবেন। কাল সকালেই পানমোহরা গিয়ে অর্ডার একজিকিউট করাবেন। যদিও চিঠিপত্রে একদিন সময় দেওয়া হয়েছে তবু আমি আরো দুটো দিন সময় দিচ্ছি। তৃতীয় দিনে আমাকে রিপোর্ট দেবেন যে আমার অর্ডার হান্‌ড্রেড পারসেন্ট ক্যারী আউট হয়েছে।

চিঠিপত্র তৈরি করে মিঃ ব্যারাকলউয়ের কাছে নিয়ে এলেন উনি। সাহেব তার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সব সই করে দিলেন। তারপর বললেন—লিসন, অ্যানাদার টু ভাইট্যাল অর্ডারস।

মিঃ ক্রীগ কাগজগুলো গুছোতে গুছোতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

উনি বললেন—চিলি নামে একটা আয়া আছে। কুলাকিরাম হেড চাপরাসীকে আমার অর্ডার জানিয়ে দেবেন—টু রেপ হার পাবলিক্‌লি বাই এ ডজন অফ ক্রেজী ম্যান! তারপর তাকে কলিয়ারী থেকে বের করে দেবে, লাইক এ বিচ ইন নেকেড কণ্ডিশন।

—ও. কে. স্যার।

—নেকৃস্ট ম্যান লক্ষা। লেবার সুর্দারি করে। ওকে মার্ডার করিয়ে দেবেন। বুঝেছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—ধন্যবাদ। তারপর ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে

বললেন —উইশ ইয়োর সাকসেস্। গুড নাইট।

দৃঢ় পদক্ষেপে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে নিজের বেডরুমে গেলেন। তখন অস্ফুট কণ্ঠে বার বার একটা কথাই বলতে লাগলেন —লেট দেয়ার বি এ ডিসাসটার! সব ধ্বংস হয়ে যাক্।

চল্লিশ

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ পানমোহরা নওরঙ্গীর যতগুলি কলিয়ারী ছিল তার ম্যানেজাররা চিঠি পেয়েই হতভম্ব। স্মরণাতীত কালে এতবড় খবর পানমোহরা নওরঙ্গীর লোক শোনেনি। কেউ ধারণা করতে পারেনি যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। জয়বাবুর নোকরি, চাকরি, ঠিকাদারি খতম! টেলার সাহেব ডিসমিস!

যে যেখানে শুনল সেখানেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করল —গেল। বারকুলি সাহেবের বেবাক খাদকুঠি চৌপট হয়ে গেল।

যেন দেউলটি খাদের বাম্পিংয়ে বেবাক চালটা তার মাথাতেই পড়েছে। কি যেন গুরুতর বিপদ সামনে এগিয়ে আসছে। এর থেকে নিস্তার নেই। এখন সব হায় হায় শব্দ।

অথচ তেমনি ডুলি চলছে। ইঞ্জিন চলছে। পুলিচাকা ঘুরছে। বয়লারের চিমনিতে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। খাদে হোল হচ্ছে। বারুদ আওয়াজ হচ্ছে। খালি গাড়ী ও বোঝাই গাড়ীর লুপ চলছে। টালোয়ানরা হেঁইয়া হেঁইয়া শব্দে গাড়ি ঠেলছে। মালকাটারা গাঁইতি চালাচ্ছে, ঝোড়া বইছে। মুনশী, মাইনিং ও ইনচারজ বাবুরা হাঁক ডাক করছে। অথচ এক বুকচাপা রুদ্ধশ্বাস ধাওড়ায়, ধাওড়ায়, বাবু কোয়ার্টারে, সাহেব বাংলোয়, কয়লা ডিপোতে, পিট টপ, পিট বটম ও খাদের সুড়ঙ্গ পথে লোকজনের বুকে চেপে বসে আছে।

মিঃ বব টেলার আজকের লোক নন। সেই যে-বছর দেউলটি কলিয়ারী চালু হয় সে বছর তিনি তার ম্যানেজার হয়ে এসেছিলেন। মিঃ ট্রুম্যান তখন চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। পাঁচ বছরের চুক্তি শেষ হলে তিনি আরো বড় কোম্পানীতে চলে গেলেন। সে পদটা খালি হল। কিন্তু মিঃ ব্যারাকলউ ওঁকে এক চান্সে ম্যানেজার থেকে সি এম. ই. করলেন না। তাই পাঁচ বছর কাটল ডেপুটি সি. এম. ই. হয়ে। তারপর সি. এম. ই. হলেন।

এতগুলো বছর একটা কোম্পানীতে কাটানো সোজা কথা নয়। তাছাড়া আপাত দৃষ্টিতে কোন দোষও তো নজরে পড়ে না। অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বিনা দ্বিধায় মালিকের হুকুম তামিল করেন। শ্রমিকদিকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করেন এবং প্রচুর মদ্যপান করেন। স্ত্রী প্রবজা। তাই ব্যক্তিত্বের দিকটা একটু

খাটো। সেটা পুষিয়ে নেন হাঁক ডাক এবং লাঠি নাচে।

তেমন একজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান অফিসারের পত্রপাঠ মাত্র বিদায় বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার।

তার চেয়েও রহস্যজনক জয়গোপালের জবাব। সেই পানমোহরা চানক কাটাই থেকে যে মানুষটা সাহেবের বশংবদ ভৃত্য, সাহেব যাকে পুঁজিপতি বানিয়ে দিয়েছেন, নিজের সবচেয়ে শ্রেয়া ও প্রিয়া রক্ষিতাটি উপহার দিয়েছেন তার কি কারণে জবাব হয় একথা বুদ্ধিরও অগম্য। সাধারণ লোকে খেই খুঁজে পায় না।

জয় তো একেবারে ঘাবড়ে গেছে। একি হল? সাহেব তার শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিলেন। গতকাল হাণ্টার মেরেও রাগ কমেনি। অথচ ও ভেবেছিল —যাক দু'ঘা হাণ্টার খেয়েই ফাঁড়াটা কেটে গেল। সেজন্য মনের মধ্যে যে চাপা ভীতি ছিল তা কেটে গিয়েছিল। হাণ্টারের কালসিটে দাগের উপর জয়ন্তীকে দিয়ে কুকৃসিমার সেঁক নিয়ে আরামে ঘুমিয়েছিল।

হে ভগবান! সাহেব ওকে আরো দশ হাণ্টার পিটলেন না কেন? এই সর্বনাশের চেয়ে সেটা যে অনেক ভালো ছিল।

মিঃ টেলারের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য সময় পেয়েছিল মাত্র পনেরো মিনিট। তারই মধ্যে চোখে চোখে ইশারায় যে যা বোঝার বুঝল। মিঃ ব্রাউন চার্জ নিতে চলে এসেছেন। জয়ের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন যুক্তি নেই।

কত লোকের কতরকম কৌতূহল। কেউ জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছিল বাবু। সাহেবের সঙ্গে ঠকামকি নাকি?

কেউ বা ইঙ্গিত করে—চুরি করে ধরা পড়ে গেছে ত।

কোন কোন বাবুর মুখ শুকিয়ে আমসি। ভয়ে হৃৎকম্প হচ্ছে—তাদেরও চাকরি নট হয়ে যাবে না ত? জয়বাবুর সঙ্গে আড়ালে আবডালে সেও মৌতাতের ভাগীদার ছিল।

সাহেবদের কী? চাকরি গেলে আবার অন্য কোম্পানীতে পেয়ে যাবে। যত মরণ এই বাবুদের। একবার চাকরি গেলে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। তাই তারা ডবল মাত্রায় সাহেব অনুরাগী হয়ে পড়ে।

রথী মহারথীদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের দশা নিয়ে চাপা গুঞ্জনে সবাই মশগুল। হতভাগিনী আয়া চিলির খবর কে রাখে?

বুলাকিরাম হেড চাপরাসী সাহেবের হুকুম পাবামাত্র অ্যাকশনে নেমে পড়ল। ডিপোর পাশ দিয়ে টানতে টানতে চাপরাসী ধাওড়ায় নিয়ে গেল। কমপক্ষে দেড়শো কুলি কামিনের সরদারনী সে। তাদের চোখের সামনে তার কাপড় চোপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে পথের কুকুরীর মতই যে টেনে নিয়ে গেল তবু কেউ

অঙ্গুলি হেলন করল না। কারো মুখে প্রতিবাদের ভাষা জোগাল না। ওর ছোট ছোট বাচ্চাগুলো মায়ের উৎকট আর্তনাদের সঙ্গে তালে বে-তালে হেই-হেই করে কাঁদতে কাঁদতে যে যেদিকে পারল ছুটল। নানকু তা দেখে শুনে লুকিয়ে পড়ল। ওর সতী মডেলের বউটা ঠোঁট উলটে ফোড়ন কাটল বড় গুমোর হয়েছিল। এবার ভাঙল ত! এতকাল ধরে সতীনের উপর রাগ পুষে রেখেছিল। এই তার উদ্গারের সময়।

চিলির সহস্র আর্তনাদ কারো কানে বাজল না। সবাই ভয়ে তটস্থ। কি জানি তাকে একটু সহানুভূতি জানাতে গেলে তারও দশা ঐরকম হবে।

সাহেবের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই। বুলাকিরাম এক মুহূর্ত বিলম্ব করল না। শুরু হল পাশবিক অত্যাচার। একপাল আখম্বা মরদ ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিল।

কে যেন লোক গুণছিল এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ...। আর চিলির জ্ঞান নেই। কতক্ষণ কে জানে? বসবার, দাঁড়াবার সাধ্য নেই। সারা শরীর যন্ত্রণাক্ত। একটা নগ্ন মৃতদেহের মতই গোবর, গো-মূত্রের মধ্যে পড়ে আছে।

বুলাকিরামের দল আবার ওকে টেনে তুলল। ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে চঞ্চলা জোড় পার করে দিয়ে বলল — ব্যস। যেদিকে খুশি চলে যা। কলিয়ারীর চৌহদ্দীতে আর ঢুকিস না।

ও জবাব দিল না। উপুড় হয়ে পড়ে রইল। অবিরল ধারায় রক্তপাতে তার জানু থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লাল হয়ে গেছে। রক্তে ভিজে গেছে মাটি। একটা মেয়ের শরীরে কত যে রক্ত আছে!

মাজা কোমর ফেটে যাচ্ছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্বর বেরুচ্ছে না। চোখ দুটো ঠিকরে গেছে। এই চোখ দিয়েই সে সিসিল মেমসাহেবের রতি বিলাস দেখেছিল।

হঠাৎ তার মাথায় একটা ভাবনা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল। এক অদম্য মনোবলে উঠে দাঁড়াল। চঞ্চলা জোড়ের ধারে ধারে হাতে পায়ে হেঁটে গেল। দামোদরের কিনারে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল। তারপর শরীরের সব ক্ষমতা একত্র করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঝাঁপ দিল দামোদরের বুকে। বর্ষার দামোদর তৎক্ষণাৎ তাকে লুফে নিয়ে ভীষণ উল্লাসে ছুটে চলল। বার কয়েক হাবুডুবু। শূন্যে হাত তুলে কিছু একটা ধরার প্রচেষ্টা। তারপরই মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে জীবনের যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণার প্রশান্তি।

লক্ষা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। দূর থেকে ডাকল —চিলি!

কিন্তু দামোদরের প্রবল জলোচ্ছাসে সে শব্দ চাপা পড়ে গেল। চিলির মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে চলে যাচ্ছে। তা দেখে হয়তো বা ঝাঁপিয়ে পড়তো। কিন্তু অন্যদিক থেকে মুগী দু'হাত তুলে ছুটে আসছে। ওকে

দেখে সে দাঁড়াল। মুগী কাছে এলো। ওর বুকটা দুপড় দপড় করছে। মুখে কথা সরছে না।

লঙ্কা বলল —কিরে মুগী ? অমন করছিস ক্যেনে ?

—তুই পালা। এখনি পালা।

—ক্যেনে ?

—চাপরাসীরা তোকে কাটতে আসছে। শুনেই ওর মাথাটা ছম করে উঠল। বলল —ক্যেনে ?

—অত কথা জানি না। তুই পালা।

—হে ভগবান ! তুদেদিকে ফেলে দিঞে পালাব ? তবে তুঁইও চল।

—আমি গেলে ছ্যেলাগুলিকে কে দেখবেক ? তুই পালা মনসারামের কাছে।

লঙ্কা এক পলকেই হাওয়া। মুগী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধাওড়ার দিকে চলতে লাগল। পেটের ছেলের কি টান ! লঙ্কাকে না পেলে চাপরাসীরা যে ওকে ছিঁড়ে খাবে, চিলির মতই দশা হবে তা জেনেই ধাওড়ায় ফিরে এল। ছেলে-পুলেদের দশা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। বড় ছেলে তুটি পালিয়ে গেছে। একটি মেয়ের পাশের ধাওড়াতে বিয়ে হয়েছিল সে সেখানে পালিয়েছে। পরের একটি মেয়ে ও তুটি ছেলে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ভয়ে কেঁদে কেঁদে নেতিয়ে পড়েছে। তার উপরে চাপরাসীরাও তু'চার ডাণ্ডা করে পিটিয়ে গেছে।

বলে গেছে —তোদের বাপ কুথায় ? উয়ার রক্ত খাব।

ঘর তুয়ার ভেঙেচুরে তছনছ। ঘরের হাঁড়িকুঁড়ি মালসা খাপুরী উঠোনে ফেলে ভেঙে দিয়ে গেছে। চাল ডাল তেল মুন ফেলে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দিয়েছে। এক হাঁড়া ধেনো মদ ছিল সেটা নিয়ে গেছে। চিলি ও মুগী তুই দলেরই কতকগুলো যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে।

সেই মদ ও মেয়ে মানুষের মাংস দিয়ে উৎসব হচ্ছে ওদের। লঙ্কার ঘর ঘিরে পাহারা বসেছে। ও এলেই ওকে খতম করে আরেকটা ভোজ করবে।

এত এত যে কুলি-কামিন সব ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যারা খাদের ডিউটিতে গেছে তারা সেখানেই বন্ধ সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়েছে। খবর চারিদিকে ছুটছে। তিনটি অপোগণ্ড শিশু নিয়ে মুগী আতান্তরে পড়ে আছে। ওদেরকে কি করে নিয়ে যাবে সেই ভাবনায় মরে যাচ্ছে। ওরা যে আটক পড়ে গেছে।

তখন কুলি বাথান তোলপাড়। জাগালি শ্মশানের ডুমুর তলে ওরা একটা মা-কালী প্রতিষ্ঠা করেছিল। টিন দিয়ে একটা ঘরও করেছিল। তারই সামনে সেই প্রাচীন ডুমুর গাছটিকে ঘিরে মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো নিয়ে জন পঞ্চাশেক মিটিং করতে বসে গেছে।

ইরফান আলির সাতটা বেগমের দশ গণ্ডা ছেলে মেয়ে। ছেলে ও জামাই মিলে পঁচিশটা তাজা জোয়ান। সাঁওতাল, বাউরী, হাড়ি, মুচি মায়েদের গর্ভে জন্ম। ঔরস বারকুলি সাহেবেরও হতে পারে, ইরফান আলিরও হতে পারে, অথবা অন্য কারো। সেটা কোন কথা নয়। ওরা কয়লা কুলি।

তেমনি চিলির দু'গণ্ডা, চামেলীর ছয়টা, বঞ্চনার দশটা এমনি কত। সবাই যে কুলি বাথানে থাকে তাও নয়। আপন আপন কলিয়ারী ধাওড়াতেও থাকে। যার যেমন সুবিধে।

লঙ্কা আসার আগেই তাদের কাছে খবর এসেছে। পানমোহরায় ইরফানের চারটে ছেলে ও দুটো জামাই থাকে বউ বাচ্চা নিয়ে। তাদেরই একজন খবর নিয়ে এসেছে। তারপরেই ছুটে এল লঙ্কা। বঞ্চনা কেঁদে বেড়াচ্ছে —ও মাগো। আমার বউ ব্যাটা নাতিপুতির কি হল গো? ওরে মনসা এখনো যে বসে আছিস বাপ। একটা কিছু কর।

মনসা ধমকে দিল —তুই চুপ কর মাসী।

মনসা বলল —টেলার সাহেব, জয়বাবু আমাকে জানে। কিন্তুক উয়ারাও তো হাবিস। এখন নোতুন সাহেবরা চিনবেক কি না কে জানে? তবু আমি সাহেবদের কাছে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে তিনজন যাবি। সব আপন আপন পকেটে দশটা করে ছ'ইঞ্চি চাকু নিবি। অন্য হাতিয়ার নিয়ে গেলে লোকে দেখতে পাবেক। এইগুলি দরকার হবেক যদি বিপদে পড়ি তো নিজের জান বাঁচাতে।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

মনসা আবার বলল —আমাদের কুলি বাথানের যেসব জড় ঝাড় পানমোহরায় আছে তাদের বউ বিটি ছোলাপুলাদিকে জরুর চঞ্চলা জোড় পার দিবি। এই খবরটি এখনি নিয়ে চলে যা কেউ যেন না জানতে পারে। মরদরা সব হাতিয়ার নিয়ে ঐখানেই তৈয়ার থাকবি। আমাদের কমসেকম বিশজন সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই পানমোহরায় হাজির হবি। বাকি লোক থাকবেক চঞ্চলা জোড়ের কাছে। যেমন দরকার হবেক তেমনি লোক যাবেক। বেশি লোক নিয়ে গেলে খারাপ হবেক। সাহেবরা যদি ভালোই ভালোই ছেড়ে দেয় তবে কোন কথা নাই। কিন্তুক যদি না ছাড়ে তবে দাঙ্গা করে মুগী আর তার ছোলাপুলাদিকে নিয়ে আসব।

সকলেই ধ্বনি দিল —কালী মাইকী —জয়!

একচল্লিশ

খুব তাড়াতাড়ি করেও বিকেল চারটের আগে পানমোহরা অফিসে পৌছাতে পারল না। যদি বা পৌছল তো ক্রীগ সাহেবের অফিসের সামনে ভজনলাল

ওকে আটকে দিল। সে সাহেবের আর্দালী। মনসারামের সঙ্গে মুখ চেনা আছে। ক্রীগ সাহেব বহুত পাওয়ার নিয়ে এসেছেন। লোকজন হরদম সেলাম দিচ্ছে। আর্দালী গেট না ছাড়লে কেউ ঢুকতে পায় না। খুব কড়া ব্যবস্থা।

টুলে বসে খৈনী টিপতে টিপতে ভজনলাল বলল—নেহী ভেইয়া! সাহেবকো বেগর হুকুমসে অন্দর জানা মানা হ্যায়।

মনসারাম বলল—হামারা থোড়াসা বাৎ হ্যায়। সাহেবকো পুছ লেগা।

—আচ্ছা। ঠাহার যাও।

আর্দালী ভিতরে গিয়ে সাহেবের হুকুম নিয়ে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিল। ওর সঙ্গীরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ কেতাদুরস্ত ভাবেই সাহেবকে সেলাম দিয়ে গুড আফটারনুন স্যার বলল।

উনি ভুরু কুঁচকে বললেন—তুমি কে?

—আমি মনসারাম ডশ।

নামটা সাহেবের চেনা। লোকটাকেই দেখেননি। বললেন—কি চাও?

—থোড়া মেহেরবানি হুজুর।

সাহেব ইশারায় ওর বক্তব্য বলার নির্দেশ দিলেন।

মনসারাম বলল—আমাদের একটা মেয়ে আর গুটিতিনেক বাচ্চা আটক পড়ে গেছে। দয়া করে ওদেরকে ছাড়বার হুকুম করে দিন হুজুর।

—কার কথা বলছো?

—লঙ্কার ফ্যামিলি।

—লঙ্কাকে এনে দাও। তবেই ওদেরকে ছাড়া হবে।

—ওর খবর তো জানি না হুজুর।

—লঙ্কাকে না পেলে ওর ফ্যামিলিকে ছাড়া হবে না।

—হুজুর! গরিব আদমীর জন্যে ভিখ মাগতে এসেছি।

—গেট আউট। আর বেশি কথা বলার দরকার নেই।

—হুজুর! গরিবের উপর থোড়াসা কৃপা করুন।

সাহেব ফেটে পড়লেন—ইউ ফাকিন্ বাস্টার্ড। কুত্তাকা বাচ্চা—হাটো হিঁয়াসে। মনসারাম শান্ত কণ্ঠে বলল—ঠিক বলেছেন হুজুর। আমি বাস্টার্ড এবং কুত্তার বাচ্চাও। তবে সেই কুত্তাটি কে জানেন? বারকুলি সাহেব। আপনার মালিক আমাকে পয়দা করেছেন।

সাহেব চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে টেবিল ঠুকে চিৎকার করে উঠলেন—আই সে—ইউ গেট আউট।

মনসারামও টেবিল ঠুকে বলল—ইউ শাট আপ!

—হোয়াট? সাহেব ওর উপরে লাফিয়ে পড়লেন। ওদিক থেকে

ভজনলালও ভিতরে ঢুকে মনসার মাথায় ডাণ্ডা তুলেছে। হঠাৎ চেহারাটা পাল্টে গেল। মনসার একটা ঘুঁষিতে ক্রীগ সাহেব ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে চেয়ারের উপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। আর মনসার সঙ্গীদের একজন ওঁর আর্দালীর পাছায় এমন লাথি ঝাড়ল যে সেও গিয়ে পড়ল সাহেবের উপর।

ক্রীগ সাহেব ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করে যখন বাইরে বেরিয়েছেন তখন ওরা গেট পার হয়ে যাচ্ছে। ভজনলাল তাদের পিছনে দৌড়াল এবং সাহেব হুকুম দিলেন —ক্যাচ্ দোজ বাগার্ডস!

চারদিক থেকে চাপরাসীরা দৌড়ে গিয়ে প্রায় ঘিরেই ফেলেছিল। হঠাৎ ওরা ফিরে দাঁড়াল এবং এক পলকে চারজোড়া ছুরি বেরিয়ে গেল। মনসারাম হাঁক দিল —হুঁশিয়ার! আমাদের পিছে ধাওয়া করেছো এক এক চাক্কুতে এক একটি লাশ ফেলে দেবো

চাপরাসীরা থেমে গেল। একজন চাপরাসী বলল —সামনে মৎ যাও ভাই। ইয়ে মনসারামকো বহুত খতরনাক হাতিয়ার হ্যায়।

বটেও তাই। এটা মনসারামের মারাত্মক অস্ত্র। ছোট ছোট ছুরিগুলি এমনভাবে ছোঁড়ে যে পাঁচ সাতগজের মধ্যে কোন দুশমনকে নির্ভুল নিশানায় গেঁথে দিতে পারে। বহু অধ্যবসায়ের ফলে ও নিজে শিখেছে ও কুলি বাথানের বারো চৌদ্দজন ছোকরাকে শিখিয়ে তৈরি করেছে। সেই নামটুকুর দোহাই দিয়েই পলকের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

মিঃ ক্রীগ তখন বারান্দায় লম্ফ ঝম্প করছেন। একজন নেটিভের ঘুঁষি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। চাপরাসীদের অপদার্থতার জন্য তাদের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে দিচ্ছেন। সেখানে বহুলোক জমে গেছে। সবাই নিরাপদ দূরত্বে থেকে তামাশা দেখছে। কেউ কেউ মনে মনে মনসারামকে বাহবা দিচ্ছে।

বুলাকিরাম ছুটে এল। সাহেব তাকে গালমন্দ করে বললেন —ব্লাডি ফাকিন্। তোমাদের সুরৎ দেখতে পুষে রাখা হয়েছে। আভি মনসারামকো পাকড়ো। কিল লঙ্কা'জ ওয়াইফ এণ্ড চিলড্রেন। পুট দেম ইন ফায়ার।

চাপরাসীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

জনকয়েক হুঙ্কার দিয়ে উঠল —জয়! বজরঙ্গবলী কী —জয়!

মনসা ছুটে গিয়ে ঢুকেছিল ইরফান আলির ছেলেদের ধাওড়ায়। ওরা তখন বাচ্চা-কাচ্চা ও মেয়েদিকে সরিয়ে দিয়ে দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দুটি মেয়ে আছে তারাও দাঙ্গা করতে প্রস্তুত।

মনসারাম সেখান থেকেই ওদের হুঙ্কার শুনল। একটা কুলিও ছুটে এসে ক্রীগ সাহেব যে হুকুম দিয়েছেন তা জানিয়ে দিল। মনসারামের দিশা ঘুরে

গেল। লোকজনকে আসতে বলেছে সন্ধ্যায় আর ওরা যদি এখুনি মুগীকে খুন করতে চলে আসে তবে ঠ্যাকা দেবে কি করে? চারিদিকে লোক পিল্ পিল্ করছে। রোদ ঝলমল করছে। অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে যে ছুরির ভেল্কী দেখিয়ে দেবে তারও উপায় নেই। ওদের লোক আছে মোটে দশটি পুরুষ তুটি মেয়ে। তাও তো ইরফান আলির ছেলেদিকে সামনে নিয়ে যাওয়া চলবে না। ওরা পিছনে থাকবে গুপ্তভাবে।

কি মুস্কিল? হঠাৎ মাথা গরম করতে গিয়ে পুরো মতলবটাই বানচাল হতে বসেছে। মুগী ও তার ছেলেদিকে যদি মেরেই দিল তবে আর দাঙ্গা কি জন্য?

মেয়ে তুটি বলল—আমরা তু'জনে মুগীর ঘরকে যেতে পারি।

—কি করে যাবি?

—সে ঈ-ঘর উ-ঘর ঘুরে চলে যাব। মেয়্যালোক দেখে কিছু করবেক নাই।

—তারপর?

—তু'জনে তুটি ছোলা নিয়ে বিরাবো।

—তখন উখানকার ডিউটিবালা চাপরাসীরা আটক করবেক।

—তুদের হাতে হাতিয়ার আছে লড়ে যাবি।

—লড়ে গেলে ছ্যেলা তুটি বাঁচাব কী করে?

মনসারাম বলল—তু'জন তোদের পেছুতে থাকবেক। আটক করলেই তারা লড়ে যাবেক। তুরা ছুটে পালাবি। কুন রকমে চঞ্চলা জোড় পিরাতে পারলে আর কে লাগলের।

অফিসের সামনে জন পঞ্চাশেক তাগড়া জোয়ানের জমায়েৎ হয়ে গেছে। লাঠি তরোয়াল, টাঙ্গি নিয়ে তৈরি। বুলাকিরাম হুকুম দিল—আগে বাড়ো! প্রচণ্ড উল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলল ওরা।

হঠাৎ ধাওড়ার মধ্যে রব উঠল—ভাগ গিয়া—ভাগ গিয়া—মারো—

আবার অন্যদিক থেকে রব উঠল—আগুন—আগুন।

ভীত ত্রস্ত কুলি-কামিনদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে হুড়োহুড়ি। কে যে কোথায় যায়—কি যে করে তার ঠিক ঠিকানা নেই। সবাই বিভ্রান্ত। ইরফান আলির ছেলেদের ধাওড়া জ্বলছে দাউ-দাউ করে। ধোঁয়ায় কিছু দেখা যায় না। মেয়ে তুটি দৌড়চ্ছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। তাদের পিছনে সাত আটজন চাপরাসী। হঠাৎ ছুরির ঘায়ে মুখ থুবড়ে পড়ল একজন। বাকিরা এগিয়ে গেল।

ওরা মেয়ে তুটিকে প্রায় ধরে ফেলেছে। পিছন থেকে লাঠি চলল চাপরাসীদের উপরে। মেয়েদিকে ছেড়ে ওরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই লাঠিবাজদের উপর।

তখন আরো একদল চাপরাসী সেদিকে ছুটে গেল।

মনসারাম হুকুম দিল—মুগীর জানের আশা ছাড়। চল ঐদিকে। না হলে উয়ারা খতম হয়ে যাবেক।

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল। আসল দাঙ্গাটা হল গিয়ে চঞ্চলা জোড়ের ধারে। সে খুব জোরদার লড়াই। দু-পক্ষই ফাঁকা ময়দানে। দু-পক্ষই সশস্ত্র। কিন্তু মনসার লোক এত কম যে এক একজনকে দু-তিনজনের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। পরস্পর বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়েছে। পকেটের ছুরি গুলিও শেষ। নিরস্ত্র অবস্থায় মারা পড়ে আর কি? তখন একটা চাপরাসী ছুরি খেয়ে উল্টে পড়েছিল বলে তার লাঠিটা পেয়ে গেল। কিন্তু চাপরাসীর দল ওকেই ঘিরে ফেলেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে এই মূল খিলাড়ী। একে পাড়তে পারলেই কেল্লা ফতে। এদিকে ক্রমে ক্রমে চাপরাসীদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। পালাবার কথা ভাবল। কিন্তু যেদিকে পালাবে সেইদিকেই চঞ্চলা জোড়ে বুক সমান জল। জোড়ের বান তোড়েই যায়।

সেই সময়ে অভাবিতভাবে দুটি পনেরো ষোলো বছরের ছেলেকে চাপরাসী-দের বেষ্টনী ভেঙে তলোয়ার হাতে এগিয়ে আসতে দেখল। ওরা লক্কার ছেলে। কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে ছিল। দাঙ্গার খবরে ছুটে এসে গেছে।

মনসারাম সাহস দিল—লড়ে যা ব্যাটা। জান কবুল।

একের জায়গায় তিনজন হল। ওদিকে মকমুদ নামের ছোকরাটাও জন দুই চাপরাসীকে ঘায়েল করে তার সঙ্গে জুটে গেল।

আর তারপরেই চঞ্চলা জোড়ের ওপার থেকে ঝাঁক ঝাঁক তীর ছুটে এল চাপরাসীদিকে লক্ষ্য করে। কেউ কেউ তীর খেয়ে হায় বাপ বলে পড়ে গেল। কুলি বাথান পার্টি তখন এসে পড়েছে। এবার চাপরাসীদিকে কচুকাটা করে ছাড়বে। কিন্তু তখন সাহেবরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন বন্দুক হাতে নিয়ে।

মনসারাম এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। সবাইকে ইশারা দিল চঞ্চলা জোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আহত, ক্ষত বিক্ষত ও সুস্থ দাঙ্গাবাজরা টপাটপ লাফিয়ে পড়ল জলে। চাপরাসীরা পিছু নিতে পারল না কারণ তীরন্দাজরা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়ছে।

ওরা সব স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। ওপার থেকে ওদেরকে টেনে তুলে নিচ্ছে। সাহেবরা পৌছে গেলেন এবং দুমদাম বন্দুক থেকে গুলী ছুঁড়তে লাগলেন।

লড়াই শেষ। কুলি বাথানের একটি লোকও আর সেখানে নেই। সাহেবরা আহতদের উদ্ধার ও শুশ্রূষায় লেগে গেলেন।

মুগী তখন পুড়ছে। ওর কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে কিছুতেই বেরোতে পারেনি। ঐ মেয়ে দুটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা লেগে গেল। ও ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই চাপরাসীরা ধরে ফেলল। ঘরে আগুন ধরিয়ে তার ভিতর ফেলে দিল। ইরফান আলীর ছেলেদের ফাঁকা ধাওড়ায় আগুন দিয়ে মনসারাম যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল সেইটুকু সময়ের মধ্যে ওরা দাঙ্গাবাজ চাপরাসীদিকে চঞ্চলা জোড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। না হলে ওকেও পুড়ে মরতে হত।

সেই রক্তভেজা চঞ্চলা জোড়ের পাশেই সাহেবদের আলোচনা সভা বসে গেল। মিঃ ক্রীগ বললেন —লেট আস্ অ্যাটাক কুলি বাথান।

মিঃ ব্রাউন বললেন —হোহাই ? আমরা পুলিশ হেল্প নিয়ে দাঙ্গাবাজদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারব। নিজেদের দাঙ্গা করতে যাবার ত প্রয়োজন নেই।

এ কথায় অনেকেই সায় দিলেন। কিন্তু মিঃ ক্রীগের রাগ এত বেশি যে উনি নিজের হাতে গুলী করে দু-পাঁচটা লাশ ফেলে দিতে না পারলে শান্তি পাচ্ছেন না।

মিঃ ব্রাউন তাঁকে বোঝালেন —মাথা গরম করবেন না মিঃ ক্রীগ। গোটা ব্যাপারটা যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তাতে আমরা নিজেদিকে বুদ্ধিমান বলতে পারি না। কারণ লক্কাকে যদি মার্ডার করার অর্ডার ছিল তাহলে তার অনুপস্থিতিতে তার ধাওড়া এবং ফ্যামিলিকে অ্যাটাক করা উচিত হয়নি। ও সতর্ক হবার এবং গা-ঢাকা দেবার সুযোগ পেয়েছে। মনসারামকে খবর দিতে পেরেছে।

মিঃ ব্যানার্জী বললেন —ইন্ ফ্যাক্ট আগে এ সব অ্যাকশন পরিচালনা করত জয়বাবু। লোকটা এত চতুর ছিল যে কেউ কিছু বোঝবার আগেই সাহেবের হুকুম তামিল হয়ে যেত।

মিঃ ক্রীগ উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন —প্লিজ ঐ বেইমানটার প্রশংসা করবেন না।

মিঃ ব্রাউন সে আলোচনায় ইতি টেনে দিয়ে বললেন —আমি পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি। আপনারা এদিকটা দেখুন। তবে কোন হঠকারিতা করবেন না।

উনি চলে গেলেন।

বিয়াল্লিশ

কুলি বাথানের মানুষদের জীবনে বহু কালোরাত এসেছে ও গেছে। তাদের প্রায় সব যুবতিই ধর্ষিতা। কেউ কেউ একাধিকবার। কারো বা সোহাগ-

রাতের পূর্বেই ধর্ষণ জনিত কারণে সতীচ্ছদ ছিন্ন হয়েছে। কাজেই নারী নির্যাতনের চরম অধ্যায় তারা পার হয়ে গেছে।

পুরুষদের তো কথাই নেই। মার খেয়ে তাদের হাড়মাস সিদ্ধ হয়ে গেছে। কারো কারো এমন পেশী যে লাঠি মারলে তা স্প্রিং করে। বাকি আছে শুধু গুলি করে মেরে দেওয়া।

মিঃ গাঙ্গুলী নামে থানার বড়বাবু মিঃ ব্রাউনকে সেই কথাটাই বললেন।

হাসতে হাসতে বললেন—আপনি কি করতে বলছেন? পিটাই। বলুন আপনার সামনে জনাদশেক ছোকরাকে ধরে এনে পিটাই দিচ্ছি। দেখবেন আমাদের পুলিশরাই হাঁফিয়ে উঠবে। মেয়েদিকে ধর্ষণ করতে বলছেন। তাও দেখিয়ে দিতে পারি। আমার পুলিশরাই নেতিয়ে পড়বে। ওদের এক একটা মেয়ে পাঁচটা পুরুষের মহড়া নিতে পারে। এই রাত্রে যদি পুলিশ নিয়ে যাই তাহলে দেখবেন আমার ফোর্স সেক্সের সাগরে ভেসে যাচ্ছে। আমি ওদের উপর অনেক অত্যাচার করেছি স্যার। শেষে নিজেই হেরে গেছি।

মিঃ গাঙ্গুলীর কথা শুনে মিঃ ব্রাউনও হেসে ফেললেন। বললেন—তাহলে কিভাবে ওদেরকে টাইট করবেন?

—দেখুন ওরা তো কুলি-কামিন। গতর খাটিয়ে খায়। যদি কোন কারণে প্রতিশোধ দিতে চান তবে কার কার উপরে সেই নামগুলো বলুন। আমি ওদেরকে এ্যারেস্ট করে ভালো করে ধোলাই দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যুতসই একটা মামলাও ফেঁদে দেবো। যাতে ছাড়া না পায়। তবে আমার অনুরোধ স্যার ওদের পুরো কুলি বাথানের উপর পুলিস নামাতে বলবেন না। বেচরোরা বড় দুঃখী। আমার বড় মায়া হয়।

মিঃ ব্রাউন বললেন—ব্রিটিশের চাকরী করতে এসে এত মায়াদয়া দেখালে ত চলে না মিঃ গ্যাংগুলি।

ঠিক আছে স্যার। আমি অপারেশন করে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি দয়া করে সঙ্গে থাকুন।

—ও. কে.। আমি সঙ্গে থাকবো।

দশ বারোজন পুলিশ নিয়ে ওঁরা কুলি বাথানের দিকে যাত্রা করলেন। মিঃ ব্রাউন বললেন –মিঃ গ্যাংগুলি। এই কজন পুলিশ নিয়ে আপনি ঐ দাঙ্গা-বাজদের গ্রামে যাবেন? কোন বিপদ হবে না ত?

—না স্যার। ওরা পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা করে না। ওদের লড়াইয়ের কৌশলটা আলাদা।

—কি রকম?

—চলুন না স্যার। গেলেই দেখতে পাবেন।

গাড়ি ঢুকতেই চারিদিকে হাউমাউ চিৎকার। মেয়েরা সব বাচ্চা বগলে নিয়ে এদিক-সেদিক ছুটে পালাচ্ছে। পালাও—পালাও—পুলিশ আসছে বলে ভীষণ চিৎকার। সে কানপাতা দায়।

পুলিশরা সব টপাটপ নেমে তাদেরকে ছাগলের মত তেড়ে বেড়াতে লাগল। ঘরে ঘরে ঢুকল। একটাও পুরুষ মানুষ নেই। মেয়েরাও কেউ ঘরে নেই। সব বাইরে পালিয়েছে। ঐ বৃহৎ ডাঙার মধ্যে কে যে কোথায় দৌড়ুচ্ছে তার হদিশ পাওয়া দায়। বাচ্চাগুলো ঢিল পাটকেলের মত গড়াগড়ি খাচ্ছে। কোন কোন ঘরে ঘুমন্ত বাচ্চা পড়ে আছে।

ডাঙাময় পুলিশ ও মেয়েদের চিৎকার। কোন পুলিশ যদি কোন মেয়েকে ধরে ফেলে তবে তার উল্লাস ধ্বনিতেই বোঝা যায় এরপর কি করবে।

কিছুক্ষণ পর মিঃ ব্রাউন দেখলেন বড়বাবুর সঙ্গে তিনি একাই দাঁড়িয়েছেন।

বললেন—মাইগড! পুলিশরা কোথায়?

—মেয়ে ধরতে গেছে স্যার।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? মেয়েগুলোও ছিনালীর হদ্দ। খানিক দূর দৌড়ে গিয়ে নিজেরাই ধরা দেবে। মানে একটু প্রণয় কৌতুক আর কি?

—আচ্ছা! আমাকে মনসারামের ঘরটা দেখান। জানেন ত?

—হ্যাঁ স্যার। কতবার এসেছি ওর ঘরে।

দু'জোড়া বুট খচ্ খচ্ শব্দে মনসারামের ঘরে ঢুকে গেল। টিনের আগল ঠেলতেই খুলে গেল। টর্চের আলো ফেলে দেখলেন মনসার বউ কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে হু হু করে কাঁপছে আর তিনটি বাচ্চা তার উপর শুকরছানার মত পড়ে আছে।

বৈশাখী বলল—দারোগাবাবু না কে?

—হ্যাঁ রে বৈশাখী। তোর মরদ কোথা?

—পানমোহরায় দাঙ্গা করতে গেইছে।

—এখনো ফিরে নাই?

—না।

—কি হল তবে?

—কে জানে মরে হারাঞে গেইছে হয়ত।

মিঃ ব্রাউন বললেন—দিস ব্লাডি উওম্যান সহবৎ জানে না। আমাদের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে কথা বলছে।

—তা তো বটে। এাই শালী ওঠ্ চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টানে উঠিয়ে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন। ছেলেগুলি মহুল পড়ার মত টুপটাপ

পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। আর মিঃ ব্রাউন দেখলেন —এক নিরাবরনা যুবতীকে যার সর্বাঙ্গে পোড়া ঘায়ের চিহ্ন।

কেমন শিউরে উঠলেন। হাতটা নিস্‌পিস্ করে উঠল! গাল দুটো টিপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বললেন --মাইগড! এত টেম্পারেচার কেন ?

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন—জ্বর হয়েছে স্যার। দেখছেন না একেবারে উদোম হয়ে কাঁথা ঢাকা দিয়েছিল। এ্যাই শ্যালী! একটা শায়া শাড়ি পরতে পারিসনি।

বৈশাখী বলল —নাই যে বাবু। ঐ একটিই কাপড় আছে কেঁথার সঁথে ঢাকা নিঞেছিলাম। তবু জাড় যেছে নাই।

হু হু করে কাঁপছে ও। আর দারোগাবাবু তেমনি করেই ওর চুলের মুঠি ধরে টর্চটা জ্বেলে রেখেছেন। বাচ্চাগুলো কেঁদে মরে যাচ্ছে

মিঃ ব্রাউন বললেন —ওর গায়ে এত পোড়া দাগ কেন ?

—আমরাই ছ্যাঁকা দিয়েছি স্যার।

—কেন ?

—বুঝলেন না —কোথাও দাঙ্গা ফৌজদারি হলে আমরা তো মনসা-রামকেই পয়লা নম্বর আসামী করি। তাই ওর বউয়ের উপরেই পয়লা চোট পড়ে।

—ওঃ ছেড়ে দিন।

মিঃ গাঙ্গুলী ওর চুলের মুঠি ছেড়ে দিলেন। বৈশাখী ধুপ করে পড়ে গেল। কাঁথাটা টেনে গায়ে ঢাকা দিয়ে নিল। বাচ্চাগুলোও ওর গায়ে পড়ল।

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন —ওর এত কষ্ট কেন স্যার। ঘরটাতে আগুন লাগিয়ে দিই। বাচ্চা-কাচ্ছা নিয়ে পুড়ে মরে যাক্।

মিঃ ব্রাউন কেমন হয়ে গেলেন। বললেন— মিঃ গ্যাংগুলি! থানাতে আপনি বলেছিলেন ওদের জন্য মায়া হয়। কিন্তু এখনে এসে তো আপনার মধ্যে সে লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

—কেন স্যার ? আমার যদি মায়া না থাকতো তবে কি ঐ মেয়েটা এখনো বেঁচে থাকতো ?

—ওকে মেরে দিলেই বুঝতাম আপনার শরীরে দয়ামায়া আছে। চলুন।

যেতে যেতে বললেন —আমি চাই —মনসারাম ও তার সেই তিন জন সঙ্গীকে যতশীঘ্র সম্ভব জেলে দেবেন। এখানকার জেলে নয় অন্য কোন জেলায়। তাহলে হয়ত ওর বউটা বাঁচবে।

তাদের পিছনে পিছনে পুলিশরাও ফিরে গেল। তখন তারা নারী সম্ভোগের আনন্দে বড়ই মশগুল। হৈ হৈ করতে করতে আপন আপন ক্রিয়াকাণ্ডের রসাত্মক বর্ণনা দিতে দিতে রাত্রির আকাশ তোলপাড় করে দিল।

পরদিন সকালেই কাবেরী এসে হাজির হল জয়ের সাতখরিয়া বাংলোয়। ঘোড়ায় গাড়ি থেকে নামতে যা দেরি। জয়ন্তী ওকে জড়িয়ে ধরে হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—এ কি হল দিদি! এই সর্বনাশ কেন হল?

কাবেরী ওকে যত থামাবার চেষ্টা করে ততই ও ডুকরে ডুকরে কাঁদে। বাচ্চাগুলোও কাঁদে। বড়মা বড়মা করে বুকে লেপ্টে যায়।

জয় তখন ছিল না। দাঙ্গা, আগুন, বিশৃঙ্খলা ওরই মধ্যে ও গত একটা দিন রাত্রি নিজের ঠিকাদারীতে কাজকর্মের হিসেব নিকেশ ও বাংলোর মালপত্র সরাবার ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত হয়ে আছে।

বলতে গেলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে এত ব্যস্ততার পিছনেও আছে টাকা। কাজকর্মের হিসেব এখুনি করতে হবে। না হলে যদি কিছু বাদ পড়ে যায়, যদি ভুল থেকে যায়, যদি মাপজোখের কাগজপত্র ঠিকমত না থাকে তাহলে চারআনা পয়সা গেলেও সেটা তারই যাবে।

আবার ও নিজে যেমন কোম্পানীর কাছে পাওনাদার তেমনি বহু কুলি-কামিন, বাবু, যারা তার কাছে কাজ করে তারা তার কাছে পাওনাদার! একি একদিনের কাজ? ও শুধু কুড়িয়ে বাড়িয়ে কাজ-কর্মের হিসেব জড় করছে। এতবড় কারবার হঠাৎ উপড়ে ফেলা সহজ কথা নয়। এর সঙ্গে জড়িত কত মানুষের সুখ-দুঃখ। কতলোক এসেছে ভাগ্য ও জীবিকার সন্ধানে। এখানে এসে সংসার পেতেছে। জন্ম, মৃত্যু, প্রেম ও বিবাহের কত লগন ঘটন অনবরত ঘটে চলেছে। ব্যক্তি বিশেষের ঠিকাদারীই তো শেষ কথা নয়। ওর যে মানুষ নিয়ে কারবার।

সারা বাংলো জুড়ে বহু মালপত্র। আর আছে কতকগুলি জীবন্ত পশু। গাই গরু, ঘোড়া ইত্যাদি। চাকর-বাকররা সেসব বাঁধা ছাঁদা ও গরু গাড়ী কিংবা ঘোড়া গাড়ীতে বোঝই করতে ব্যস্ত। মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও মানুষগুলি যাবে আসানসোলের নতুন বাড়িতে। জীবজন্তু ও তাদের ব্যবহার্য জিনিসগুলি যাবে সাতখরিয়া খামারে।

এই আতান্তরে এসে কাবেরী বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সবাই তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। যেন এই মহাসঙ্কট থেকে সেই উদ্ধার করতে পারে।

একটু পরে জয় ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে। চাব্বিশ ঘণ্টাতেই ওর সুরৎ পাল্টে গেছে। চোখদুটো ভিতরে ঢুকে গেছে। মুখটা শূন্য। এলোমেলো চুল।

বলল — তুমি এসেছো?

—হ্যাঁ।

—দেখছো তো কি সর্বনাশ। তারপরে আবার দাঙ্গা, ফৌজদারি, আগুন।

ঢাউস একটা পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। জয়ন্তীর ছোট বাচ্চাটা তার কোলে। বাকি দুটি পিঠে চড়ে গলা জড়িয়ে ধরছে। বাপকে দেখে সরে গেল। কাবেরী ওদেরকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথাটা নীচু করল।

জয় বলল—তুমি একবার যাও না সাহেবের কাছে। তোমার কথা ঠেলতে পারবেন না। কাবেরী চুপ করে রইল। এই ক'দিন আগে কাঁদতে কাঁদতে সাহেবের বাংলো থেকে ফিরেছে। তারপর আবার তার কাছে কি করে যাবে?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জয় বলল—কি হল? চুপ করে আছো কেন?

কাবেরী মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। এখন চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছে। কি করে সেকথা বলবে তাই ভেবে পাচ্ছে না।

জয় এবার গলা চড়িয়ে বলল —কি যাবে না।

স্তিমিত কণ্ঠে কাবেরী বলল—যাবো ত! কিন্তু কি মুখ নিয়ে যাবো?

জয় একটা অশ্লীল শব্দ যোগে ফট করে বলে দিল —যে মুখ নিয়ে যৌবনকালে প্রেম করতে।

কাবেরী স্তব্ধ হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ কানে আঙুল দিতে হয়।

কথাটা এত কটু এত বিসদৃশ যে জয়ন্তীর বুকেও দমাস করে হাতুড়ি পড়ল। বলল— কি বলছো গো ছেলেমেয়েদের সামনে মুখ খারাপ করছো কেন?

কাবেরী ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল— বলতে দে ছোট বৌ! কথাটা তো মিথ্যে নয়।

জয় বলল— এতই যদি বোঝ তবে যাচ্ছো না কেন?

—যাবো না ত বলিনি।

—শুধু টাল বাহানা করছো।

কাবেরী চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— কেন যে করছি তার মর্ম তুমি কি বুঝবে? তোমরা কি মেয়ে মানুষের মনের খবর রাখো?

—অতো সতীপনা ছাড়ো ত।

—আমি সতী নই তা সবাই জানে। তবু কেন খোঁটা দিচ্ছো?

জয়ন্তী জয়কে বলল - তোমরা কি শুরু করেছো বল দিকি? এই দুঃসময়ে দিদিকে কাঁদিয়ে তুমি কি সুখ পাচ্ছো?

জয় কড়া গলায় বলল—তুমি যা জানো না তা নিয়ে কথা বোল না ছোট বৌ। আজকের এই দুর্ভাগ্যের মূলে তোমার দিদি।

কাবেরী আস্তে আস্তে বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। জয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—তুমি যদি তাই মনে কর তাহলে বলি

সৌভাগ্যটাও আমি এনে দিয়েছি। দু'হাত ভরে সৌভাগ্য নিয়েছো—দুর্ভাগ্য নেবে না ?

জয় কেমন শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে বলল— ওঃ। তোমরা তাহলে সাঁট করেছো।

কাবেরী তীব্র কণ্ঠে বলল— না। মিথ্যাকথা।

জয় একটু মিইয়ে গেল। বলল—সাহেব তোমকে কি প্রস্তাব দিয়েছিল ?

—ছেলেমেয়েদের সামনে সেকথা খুলে বলতে হবে নাকি ?

—সেজন্যই ত বলছি এত সতীপনা কিসের ?

—আমিও ত বলছি সেকথা তুমি বুঝবে না।

—ওঃ। তাহলে তুমি যাবে না।

—কেন যাবো না ? তুমি স্বামী হয়ে পাঠাতে পারবে -- না গেলে সাঁট করেছো বলবে। তারপরে যেতেই হবে। কিন্তু তুমি একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তোমাকে কখনো ছাড়বো না। আজ স্বার্থের বশে সব ভেসে গেল।

—আর তুমি যে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। সেটা কোন কথা নয়।

—তা তোমারই মঙ্গলের জন্য। ভেবেছিলাম জাতে উঠবে। যাক্, আর তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল —কচোয়ান !

জয়ন্তী পিছন পিছন এসে বলল —এ কি দিদি এখুনি চলে যাবে কেন ? খেয়ে যাও।

কাবেরী ওর চিবুকে হাত দিয়ে বলল —শেষ বয়সে রক্ষিতা হতে চললাম। আর বুঝি তোর হাতে খাওয়া জুটবে না রে ছোট বৌ। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

—কত সাধ করে মদন মোহন ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। মাছ মাংস খাওয়া ছেড়েছিলাম। গলায় তুলসীর মালা নিয়েছিলাম। সব শেষ হয়ে গেলরে। আবার আমাকে রঙ্গনটী সেজে সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়ার গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

জয়ন্তী বলল —দাঁড়াও দিদি ! গড় হয়ে প্রণাম করল।

ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল। ছেলে মেয়েগুলোকে কোলে নিয়ে আদর করে, চুমু খেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে চড়ল।

একদা রুক্ষ ডাঙার ধূসর পটভূমিতে যে জয় গোপাল জীবনের দাবদাহী হাহাকার নিয়ে বসবাস করতে এসেছিল তার প্রাণে ঝর্ণার কল্লোল, পাখীর কূজন, ফুলের সৌরভ, ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা নিয়ে যে রঙ্গনটী সদা সর্বদা সেবা যত্ন ও অনুরাগে তাকে ভরে দিয়েছিল সে আজ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সাহেব

বাংলো, কুলি ধাওড়া, বাবু কোয়ার্টার একে একে পার হয়ে গেল। সবাই তখন কাজে ব্যস্ত। কারো দাঁড়াবার অবসর নেই। ভাগ্যলক্ষ্মী বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তা দেখতে কেউ এলো না।

এমনিই হয়। মানুষ যখন বিপদে দিশেহারা, স্বার্থে উন্মত্ত তখন বুঝতে পারে না কে কার ভাগ্যলক্ষ্মী ?

তেতাল্লিশ

সন্ধ্যা সাতটার সময় সাহেব এসে বসলেন ওঁর ড্রয়িং রুমে।

কাবেরী হাসি মুখে ওঁর কাছে এগিয়ে এলো।

উনি বললেন হ্যালো কাবেরী। তুমি কখন এসেছো ?

—বিকেলে এসেছি সাহেব।

—খবর পাঠাওনি যে।

—কই পাঠালাম ?

দু'জনে বসার ঘরে ঢুকলো। সাহেব আরাম কেদারায় বসে একটা সিগার ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—জয় তোমাকে পাঠিয়েছে বুঝি ? কাবেরী হেসে বলল —কেন সাহেব ? ও না পাঠালে আমাকে আসতে নেই না কি ?

সাহেব একটু হেসে বললেন —আমার প্রোপার্টির সর্বত্রই তোমার অবাধ গতি। যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে যেতে আসতে পারো। সেটা কথা নয়।

—তাহলে ?

—বিশেষ করে এই সময়ে তোমার আসার মধ্যে জয়ের উদ্দেশ্য হাসিল করার মতলব আছে। এটাই আমার মনে হচ্ছে।

কাবেরী ওঁর কাছে দাঁড়িয়ে বলল —ওর উপরে তোমার খুব রাগ হয়েছে তাই না সাহেব ?

—তুমি বোস। তোমাকে আমি সব কথাই বলছি।

কাবেরীকে হাত ধরে বসালেন। তারপর বলতে শুরু করলেন —সিসিল একটা ভুল করেছিল। বরজোর সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তা কি জানো ?

কাবেরী অবাক হয়ে বলল —হে ঈশ্বর ! একথা তো জানি না।

—জয় তোমাকে বলেনি ?

—না।

—বোঝ তাহলে ! তোমার মত স্ত্রীকেও সে বলেনি। অথচ সাহেব মহলে সেই এ সংবাদ ফাঁস করেছে। ষড়যন্ত্র করেছে। তার নামে কুৎসা

ঘটনা করিয়েছে, মিঃ হরসকে দিয়ে। সেক্স স্টোরী লিখে সিসিলের হ্যাণ্ডব্যাগু, আমার মিসেস এবং বিভিন্ন ইউরোপীয়ানদের কাছে পাঠিয়েছে।

কাবেরী উত্তরোত্তর অবাক হয়ে যাচ্ছে। বলল —কিন্তু তাতে ওর স্বার্থ ?

—ওরা একটা দুর্নীতির চক্র তৈরি করেছিল। মিঃ টেলার তার মধ্যমণি। বাকীরা সহযোগী। সিসিল সেটা ধরে ফেলেছিল। তাই ওকে সরাতে এতকাণ্ড করেছে। আচ্ছা বল ত কাবেরী জয়ের কি উচিত ছিল না সিসিলের ব্যাপারে কোন অবৈধ আচরণের সংবাদ আমাকেই আগে জানানো।

কাবেরীর তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সিসিলের মত এমন চৌকস মেয়ে কি করে এভাবে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হতে পারে ? জয়ের কাছে এখবর আসতেই পারে। কিন্তু তা নিয়ে ষড়যন্ত্র করে একন নিমকহারামি করল ? তাই ত! যাকে হাতে করে মানুষ করেছেন তাকে শিকড় শুদ্ধ তুলে ফেলে দেবার পিছনে বিরাট কারণ না থাকলে সাহেব তা করতেন না।

বলল —আমি এসবের কিছুই জানি না সাহেব। তুমি যা বলছো —তা যদি সত্যি হয় তবে সে ঘোরতর অন্যায় করেছে।

—আমি যে এতবড় অ্যাকশন করলাম তা কি কোন মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হতে পারে কাবেরী ? এতে কি আমারই কম ক্ষতি হয়েছে ?

কাবেরী বেশী কথা বলতে পারল না। জয়ের জন্য উমেদারি করতে এসেছিল। কিন্তু এখন তার উচ্চকণ্ঠে বলতে ইচ্ছা করল —জয়। তুমি বেইমান! তুমি নিমকহারাম। সাহেব তোমাকে উচিত শাস্তিই দিয়েছেন।

রাত ঠিক ন'টার সময়ে ডিনার দিতে বলল কাবেরী। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে টেবিল সাজাল। সাহেবকে ধরে এনে বসিয়ে দিল।

অন্যান্য দিন সাহেবের ডিনার সময়মত হত না। উনি অফিস থেকে ফিরে স্টাডিরুমে না হয় সংগ্রহশালায় ডুবে থাকতেন। কাবেরী এসেছে বলে কথা-বার্তা বলতে বলতে মনটা হাল্কা হয়েছে। তিনি যাবতীয় ঘটনার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাবেরীর কাছে বললেন।

ডিনারের আগে ওষুধ, পরে ওষুধ। কাবেরী ওঁর কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ালো। ওষুধ পত্র দিল। উনি খুশীমনেই সবকিছু গ্রহণ করলেন। তারপর একটি চুরুট ধরিয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন। এটাই ওঁর অভ্যাস।

একটা সন্ধ্যা কাবেরীর সান্নিধ্যে কাটিয়ে মনের অপ্রসন্ন ভাবটা সরে গিয়েছিল। তাই শোবার আগে যিশাস ক্রাইষ্টের তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন। বুকে ক্রশ এঁকে শোবার ঘরে ঢুকলেন।

বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আবলুস কাঠের কারুকার্য করা পালঙ্কে

মখমলের চাদর বিছানো নরম বিছানা। নীল আলো জ্বলছে। সুরভিত ধূপের গন্ধে ঘরটা ভরে আছে।

বর্ষাকাল। বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। পূবের জানালা দিয়ে ভেসে আসছে জলো বাতাসের সঙ্গে কলমীশায়রের জলজ উদ্ভিদের গন্ধ। ব্যাঙ ডাকছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। টুপ্ টাপ বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে।

বেশ ভালো লাগলো ওঁর। ঘরের পরিবেশটি এত সুন্দর যে চোখ বুজালেই ঘুম এসে যাবে। আঃ ঘুম! কত সাধের, কত সাধনার বস্তু।

নাকে লাগল মিষ্টি সেন্টের সুগন্ধ। কানে বাজল অলঙ্কারের শিঞ্জন। চোখ মেলে তাকালেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মনোরমা রমণীর দিকে। এ সেই সৌন্দর্য! শেরগড়ের সাহেব কোঠী থেকে নওরঙ্গী বাংলো পর্যন্ত সুদীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় যা দেখে আশ মেটে না। যে সৌন্দর্য ম্লানও হয় না।

মিষ্টি হেসে কাবেরী বলল —ভালো দেখাচ্ছে সাহেব?

– নিশ্চয়ই।

হাত ধরে পাশে বসালেন। চিবুক স্পর্শ করে বললেন —আজ এমন মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত সাজে কেন সাজলে কাবেরী?

—তোমার কাছে আসবো বলে।

—সত্যি কি তুমি আমার কাছে এসেছো? নাকি জয়ের জন্য তদবির করতে এসেছো?

কাবেরী মাথা নীচু করল।

সাহেব বললেন —কাবেরী তুমি সুন্দর। তোমার সাজশজ্জা, রূপ যৌবন সবই সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে বেশী সুন্দর তোমার হৃদয়। ঐ হৃদয়টাকে আমি যে কত ভালবাসি কত শ্রদ্ধা করি —তা তুমি জানো না। তোমার সম্পর্কে এই যখন আমার মনোভাব তখন এই মন ভুলানো সাজসজ্জা কেন?

কাবেরীর মুখটা আরো নীচু হয়ে গেল। নিজেকে ছোট মনে হল। সত্যিই ত! আজ সে অভিনয় করতে এসেছে। সাহেবের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে জয়ের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করতে এসেছে। অথচ সাহেব তাকে হৃদয়ের রানী করে রেখেছেন।

বলল —জয়ের জন্য আমি তোমার কাছে আর্জি জানাতে এসেছিলাম সাহেব। ওকে কি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারো না?

সাহেব ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন —তুমি ওর হয়ে কিছু চেও না কাবেরী। তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে আমার হৃদয় ভেঙে যাবে।

কাবেরীর মুখটা মলিন। জীবনে এই প্রথম সে ছলনার অভিনয় করতে এসেছিল। প্রথম বারেই ধরা পড়ে গেল।

সাহেব বললেন —আমি তোমাকে ভালবাসি কাবেরী। ভালবাসা দিয়েই তোমাকে পেতে চাই। বেইমানের বেইমানি বরদাস্ত করে নয়।

সে এক চরম দ্বান্দ্বিক মুহূর্ত। একদিকে স্বামী অন্যদিকে প্রেমিক। স্বামী তাকে অসতী বলে সাহেবের কাছে পাঠিয়েছে তার সৌভাগ্যের ভাঙা সিঁড়িটা মেরামত করতে। আর প্রেমিক প্রেম চাইছে প্রেমের বিনিময়ে। কোনটা কাম্য ?

প্রেম এবং বস্তু, আবেগ এবং বুদ্ধি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমেছে। ক্রমশই লোপ পাচ্ছে বিচার বিবেচনার বুদ্ধি। মুখটা ঝুঁকে পড়েছে। উনি ওর চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। কাবেরী প্রায় ভেঙে পড়েছে।

সাহেব বললেন —তুমি এসেছো —আমার কাছে আছো এর মূল্য আমি তোমাকে দিতে পারবো না।

—অনেক দিয়েছো সাহেব। তোমার নিয়েই ত আমার সংসার ভরে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন দু'একটা শেল বুকে বিঁধে যায় যে তার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে। বলতে গেলে জয় আজ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার কাছ থেকে যদি কিছু নিয়ে ফিরতে না পারি তবে সে হয়তো আমাকে ত্যাগ করবে।

—তাই তুমি আমার কাছে রঙ্গনটী সেজে ধরা দিতে এসেছো ?

কাবেরী আর্তকণ্ঠে বলল —সাহেব !

—ভুল করেছো। রঙ্গনটী কাবেরীর চেয়ে আসল কাবেরীর হৃদয়টাই আমার কাম্য। শরীর দিয়ে আমাকে ভোলাতে চেও না।

কাবেরীর বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। এমন কথাও তাকে শুনতে হল আজ। কিন্তু কার জন্য ?

ভীষণ লজ্জাবোধ করল। মাথা নীচু করে স্খলিত পায়ে নিজের ঘরে এলো। টান মেরে খুলে দিল রঙ্গনটীর সাজ পোশাক। কপালে করাঘাত করে বলল —ঠিক হয়েছে। সাহেব আজ তার মুখের উপর ঠিক জবাব দিয়েছেন। রূপ দিয়ে স্বামীর জন্য রূপো আদায় করতে এসেছিল। এই ঠিক হল।

সকালে উঠে স্নান করে যাবার জন্য তৈরি।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন —তুমি আজ চলে যাবে কাবেরী ?

—হ্যাঁ সাহেব।

—কোথায় যাবে ?

— আমার কুটিরে।

—জয় কি সত্যিই তোমাকে ত্যাগ করবে ?

—কি জানি ?

— তোমার জন্য আমার হৃদয়ের দুয়ার খোলা রইল কাবেরী। আর তোমার আজীবন ভরণপোষণের দায়িত্ব তো আছেই। টাকাকড়ি যখন যা দরকার পানমোহরা ক্যাশিয়ারকে স্লিপ দিলেই পাবে। সরিতা এলে পাঠিয়ে দিও।

অফিসে গিয়ে উনি গাড়ীটা ছেড়ে দিলেন কাবেরীকে পৌছাতে।

জয় এলো দুপুর বেলায়। ঘোড়া থেকে নেমে রুক্ষ এবং কর্কশ ভঙ্গীতেই ঘরে ঢুকল। কাবেরীকে বলল তুমি এখানে চলে এসেছো —ওদিকে আমরা ভেবে মরছি।

—তোমার ভাবনার জগৎ ভরিয়ে দেবার মত খবর নেই বলেই ও বাড়িতে গেলাম না।

জয় হতাশভাবে বসে পড়ল।

কাবেরী বলল —আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না।

জয় ওর দিকে কট্ কট্ করে তাকিয়ে বলল, তা পারবে কেন ? তুমি তো আমার জন্য যাওনি। গিয়েছিলে নাগরের কাছে সোহাগ খেতে।

কাবেরী জ্বলে উঠল। ঝঙ্কার দিয়ে বলল —চুপ করো। শুধু তোমার জন্যে মান সম্মান খুইয়ে, ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়ে সাজানো গোছানো শরীর নিয়ে হ্যাংলার মত সাহেবের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জয় ওর দিকে তাকিয়ে ওর তেজ দেখে ঘাবড়ে গেল। বলল -- ঠিক আছে। আমিও দেখে নেবো।

—তুমি ওঁর কি দেখবে ? একটা পাহাড়ের সঙ্গে টক্কর লাগাতে গেলে নিজেই গুঁড়ো হয়ে যাবে। অনেক তো করেছো। ওর মেয়ের বিরুদ্ধে ষড়-যন্ত্র করেছো। দুর্নীতির চক্র বানিয়েছো। তোমার লজ্জা করে না যার খাচ্ছো তারই চুরি করছো। তারই মেয়ের নামে কুৎসা রটাচ্ছো।

জয় গলা চড়িয়ে বলল —চুরি আমি করিনি। করেছে সাহেবরা। কিসের টাকায় ওরা মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করত ? ব্যাঙ্ক ব্যালন্স বানাত ? সে টাকা কোথা থেকে আসত ? এই জয় গোপাল যোগান দিত। কারণ সে ঠিকাদার। বিল ভাউচার তার নামেই হয়েছে। তার মেয়ে কামের জ্বালায় একটা চাকরের সঙ্গে লটঘট করেছে। আর দোষী হল জয় গোপাল।

কাবেরী স্থিরভাবে বলল —তুমি কিছুই করনি ?

—করেছি। সাহেবরা আমার নামে বিল করে টাকা লুটবে আর আমি আমড়া আঁঠি চুষবো —তা ত হয় না। ওরা যদি হাজার টাকা পেয়েছে তো আমি শ'টাকা পেয়েছি। সেও ত আমার ভাগ্যের ধন।

কাবেরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল —এসব কথা সাহেবকে বলনি কেন ?

—সাহেবদের রাজত্বে সাহেবদের নামে চুগ্‌লি করতে গেলে আমার

মাথাটাই উড়িয়ে দিত। তোমার মাথায় সিঁদুর না পরলেও চলবে কিন্তু জয়ন্তীর ত তা নয়।

খোঁচাটা কাবেরীর বুকে লাগলেও সে সহ্য করল। একটু চুপ করে থেকে বলল —বেশী মাথা গরম কোর না। খাবার দিচ্ছি। মুখ হাত ধুয়ে এসো— খাবে।

জয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল —না। খাবো না। তোমাকে আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি যদি আমাকে স্বামী বলে মনে কর তবে মানবে। না হলে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে যা খুশী করবে।

কাবেরী ঘাড় বেঁকিয়ে ওর দিকে তাকাল।

জয় বলল -আজ থেকে সাহেবের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে। তুমি কোনদিন যাবে না। সরিতাকেও যেতে দেবে না।

—বেশ। তাই হবে। কিন্তু সরিতা তোমার কথা মানবে কেন? যতই হোক সাহেব ওর জন্মদাতা পিতা।

—অত সোহাগ দেখাবার দরকার নেই। যা বললাম —তা ইচ্ছা হলে মানবে। না হলে জয় গোপালের স্ত্রী বলে পরিচয় দিও না।

ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে গেল জয়। রান্নাঘরে তার জন্য বাড়াভাতে মাছি বসল। কাবেরীর বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

এই জয় গোপাল একদিন তার ভালবাসার জন্য সমাজ সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল। সেও কি তাহলে স্বার্থের জন্য? তখন ওর কাছে সমাজের চেয়ে কাবেরীর দাম বেশী ছিল। কারণ ওর আঁচলেই বাঁধা ছিল ভাগ্যলক্ষীর চাবিকাঠি।

স্বার্থ তাহলে ভালবাসার চেয়েও বড়?

এক গভীর জিজ্ঞাসা তার বুকে খোদিত হল হৃদয় ঝরা রক্ত দিয়ে।

চুয়াল্লিশ

ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষার রাত। মেঘ ঝুলে পড়েছে চঞ্চলা জোড়ে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই ক্ষণপ্রভার চকিত প্রভায় ঝলসে উঠছে দুই চলমান রাহী। ওরা জাহান্নামের মুসাফির। বাঁশ বাঁধা একটি মৃতদেহ বহন করছে অসীম দুঃখে।

পানমোহরা দাঙ্গার দুই কিশোর যোদ্ধার ছোটটি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। চিকিৎসা হলে সেরে উঠত। কিন্তু যে হতভাগ্য মানব সন্তান দিনের আলোতে শবদেহ সৎকার করতে পায় না তাদের চিকিৎসা পাবার ভাগ্য নয়। তাই সে রক্তক্ষরণ ও ধনুষ্টঙ্কারে মারা গেছে।

চঞ্চলা জোড়ে দু'কানা বান। হড় হড় শব্দে অবিরত জল বইছে। তার কিনারায় এসে থামল। কাঁধ থেকে মড়া নামাল। দু'জনেই হাঁফাচ্ছে। মড়াতেও দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সকালেই মারা গেছে কিন্তু পুলিশের ভয়ে মড়া বের করতে পারেনি। মনসারাম বলেছে রাত্রি হলে কবর দিবি। লোকজন সঙ্গে নিস্ না। তাহলে জানাজানি হতে পারে।

লঙ্কা ভিজে মাচার উপর হতাশ হয়ে বসে পড়ল। তার জীবনে দুঃখের সীমা নেই। চিলি দামোদরে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই অসম্ভব লাবণ্যময় নগ্ন নিতম্ব তার চোখে ভাসছে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত। মুগী ও তার কোলের বাচ্চাটি ধাওড়ার আগুনে জ্যান্ত পুড়ে মরল। এখন বয়ে নিয়ে এসেছে মেজো ছেলে ভুনেশ্বরের লাশ। এতগুলি তপ্ত শলাকা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তো তার খতম হয়ে যাওয়াই ভালো ছিল। কেন সে তখন নিজের জান বাঁচাবার জন্য অমন করে পালিয়েছিল?

কালেশ্বর বলল — বাবা। ই-বারে কি করব?

—একটি গাঁড়া খুঁড় বেটা।

কোদাল সঙ্গে এনেছিল। ভিজে মাটি অনায়াসেই কাটতে পারত। কিন্তু শোকে, দুঃখে ও আঘাতে জর্জরিত, প্রায় অনাহারে দুর্বল কিশোরটির একটি গর্ত খুঁড়তেই কালঘাম বেরিয়ে গেল। বসে বসে কুকুরের মত হাঁফাল। লঙ্কা সেই যে বসেছে আর উঠবার সাধ্য নেই।

কালেশ্বরের বুকের ধড়ফড়ানি কম হবার পর বলল —ঈ-বারে কি হবেক?

—বাঁশ থেকে খুল। কাপড় চুপড় খুলে জোড়ের জলে সিনান করা। তারপর গাঁড়াতে শুয়াঞে দে।

কালেশ্বর অক্ষরে অক্ষরে বাপের আদেশ পালন করল। তারপর দু'জনে মিলে গর্তটি ভরাট করল। ঘাস সমেত নরম মাটির চেলি কেটে উপরে বসিয়ে দিল। জন্মদাতা পিতা পুত্রকে কবর দিল বিনা অশ্রুপাতে। কালেশ্বরের বুকটা ডুকরে ডুকরে উঠছিল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কিন্তু লঙ্কার চোখে জল নেই। তার বুকজোড়া খরার হাহাকার।

কালেশ্বর বলল —বাবা। ভাইয়ের কবরে ফুল দিতে হত।

—ফুল কুথায় পাবি রে বাপ? নাই —ঈ-সংসারে ফুল নাই।

কালেশ্বর সেই কবরের মাটিতে হাত দিয়ে বলল —পিদিম দিতে হত।

—নাই। পিদিম নাই। ঈ-জগতে আলো নাই।

অন্তরাত্মা ভেদ করা সেই আর্তি এত শুষ্ক, এত নীরস যে নিংড়ে দিলেও এক ফোঁটা রস বেরুবে না। নিশ্চল হয়ে বসে রইল প্রেত মূর্তির মত। রাত্রির প্রহর বয়ে চলল। চারিদিকে বর্ষার গর্জমান নৈসর্গিক শব্দতরঙ্গ ভৌতিক রহস্যে ভরে রইল।

পুরনো ও পরিত্যক্ত খনিগর্ভে মূষিকের মত বাস করছিল কয়েকজন নারী ও পুরুষ। ওরা মনসারাম, ব্রজলাল, বাসমতি, কালো পইরা, ইরফান আলী প্রভৃতি পানমোহরা দাঙ্গার পলায়িত আসামী। তাদের কুলি বাথানে থাকবার জো নেই। কোন লোকালয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না। তাই পুরানো দিনের যেসব খনিতে সাপ, শিয়াল ও নেকড়ের বাসস্থান সেখানে তারও বাস করছে।

গভীর রাত্রে মনসারাম বলল—আমাকে একবার কুলি বাথান যেতে হবেক। বৌটির জ্বর হঞেছে। বেঁচে আছে কি না দেখে আসি।

ব্রজলাল বলল --একা ক্যেনে যাবি? আমি স'থে যেছি।

আরো দুটি যাত্রী ঘন অন্ধকারে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। কুলি বাথানে এসে কান পেতে শুনল এমন কোন সাড়া শব্দ আছে কি না যাতে পুলিশের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তারপর দু'জন গোটা গাঁটাকে প্রদক্ষিণ করল নিশ্চিত হবার জন্য। ব্রজলালকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে মনসারাম ওর ঘরের আগলটি ধরে মৃদুস্বরে ডাক দিল—বৌ! ঘুমাঞে গেইছিস ন'কি?

—তুমি এসেছো? টুকদুন দাঁড়াও। একাই আছো?

—না। বরজলাল আছে।

—অঃ। কাপড়টি পরে লিই।

অর্থাৎ সেই ব্যাপার। পরবার কাপড় ওর জোটে না। সেই যে বয়ঃসন্ধি কালে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে তাকে যেমন অন্ধকারের শাড়ী পরে লজ্জা নিবারণ করতে দেখেছিল আজও তেমনি চলছে।

আগল খুলে দাঁড়াল। তেল জুট দিয়ে পাথরের প্রদীপটি জ্বালাল। মনসারাম ব্রজলালকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বাচ্চাগুলো ঘুমে ন্যাতা হয়ে আছে। তাদের মুখ দেখল। মাথায় হাত দিয়ে আদর করল। বৈশাখী একটি তালাই পেতে দিল। তাতে বসে মনসারাম বলল—তুকে দেখতেই এলাম। কেমন আছিস।

—জ্বরটি আজ ছেড়েছে। দ্যাখ ক্যেনে?

হাতটি বাড়িয়ে দিল। মনসারাম স্পর্শ করে বলল—হুঁ। ঠাণ্ডা আছে।

ওদের জ্বর ব্যাধি প্রাকৃতিক কারণেই হয় আবার ছেড়েও যায়। যতক্ষণ জ্বর থাকে ততক্ষণ হু হু করে। জ্বর ছেড়ে গেলেই টুনমুনে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বিভিন্ন খবরাখবর আদান প্রদানের মধ্যেই বৈশখী বলল—ভাত খাবে?

—এত রেতে ভাত কুথায় পাবি?

—আছে। তুমার ভোজীতে দিঞে গেইছে।

-- উ-ত গেল জনমে আমার মা ছিল।' কিন্তুক কি করে বুঝলেক যে আজ আমি আসব।

—তুমার বেপারে উ-হাত গুণতেও পারে। সাঁঝ বেলাতে বললেক রেতে ঘুমাস না ছুটু বৌ আজকে উ জরুর আসবেক।

মনসারাম ব্রজলালের দিকে তাকিয়ে বলল ভাবতে পারিস ?

—হয় রে। মায়ের জাত ছ্যেলার হাল ভালই জানে।

মনসারাম বলল —দে। যা আছে দু'জনকে ভাগ করে দে। তুরা খেঞেছিস ত ?

—হঁ-হঁ। তুমরা খাও।

ভাত বেড়ে দিয়ে ও বেরিয়ে গেল শান্তিকে ডাকতে। সাধের দেওর ঘরে এসে চলে গেছে। ওর সঙ্গে দেখা করেনি। এ অপরাধ ও মার্জনা করবে না। মনসারাম যত বড়ই দাঙ্গাবাজ হোক সে ওর পিঠে চ্যালা কাঠ ভেঙে দেবে।

স্নেহ ভালবাসার কি অমলিন সম্পর্ক।

শান্তি এল প্রায় আলুথালু হয়ে। বলল মনসা এলি ?

—হঁ ভোজী।

ওঃ। তুর লেগে ভাবনায় মরে গেলাম রে মনসা।

তারপরই তার স্বভাব জাত ব্যাকুলতায় হেসে কেঁদে কাদা করে দিল। মনসার সর্বাঙ্গে হাত বুলাল। বড বড চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আদর করল।

বৈশাখী মুখ টিপে হেসে বলল - হঁ! বুড়া লুলুকে দমে আদর কর।

—তুঁই কি জানিস টে ? মনসা আমার বেটা বটে।

—হঁ ভোজী। তুঁই আমার মা বটিন।

আবেগের জোয়ারটা কম হবার পর মনসা জিজ্ঞাসা করল —পুলিশ তুদের উপর খুব অত্যাচার করছে ?

—সে কি বলতে হবেক ? হর হামেশা আসছে জুয়ান বউ-বিটিদিকে ধরে নিঞে যেছে তারপরে ঝিলের মড়া করে ছেড়ে দিছে। কারু কিছু বলবার জো নাই, গাঁয়ে একটি মরদ লোক নাই।

মনসা অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল তারপর ব্রজকে বলল —ঘরে ঘরে যা। বেবাক ম্যেয়া মরদকে ডাক দে, এখনি মা কালীর থানে জমা হতে বল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে জাগালি শ্মশানের ডুমুর তলে সবাই জমায়েৎ হল। মনসারাম বলল —আমরা একটি লড়াই লাগু করেছি যা এক জনমে শেষ হবার লয়। ঘুরে ঘুরে জনম লিতে হবেক। জান মান দিতে হবেক। কুলি বাথানের মানুষ হিম্মৎ রাখে। তা আমরা একদিনে পাই নাই। বহুত রক্ত দিঞেছি, বউ-বিটির ইজ্জত দিঞেছি, আপনা জান বাজি রেখে দাঙ্গা লড়েছি। আজকে যে পুলিশের অত্যাচার হছে তা সেই দাঙ্গার কারণেই। আমি কাল এমন ব্যবস্থা করব যেমন পুলিশের অত্যাচার বন্ধ হয়। আর তুদেদিকেও বলছি জান দিবি তবু মান দিবি নাই। কুলি বাথানে যেমন কেউ পয়সা নাচাঞে মেউয়া

নিতে না পারে। কোন পুলিশ জবরদস্তি করলে বুক পেতে বুলেট খাবি তবু গায়ের কাপড় খুলে সুখের ভাত খাবি নাই। ঠিক ত?

সবাই এক বাক্যে বলল —একদম ঠিক।

পঁয়তাল্লিশ

পরদিন চুল কেটে দাড়ি কামিয়ে কড়া মাঙ্গা দেওয়া খাকি ফুল প্যাণ্ট ও শার্ট পরে জুতো মচ্ মচ্ করতে করতে পুলিশ সাহেবের চেম্বারে ঢুকে গেল। গেটের বাইরে ঘোড়ার গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নামা, গট্ গট্ করে হেঁটে যাওয়া, চুল ও গায়ের রঙের উপর খাকি ড্রেস চড়ানো ইত্যাদির কারণে পাহারা-দাররা কেউ বাধা দিল না। বরং দু-একজন সেলাম দিয়ে দিল!

একজন কে বলেছিল—কাকে চান?

ঘাড় নেড়ে নড্ করে যেন সে ওর সেলামের প্রত্যুত্তর দিচ্ছে তেমনি ভঙ্গীতে বলল— বড় সাহেব।

তখন ওকে দেখাচ্ছিল মিঃ ব্যারাকলউরের যৌবনদীপ্ত মূর্তিটির মত।

পুলিশ সাহেব ছিলেন ইউরোপীয়ান। তাঁকে গুড মর্নিং বলে দাঁড়াল বিনীত ভঙ্গীতে। কিন্তু তার মুখটা শক্ত চোখ দুটো উজ্জ্বল এবং ঠোঁট দুটো অহঙ্কারী।

সাহেব পেনসিল তুলে বসবার ইঙ্গিত করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কে?

—আমি কুলি বাথানের মনসারাম ডশ। আপনার কাছে ধরা দিতে এসেছি।

সাহেব চমকে উঠলেন— মাই গড! তুমি মনসারাম। এ নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল।

কলিং বেল টিপলেন। একজন সান্ত্রী এসে বুটে বুটে টোক্কর দিয়ে স্যালুট করে দাঁড়াল। সাহেব বললেন —একে অ্যারেস্ট কর।

মনসারাম উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডকাপ পরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

সাহেব বললেন— তুমি বোস। আমার প্রশ্নের জবাব দাও। হাজতে যাবার সময় তোমাকে হাতকড়ি পরিয়ে নিয়ে যাবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

—ওদিকে দারোগা তোমাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে অথচ তুমি আমার কাছে ধরা দিতে এসেছো। তোমার সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে তুমি আইন কানুন কিছু জানো। কাজেই কোর্টেও স্যারেণ্ডার করতে পারতে। তাহালে কেন এসেছো?

—আমি একা আসিনি স্যার। আমার বউ ছেলেমেয়েদিকেও নিয়ে এসেছি। বাইরে ঘোড়ার গাড়িতে আছে। দয়া করে যদি অনুমতি দেন তবে নিয়ে আসছি।

উনি সান্ত্রীকে হুকুম দিলেন ওদেরকে আনবার জন্য। বললেন —বল। আমার কথার উত্তর দাও।

—ওরা আসুক। তারপর বলছি।

বৈশাখী সহ ছেলেমেয়েদিকে নিয়ে হাজির হল সান্ত্রী। বৈশাখীর মুখটা ঘোমটায় ঢাকা ছিল। সাহেব ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। ছেলেমেয়ে-গুলি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে।

মনসারাম বলল —সাহেবকে দেখা।

বৈশাখী সান্ত্রীটার দিকে তাকাল। মনসারাম বলল—সে লজ্জা করিস না।

বৈশাখী কাপড় খুলে দিল। সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—হোয়াট ইজ দিস ? সিলি ম্যাটারস।

মনসারাম বলল —হ্যাঁ স্যার। সিলি ম্যাটারস এবং ভীষণ নিষ্ঠুরতা। দেখুন কি নিষ্ঠুরভাবে আমার বউকে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছে। আরো কত অত্যাচার হয়েছে তা তো বুঝতেই পারছেন। তাহলে আমি ক্রিমিন্যাল হবো না ত কী ?

অল রাইট উওম্যান! তুমি ড্রেস করে নাও। ওখানে বোস।

বৈশাখী কাপড় পরে একটা চেয়ারের উপর জড় সড় হয়ে বসল। সাহেব সান্ত্রীটাকে বললেন —এই বাচ্চাগুলোকে ভালো করে খাইয়ে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখো। সান্ত্রী সেলাম দিয়ে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেল।

সাহেব ওঁর সেক্রেটারীকে ডেকে মনসারামের ফাইল আনতে বললেন।

জিজ্ঞাসা করলেন —তুমি কি কুলি বাথানের নেতা ?

—হ্যাঁ স্যার।

—রাজনীতি কর ?

—না স্যার।

—গান্ধীজীকে জানো ?

—নাম শুনেছি। চোখে দেখিনি।

—ওঁকে তুমি মানো ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কিরকম মানো ?

—লাইক গড।

—উনি কি বলেছেন দাঙ্গা-ফৌজদারি করগে ?

—না স্যার।

—তবে কেন এসব করছো ?

—নিজের জান বাঁচাবার জন্য। আমাদের জড় ঝড়ের জান বাঁচাবার জন্য। আমাদের মেয়েদের সতীত্ব বাঁচাবার জন্য। এবং এই নির্যাতনের জন্য।

—তুমি কি চাও ?

—কুলি বাথানের কুলি-কামিনরা যেন গতর খাটিয়ে খেতে পায়। তাদের উপর অত্যচার না হয়।

—সেটা আমি দেখবো তুমি এখন লক্ আপে যাও। আদালতের আইন অনুযায়ী তোমার শাস্তি হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে। তোমার ওয়াইফ ও বাচ্চাদিকে ছেড়ে দিলাম।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

সান্ত্রীকে ডেকে হুকুম দিলেন – একে একটা ঘরে বউ-বাচ্চার সঙ্গে পনেরো মিনিট কথা বলার সময় দেবে। তারপর লক্ আপে নিয়ে যাবে।

মনসারাম সাহেবের এই বদান্যতায় অভিভূত হল। পনেরোটা মিনিটকে মনে হল পনেরো বছরের প্রাণ টাটানো জীবন কাব্য। ছেলেমেয়েদের সামনেই বৈশাখীর পোড়া গালে চুমু খেয়ে অঝোর ধারে কাঁদল। বৈশাখী তার স্বামীর চোখে কখনো জল দেখেনি। সেদিনের সেই লোনা অশ্রুজল সে চেটে চেটে খেল।

ছেলেমেয়েদিকে বুকে নিয়ে আদর করে চুমু খেয়ে হাতে হাতকড়া পরে সান্ত্রীর সঙ্গে তেমনি মার্চ করতে করতে হাজতঘরে ঢুকল মনসারাম।

সাহেব তার জন্য আরো একটি কাজ করে দিয়েছিলেন। তা হচ্ছে তার কেশ ফাইলে একটি বহুমুল্য মন্তব্য। যা পরবর্তী অধ্যায়ে তার জীবনের ধারণাটাকেই পাল্টে দিয়েছিল। সাহেব লিখেছেন —মনসারাম ভশ সাধারণ ক্রিমিন্যাল নয়। সে একটা কমিউনিটির নেতা। তাকে রাজনৈতিক বন্দীর সুযোগসুবিধা যেন দেওয়া হয়।

সাহেব তার প্রতি কৃপা-পরবশ হয়েই যেন তার ললাট লিপি লিখে দিলেন।

কুলি বাথানের উপর পুলিশী জুলুম বন্ধ করার হুকুম দিয়েই শান্ত হলেন না তা যাতে পালিত হয় সেজন্য একজন পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব দিলেন।

কুলি বাথানে শান্তি নামল। বৈশাখী তার ঘরে ফিরে এলো। অন্ধকার সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলি ঘরে ফিরে এলো। ফিরে এলো না লক্ষা। তার এখানে ঘরই নেই। ফিরবে কোথা ?

সকলে মিলে কাঠ বাঁশ জোগাড় করে কালেশ্বরকে একটা কুঁড়ে বানিয়ে দিয়েছিল। ওর বিয়ে হয়েছিল সাতঘরিয়ায়। বউটি নিতান্ত ছোট। দশ এগারো বছর বয়স। তাকেই ওরা আনিয়ে দিল। ওর মা-বাপ আপত্তি করেছিল এটুকু মেয়ে আবার শ্বশুরঘর যাবে কি? গায়ে হোক তারপর যাবে।

ওরা তা শোনেনি। উদাহরণ দিয়ে বলেছে মনসারাম তার এগারো বছরের বউকে নিয়ে ঘরকন্না শুরু করেছিল। ওদেরই বা হবে না কেন?

সেই বউ আর একটি ছোট ভাই যাকে দাঙ্গার দিন উদ্ধার করে এনেছিল এই নিয়ে কালেশ্বরের সংসার। বনবহাল কলিয়ারীতে কুলি বাথানের একটা দলের সঙ্গে কাজ করতে যায়। ওর বাপ লক্ষা সেই ভাঙাচোরা মানুষগুলির জোড়া লাগানো সংসারে থেকেও নেই। কাজকর্ম করে না। সারাদিন হায় হায় করে।

কালেশ্বর কলিয়ারী গেলে ওর বউ দেওরের সঙ্গে হট্র হঠং খেলে। জাগালি ডাঙায় নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ায়। সে জানেই না কুলি বাথানের বউ হবার কত মান, কত অসম্মান।

বৈশাখীর বয়স ত বেশী নয়। গালটা পুড়িয়ে দিয়েছে বলেই না হলে এখনো মুখের লালিত্য আছে। মেহনত করা শরীর। গড়ন পিটন মজবুত। প্রায় দশ-বছর বয়সের ছেলেটাকে দেখাচ্ছে যেন ছোটভাই। কাবেরীর কাছে এসে দাঁড়াল।

কাবেরী ওকে ঠিক চিনে নিল বলল—ওমা! বৈশাখী তুই? এটি তোর ছেলে? বাব্বাঃ! এ যে বেশ বড় হয়েছে রে।

দু'জনকে বসিয়ে ও কাছে বসল। প্রথমেই মনসারামের খবর নিল। সে যে জেলে আছে তা ও জানত।

বৈশাখী ওর জীবনের সুখ-দুঃখের কথা গল্ গল্ করে বলল। মুড়ি, নাড়ু, জলটল খেয়ে ধকলটা কাটাল। কাবেরী বলল—বাবাঃ। কতদূর থেকে হেঁটে এসেছিস রে। এইটুকু ছেলের কত না কষ্ট হয়েছে। কখন বেরিয়েছিলি?

—সেই পরাতা তারা দেখে বিরালম।

ওদের তো ঘড়ি ঘণ্টা নেই। শুকতারাকে বলে পরাতা তারা।

কাবেরী বলল—বেশ। আজকের দিনটা থেকে যা।

—ঈ বাবাঃ। কাল সকালে কাজে যেতে হবেক হে কাকীমা।

—কেন? একদিন কাজে না গেলে চাপরাসীতে লাঠি নাচাবে বুঝি?

—না। কুলি বাথানের কুলি-কামিনদিকে আর কেউ লাঠি দেখায় না। তাপরে আমি হচ্ছি মনসারামের বউ। তার নামে খাতিরও যত দুঃখও তত।

কাবেরী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—তা জানিরে। তোদের দুঃখ কষ্টের সব খবরই রাখি। কিন্তু কি করব? তুই যদি একা হতিস তবে

তোর ছেলেদের এত কষ্ট হতে দিতাম না। কিন্তু মনসা তো একার জন্য লড়াই করে না।

—সেই গরব নিঞেই বেঁচে আছি। না হলে আমার উপরে যা দগদন হঞেছে তা কি আর বলে শেষ করতে পারব। কিন্তুক মানুষটি যে জেহেল খাটতে গেল আর ত তাকে ছাড়াবার কুনু উপায় দেখছি নাই। আগে মাস্টারবাবু ছিল জেল হাজতে গেলে ছাড়াবিড়া করাঞে আনত। উ মরে যাবার পরে আমরা ফাঁকা পড়ে গেইছি।

খুব চিন্তিতভাবে কাবেরী ঘাড় নাড়ল।

বলল—পানমোহরার দাঙ্গা ত শুধু শুধু হয়নি রে। জয়বাবুকেও আসামী করেছে। জামিনে ছাড়া পেয়েছে। এখনো তো কোর্টে মামলা ওঠেনি।

—তবে কি হবেক কাকীমা? উয়ার কি জামিন হবেক নাই?

—সেই ত রে! বড় ভাবনায় ফেলে দিলি। ঠিক আছে। যদি কিছু করা যায় তবে নিশ্চয় করব।

কাবেরী ওকে সেদিন যেতে দিল না। পরের দিন শুকতারা ওঠার সময় ঘোড়ার গাড়ী করে কুলি বাথানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করল। বৈশাখী একটা রাত দুঃখের পাঁচালী গেয়েই কাটিয়ে দিল।

ছেচল্লিশ

শুরু হয়েছে পুজোর ছুটি। কাবেরী-কুটিরের বারান্দায় ঝলমল করছে আশ্বিনের সোনা রোদ। চোখ মেললেই সবুজ শস্যক্ষেত্র। এবছর ধান হয়েছে ভাল। ধানের চারাগুলো গর্ভিনীর পুলকে বাতাসে দোল খাচ্ছে। এসব কাবেরীর জমি। সাহেব ওকে দিয়েছেন সেই কতকাল আগে। টুসী ও মতি সিংয়ের ছেলেরা তা চাষ করেছে। প্রত্যেক বছরই করে। কিন্তু কাবেরী এত মন দিয়ে সে ধান দেখে না। এবছর দেখছে। অর্থাৎ দেখতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ ঐ ধানগুলিই তার সারা বছরের সম্বল।

টুসীর ছেলেরা বড় হয়ে চাকরি বাকরির চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যটাকেই পছন্দ করে ফেলেছে। সেই কবে কাবেরীর কাছে টাকা নিয়ে মতি সিং একজোড়া মোষ কিনেছিল এখন সেই মোষ জোড়াটা নেই। কিন্তু তার ছানাপোনা এবং দুধের দামের সুদ আসল নিয়ে বিরাট খাটাল। তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে, একটা পানমোহরা কোল কোম্পানীতে, একটা শেরগড় কোল কোম্পানীতে। তার দুই ছেলে দু'জায়গায় আছে। বাকী দুটি ছেলে এখনো ছোট। তার কাছেই থাকে। খাটাল চালায়। চাষ করে। পয়সা কড়ির কোন অভাব নেই। তবু তারা দু'জন কাবেরীর দাস-দাসী। এবং ছেলেমেয়ে বউ জামাই সবাই। ওরা কাবেরীকে কি যেন মনে করে।

কাবেরী যখন ঠাকুর মদনমোহনের সামনে বসে গান করে, অঝোর ধারায় কাঁদে তখন ওরা দু'জন তার কাছে বসে ঘাড় নাড়ে, কাঁদে, চোখের জল মোছে। ভক্তিরসের ধারায় অন্তর বাহির প্লাবিত হয়ে যায়।

সরিতা চিঠি লিখছে --ডিয়ার রবার্ট,

তোমাকে তো জানিয়েছি যে আমি ইংরেজী অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু পড়াটা শেষ হবে কি না সেটাই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমার স্থির প্রতিজ্ঞা এম এ-তেও ফার্স্ট ক্লাস নেবো। আমার মা সেজন্য তাঁর মদনমোহন ঠাকুরের কাছে অনেক মানত করে ফেলেছেন।

কিন্তু দুর্যোগটা এসেছে অন্যদিক থেকে। এসব ব্যাপার জানতামই না। পুজোর ছুটিতে মায়ের কাছে একমাস থাকবো বলে এসেই শুনলাম —আমার জন্মদাতা পিতা আমার লিগ্যাল ফাদারকে জবাব দিয়ে সাতখরিয়ার বাংলো খালি করিয়ে দিয়েছেন। এবং তোমার বাবাকেও। কি রকম মিস্টিরিয়াস ম্যাটারস্ বল ত। আমার ভীষণ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

থাক্ গে। এসব নিয়ে ভাববো না। আমি তোমার কথা ভাববো। তার মধ্যে কিরকম চার্ম আছে। আর আমার মা ভাববেন —আমাকে নিয়ে।

জানো মা প্রায়ই আক্ষেপ করেন —এসব গণ্ডগোল হবার আগে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত তবে আমি শান্তিতে ঠাকুর নাম করতাম।

আমি বলি —আমার বিয়ের জন্য তুমি ভেবো না মা। কিন্তু ওঁর সেই এক কথা —এতটা বয়স হল। এই বয়সে মেয়েরা মা হয়ে যায়।

হোয়াট এ সিলি ম্যাটার!

কিন্তু মা শব্দটার মধ্যে কেমন একটা অতলস্পর্শী গভীর ব্যঞ্জনা আছে এবং বিয়ে শব্দটায় দারুণ রোমাঞ্চ!

রবার্ট, আমি কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। আমার প্রতিজ্ঞা থেকে একচুলও বিচ্যুত হইনি। আশা করি তুমিও হবে না।

তোমার কোর্স শেষ হতে আর কত দেরি? ফাইন্যাল দিয়েই চলে আসবে। আসবে ত? তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম। অজস্র চুম্বন নিও।

ইতি—তোমার ভালবাসা।

খামে মুড়ে টিকিট সেঁটে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পোস্ট অফিস চলে গেল। নিজের হাতে পোস্ট করতে হবে। অন্যকে বিশ্বাস নেই।

যখন ফেরে তখন দেখল ব্যারাকলউ সাহেবের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বনেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার আর বারান্দায় থমথমে মুখে তার মা। সরিতা

ঘোড়া থেকে নামতেই ড্রাইভার ওকে সেলাম দিল।

সরিতা বলল —হ্যালো আংকল ! কখন এলেন ?

—জাস্ট নাউ।

আরো কিছু বলত। কাবেরী ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। মা ও মেয়ে ঘরে ঢুকল। কাবেরী ফিস্ ফিস্ করে বলল —সাহেব তোকে নিতে পাঠিয়েছে। কিন্তু — নওরঙ্গী হাউসের ডাক এসেছে শুনেই ওর মনটা খুশী হয়ে উঠেছিল। প্রথম প্রেমের কত স্মৃতি সেখানে। আর প্রেম নিয়েই ভাবছে এখন। বলল —কিন্তু কি মা ?

—উনি বারণ করে গেছেন।

—কেন ?

—কেন আবার ? স্বার্থের ঝগড়া।

—আমি মানবো কেন ?

—তাহলে আমি দোষী হব।

—তা কেন ?

—বলেছে আমাকে যদি স্বামী মনে কর তবেই মানবে।

—তাহলে গাড়ি ফিরিয়ে দাও। গট গট করে বাথরুমে ঢুকল। ভীষণ রাগ হয়েছে ওর।

সাতচল্লিশ

অবশেষে একদিন শেষ হল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। সে যুদ্ধের দামামা ধ্বনিতে সারা বিশ্বে প্রলয় নাচন হয়ে গেল তার বিয়োগান্তক অবসানে সমস্ত ব্রিটিশ ফার্মের অফিসে, বাংলোতে ইউনিয়ন জ্যাকের বিজয় পতাকা উড়ল। ব্যাণ্ড বাজল। সাহেবরা সব ক্লাবে, অফিসে মিলিত হয়ে রাজা ও রানীর সুদীর্ঘ আয়ু কামনা করে স্বাস্থ্য পান করলেন। গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। রানীকে তাঁদের বড় ভক্তি। আনন্দের জোয়ারে ভেসে গেলেন।

কিন্তু যাদের ঘরে ভাত নেই, যাদের কণ্ঠে গান নেই, যাদের মুখে ভাষা নেই সেইসব হতভাগ্য কুলি-কামিনের দল কোথায় আনন্দ খুঁজে পাবে ? ইউরোপের যুদ্ধ শেষ। চরম উত্তেজনার পর অবসাদের পালা শুরু হয়েছে। মাস ছয়েকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে ক্রমে ক্রমে কিন্তু অনিবার্যভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির রক্তস্রোত বন্ধ করে দিচ্ছে।

যে কয়লা কিনবার জন্য দেশ বিদেশের কনজিউমাররা হুমড়ি খেয়ে পড়তো, আগে টাকা দিয়ে অর্ডার বুক করাতো রেলে, কয়লা কুঠিতে তারাই এখন

চিঠি পাঠিয়ে সেসব অর্ডার ক্যানসেল করাচ্ছে। শেষ হয়ে গেছে কোলরাশের রমরমা বাজার। রব উঠেছে —ছাঁটাই-ছাঁটাই।

হতভাগ্য কুলি-কামিনের দল ভোর রাত্রে আপন আপন ডেরাডাণ্ডা, ছানা-পোনা, বাকসো পেঁটরা মাথায় নিয়ে মিছিল করে হেঁটে যাচ্ছে।

তাদের দেনাপাওনা জনে জনে হিসাব করে দেওয়া হয় না। এক একজন সর্দারের কাজ হিসাব করে ঠিকাদাররা পেমেণ্ট দেয়। সর্দার দেয় তার কুলি-কামিনদিকে। এমনি নিয়ম চলে আসছে প্রায় সব কলিয়ারীতে।

স্বভাবতই ফাইন্যাল হিসাবের সময় দাদন থেকে শুরু করে যা কিছু আগাম টাকা দেওয়া ছিল তার সুদের সুদ তস্য সুদ জুড়ে যা হচ্ছে তাতে পাওনার নামে বাজবন্দা ফারখৎ পেলে বাঁচি।

কুলি-কামিনদের হয়তো বা দু'পাঁচ টাকা করে পাওনা হতে পারে কিন্তু সর্দারদের দেনার খেসারৎ মেটাতেই তারা ফতুর। বেচারিদের দুরবস্থার শেষ নেই। যেসব দেউলিয়া সর্দার তারা আগেই বুঝে নেয় হিসেব নিকেশ হবার পর তার দশা কি হবে? ভয়ে গা-ঢাকা দেয়। হিসেব করতেই আসে না।

দু'পাঁচজন বড় বড় সর্দার ছাড়া ছোট-খাট সর্দারদের ব্যাপারই এরকম ছিল। কুলি-কামিনদের নামে ধার দেনায় লবচবানি চলত। মদের জোয়ার বইত। কার সাধ্যি কাছে দাঁড়ায়?

মালিকের কাছে ধার, বাবুর কাছে ধার, সুদওলার কাছে ধার, দোকানে ধার, মদের দোকানে ধার। সে একটি ফাটা ঢোল।

আবার কেউ কেউ বানিয়েও নিয়েছে। নিজের দেশে ঘরবাড়ি, জোতজমি করে হাল ফিরিয়ে নিয়েছে। সর্দারী থেকে ঠিকাদারী করতে গেছে। সেটা যার যেমন এলেম। পয়সা উড়ে যায়। যে যত পারে ধরে নিয়ে বাকসো বন্দী করে। যারা অভাগা তারা পয়সার সঙ্গে উড়ে যায়। আর মনুষ্যচরিত্রের কি দুর্ভাগ্য এই উড়ে যাওয়া লোকের সংখ্যাই বেশি।

ধারে পাশের গা, গঞ্জ, ডিহি, পাহাড়ী, বাদ, বাথান ও পুরের সাঁওতাল, বাউরী, হাড়ি, মুচি, পোল কোঁড়া, কুলি-কামিনরা আগে দিন-মজুর, ক্ষেতমজুরের কাজ করত। দু'বেলা মাড়ভাতেই পেট ভরত। কয়লাকুঠির রম-রমা বাজারে কিছু রোজগারপাতি করেছিল। তাতে জীবনের অন্যকোন উন্নতি হয়নি। গাঁজা, ভাঙ, তাড়ি, মদের মাত্রা বেড়ে শরীরটাই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। রোগ ধরেছে —কফ, শ্লেষ্মা, ক্ষয়, অম্লশূল আর পিত্তশূল। বাতের ব্যথা রাতের কানা। সিফিলিস, গনোরিয়া। যার যেমন কর্ম।

কেউ কেউ জুয়াড়ী। কেউ বা প্রফেসন্যাল প্রেমিক। তারা একাধিক-

মেয়ের সঙ্গে আশনাই করত। এখন সেসব বিষের কাঁটা। নিজেরই ভাত জোটে না পীরিতের আবার খাঁই কি ?

তবুও এত দুঃখের মাঝেও নিজের গাঁয়ে মাথার উপর একটা কুঁড়ে ঘরের চাল আছে। একটা ঠিকানা আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু আরা, বালিয়া, ছাপরা, মতিহারী, দেওরিয়া, আজমগড়, বস্তি, বিলাসপুর, রায়পুর, গাজীপুর, মুঙ্গের, মানভূম, সিংভূম, রাঁচি, পালামৌ, হাজারিবাগ থেকে যারা এসেছিল তাদের দুর্দশার অবধি নেই। হিসেবনিকেশ করে পয়সাকড়ি তো কিছু পায়নি। আবার আশায় আশায় থেকে দু'সপ্তাহ সেখানেই বসে খেয়েছে। দেশে ফেরার গাড়ি ভাড়াও নেই।

ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তার দরুন ভারতের কয়লার বাজারে মন্দা, এমন গূঢ়তত্ত্ব বোঝার সাধ্য নেই। ভেবেছিল জয়বাবু, বিজয়বাবু, রামবাবু, শ্যামবাবু, যে হোক একজন জুটে যাবে। আদর করে নিজের কলিয়ারীতে নিয়ে যাবে। যেমন আদর করে দেশ থেকে এনেছিল তেমনি আর কি!

কিন্তু জানাচেনা বাবুদের হাতেপায়ে ধরেও কিছু হয়নি। কিছু দোকানদার ও সুদওলা অতি লোভের আশায় ধার দেনা দিয়েছিল, তারাও ফাঁপরে পড়ে গেল। এই সব গৃহহীন, অন্নহীন কুলি-কামিনের কছে কি নিয়ে পয়সা উশুল করবে ?

ছাঁটাই!

বারো থেকে বিয়াল্লিশ বছরের মেয়েরা তো একথালা ভাতের বিনিময়ে যৌবন দিতে রাজি। কিন্তু খদ্দের কোথায় ? নারীমাংস অতি সুলভে বিক্রি হতে লাগল। জোয়ান জোয়ান মরদগুলো চার আনা হাজরীতে সারাদিন মাটি কাটতে রাজি। তাই কাজ কোথায় ?

ছাঁটাই!

রাতের অন্ধকারে দলে দলে চলে যাচ্ছে। কোনরকমে স্টেশনে গিয়ে আপ ট্রেনে আলু পিঁয়াজের বস্তার মত লোড হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য টিকিটও নেই। পয়সাও নেই। আছে শুধু ঝন্ ঝন্ শব্দের চিৎকার ও ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের কান্না। চেকারবাবুরা ঘাড় ধরে যে স্টেশনে নামিয়ে দেয় সেখানেই টাট্টি, পেসাব, নোংরামি।

ছাঁটাই!

এই চিত্রটার সঙ্গে আগের চিত্রগুলির কি ফারাক! তখন একটা কুলি রাতের অন্ধকারে পালাবার চেষ্টা করলে ধরে এনে খাদের কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিত। স্টেশন পর্যন্ত চাপরাসী দৌড়াত ধরে আনার জন্য।

এই বুঝি কালচক্রের অমোঘ আবর্তন। জীবন ও জীবিকার মর্মান্তিক

প্রদাহ। যে সব যুবকরা এসেছিল তারা বৃদ্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। যে সব বালিকারা মা বাবার পিছনে পিছনে এসেছিল তারা সন্তানবতী হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কেউ বা হারিয়ে গেছে। ফুরিয়ে গেছে। কেউ থিতু হয়েছে।

তবু শেষ হয়নি অবিরাম জনস্রোত।

ব্লাডি জয়ের এখনো গরম ভাঙেনি। ঠিক আছে তোমার মাজা আমি ভেঙে দেবো। জীবনে কখনো মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে না।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। মাথাটা একবার গরম হলে হয়। মিঃ ক্রীগের ডাক পড়ল। ছাঁটাই, জবাব, ধাওড়া খালি করার মত অপ্রিয় কাজগুলি করতে করতে মিঃ ক্রীগ এখন দুর্দান্ত ভিলেন বনে গেছেন। ডাক পেয়েই ছুটে এলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন —জয়বাবুর বিল পেমেণ্ট হয়নি ত ?

—না স্যার। আপনি বারণ করলেন।

—ইয়েস। ওর কত বিল হয়েছে।

—ও ত এক গাদা বিল দিয়েছে। প্রায় এক লাখ বাইশ হাজার টাকার। তবে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। তাতে অনেক গলদ আছে।

—তোমার হিসেবে কত হবে ?

—এক লাখ। কিছু কমই হবে।

—অলরাইট সে পেমেণ্ট বন্ধ থাকবে। মিঃ বাসুকে বল কোরাপ্ট চার্জটার যেন জোর তদ্বির করে ওর প্রপার্টি অ্যাটাচ করার অর্ডার বের করে অনেন। আমি চাই ওর সাধের সাতখরিয়া বহালে যেন একগাছিও ফসল না হয়। রাইট ?

—ইয়েস স্যার।

—থ্যাঙ্ক উই।

মিঃ ক্রীগ চলে গেলেন। উনি আবার স্বগতোক্তি করলেন—ব্লাডি ফুল। সরিতাকে আসতে দেবে না। ব্যারাকলউ সাহেব তাতেই হাতুসে যাবে। তোর কাছে স্যারেণ্ডার করবে। আরে বুড়বক ! ব্যারাকলউ সাহেব হাতুসহবার মাল। সে এমন কত সরিতা পয়দা করেছে। মাঠে ঘাটে কয়লা কুঠিতে চরে বেড়াচ্ছে। তোর মত ভেড়ুয়া জয় গোপালরা তাদের বাপ বনে থাকে।

ঐ মেয়েটা কাছাকাছি থাকতো, লেখাপড়া, নাচগান, কালচার সবই আমাদের সোস্যাইটির স্টাণ্ডার্ডে আর দেখতে তো প্রকৃত সুন্দরী তাই স্নেহ মমতা পড়ে গেছে। ওর মা-টা সত্যিই ভালো মেয়ে। প্রাণের টান আছে। তাই। না হলে কিসের আকর্ষণ হে !

এমনধারা ভাবনার পর উনি বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন।

ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, ভিয়েনা, হংকং, সিঙ্গাপুর, বোম্বে, ক্যালকাটার শেয়ার বাজার পড়তির মুখে হড়কে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজার শিল্প-বাণিজ্যকে রাহুগ্রস্ত করে তুলেছে।

চালতা, চয়নপুর, নওরঙ্গী, নতুন হাট ও খয়েরকানালীর ডিপোগুলো থেকে আগে যেখানে দিনে একশো ওয়গন ডেসপ্যাচ হত আজ সেখানে বিশ ওয়াগন হয় না। আগে কন্‌জিউমাররা আগাম টাকা জমা দিত এখন ধারেও কয়লা কেনে না। সারা সপ্তাহে যেটুকু ডেসপ্যাচ ও টাকাকড়ি আদায় হয় তাতে লেবার পেমেণ্ট হয় না।

সেজন্য মিঃ ব্যারাকলউয়ের ভাবনা কম নয়। তিনি দিনে দিনে প্রোডাকশন কমিয়ে আনছেন। প্রায় অর্ধেক শ্রমিক ছাঁটাই করে দিয়েছেন। তাদের দুঃখ দুর্দশার দিকে পিঠ দেখিয়ে আছেন।

এই সময়ে মিসেস ব্যারাকলউয়ের চিঠি এলো। তিনি লিখেছেন—বর্তমান বাজারের যা দশা তাতে নওরঙ্গীর কয়লা বিক্রি হবার সম্ভাবনা নেই। অযথা কয়লা তুলে জমিয়ে রাখার কি দরকার? ডিপোতে আগুন লাগলে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কাজেই নওরঙ্গী কোল কোম্পানীতে ক্লোজার ডিক্লেয়ার করে দাও।

পড়তে পড়তে সাহেবের ব্রহ্ম তালু জ্বলে গেল। এই ভদ্রমহিলা কি মনে করে কি? সারাজীবন আমার উপরে হুকুম চালাবে? আর আমি তা তামিল করবো?

তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখতে বসলেন—ডারলিং!

এই কোলফিল্ড তৈরি করার অন্য আমি শরীরের রক্ত ঢেলে দিয়েছি। মনকে বন্ধক দিয়েছি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রোগ ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে মরতে বসেছি। তবু এরই মধ্যে একটু আনন্দ পাই যখন দেখি বয়লার চিমনির ধোঁয়া আকাশে উড়ে যাচ্ছে। কুলি-কামিনরা সার দিয়ে কাজে যাচ্ছে। এবং হল্ হল্ করে ইঞ্জিন চলছে। যান্ত্রিক শব্দগুলো আমার কাছে কারেরীর গানের চেয়েও মধুর মনে হয়।

কাজেই দয়া করে আমার সৃষ্টিকে শুব্ধ করে দেবার হুকুম জারি করতে এসো না।

উইথ থাউজেণ্ড কিসেস! ইয়োর্স—এফ. জি. ব্যারাকলউ!

মাথাটা যেদিন গরম থাকে সেদিন মদ খেতে ইচ্ছে করে। খানসামাকে অর্ডার দিলে টালবাহানা করে। জোর ধমকে বেশি করে জল মিশিয়ে হাল্কা করে দেয়। এও মেমসাহেবদের হুকুম। সিসিল মেমসাহেব আর কাবেরী মেমসাহেব।

শালা! জিন্দেগীটা মেয়ার খিদমৎ খাটতে গেল।

—এ্যাই খানসামা! সরাব লে আও।

জয় গোপাল সরকার তখন ট্রান্স অজয় কোল কোম্পানীর অজয় ভ্যালি কলিয়ারীর মালিক। প্রায় লাখ টাকা দাম দিয়ে কিনেছে ও লাখ টাকা লগ্নী করেছে। ব্যারাকলউ সাহেব যেমন এক একটা কলিয়ারী করার সময় দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যান তেমনিভাবেই সে অগ্রসর হচ্ছিল। আশা ছিল পাঁচটা বছর চালাতে পারলেই মাৎ করে দেবে। ব্যারাকলউ সাহেব ও চঞ্চলবাবুর মত সেও কলিয়ারীর পর কলিয়ারী খুলবে।

কিন্তু জায়গাটা বেয়াড়া। অজয় নদী পার হয়ে আসতে হয়। কোন রাস্তাঘাট নেই। অণ্ডাল সাঁইথিয়া লুপ লাইনের ট্রেন একমাত্র গতি। তাই সে ওখানেই একটা বাংলোতে থেকে গেছে। জয়ন্তী থাকে আসানসোলের বাড়িতে। বড় ছেলেদুটি কলকাতার হিন্দু স্কুলে পড়ে। ছোটগুলি আসানসোলেই।

কলিয়ারীর কাজ ভালই শিখেছে। দিনে দিনে রেজিং ডেসপ্যাচ বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আশার ফানুসটা ক্রমশ বিরাট আকার ধারণ করছিল।

কিন্তু কাল বড় বলবান। এক ফুঁয়ে নিভে গেল আশা। বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজার। ট্রানস অজয় কি বিশ্বের বাইরে? এখন ওর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দায়। জয় প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে অস্তিত্বের সংগ্রামে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বিষাদ করুণ প্রতিমার মূর্তি। কল্লোলিনী ঝর্নাধারার মত তার জীবনটা জুড়ে বসেছিল, সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিল; আজ তার কাছে দাঁড়াবার মুখ নেই।

কেন নেই? সে তার স্ত্রী। যত দুর্ব্যবহারই করুক তার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে কি? না। অতবড় হৃদয় ঠুনকো আঘাতে ভাঙবার নয়! না জানি এখন সে কত দুঃখকষ্টে আছে? অথচ তার কিসের ভাবনা? গজলের রানী সে।

যত দুঃখ জয়ের জন্য।

ওর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আটচল্লিশ

ভগবান কার জন্য যে কোথায় অন্নজল বরাদ্দ করেছে তা কে বলতে পারে। যে মিঃ হবস ভারতীয়দের নিগার বলতেন তাঁকেই অবশেষে চঞ্চলবাবুর কাছে চাকরি করতে হচ্ছে? তিনি এখন বন বহাল কলিয়ারীর ম্যানেজার।

যখন যুদ্ধের বাজার ছিল, কলমীশায়েরের স্বপ্নদ্বীপে নীল আলো জ্বলত,

সিসিল মেমসাহেবরা বাস্টার্ড সার্জেন্টদের সঙ্গে নিভৃত কুজন করতেন, হাইলি ডেকোরেটেড আলো ঝলমল-শয্যায় রতিস্নান করতেন তখন তাঁর যে দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছিল আজও তার শেষ নেই।

মার্টিন বার্ণ কোম্পানীতে চাকরি একটা পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তা ছিল অস্থায়ী। টাইম বাউণ্ড এগ্রিমেন্ট ছিল না। বিয়েও করে ফেলেছিলেন? যুদ্ধটা শেষ হয়ে যাবার পর মন্দার রাহু তাঁকে গ্রাস করল। মাস ছয়েক পর ওঁরা তাঁকে নোটিশ দিয়ে দিলেন।

সে সময় অনেক সাহেব নোটিশ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তাঁরা সব বিলেত যাবার ভাড়া পেয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ হবস তা পাননি। ওঁর চুক্তিতে সে শর্ত ছিল না। যেখানে ছিল সেই পানমোহরা কোল কোম্পানী কোর্টের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। উনি মামলা লড়ছেন তবে এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। ওটা হয়তো জিতে যাবেন কিন্তু তাঁর জীবনের যে কষ্টভোগ ছিল তা হয়ে গেলে।

তাঁর স্ত্রী যখন পূর্ণগর্ভা তখনই চাকরি জবাবের নোটিশ। দেশেও ফিরতে পারছেন না নানা কারণেই। আবার কোন কোম্পানী তাঁকে চাকরিও দিচ্ছে না। বড় দুঃসহ অবস্থা। কুলি-কামিনদের ছাঁটাই হলে না হয় দল বেঁধে ঘর যায়, গলা ভেঙে কাঁদে। উপোস দেয়। কিন্তু সাহেব ছাঁটাই হলে তার দুর্গতির অবধি থাকে না।

মাস তিনেক বেকার জীবন কাটাবার পর বন বহাল কলিয়ারীর চাকরিটা পেয়েছেন। কারণ চঞ্চলবাবু ঐরকম একজন ম্যানেজারই চাইছিলেন যাঁর নিয়োগ-চুক্তিতে দেনাপাওনার কড়াকড়ি থাকবে না। জবাব দিলেই চলে যাবেন। কারণ সর্বক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচের প্রয়োজন তাঁরও। উনি দেশী মালিক। দেশী ছকেই বাঁধা ছিল প্রশাসন। বিলিতী কোম্পানীর ঠাট ঠমক ছিল না। ক্লাব বা সুইমিং পুল ছিল না। আনন্দের উপকরণ বলতে দেশী মহুয়া, দেশী জানানা।

মিঃ হবস তাতেই রাজি। না হয়ে উপায় কি?

এই দুঃখের সময়ে তিনি একটি পুত্র লাভ করেছিলেন এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লঙ্কার। খালি গা, খালি পা। পরনে একটা শতচ্ছিন্ন তালি-মারা হাফ প্যান্ট। বড় বড় চুল দাড়ি। চোখগুলো লাল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে।

মিঃ হবস তার চেহারার আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও চিনে ফেললেন।

প্রতিহিংসা চরিতার্থের মত গুরুতর কাজের সঙ্গীকে কার বা না মনে থাকে? তিনি ঘোড়ার লাগাম কষে দাঁড়ালেন। বললেন—তুমি লঙ্কা?

লঙ্কাও তখন সাহেবকে চিনেছে। সেলাম করে বলল—হাঁ হুজুর।

—তোমার এমন দশা কেন ?

—হুজুর আমার তো বেবাক খতম হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ। শুনেছি তোমার হোল ফ্যামিলি ম্যাসাকার হয়ে গেছে। এখন কি কর।

—এই ভিক্ষা করি। আমার ছ্যেলাটা কাজ করত। তারও ছাঁটাই হয়ে গেছে।

—কোথায় কাজ করত ?

—বনবহাল কলিয়ারীতে।

—মাই গড ! আমি বনবহালের ম্যানেজার আর তোমার ছেলেই ছাঁটাই। অল রাইট। তুমি কাল ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি কাজ দেব।

লম্বা সেলাম দিয়ে বলল —হুজুরের বহুত মেহেরবানি।

ব্যয় সংকোচ !

মিঃ ক্রোগের টেবিলে থাক থাক কাগজপত্র, বিল, ভাউচার। একটিও না দেখে সই করেন না। তিনি সই না করলে বিলও পাশ হয় না। পেমেণ্টও হয় না। ডেভলপ্‌মেণ্টের কাজ বন্ধ। প্ল্যাণ্ট মেশিনারি কেনা বন্ধ। স্টোরের উপর জবরদস্ত বাধানিষেধ।

ব্যয় সংকোচ !

একটা সুদীর্ঘ ছাঁটাইয়ের তালিকা। গত ছ'মাস ধরে দফে দফে ছাঁটাই করেও কাজ শেষ হয়নি। এখনো চলছে এবং চলবে। কুলি-কামিনদের ফুল ফাইন্যাল পেমেণ্ট। পাসড। খচ্‌ খচ্‌ করে দস্তখত করে দিলেন। যেন মাথা থেকে একবোঝা কাঠ নামল।

ব্যয় সংকোচ !

ঘোড়ার দানা। ফুল গাছের সার। রসুই খানার ভাঙা কাঁচের বাসন-গুলির বদলি বাসন। বাবু কোয়ার্টারের মেথর। সার্ভিস ল্যাট্রিনের দশখানা টিন। বাবুদের ঘরে কেরোসিন তেল। মিস্ত্রীদের হাতমোছা জুট। চাপ-রাসাদের ড্রেস। হাসপাতালের ফিনাইল। সাফাই কামিনদের ঝাড়ু-ঝাঁটা সাজি মাটি। নট পাসড।

ব্যয় সংকোচ !

মাত সিং ও টুনীর বেতন। কাবেরীর হাত-খরচ। সরিতার পড়ার খরচ। ক্রীগ সাহেবের কলমটা একটু থামাল। ব্যারাকলউ সাহেবের সঙ্গে ত ওদের সব সম্পর্ক চুকে গেছে। তবে আর বোঝার উপর শাকের আঁটি কেন ? খচ্‌ খচ্‌ করে লিখে দিলেন —নট পাসড !

ব্যয় সংকোচ !

মিঃ ব্যারাকলাউ যেদিন ব্যয় সংকোচের জন্য মিটিং করেন সেদিন মিঃ ক্রাগ সেই সপ্তাহে কত টাকা খরচ বাঁচিয়েছেন তার ছোট পরিমাণ দাখিল করেন।

উনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন—ওয়েল ডান চালিয়ে যান। আরো কোথায় কত বে-ফালতু খরচ হচ্ছে খুঁজে বের করুন।

—ইয়েস স্যার।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ জয় গোপাল পড়ে আছে বর্ধমান কোর্টে। তার বিরুদ্ধে আনীত দেওয়ানী মামলার জন্য নথিপত্র ও অভিযোগের জবাব তৈরি করতে সে ব্যস্ত। সুবিমান মল্লিক বর্ধমান বারের সিনিয়ার এ্যাডভোকেট। তিনিই ওর মামলা হাতে নিয়েছেন।

ইতিপূর্বে পানমোহরা কোল কোম্পানীর ওকালত নামার বলে মিঃ বাসু, বার এ্যাট ল জয় গোপাল সরকারের চারশো বিঘা জমি ও সাতখরিয়ার খামার বাড়ি অ্যাটাচ করে বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা ও দুর্নীতির অভিযোগে ঐ সব সম্পত্তির উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেছিলেন ও তা পেয়েছিলেন।

ফলত, জয় সেখান থেকে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল।

এই কাজে সাহেবদিকে মদৎ জুগিয়েছিলেন তারিণী মুখুজ্যে। পানমোহরার হেড ক্যাশিয়ার। জয়ের যখন ঠিকাদারী ও গোমস্তাগিরি চালু ছিল তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন। লোভ আরো বেশি ছিল। জয়ের জবাব হয়ে যাওয়ার পর সেই বিষ উগ্‌রে দিলেন।

তখন ভাউচারে টাকা দেওয়া হত। তার বয়ান ছিল —পে টু জয় গোপাল সরকার রুপিজ···অ্যাজ অ্যান অ্যাডভান্স ফর পারচেজিং ল্যাণ্ডস ইত্যাদি।

উল্টো পিঠে সই করে জয় টাকা নিয়েছিল। প্রায় পনেরো-ষোলো বছর যাবৎ দফে দফে নেওয়া টাকার অঙ্কটি বিরাট। তা হলেও সিসিল মেম-সাহেবের মত ঝানু এ্যাকাউন্টেন্ট যখন তদন্ত করেছিলেন তখন জয় গোপাল টেলার সাহেবের সঙ্গে যোগ সাজসে হিসেব নিকেশ ফারখৎ করে রেখেছিল। ফাইন্যাল অ্যাডজাস্টমেন্টের সে ভাউচারগুলির নকল তার কাছে ছিল।

পানমোহরা কোল কোম্পানীর নামে অমন দু-তিন হাজার বিঘা জমি কেনা হয়েছিল। সেই দামের সঙ্গেই ঐ ভাউচারগুলির ফারখৎ টেলার সাহেবের সই হয়ে যাওয়ার পর লিগ্যাল ডকুমেণ্টস হয়েছিল। সিসিল মেমসাহেব তা বুঝেছিলেন। সেজন্যই তিনি মামলা মোকদ্দমার সুপারিশ করেননি। তিনি কারচুপিগুলি ধরেছিলেন ঠিকই কিন্তু ম্যাটিরিয়েল এভিডেন্সের অভাবে জয়কে সরাসরি অভিযুক্ত করতে পারেননি।

এবং তারিণী মুখুজ্যের ভাউচারগুলিরও বিষ দাঁত ছিল না। সেই নথিগুলিই এখন জয়ের রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়াল। সুবিমলবাবু প্রাজ্ঞ উকিল। তিনি বেশ মুসাবিদা করে জবাবটি তৈরি করলেন। নিষেধাজ্ঞা তুলে দেবার জন্যও প্রার্থনা করলেন।

বহু শ্রম ও সংগ্রহের কারণে জবাবপত্রটি জয়ের সাধারণ বুদ্ধিতে বেশ যুতসই মনে হল। কোর্টে দাখিল করার পর খুব হাল্কাবোধ করল। এবার যেন মনে হচ্ছে মুস্কিল আসানের একটা পথ পেয়েছে।

তারপর সুবিমলবাবুর পরামর্শে জয় তার ঠিকাদারীর অনাদায়ী টাকার জন্যও একটা মামলা দায়ের করল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পানমোহরা কোল কোম্পানী ও নওরঙ্গী কোল কোম্পানীর নামে।

ওদিকে পানমোহরা দাঙ্গার মূল আসামী মনসারাম ডস এখন রাজনৈতিক বন্দী, তার তিনজন সাকরেদ কালো বাউরা. সাগির আলী ও ভারত ধোবীও অভিযুক্ত। ব্যারাকলউ সাহেব তার সঙ্গে জয় গোপালকেও জুড়ে দিয়েছেন।

সেই গাঁট ছাড়াতে জয়কে প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করে জামিন নিতে হয়েছে। পুলিশ রূপচাঁদের বশ। ব্রিটিশ আমলেও তারা ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না। জয়কে দুইয়েছিল ভালোই।

একমাত্র মনসারাম ছাড়া বাকী সবাই জামিনে ছাড়া আছে। পুলিশ চার্জসিট দিতে দেরি করেছে তাই শুনানীর দিন ধার্য হয়নি। বর্ধমান থেকে ফিরে এসে জয়ন্তীর কাছে শুনল —দিদি মতি সিংকে পাঠিয়েছিল পানমোহরা দাঙ্গা মামলা সম্পর্কে খবর দিতে। ও বলেছে বাবু যেন মনসারামের জন্য তদ্‌বির করে।

জয় বলল —পুলিশ সাহেব ওকে রাজনৈতিক বন্দী বানিয়ে কোথায় যে চালান করেছেন তার খবর পাচ্ছি না।

জয়ন্তী বলল —দিদি তাও বলেছে। রাণীগঞ্জ কোর্টের উকিল বক্সীবাবুকে ফীসের টাকাকড়ি দিয়ে ঠিক করেছে।

—বাঃ। তোমার দিদি ত মামালা মোকদ্দমাও শিখে গেল দেখছি।

—ঠাট্টা কোর না।

—না। ঠাট্টা করব কেন? সেই ত আমার ভাগ্যলক্ষ্মী। মানুষের যখন দুঃসময় আসে তখনই ত তার মতিভ্রম হয় আমারো তাই হয়েছিল বলেই তো ভাগ্যলক্ষ্মীকে অপমান করেছি।

—তুমি একবার যাও না গো।

—কোন্ মুখ নিয়ে যাবো?

—তবে কি তার সঙ্গে কোনদিন দেখা করবে না?

—করবো। যেদিন জিতে আসবো সেদিন ওকে বরণ করতে যাবো।

আর যদি হারি তবে হারতে হারতে যেদিন ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবো সেদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

উনপঞ্চাশ

বিকেলে রোদ পিঠে নিয়ে কাবেরী তখন আনমনে বসেছিল। সে তার জীবনের দুঃখ বেদনাকে অতিক্রম করে গেছে। এখন তার মুখে প্রসন্ন প্রভা। শরীরটাও আঁটে-সাঁটো ছিম-ছাম হয়ে গেছে। সুখের বাসরে যেটুকু মেদ সঞ্চিত হয়েছিল দুঃখের আগুনে সে চর্বি গলে নেমে গেছে। ঈশ্বরের পায়ে আত্মনিবেদন করে ভালোই আছে।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ির শব্দে গেটের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল। চপল ও চঞ্চল ভঙ্গীতে ছুটে গেল। সরিতা তখন ঘোড়ার গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে। কাবেরী বাচ্চা মেয়ের মত কল্ কল্ করে বলল—ওমা! তুই!

টুক করে একটি চুমু খেয়ে ফেলল। সরিতা জড়িয়ে ধরল ওর মাকে।

অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে মেয়েকে পেয়ে ওর আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁক ডাক স্নুরু করে দিল—ও টুসী! ত্যাখ সরিতা এসেছে।

টুসী ছুটে এলো। ওর ছেলে বচন সিং ছুটে এলো। মতি সিং, গুলাম আলি ছুটে এলো। মাড়ি শুদ্ধ দাঁত বেরিয়ে গেল সবারই।

কাবেরী ওকে চুমু খেয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদরে সোহাগে কাদা করে দিল। সরিতা বলল—ধ্যেৎ! তোমরা এমন স্নুরু করলে যেন রাজকন্যা এসেছে।

টুসী জবাব দিল—তুই তো রাজকন্যাই বটিস মা।

কাবেরী বলল—ও বাবা বচন, তুই একবার বাজারে যা। তরিতরকারী ফল মিষ্টি নিয়ে আয়। ভালো দেখে মাছ আনবি। না হলে মাংস আনবি। টুসী, দুধটা ঘন করে জ্বাল দিস। পায়েস করে দেবো।

সরিতা বলল—আচ্ছা মা। আজ কি আমি নতুন আসছি যে এত আদিখ্যেতা শুরু করে দিলে?

কাবেরী ওর কথা শুনলই না। রান্নাঘরে হাজির হল।

সরিতা বলল—দেখো মাসী! মাকে বারণ করে দাও। আমার এত আদিখ্যেতা পছন্দ নয়।

—তবে তোর কি পছন্দ? টুক টুকে রাঙাবর।

হাসির শব্দে গাছের ফুল খসে পড়ল টুপ টাপ। কত যে হাসি। সবারই মুখে হাসি। কাবেরী কুটির হাসিতে ভরে গেল।

সন্ধ্যাকালে গোলাম আলি বসে গেল পাখোয়াজ নিয়ে। বলল—আরে

বিটিয়া। আজ আমি গান করবো। তোর মাকে বলে দে ঐ কান্নাকাটির গান যদি করে তবে আমি সঙ্গত করবো না।

সরিতা বলল—ঠিক আছে চাচা।

কাওয়ালি হোক।

রাত্রে শোবার সময় সরিতা বলল—আচ্ছা মা তুমি তো জিজ্ঞাসা করলে না—আমি এমন হঠাৎ চলে এলাম কেন?

ও মা! তাইতো! তোকে দেখে আমি সব ভুলে গেলাম।

—ভালোই করেছো মা। এমনি করে ভুলে থাকতে পারো বলেই অনেক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছো। সরিতার কণ্ঠস্বর আবেগময়।

—থাক ওসব কথা। কি হয়েছে বল ত?

—আজ দু'মাস আমার টাকা যায়নি। তাই খবর নিতে এসেছি।

কাবেরী একটু চুপ করে থেকে বলল—ওঃ তোর টাকাও বন্ধ। আমি মনে করেছিলাম এখানকারই বুঝি বন্ধ।

—সে কি?

—হ্যাঁ রে। টুসী, মতি সিংয়ের বেতন বন্ধ। আমার হাতখরচ বন্ধ।

সরিতা চিন্তায় পড়ে গেল। বলল—তাহলে? আর যে একটা বছর।

—সে তুই ভাবিসনে। আমি যোগাড় করে দেবো।

—তুমি কোথা থেকে জোগাড় করবে মা? আমি চালিয়ে নেবো।

কাবেরী গালে হাত দিয়ে বলল—ও মা! মেয়ের কথা শোনো। বিনা পয়সায় কি করে চালাবি রে?

—সে তুমি ভেবো না মা। কলকাতায় অনেক সুযোগ। বিদ্যে ত কম শেখাওনি। কত নাচগানের স্কুলে সপ্তাহে একটা দিন ক্লাস নিলেই সারা সপ্তাহের খরচ বেরিয়ে যাবে। দুটো টিউশানি নিলে বাকী খরচ। ছিলাম সাহেবের মেয়ের মত। না হয় গরীবের মেয়ের মত থাকবো। এই হস্টেলটা ছেড়ে দিয়ে মেয়েদের হস্টেলে থাকবো। তবু আমি এম.এ. পাশ করবই। এবং ফার্স্ট ক্লাস নেবো।

কাবেরী সরিতার মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে একবার কেঁদে নিল। তারপর ওর চিবুকে তিনটি আঙুল ছুঁইয়ে চুমু খেল। উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা বাক্সো বের করে এনে বিছানার উপর প্রদর্শনী খুলে দিল।

বলল—তোর মা অত গরীব নয়রে। সাহেবের মেয়ের মতই থাকবি।

ঝলমলে সোনার গয়নার জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে গেল সরিতার। সে অবাক হয়ে বলল—এসব গয়না তোমার?

—হ্যাঁ রে। তোর মা গজলের রাণী। তার কি গয়নার অভাব? এক

বছরের কথা কি আমি তোকে দশবছর পড়াতে পারি।

সরিতা এক একটি গয়না নিজের হাতে তুলে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সহজাত কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করল এত গয়না কোথায় পেলে মা?

—সে সব শুনবি? না তোর কাছে লজ্জা কি? তুই আমার পেটের মেয়ে।

—থাক না। তবে আর বলতে হবে না।

কাবেরী সেগুলো গুছিয়ে রেখে বাক্সোটা বন্ধ করে আলমারিতে রেখে দিল।

বলল—ঘুমো! তোর কোন ভাবনা নেই। বিয়ের রাতে এসব তোকে পরিয়ে দেবো।

বিয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সরিতা ঘুমিয়ে পড়ল।

কুলিবাথানের কুলি-কামিনরা খোদার দরবারে আর্জি পেশ করে খোদা মেহেরবান। বলে দাও আমরা কি খেয়ে বাঁচবো? ধারে পাশের কলিয়ারী-গুলিতে চলছে শুধু ছাঁটাই। বনবহালের কয়লা বিক্রি হয় না। তাই চঞ্চলবাবু অর্ধেক কুলি-কামিন ছাঁটাই করে দিয়েছেন। পানমোহরা সাতখরিয়া, দেউলটিতে আমরা ঢুকতে পাই না। ক্রিগ সাহেব কুলিবাথানের জড় সেখান থেকে উপড়ে দিয়েছেন। শেরগড় কলিয়ারী বন্ধ। তাহলে আমরা যাবো কোথায়? খাবো কি?

কাজ করেও যারা খেতে পায় না কাজ না থাকলে তারা উপোষ দেবে এতো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। চন্দনবাবুর চাষবাস ও চঞ্চলবাবুর বনবহাল তাদেরকে দিন গুজরানের যেটুকু সুযোগ দিয়েছিল তাও হারিয়ে গেল ছাঁটাইয়ের ঠ্যালায়।

চঞ্চলবাবু এখন নিয়ম করেছেন প্রতি পরিবারের একজন করে কাজ দেবার। তাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে প্রতিদিন একজন কাজ পায়। তার মধ্যে ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করেছে আজ যদি গৌউর ও শান্তি কাজে গেল তো কাল নিতাই ও মালতী যাবে। বৈশাখী কাজে যাবে একদিন পর পর।

এমনভাবে ক'দিন চলবে? না খেতে পেয়ে শরীরগুলো শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে। কাজ করবে কি করে? তারপরে আছে অসুখ-বিসুখ, মামলা মোকদ্দমা।

সেদিন ছিল পানমোহরা দাঙ্গার প্রথম শুনানি।

তিনজন আসামীর সঙ্গে বৈশাখীও কোর্টে যাচ্ছে ওর বড় আশা আজ নিশ্চয় তার স্বামীকে কোর্টে হাজির করা হবে। জামিনে ছাড়া পাক বা না পাক একবার তাকে দেখতে ত পাবে। ছেলেগুলিকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। মধ্য রাত্রে উঠে একটি ছেলে কোলে বাকী দুটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বহু কষ্টে।

আগে আগে যাচ্ছে কালো বাউরী। তার পিছনে ভরত। বৈশাখী ও ছেলে দুটি মাঝে রেখে সবার পিছনে সাগর আলী। জি. টি. রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সকাল নটার সময় রাণীগঞ্জে পৌছাল। তখন কেউ কোথাও নেই।

একটা গাছতলে বসে পড়ল ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের মত। ক্লান্ত অবসন্ন, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ছেলেদুটি একেবারে নেতিয়ে গেছে। গাছতলে বসামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

এই দিনটির জন্যই যুগিয়ে রাখা চার আনা পয়সা দিয়ে কালো বাউরী মুড়ি কিনল। সবাই মিলে ভাগ করে খেয়ে পুকুরে জল খেল তবে ওদের বুকে বল এল।

বেলা দশটার পর একটি দুটি করে লোক আসতে শুরু হল।

জয়বাবু এল সাড়ে দশটার সময়। ঘোড়ারগাড়ি থেকে নেমে সোজা উকিলবাবু যেখানে বসেন সেখানে গেল। তখন মুহুরীবাবু একটি মাদুর বিছিয়ে দপ্তর সাজাচ্ছেন। ওঁর উকিলের নাম নারায়ণ দত্ত।

কাবেরী মনসারামের জন্য উকিল ঠিক করেছিল বক্‌সীবাবুকে। দুই উকিলে কিছুক্ষণ পরামর্শ করার পর কালো বাউরীদের ডাক পড়ল।

বক্‌সীবাবু বললেন—তোরা সবাই এসেছিস ত?

—আজ্ঞা হঁ।

—মনসারামের বউ এসেছে বুঝি?

—আজ্ঞা হঁ।

—ঠিক আছে তোরা বোস। তোদের হাজিরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। পুলিশ মনসারামকে নিয়ে আসবে।

—আজ্ঞা উয়ার সঁথে বউটির দেখা হবেক ত?

—হবে—হবে।

সেই আশায় বুক বেঁধে ওরা বসে রইল। মাথার উপর খর সূর্যের তাপ। বুকে দুরুদুরু করছে ভয়।

জয় তার ঘোড়ার গাড়ির কচোবানকে দিয়ে মুড়ি, ছাতু, পিয়াজ, কাঁচালঙ্কা, গুড় ও মাটির হাঁড়িতে করে এক হাঁড়ি জল আনালো। ওদের কাছে এসে বলল—এগুলো তোদের জন্য। ক্ষিদে পেলেই খাবি।

বৈশাখী ঘোমটায় মুখ ঢেকে ছিল। ওকে বলল—তুই বুঝি তোর কাকী-মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি?

—হুঁ।

—ও তোদের জন্য উকিল ঠিক করে দিয়েছে। আমারো উকিল আছে। আমি বলেছি মনসার জামিনের জন্য আবেদন করতে। তোকে হাকিমের

কাছে একবার হাজির করতে বলেছি। হাকিম সাহেব যদি অনুমতি দেন তবে তুই ওকে বলতে পারবি ?

—কি বলব ?

— তোর উপর যা অত্যাচার হয়েছে। তোর স্বামীকে আটক করে রাখার জন্য ছেলে-পুলেদের ভাতের অভাবে কত কষ্ট হচ্ছে।

—হুঁ।

—বেশ। সময় হলেই তোকে ডেকে নেবো।

ও চলে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পর একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে হাতে পায়ে শিকল বাঁধা ছ-সাতজন জেলের আসামীর সঙ্গে মনসারামকে আনা হল। ওদের সঙ্গে কড়া পুলিশ প্রহরা। একটা জায়গায় নামিয়ে চারিদিকে বন্দুকওলা পুলিশ ওদেরকে ঘিরে দাঁড়াল।

জেলে যাবার পর থেকেই মনসরাম দাড়ি কামায়নি। লম্বা-চওড়া শরীর। একমুখ বাদামী রঙের দাড়ি। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়ানো মনসারামকে দারুণ রূপবান দেখাচ্ছিল।

পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে দাঁড়িয়ে বৈশাখী ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। দু-চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে। দুটি ছেলে সামনেই দাঁড়িয়ে। কোলেরটি হামলাচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দৃষ্টিপাত যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মুহূর্ত। কারো চোখে পলক পড়ছে না।

জয় এসে একজন পুলিশকে অনুরোধ করল—ঐ আসামীর সঙ্গে তার বউয়ের দুটো কথা বলবার সুযোগ করে দিতে। অবশ্যই তার দক্ষিণাও সে গুনে দিল।

তখন মনসারাম রইল পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে বৈশাখী এসে দাঁড়াল তার বাইরে। কোলের বাচ্চাটাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে আদর করল। আরো দুটিকেও আদর করল।

বৈশাখীকে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওর হাতের ওপর হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল—আর কেউ তুদের উপর অত্যাচার করেনি ত ?

—না।

— খেতে পরতে পেছিস ?

—পেছি। তুমাকে কবে ছাড়বেক ?—

—সে ত হাকিম সায়েবের মর্জি।

—কাকীমা তুমাদের জন্য উকিল দিয়েছে।

—শুনেছি। মায়ের কাজই করেছে।

—জয় কাকাও তুমাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

—দেখ কপালে কি লেখা আছে।

সেই সময় একজন পুলিশ অফিসারকে দেখে সেখানকার পুলিশরা বৈশাখীকে সরে যেতে বলল।

সেখান থেকে সরে একটা বাড়ির দেওয়ালের ধারে যে একটুখানি ছায়া ছিল ওখানেই বসল ও। মনসার দিকেই তাকিয়ে রইল। ঐ যে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হল, দুটো কথা হল, ছেলেদিকে আদর করল ওতেই ওর বুক ভরে গেল। দুটি অবাধ্য চোখ দিয়ে গল গল করে অশ্রু ঝরে পড়ল।

মুনা বলল—হেঁ মা, আজ বাবাকে ছাড়বেক ত ?

—ভগবান জানে বেটা। তাকেই ডাকছি।

লাঞ্চ ব্রেকের পর পানমোহরা দাঙ্গার আসামীদের ডাক পড়ল। মামলার প্রথম দিন পাবলিক প্রসিকিউটার আসামীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নরহত্যা ও ঘর জ্বালাবার অভিযোগ বিবৃত করলেন।

হাকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা দোষ স্বীকার কর ?

মনসারাম হাতজোড় করে বলল—না হুজুর। আমরা নির্দোষ।

হাকিম সাহেব পরবর্তী শুনানির জন্য একটা দিন ধার্য করে দিলেন। ওরা কাঠগড়া থেকে নামল।

তখন বক্সীবাবু মনসারামের জামিনের আবেদন দাখিল করে প্রার্থনা করলেন—মাই লর্ড! এই মামলার সব আসামীরাই জামিনে ছাড়া পেয়েছে। এক মনসারামকেই ছাড়া হয়নি। সেজন্য ওঁর পরিবারের চরম দুর্যোগ চলছে।

বৈশাখীকে সামনে হাজির করে আবার বললেন—মাই লর্ড! এই হতভাগিনীর দিকে একবার তাকান। দেখুন কি অত্যাচার ওর উপর হয়েছে। তারপর স্বামী জেলে। তিনটি অপোগণ্ড শিশু নিয়ে কি যে কষ্টের মধ্যে আছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ওরা না খেয়ে উপোষ দিচ্ছে আর কি বলব ?

হাকিম সাহেব ওঁকে থামবার ইশারা করে জামিনের আবেদন শুনানির জন্য একটা তারিখ দিলেন।

ব্যস। সেদিনের মত কোর্টের কাজ শেষ। এরই জন্য অতদূর থেকে আসা। তবু বৈশাখীর মনের ভার অনেকটা কেটে গেছে। মনসারামের যে মূর্তিটা ও দেখল তারই ধ্যান করে পরবর্তী তারিখের জন্য দিন গুনবে।

ফাকিন্ ব্যারাকলউ!

সুতীব্র ঘৃণায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেল মিঃ হবসের। ভিতরটা জ্বালায় জর্জরিত। সেই সঙ্গে জুটেছে লঙ্কা। দুই জীবন্ত পাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুজনেরই ভিতরে খরার হাহাকার। একজন মান হারানোর দায়ে। আরেকজনের মানের বালাই না থাকলেও গুষ্টি শুদ্ধ জান হারানোর দায় আছে। সেই ভয়ঙ্কর দিনরাত্রিগুলির কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

মিঃ হবস উস্কে দিলেন—কি বললি লঙ্কা? তোর বউটা যখন পুড়ছিল তখন ভীষণ চীৎকার করছিল?

—হঁ সাহেব।

—কোলের ছেলেটাও পুড়ে গেল?

—হঁ সাহেব।

—চিলিকে একডজন চাপরাসী ধর্ষণ করেছিল?

—হঁ সাহেব!

—ফাকিন্ ব্যারাকলউ!

—আমি বদলা লিব সাহেব। তার উপায় বাৎলে দাও।

—দেবো…দেবো—তোর বদলা, আমার বদলা, তোর বউছেলের বদলা, চিলির বদলা সব একসঙ্গে উশুল করে দেবো। তারপর তোকে আমি সর্দার বানিয়ে দেবো। তোর জন্য আলাদা বাড়ি, তোর কুলি-কামিনদের জন্য ধাওড়া বানিয়ে দেবো। তুই একটি আঁটোসাঁটো ডাঁসা পারা মেয়ে ছাখ। তোর স্যাঙা দেবো। প্রতিশোধের আগুনটা নিভিয়ে তার চিতাভস্মের উপরে নতুন সংসার গড়বি রে লঙ্কা। এই ওয়াদা তোকে দিলাম।

এক পাপ আরেক পাপের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল—শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়। জীবনে এতবড় স্বপ্ন তার সামনে কেউ তুলে ধরতে পারেনি।

পাপ তার প্রবেশের পথ অন্বেষণ করে।

একদা মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর ভূমি দখলের আগ্রাসী প্রয়াসে বন বহালের সীমানা অতিক্রম করে পানমোহরা থেকে সুড়ঙ্গ পথ চালিয়েছিলেন। চঞ্চল-বাবুর পূর্বের গতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে তা আপোস মীমাংসা হয়েছিল বটে তবে সেই সুড়ঙ্গ পথগুলি আজও বর্তমান। আড়াআড়ি ইটের দেওয়াল দিয়ে চঞ্চলবাবু তার সীমানা পুনরায় অধিকার করেছিলেন।

সেই ত পথ। পাপের পথেই না পাপ ঢুকবে!

পানমোহরা থেকে দেউলটি পর্যন্ত খাদের অন্ধি সন্ধি মিঃ হবসের নখদর্পণে। একদা ঐ কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। গোটা খাদ চষে বেড়িয়েছেন।

সেটাই উনি ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন লক্কাকে।

ঐ ইটের দেওয়াল ভেঙে একটি লোকের ঢুকবার রাস্তা করবি। সুড়ঙ্গ পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পানমোহরা। একটা সিঁড়ি পাবি পাথর কেটে সুড়ঙ্গ চালানোর। সেটা দিয়ে নেমে গেলে সাতখরিয়া। তারপর স্ট্যাপল পিট দিয়ে নেমে দেউলটি। সাতখরিয়ার সঙ্গে যুক্ত ঐ চানকটিতে লোহার সিঁড়ি বসানো আছে। নামতে কোন কষ্ট হবে না।

—না। কষ্ট আবার কি? আমি সব পথঘাট জানি।

মিঃ হবস ওর পিঠ চাপড়ে বললেন—জানবি বৈকি! এতদিন কাজ করেছিস। তোদের হাতেই তো সে খাদ তৈরি হয়েছে। আর আজ সেখানে গিয়ে দু'মুঠো ভাত পায় না। চাপরাসীরা টাঙ্গি তুলেই আছে। পেলেই দু'ফাঁক করে দেবে। ফাকিন্ ব্যারাকলউ!

মিঃ ব্যারাকলউ নওরঙ্গী ছেড়ে পানমোহরা বাংলোয় এসেছেন। স্বপ্ন-দ্বীপের স্বপ্ন মায়া নিয়ে পড়ে থাকবার আর মেজাজ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তারপর একবছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। এই সময়টা শুধু দুঃখের। যুদ্ধের দামামা ধ্বনিতে যে প্রবল নাচন তাথৈ তাথৈ করে সারা বিশ্বে চলছিল তারই শ্রম, স্বেদ ও গ্লানি সামলাতে বিশ্বকে আরো কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

সরীসৃপের মত কুটিল গতিতে বিড়ালের মত হাল্কা পায়ে খাদের অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে এক অন্ধকারের যাত্রী। তার কাঁধে ঝুলছে একটি থলি। কোমরে গোঁজা ছুরি। হাতে লণ্ঠন।

রবিবারের রাত। খাদ জনশূন্য। কেউ তাকে দেখতে পেল না। অবলীলায় চলে গেল বনবহালের সীমানা পেরিয়ে পানমোহরা। তারপর সাতখরিয়া। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল সেই দশ ফুট ব্যাসের চানকটি। দেউলটি ও সাতখরিয়াকে যুক্ত করে রেখেছে। তার গায়ে গায়ে লোহার সিঁড়ি। পাক দিয়ে উঠেছে। তার উপরে পা রাখতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অজানা আশঙ্কায় থর থর করে কেঁপে উঠল। যদি কেউ দেখতে পায় তবে সেইখানেই শেষ। বাঘের গুহায় তো ঢুকেছে। একেবারে শেষ-প্রান্তে এসে গেছে। এখান থেকে পালাবারও উপায় নেই।

সে এক জায়গায় বসল। একটু ভেবে নিয়ে চলতে লাগল। এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না। প্রতিহিংসার ভীষণ আগুন তার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে কাউকে মানবে না। সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

অবশেষে সে দেউলটি খাদে পৌঁছে গেল। হাওয়া রাস্তা ছাড়িয়ে, হলেজ রাস্তা পার হয়ে একটা বন্ধ সুড়ঙ্গে এসে দাঁড়াল। বুকটা তখন হাপরের মত

চলছে। এবার তাকে বসে থাকতে হবে পুরো একটা দিন। সংগ্রহ করতে হবে কাঠ কুটো। কেউ দেখতে পেলে চলবে না। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। পকেট থেকে ছোট ছু-সেল টর্চ বের করে কাঠ কুটো যোগাড় করে রাখল। কাজ শুরু হবে বিকেল চারটেয়। কারণ দিনের বেলায় বহু লোকজন। কারো চোখে পড়ে গেলেই বিপদ। চারটের সময় কাজ শুরু করলে আট নটা নাগাদ ফিরে যেতে পারবে তার বসের কাছে।

বাতি নিভিয়ে দেওয়া মাত্র ঘর অন্ধকার। নিজেকেও দেখতে পাওয়া যায় না। কোন শব্দ নেই। বাতাস বইছে খুব আস্তে। সেই নিঃশব্দের মাঝে একটা আরশুলা উড়লে তার পাখার শব্দে আতঙ্ক ভেসে আসছে। ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। শ্বাস যন্ত্র চলছে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। এক একটা মিনিট অতিক্রান্ত হচ্ছে ভয়াবহ ভয় ও অবসাদের মধ্যে। মনে হচ্ছে যে বুঝি এখানে জমে যাবে।

তার কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল যান্ত্রিক শব্দ। হড় হড করে খালি টবগাডি নামছে। তার পাশের তিনটি সুড়ঙ্গ পার হয়ে। ঐ টবগাড়ি ভর্তি হয়ে ফিরে আসবে। ব্যারাকলউ সাহেবের কুঠিতে রেজিংয়ের হিসেবে যোগ হবে। কিন্তু তার জীবন থেকে বিয়োগ হয়ে গেছে পাঁচটি প্রাণ। এ যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারে না।

ক্রমে ক্রমে সেই সময় এগিয়ে এল। যেন বহু যুগ পার হয়ে একটি বলির লগ্ন। কাঠ-কুটোর উপর বিছিয়ে দিল তেলে-ভেজা জুট। নিচে-উপরে ঠিকভাবে সেগুলি সাজাল। তারপর চারিদিকে কয়লার ছোট-বড় চাঙড় এনে রাখল। কত যত্ন। যেন কারো চিতা সাজাচ্ছে। কার চিতা রে?

থলি থেকে বের করল কেরোসিন তেলের বোতল। লণ্ঠনটি জ্বালাল। চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লণ্ঠনের আগুনটা তার উপর ফেলে দিল। তেলে-ভেজা জুট ও কাঠ কয়লা আগুন পাবা মাত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আগুন দেখে ওর ভেতরটা শুকিয়ে গেল।

একটা সাংঘাতিক কাণ্ড যে করেছে তা ও জানে। এই আগুন আস্তে আস্তে কয়লার স্তরে চারিয়ে যাবে। গোটা খাদটা গ্যাস ও আগুনে বিষাক্ত হয়ে উঠবে। লোকজন পালাবার পথ পাবে না। খাদটা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যারাকলউ সাহেবের সোনার হাঁস আর সোনার ডিম পাববে না।

হাঃ হাঃ হাঃ। উৎকট উল্লাসে ফেটে পড়ল সে।

আগুনটা নাচছে। কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ঠিক এমনি আগুনে পুড়ে মরেছিল ওর বউ এবং বাচ্চা।

না না। আর এখানে থাকা চলবে না। সবারই অলক্ষ্যে যেমনভাবে এসেছিল তেমনিভাবেই ফিরে যেতে হবে। ফিরবার পথ ধরে চলছে।

কিন্তু পথটা যে অচেনা। এ পথে তো আসেনি। তাহলে কোথায় হারিয়ে গেল সে পথ ? মাথা ঘুরে গেল।

সময় যত বয়ে যাচ্ছে তত ওর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যাচ্ছে। আর চলবারও সাধ্য নেই। একটা কয়লার কাঁথিতে ঠেস্ দিয়ে পূর্বাপর ভাববার চেষ্টা করতে শুরু করল। কিন্তু তার ভাবনার স্রোতে মিছিল করে ভেসে যাচ্ছে ক্ষত-বিক্ষত জলমগ্ন একটি শিশুর ভেসে যাওয়া, চঞ্চলাজোড়ের ধারে সেই কবর যাতে সে কোনদিন একটা মোমবাতি দেয়নি, একটা ফুল দেয়নি এবং জলন্ত ধাওড়া। সেখানে তার বউ বাচ্চা পুড়েছে

আঃ। কিরকম চীৎকার করে উঠে দাঁড়াল। চলবার চেষ্টা করল। তখন দেখল সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা দারুন লাবণ্যময় নিতম্ব হেঁটে যেতে যেতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপরই—ঝপাং !

বুকফাটা চীৎকার করে উঠল—আঃ।

সেই শব্দ নিস্তব্ধ পাতালপুরীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই কানে এমনভাবে বাজল যে সে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। তার পিছনে ছুটল একপাল প্রেত। তারা সব ভীষণ জিঘাংসায় খল্ খল্ করে হাসছে। লক্ লক্ কক্ ঝক্ করে ছুটে আসছে তাকে গ্রাস করতে।

রক্তবর্ণ আগুনের নদী ছুটে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের পথে পথে। কি ভয়ঙ্কর তার সৌন্দর্য। কি বেগবান তার প্রবাহ ! কি প্রকাণ্ড তার শব্দ ! বিস্ফোরণ !

পানমোহরা বাংলোর সেই বারান্দা। যেথামে বসে ব্যারাকলউ সাহেব পঞ্চকোট পাহাড়ের মাথায় মেঘের খেলা দেখতেন। শীতের সন্ধ্যায় রক্তসূর্যের রাগরঞ্জিত পটভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। চৈত্রের রাত্রে দেখতেন আগুনের মালা। এক এক ঋতুতে এক এক রকম দৃশ্যাবলী। একটি পাহাড় একটি নদী শেরগড় পরগণার ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।

শীতের সন্ধ্যা উৎরে গেছে। নির্মল আকাশে অনেক তারার মালা। পটভূমি অন্ধকার। বিজলি বাতির ছটায় দেখতে পাওয়া যায় চিমনি ও হেড গীয়ার। চিমনির ধোঁয়া কুয়াশার জালকে ঘন করে তুলেছে। বাতিগুলো দেখাচ্ছে জোনাকির মত।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হাঁটুতক্ মোজা, ফুলপ্যাণ্ট, কোট, অলেস্টার ও টুপীতে জম্পেশ পোশাক পরে অকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে নিজের অতীত খুঁড়ে একটি-দুটি করে সুখ-দুঃখের স্মৃতিকে টেনে টেনে বের করছেন ও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। এমন নিরালা প্রহর মিঃ ব্যারাকলউয়ের জীবনে কদাচিৎ এসেছে।

পায়ের নীচে একটি মৃদু কম্পন। মুহূর্ত মধ্যে সেই কম্পন প্রচণ্ড

ভূমিকম্পের মত থর্থর্ করে উঠল। দরজা-জানালা খড়খড় শব্দে ভেঙে পড়ার উপক্রম। হঠাৎ এক তীব্র আলোর ঝলক। দেউলটি চানকে লক্ষ লক্ষ হাওয়াই বাজির প্রচণ্ড উল্লাস। নীল হলুদ আলো ও লাল আগুনের বিশাল স্তম্ভ। তার মাথায় প্রকাণ্ড ছাতার মত কালো ধোঁয়া। সেই সঙ্গে ধরিত্রী বিদীর্ণ করার ভয়াবহ শব্দতরঙ্গ লক্ষ বজ্রের মিলিত শক্তির দম্ভ।

বিস্ফোরণ!

এক অস্ফুট অর্তনাদ করে পড়ে যাচ্ছিলেন। চেয়ার ধরে সামালে নিলেন। ভয়ে উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। মাটি কাঁপছে। নিজের সৃষ্টি নিজের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেছে সেই ভয়ঙ্কর রূপবান অগ্ন্যুদ্গারে। ওঃ হোয়াটস এ হরর!

বিস্ফোরণ!

একান্ন

মিঃ ব্যারাকলউয়ের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস ক্রীগ পানমোহরা বাংলোতেই থাকতেন। ভীষণ শব্দ, কম্পন ও প্রচণ্ড আলোকোচ্ছাসে তাঁদেরও চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। কানে তালা লেগে গেছে। অজানা আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করে কাঁপছেন। একটু পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়েই ছুটে এলেন মিঃ ব্যারাকলউয়ের কাছে।

তখন ওঁর মুখটা ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। যেন কোন শক্তিশালী সাকশান পাম্প দিয়ে তাঁর মুখের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। তখনো শরীরের কাঁপুনি শেষ হয়নি। খট্ খট্ করে দাঁতে দাঁত লাগছে। তবু উনি বললেন—মিঃ ক্রীগ। দেউলটিতে বিস্ফোরণ হয়ে গেছে। তুমি এক্ষুণি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়। সব ম্যানেজারদিকে জরুরী তলব কর। সাতখরিয়া ও পানমোহরার সমস্ত লোকজন তুলে দাও। সব খাদের হাওয়া পাঙখা বন্ধ রাখতে বল। যাতে দেউলটির বিষাক্ত বাতাস অন্য খাদে ঢুকতে না পায়। আমার গাড়ি বের করতে বল।

—আপনি যাবেন স্যার? কেমন আশ্চর্য হয়েই বললেন উনি।

—ইয়েস! আমার খাদ বিস্ফোরণের মুখে উড়ে গেল আর আমি বাংলোতে বসে থাকবো? যাও। দেরি কোর না। হারী আপ।

মিঃ ক্রীগ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। একজন বেয়ারা এসে সাহেবকে জুতো পরিয়ে দিল। গাড়ি এসে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়াল। মিসেস ক্রীগের কাঁধে ভর দিয়ে উনি গাড়িতে উঠলেন।

প্রথমেই দেউলটি পিটটপ। সেখানে তখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। চরিদিকে ঘন অন্ধকার। কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি কয়লা কনার মেঘ। বাতাসে

পোড়া পিচের গন্ধ। চানক থেকে ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসছে বিষাক্ত ধোঁয়া।

ডিপোর টালোয়ানরা প্রাণ নিয়ে ছুটে পালিয়েছে। একজন ঘণ্টাওলা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। দুটো চানকের মধ্যে একটাতেও জনপ্রাণী নেই। মিঃ ব্রাউন ও মিঃ ব্যানার্জী মিনিট দুই তিন আগে এসেছেন। কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের মুখে কথা সরছে না।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—এ ড্রেডফুল ডিসাস্টার! আমি ভাবতেও পারিনি। যাইহোক চেষ্টা করুন যাতে সাতখরিয়া ও পানমোহরায় সব লোকজন তুলে দেওয়া যায়। দেউলটিতে কেউ বেঁচে থাকবে না। ওখানে কোন ঝুকি নিতে হবে না।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

ম্যানেজার, অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, সুপারভাইজার, মাইনিং সর্দার, ইনচারজ সবাই আপন আপন পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন খাদ থেকে লোকজন ওঠানোর জন্য। ডাক্তারবাবু একটা মেডিকেল ইউনিট নিয়ে ছুটে এসেছেন।

পানমোহরা ও সাতখরিয়ার দু-জোড়া চানকে হস্ হস্ করে ইঞ্জিন চলছে। ডুলিতে ঠাসাঠাসি করে লোক আসছে। তাদের মুখে কি অপরিসীম উদ্বেগ ও আতঙ্ক। বুকে হাপর চলছে। হাত পা থর থর করে কাঁপছে। কেউ ছুটে আসছে বিশ নম্বর লেভেল থেকে, কেউ পঁচিশ নম্বর লেভেল থেকে। পাঁচ ফুটে এক ফুট চড়াই অতিক্রম করে ছুটে আসা অমানুষিক ব্যাপার। দুর্ভাগ্যকে আরো দুঃসহ করে তুলেছে বাতি নিভে গিয়ে। ডিবরী বাতিগুলো শব্দের ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারেনি। মাইনিং বাবুদের হাতে টর্চ থাকে। তাই সম্বল করে ছুটোছুটি। সেও তো প্রাণ বাঁচাতে অস্থির। যারা শরীরে ও মনে খুব শক্ত, ধীর স্থির তারাই চকমকি ঠুকে বাতি জেলে নিয়েছে। কারো বা বাতিটাই হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে।

কামিনদের কথা তো বলবারই নয়। কারো কোমরে একটা গামছা বা ফ্যানাড়ী আছে। কারো বা তাও নেই। কোথায় পড়ে আছে গায়ের কাপড় কে বা খোঁজ নেয়? আলু-থালু মাথার চুল। হপং হপং করে লাফাচ্ছে বুকের স্তন। কেউবা ছেলে হারিয়ে চীৎকার করছে—ওমা! আমার ছ্যিলাটি কুথায় গেল গো?

কালো কালো উদোম আদুল মেয়েগুলোকে এত বিশ্রী দেখাচ্ছে যে তাকানো দায়। যত আতঙ্ক ওদের মুখেই। সর্বাঙ্গ ভয়ের বিভীষিকায় কম্পমান! মুখটা হাঁ হয়েই আছে। আর কি প্রাণফাটা চীৎকার। শুনলে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

লজ্জা আব্রু সব বরবাদ। সব ডুলিতেই কুলি-কামিন ঠেলাঠেলি করে উঠছে। উপরে উঠেই অন্ধকারের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তখন বুঝি লজ্জার বোধ এসেছে।

খাদের ভিতরে গরমে ঘামে গায়ের কাপড় থাকে না। পুরুষরা নেংটি খিঁচে থাকে। মেয়েরা ফ্যানাড়ী পরে। শব্দ শুনেই কাপড়ে চোপড়ে পেচ্ছাব, পায়খানা, বমি। পায়ের তলে মাটি কাঁপছে। কুলি-কামিন আছড়ে পড়ছে।

রব উঠল—বাঁচাও বাঁচাও। পালাও পালাও।

কে কাকে বাঁচায়? কে কোথায় পালায়? প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে। হবড় জবড় হয়ে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে। রাস্তার হদিশ কে পায়? কেউ বা হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ বা আছাড় খেয়ে পড়ে আর উঠতে পারছে না। যে পারল না তার দিকে তাকালো না। নিজের প্রাণ নিয়েই দৌড়াল। ডুলিতে চড়ে কুকুরের মত হাঁপানি। উপরে উঠে আকাশের তারা দেখে বুঝল যে প্রাণে বেঁচে আছে। তারপর তো লজ্জা সরমের বালাই।

ওঃ কি করুণ, কি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য।

সাতখরিয়া খাদের ইন্‌চারজ দাম্নু ঘোষ তখন খাদের ভিতরে।

দেউলটি খাদে তো আতঙ্কের কোন প্রশ্ন নেই। এক লহমায় সব সাফ করে বয়ে গেছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ তরঙ্গ।

তামাম পানমোহরা অঞ্চলে সৃষ্টি করেছে ভূমিকম্প। আর সবচেয়ে ভয়াবহ আতঙ্ক সাতখরিয়া খাদে। কারণ তার নীচেই দেউলটি কয়লা স্তর। মাত্র দেড়শো ফুট নিরেট পাথরের ব্যবধান। যে বিস্ফোরণ তরঙ্গে দশ মাইল জুড়ে ভূমিকম্প হয় দেড়শো ফুট উপরে তার যে কি ভয়ানক প্রতিক্রিয়া তা যারা খাদে ছিল তারাই জানে।

দাম্নুবাবু ঠিক সেই সময়ে মেন ডিপের হলেজলাইন ধরে নিচে নামছিলেন। পায়ের নিচে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড তাড়নায় মনে করলেন বাম্পিংয়ের চোটে দেউলটি ও সাতখরিয়ার মাঝে ব্যবধান ভেঙে গেছে। উনি অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। কানে তালা লেগে গেছে। জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত। ছিটকে পড়েছেন কাঁথির ধারে।

কতক্ষণ পড়েছিলেন কে জানে? সেই কালো শিলাস্তরের কম্পমান প্রেক্ষাপটে একাকী পড়ে থাকতে থাকতে ভয়ে জিভ তালু শুকিয়ে গিয়েছিল। শিলাস্তরের কম্পন থামার পর তাঁর বুকের কম্পন একটু কমল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। কি ভাগ্যে হাতের হাতিয়ার টর্চটি তখনো হাতেই আছে। সেটা জ্বাললেন। অন্ধকার কাটল। বুকে বল এল। খাদের ভিতর এই একফালি আলো যে মানুষের মনে কত শক্তি ও সাহস যোগান দিতে পারে তার বুঝি পরিমাপ হয় না।

উনি উপরের দিকে উঠে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সদা সচেতন দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তাঁকে নিচের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য করল। তখন তিনি নিজের কথা ভাবছেন না। ভাবছেন কুলি-কামিনদের কথা। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁর। তিনি খাদের ইনচারজ। পালিয়ে গেলে ব্যারাকলউ সাহেব কি বলবেন ? তোমার হাতে এতগুলি কুলি-কামিনের প্রাণ সঁপে দিয়েছি আর তুমিই পালিয়ে এলে ? তাঁর ইমান কি বলবে—সহায় সম্বলহীন অবস্থায় যে কলিয়ারীতে এসে চাকরি পেয়েছি, কুলি থেকে ইনচার্জ হয়েছি তার বিপদের দিনে সটকে পডলাম ? না। ইমানের এতবড় খিলাপ হতে দিলে চলবে না।

শুনতে পেলেন বিপুল কোলাহল। ভীষণ আর্তনাদ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে। পথ ঘাটের কোন বালাই নেই। যেদিকে পারছে সেদিকেই ছুটছে। হলেজ রাস্তা, হাওয়া রাস্তা সব দিকেই মানুষের স্রোত। বেবাক কুলি-কামিন, মায় সর্দার মুনশীরা পর্যন্ত উপরের দিকে দৌড়চ্ছে। প্রাণ ভয়ে পলায়মান সেই বিভীষিকাগ্রস্ত, আলুথালু, উদোম আদুল, নোংরা বমি পায়খানায় মাখামাখি কুলি-কামিনদের দেখে তাঁরও মনে দারুন ভয় ঢুকে গেল।

তখনো কেউ জানে না আসল ঘটনা কী ? শব্দ ও কম্পনের তাড়নাতেই তারা দৌড়চ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক তাগিদেই দৌড়চ্ছে। ওঁর আবার মনে হল—আমিও দৌড়ে পালাই। কিন্তু কর্তব্যবোধ আবার তাঁকে বাধা দিল। হতে পারে বাম্পিংটা খুব জোরদার হয়ে গেছে। তা না দেখে তো যাওয়া যায় না!

হা ঈশ্বর! উনি তখনো ভাবছেন—বাম্পিং! বিস্ফোরণ শব্দটা মাথায় আসছে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁকে অতিক্রম করে ওরা চলে গেল। একজন শক্ত সমর্থ কুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উনি ছুটে গিয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়ালেন।

হে ভগবান! শরীরের উষ্ণতা আছে কিন্তু দেহে প্রাণ নেই। হৃদযন্ত্র বন্ধ। ব্যাচারি তাঁর চোখের সামনে মারা গেল! এমন মুর্দা আরো কজন আছে ? আরো এগোলেন। এবার পেলেন একটি যুবতী কামিন। সে চীৎকার করে কাঁদছে ও হাতড়ে হাতড়ে ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে দাসুবাবুর সাড়া পেয়ে ওর পায়ে আছড়ে পড়ল। সে কি বুকফাটা আর্তনাদ—আমার ছ্যোলাটিকে এইখেনে শুয়াঞে রেখেছিলাম বাবু। আর খুঁজে পেছি নাই।

দাসুবাবু দেশলাই জেলে ওর বাতিটি জেলে দিয়ে বললেন···ভালো করে খুঁজে ভাখ। পাস্ বা না পাস্ এইখানে থাকবি। ফেরার সময় নিয়ে যাবো।

এর পরের দৃশ্য আরো মর্মান্তিক। একটি কামিন তার রক্তাক্ত ছেলেটিকে

কোলে নিয়ে মাথায় ফুঁ দিচ্ছে। যেন এক পাগলিনী। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। কোল থেকে ছিটকে পড়ে নিরেট পাথরের ঠক্করে ওর মাথাটি ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। ভলকে ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে। মেয়েটির দু-হাত ছেলের রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

তারপর পেল একটি খুঁটা কুলি। সে নোংরা মেঝের উপর মুখ গুঁজে দাঁত খিঁচে পড়ে আছে। চোখ দুটো উল্টে গেছে। হাত দিয়ে নাড়তেই কেমন বিকৃত কণ্ঠে সাড়া দিল। ওর ছিল মৃগীরোগ। ভীষণ ভয়ে রোগটি চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

এমনি করে খুঁজে পেতে উনি পাঁচটি কুলি-কামিন একান্ত আতান্তর থেকে উটিয়ে এনে এক জায়গায় জড় করলেন। তার মধ্যে তিনটি কুলি, দুটি কামিন ও দুটি শিশু। হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাটিকে সেই মেয়েটা খুঁজে পেয়েছে। রক্তাক্ত শিশুটির জননী ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে।

বাহান্ন

তখন ভোর রাত্রি। হু-হু করে হাড় কাঁপানো বাতাস বইছে। গাছের পাতায় শন্‌শন্ শব্দ। তাছাড়া আর কোন শব্দ নেই। গোঁ-গোঁ শব্দে ফ্যান চলছে না। ইঞ্জিনের হস্ হস্ শব্দ নেই। যেন এক দুরন্ত বেগবান জলস্রোত হঠাৎ থেমে গেছে।

পানমোহরা বাংলোর ড্রয়িং রুমে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ঝাড় লণ্ঠনের আলোতে আট দশজন সাহেব গুম হয়ে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে মিঃ ব্যানার্জী ভারতীয়। বাকি সব লাল মুখো সাহেব।

সেণ্টার টেবিলের উপর একটা লম্বা চওড়া নকশা টান টান করে পাতা। তিনটি খাদের তিনটি স্তরে যে কাজ হচ্ছে তার চানক, ইনক্লাইন, সুড়ঙ্গ, জলের পাম্প স্টপিং প্রভৃতি দেখানো আছে।

মুখো'মুখি বসেছেন মিঃ ব্যারাকলউ ও মিঃ ব্রাউন। তাঁদের পাশে মিঃ ব্যানার্জী। তাঁর মুখটা দেখাচ্ছে মার্ডার কেসের আসামীর মত। ট্রায়াল হয়ে গেছে এবার জাজমেণ্ট বেরুবে। কারণ উনিই তো দেউলটির ম্যানেজার।

মিঃ ক্রীগ বসেছেন মিঃ ব্যারাকলউয়ের পাশে। তাঁর হাতে নোটবই পেনসিল। টপটপ ডিকটেশান নিচ্ছেন। সবাই গম্ভীর। সবাই চিন্তিত। অথবা সবারই মাথা ফাঁকা।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—খানসামা! সরাব লে আও।

মদের বোতল ও গ্লাস এল। ঢালা হল। উনি বললেন—আমাকে দাও।

মিঃ ব্রাউন বললেন—সেটা কি ঠিক হবে স্যার? আপনার শরীর খারাপ।

—সো হোয়াট ? মরার চেয়ে বেশি কিছু হবে। মদ খেয়ে মরবো। হোয়াট মোর ?

উনি আতঙ্কিত হয়ে বললেন—স্যার। ফর গডসেক।

—ফর গডসেক আপনারা ডিস্টার্ব করবেন না। এই ডিসাসটারের পর আমার বেঁচে থাকার যুক্তি নেই। প্রসিড।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে নকশার উপর পেনসিল ঠুকে বললেন—এটা কেন হল ?

ওঁর মুখের সামনে কথা বলাই দায়। মিঃ ব্রাউন ছাড়া কারো মুখে রা নেই।

উনিই বললেন—মনে হয় বাম্পিং হয়ে মিথেন গ্যাসের আউট বার্স্ট হয়েছিল। তারপর কোনভাবে আগুনের ফুলকি পেয়ে সেই গ্যাসে এক্সপ্লোসন হয়েছে।

—কিন্তু এর যে লক্ষণ তাতে ফায়ার ড্যাম্প এক্সপ্লোসন বলা যায় না। রীতিমত কোল ডাস্ট এক্সপ্লোসন।

—হতেই পারে। ফায়ার ড্যাম্প এক্সপ্লোসন কোল ডাস্টের সংস্পর্শে এসে তা কোল ডাস্ট এক্সপ্লোসন হয়েছে।

—হ্যাঁ। তাহলে পুরো ফ্যাক্টটা কিভাবে এসটাবলিশড হল ? আই মীন টেকনিক্যাল এক্সপ্লানেশন কি ? বাম্পিংয়ের ফলে মিথেন আউট বার্স্ট। কোনভাবে আগুনের সংস্পর্শে এসে এক্সপ্লোসান। ঠিক ত ?

—হ্যাঁ স্যার।

—এখন প্রশ্ন উঠবে আগুন কোত্থেকে এল ?

—সেটা কোন ব্যাপার নয় স্যার। বাতি থেকে হতে পারে।

—নো-নো। বাতি কোথায় পেলেন ? আপনি তো সব লোক উঠিয়ে দিয়েছেন।

মিঃ ব্যানার্জী বললেন—না স্যার। দেউলটি খাদের লোক ওঠানো হয়নি।

উনি টেবিলে পেনসিল ঠুকে বললেন—আমি বলছি হয়েছে।

সবাই থ। একি আশ্চর্য কথা! লোক ওঠানো হয়েছে পানমোহরা ও সাতথরিয়ার। দেউলটি তো বেবাক সাফ। আর উনি বলছেন লোক ওঠানো হয়েছে!

মিঃ ব্যারাকলউ তাঁদের বিমূঢ়তা কাটাবার জন্য বললেন—আমাদিকে এই ফ্যাক্টটা এস্টাবলিশ করতে হবে। অর্থাৎ বাম্পিং ও আউটবার্স্টের পর খাদে মিথেন গ্যাস বেড়ে যাওয়ার জন্য সব লোক তুলে দেওয়া হয়েছিল বিকেল চারটের সময়।

বিস্ফোরণ হয়েছে রাত্রি সাতটার সময়। নো ক্যাজুয়েলিটি। কোন লোক মরেনি।

মিঃ ব্রাউন ঘাড় নেড়ে বললেন—টেকনিক্যাল এক্সপ্লানেশন হিসেবে এ

যুক্তিটা মন্দ নয়। তাছাড়া আইন-কানুনের অনেক জটিলতা কমে যাবে।

মিঃ ব্যারাকলউ হুইস্কীর গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন। একটা চুরুট ধরিয়ে মিঃ ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি ম্যানেজার। প্রাইমা ফেসী রিপোর্ট তোমাকেই দিতে হবে। বল কি করে নিজেকে বাঁচাবে? কি করে ম্যানেজমেণ্টকে বাঁচাবে? মিঃ ব্যানার্জী বিমূঢ়। ওঁর মাথায় কিছুই ঢুকছে না। বললেন—ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তাই রিপোর্ট করবো।

—তারপর তদন্ত হবে। দেখা যাবে চারশো সতেরোজন কর্মী খাদে ছিল। তারা কেউ ওঠেনি। তখন কি ব্যাপারটা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পর্যন্ত গড়াবে না? আইনের চোখে তুমি আমি অপরাধী হব না? হার ম্যাজেষ্টি কমন্স সভায় বিব্রত বোধ করবেন না? বিরোধী নেতারা এটাকে একটা ইস্যু খাড়া করবেন না? তাই বলছি রিপোর্টটা যেভাবে বললাম সেইভাবে তৈরি করবেন।

কে একজন বললেন—কিন্তু স্যার। এতবড় দুর্ঘটনাকে চাপা দেবেন কি করে? এত এত কুলি-কামিন, বাবু, সর্দার আছে তদন্তের সময় তারা যদি সত্যি কথা বলে দেয় তবে ত আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। মারাত্মক মিথ্যাচার।

মিঃ ব্যারাকলউ উষ্ণভাবে বললেন—ওহ মাইগড! আজ যদি মিহির গোমস্তা থাকতো অথবা জয়গোপাল তাহলে শুধু ইশারাতেই কাজ হাসিল করে দিত। এসব লোকের কাজের কোন মূল্যায়ন হয় না।

অর্থাৎ এতগুলো লালমুখো সাহেবের চেয়ে নেটিভ গোমস্তাগুলোই বেশি কাজের। ওদের লালমুখ সিঁদুর হয়ে গেল।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—মিঃ ক্রীগ। ক্যাশে কত টাকা আছে?

—ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা।

—কত বন্দুক আছে?

—কুড়িটি।

—কার্তুজ পুরো আছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—আলরাইট। বিশ হাজার টাকা ও বিশটি বন্দুক রেডি কর। চাপরাসীদিকে বলে দাও দেউলটি কুলি ধাওড়ায় বন্দুক নিয়ে মার্চ করবে। সঙ্গে লাঠি-চাপরাসীও থাকবে। তুমি একজন ক্যাশিয়ার সহ টাকা নিয়ে যাবে। হাতে হাতে পেমেণ্ট দেবে ও দু' ঘণ্টার মধ্যে ধাওড়া খালি করে চলে যেতে বলবে। চেতাবনী দেবে কেউ যদি কোন কারণে কারো কাছে বলে যে দেউলটি খাদে লোক মরেছে তবে বন্দুকের গুলিতে তার মাথার ভিতর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেওয়া হবে।

মিঃ ক্রীগ। প্রায় মিলিটারী পদচারে বললেন—ও. কে. স্যার।

—বাগার্ড ছুটোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

—কাকে স্যার?

—দোজ লেবার সরদার—চমনলাল ব্রাদার্স।

—ও. কে. স্যার।

মিঃ ব্যারাকলউ সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তখন তাঁকে রীতিমত কুটিল ও চক্রান্তকারী সমর নায়কের মত দেখাচ্ছিল। এখন তাঁকে দেখে কে বলবে যে এই মানুষটি রোগ ব্যাধিতে জরাজীর্ণ।

সাহেবরা সব উঠে দাঁড়ালেন। উনি বললেন—মাই ফ্রেণ্ডস! আশা করি আপনারা আমার প্ল্যান বুঝতে পেরেছেন। যান—মিঃ ক্রীগকে সর্বতো-ভাবে সাহায্য করুন। উইশ ইউ সাক্‌সেস।

সেই অমোঘ নির্দেশ মাথায় নিয়ে সাহেবরা সব চলে গেলেন। তাঁরা খুব সভ্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ। উপরওলার নির্দেশ মানে ঈশ্বরের নির্দেশ। সেই নির্দেশ পালন করতে পুরনো বুট বদলে নতুন বুট পায়ে দিয়ে অসভ্য কুলিদের বুকে দলন মন্থন ক্রিয়া চালাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মিঃ ব্রাউনকে উনি হাতের ইশারায় থামতে বললেন। তারপর ওঁরা দুজন আবার নকশার সামনে বসে আরো কিছু আলোচনা করলেন।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—মিঃ ব্যানার্জীকে দিয়ে আজ রাত্রের মধ্যেই একটা প্রিলিমিনারী রিপোর্ট তৈরি করিয়ে নেবেন। কারণ যত সময় যাবে ততো উনি নার্ভাস হয়ে পড়বেন। ওঁর মিসেসকে থ্রু সাম উওম্যান খবর পাঠিয়ে দেবেন যেন তাঁর মেড ইন ইণ্ডিয়া বডিটা ইলেকট্রিক চার্জারের মত মিঃ ব্যানার্জীকে এ্যানারজাইস্ করে রাখে। আদার ওয়াইজ হি উইল বি ম্যাড।

—ও. কে. স্যার। আপনার সব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ! দুটি চওড়া হাতের পাঞ্জা মিলিত হল একই উদ্দেশ্য নিয়ে।

উনি বলেছিলেন বাগার্ড দুটোকে পাঠিয়ে দিতে। আছে একটি। আর একটি দেউলটি খাদে। তার শোকে চমনলাল বুক চাপড়ে কাঁদছে। দুটি পৃথুলা রমণী ছানা-পোনা ছত্রখান করে ফেলে, ছড়িয়ে, এলোচুলে, উদোম বুকে পা মেলে নিতম্বের ভরে মাটিতে বসে, দু' হাতে মাটি থাপড়াতে থাপড়াতে সুর করে কাঁদছে। সে কি বিটকেল বিলাপ ধ্বনি। দূর থেকে শুনলে মনে হবে রামলীলার সীতার বিলাপপালা হচ্ছে। কাছে এলে দেখা যাবে চেড়ীবিলাপ।

বানারসী ও চমনলালের বড় ছেলে হীরালাল চারবাজা পালি কাজে গেছে। আর ফেরেনি। ফিরবেও না। অতঃপর চমনলালের বউ পুত্রহারা এবং বানারসীর বউ স্বামীহারা। আরো কি কারো বুকে বল থাকে? বউ-বাচ্চার হরল-গরল কান্নার দৃশ্য ও শব্দে হৃদয়বিদারী অনুষঙ্গ।

ঠিক একই অবস্থা পুরো ধাওড়াটিতে। নিদারুণ শোকের বুকফাটা হাহাকার। পুরো ধাওড়ার আধা আদমী সাফ। কুলিরা পরস্পরের সঙ্গে শিকড়েবাকড়ে জড়ে ঝাড়ে আত্মীয়-বান্ধব। বাপ, ভাই, ছেলে, খুড়ো, ভাইপো, মামা ফুফা নিয়ে ছোট ছোট দল। দশ বিশটা দল জুড়ে একটা বড় দল। তার উপরে সর্দার। এমনিভাবেই না সংগঠন। তবে ওদের দলে মন্দের ভাল ধাওড়ায় মেয়ের সংখ্যা কম। দেশ থেকে পুরুষরা কাজ করতে এসেছে। কলিয়ারীতে জনে জনে ধাওড়ার ব্যবস্থা নেই। সব গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে থাকে। আধালোক কাজে যায় বলে শোবার বসবার জায়গা হয়। রবিবার ছুটির দিন সব লোকগুলি একসঙ্গে জুটে গেলে দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।

সেই ধাওড়ায় স্বজন হারানোর শোক উথাল পাতাল করছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! মানুষ হারিয়ে যায় তবু আশা হারে না। আশাবাদীরা এখনো মনে করে ঐ দেউলটি খাদের ভিতরে তাদের মানুষজন বেঁচে আছে। সাহেবরা ডুলি চালু করে দিলেই তারাই সব একটি দুটি করে উঠে আসবে। অসীম উদ্বেগ ও রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় তারা সকলের দিকে তাকিয়ে আছে।

তখন সেই মানুষের অশ্রুজলে ভেজা মাটির উপর কাঁচা চামড়ার নাগরা জুতো পরা ব্যারাকলউ সাহেবের মিলিটারী ফোর্স মচমচ শব্দে মার্চ করতে করতে সেখানে এসে দাঁড়াল। তাদের কাঁধে বন্দুক। চোখে জিঘাংসা। আগে পিছে লালমুখো সাহেব।

চমনলালের চোখ দুটো ঠিক্‌রে পড়ছে। মিঃ ক্রীগ ওকে ডেকে বললেন—ইউ বাগার্ড! কান্না বন্ধ কর। কেউ কাঁদবে না। তাহলে—আঙুল বাড়িয়ে বন্দুকওলাদিকে দেখিয়ে দেন।

চমনলালের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। এত সাহেব, এত বন্দুক, এত চাপরাসী দেখে সে কাঁদতে ভুলে গেল।

মিঃ ক্রীগ বললেন—যদি শুনি তোমরা কারো কাছে বলেছো যে দেউলটি খাদের বিস্ফোরণে লোক মারা গেছে তাহলে তোমাদেরও মাথা উড়ে যাবে। অবশ্য মিঃ ব্যারাকলউ তোমাদের প্রতি অতিশয় সদয়। তোমাদের সব লোকের যাবতীয় পাওনাগণ্ডা সহ বাড়ি যাবার ভাড়া নগদ দিয়ে দেবেন। যাও আপন আপন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা কর। দু'ঘণ্টার মধ্যে ধাওড়া খালি করতে হবে। তারপর এই ধাওড়ায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। যাও হারি আপ।

যেন একটা ম্যাজিক। যাদুমন্ত্রবলে শুষে নিল চোখের জল। বুকের কান্না বুকের ভিতরেই জমাট বেঁধে গেল। হা হা শব্দের হাহাকারে গলার মধ্যে কফ শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি।

একটা বিরাট সত্যকে চাপা দেবার জন্য শ্রমিকদের বুকের উপর কাঁচা চামড়ার নাগরা জুতো। কেউ যে তাদের আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ খবর করবে তারও উপায় রইল না। সব আপন আপন বাকসো বিছানা মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কয়লা গাদার উপর দিয়ে। কি ক্লান্ত, কি শোকার্ত তাদের মুখ। যেন একসারি মড়া।

ক্রীগ সাহেব মুখের উপর টাকা ছুঁড়ে দিয়েছেন। তাই দিয়ে শোক দুঃখের ক্ষত স্থানের জন্য মলম কিনে নেবে। আবার কি?

চমনলাল সাহু তখন পাগল। ছেলে, ভাই, এত কুলি, কত আত্মীয়স্বজন কেউ ফিরে এল না। এবার ও কি নিয়ে দেশে ফিরবে? দেশে তো আরো আত্মীয়স্বজন আছে তাদেরকে কি বলবে?

হায়। হায়। হামরো ক্যা হো গইল! এই তার মুখের বুলি। চোখ দুটো লাল। মাথার চুল সোজা হয়ে গেছে। গায়ের জামা খুলে পড়েছে। চলতে ফিরতে পায়ে পা লাগছে। ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে যখন পেঁাছাল তখন ও চোখেও দেখতে পাচ্ছে না। কোনরকমে সেলাম করে দাঁড়াল। সাহেব তার খানসামাকে হুকুম্ দিলেন—বিলাইতী দারু লে আও। চমনলাল সর্দারকো পিলাও।

শোক দুঃখের হাহাকারে এর চেয়ে বড় দাওয়াই আর কি আছে? সে ব্যাচারি ঢক্ ঢক্ করে মদ গিলল। হাত বাড়িয়ে থলে ভর্তি টাকা নিল। হর্ষে ও বিষাদে পাগলের মত হাসি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সাহেব বললেন খবরদার! দেউলটির বাৎ কারো কাছে বলবে না। যাও।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ধাওড়ার আগুন। তারপর সেই ভস্মস্তূপের উপর পাম্পের হোস পাইপ দিয়ে জল ঢালবে। লাঙ্গল চলবে। কর্ষিত ভূমির উপর চাষ হবে কলাই, মসুরি, গম, বাজরা। সবুজ শস্যে ভরে উঠবে সেই জায়গা। যেন ভাবীকালের কেউ বুঝতেও না পারে যে এখানে একদিন ধাওড়া ছিল। তদন্তকারী অফিসাররা যখন আসবেন তখন সেখানে বোনা কলাই মসুরীর বীজ অঙ্কুরোদ্গমের প্রসন্ন পুলকে চষামাটির আলে আলে সবুজ মেখলা বিছিয়ে দেবে।

তিপ্পান্ন

শীত ফুরিয়ে গেছে ফাগুনের সন্ধ্যা।

কুলিবাথানের ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। খাদ থেকে ফিরে এসে বৈশাখীও ভাতের হাঁড়ি চড়িয়েছে। কিছুদিন হল একটা মিশনারী সংস্থা ওদেরকে কিছু খয়রাতি সাহায্য দিয়েছিল চাল, গম, বাজরা ও একটি করে মোটা সুতোর কাপড়। ওতেই পাদ্রী সাহেবদের জয় জয়কার।

কুলিবাথানের লোক সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। বেশ কিছু লোক জঙ্গল কাটাইয়ের ঠিকাদারদের কুলি হয়ে গেছে। বর্ষার আগে পর্য্যন্ত জঙ্গল কাটাইয়ের সিজন। ততদিন কাজ পাবে।

হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। ছেলেগুলি হুটুর পুটুর করে বেড়াচ্ছে। বৈশাখী ভাবছে একবছর বর্ষাকালে পানমোহরায় দাঙ্গা হল। মানুষটা জেলে গেল। তারপর আবার বর্ষাকাল এল। তাও ফুরিয়ে গেল। দেখতে দেখতে ফাগুন মাস এসে গেল।

এমনি করেই ও দিনের হিসেব করে। মাঝে একবার খুব আশা হয়েছিল যখন হাজিরা দেবার জন্যে ওকে আনা হয়েছিল। তারপর আবার একটা দিন পড়েছিল শুনানরি জন্য। ভেবেছিল সেদিন ও নিশ্চয় ছাড়া পাবে। কিন্তু কি যে গাঁট লাগল আর কোন সাড়া শব্দ নেই। মামলার তারিখ পড়েনি।

ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল পড়ল। আঁচল দিয়ে মুছে বড়ছেলেকে বলল—মুনা! যা বেটা তুর বড়মায়ের কাছে টুক্‌কুন্ নুন নিঞে আয় গা।

ওদের তিন ভাইয়ের পাশাপাশি ঘর। মুনা উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতেই থমকে দাঁড়াল। সাঁ করে ঘুরে দুড় দুড় করে দৌড়ে এল ওর মায়ের কাছে চীৎকার করে ডাকল—মা-মা—

বৈশাখী সটান উঠে দাঁড়াল। মন তো সদাই শঙ্কিত। ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে দুয়ারের দিকে তাকিয়েই বুকটা ধড়াস করে উঠল। থর থর করে কেঁপে উঠল সারা শরীর। গলা দিয়ে স্বর বেরুল না।

মনসারাম উঠোনে পা দিল মচ মচ শব্দে।

বিস্ময় বিমূঢ় মুহূর্তটি অতিক্রম করে ছেলেরা কলরব করে উঠল—বাবা—বাবা এসেছে—বাবা!

সেদিনের কোলের ছেলেটি বাপকে চেনার কথাই নয় যার সেও টাল-মাটাল খেতে খেতে মনসারামের প্রসারিত হাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল!

অসীম স্নেহে তিনটি ছেলেকে বুকে করে মনসা মাটির উপরে থপ করে বসে পড়ল।

মাথায় আঁচল তুলে বৈশাখী বলল—তুমি এলে?

বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল।

মনসা ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল—আহা! কাঁদছিস ক্যেনে?

—না না। কাঁদব ক্যেনে?

আঁচলে চোখ মুছে ফিক করে হাসল। পোড়া গালে সেই হাসির কি যাদুকরী মায়া। মনসার মনে হল এখুনি একটা চুমু খায়।

এতদিন পরে সাক্ষাৎ। মিলন বাসনায় উন্মুখ দুটি হৃদয়। কিন্তু নিরি-

বিলিতে দুটো কথা বলার জো আছে কি? আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল খবর। পিল্ পিল্ করে ঢুকে গেল কুলিবাথানের কুলি-কামিন, ছেলে বুড়ো সব।

মনসারামকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

শান্তি ওর গা-হাত টিপে দাড়িতে হাত বুলিয়ে এক গাল হেসে বলল—হঁ। এইটিই আমাদের মনসারাম বটে।

শান্তির হাতের স্পর্শ পেয়ে মনসার মনে হল তার মা ছলনা দাসী আদর করছে। বলল—আঃ ভোজী! কতদিন তুদেদিকে দেখি নাই। মনটি ডহল বিকল করছিল।

মালতী বলল—এইবারে আমাদের দ্যাওরের চেহারা হঞেছে একখানা। ছুটু বউয়ের মন ভরে গেইছে।

ভরত ধোবী ওর সঙ্গেই আসামী। মনসারাম পুলিশ সাহেবের কাছে ধরা দেওয়ার কারণে ওদেরকে গ্রেপ্তার করা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন তিনি। সে ছুটতে ছুটতে এল। মনসারামকে জড়িয়ে ধরে বলল—দ্যাখ মনসা উপরে ভগমান আছে কি না? সেই দাঙ্গার পরে শ্যালা কিরিগ সায়েব কুলিবাথানের কাহুকে পানমোহরায় পা দিতে দেই নাই। সেটি কেমন শাপে বর হল।

—ক্যেনে? কি হঞেছে?

—দেউলটা ফুটে গেইছে। বিস্ফোরণ। বেবাক কুলি-কামিন খাদের ভিতর মরে পড়ে আছে। বারকুলি সাহেবের মাজা ভেঙে গেইছে। শ্যালা কুলিবাথানের উপর বড়বাদ।

খবরটা শুনে মনসারাম খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—কত লোক মরেছে?

—চার পাঁচশো তো হবেক।

—মাইগড! এটা খুব দুঃখের খবররে ভরত। বারকুলি সাহেব আমাদের সঙ্গে দুষমনি করতে পারে কুলি-কামিনরা ত নয়।

কথার পর কথা। এলোমেলো, অসংলগ্ন হাসি তামাশা, হৈ-হৈ, চেঁচামেচি। ফুক্ ফাক্ সময় কাটছে। ওর উঠোনে লোক দাঁড়াবার জায়গা নেই।

শান্তি বলল—ই বারে টুককুন জিরাতে দে। কতদূর থেকে এসেছে। যা। তুরাও ঘরকে যা খেঞে-দেঞে ঘুমা-গা। মনসা তো রইল। কাল দিনের বেলায় দেখবি।

এ মনসা সে মনসা নয়। এখন সে শিক্ষিত ও পরিণত মনসা। সেই পুলিশ সাহেবটি তার ললাটে যে লিপি লিখে দিয়েছিলেন তাই সত্যি হয়ে বসেছে। বর্ধমান, বহরমপুর, আলিপুর প্রভৃতি বড় বড় জেলে সে থেকেছে

রাজনৈতিক বন্দী হয়ে। সেই কারণেই তার ছাড়া পেতে দেরি হল। জামিনের আবেদনে শুনানির সময় হাকিম সাহেব তার রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে গণ্য হবার কারণ জানতে চেয়ে নোট পাঠিয়েছিলেন।

পুলিস সাহেবটি তখন অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। কাজে কাজেই দেরি।

বহরমপুর জেলেই হয়ে গেল তার রাজনৈতিক দীক্ষা। প্রবীণ বিপ্লবী বালা সরস্বতীজী তখন বহরমপুর জেলে। মনসারাম পাঁচু মাস্টার মশাইয়ের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিল, প্রথমবার জেল খাটার সময় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে তার মনের মধ্যে যে বোধ জাগ্রত হয়েছিল সরস্বতীজী তার লব্ধ জ্ঞানকে বিকাশের পথে নিয়ে গেলেন। উনি নিজেই সাক্ষাৎ সরস্বতী। পেলেন মনসারামের মত ছাত্র। মন দিয়ে পড়ালেন সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান। অনুপ্রাণিত করলেন মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে। দীক্ষা দিলেন রাজনীতিতে।

যে সব বিপ্লবীরা তখন জেল খাটতেন তাঁদের বুকে থাকত ঠাসা বারুদ। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়েই তাঁদের জীবন পরিক্রমা। নানারকম ফৌজদারি মামলায় গেঁথে শাসক সাহেবরা তাঁদেরকে জেলে আটকে রেখেছেন। মনসারাম তাঁদের সংস্রবে এল ও তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাল।

সে নিজের প্রচেষ্টায় একটা কুলিবাথান তৈরি করেছে, সাহেবদের সঙ্গে দাঙ্গা লড়ছে, কয়লা কুঠির কুলি-কামিনদের জন্য বুক পেতে দিয়েছে। এ সব কথা শুনে ওঁরা বাহবা দিতেন। দেশ ও জাতির মুক্তির কথা বলতেন। পরাধীনতার গ্লানির কথা বলতেন।

শুনতে শুনতে ওর রক্তে আগুন ধরে যেত। গ্লানি যে কাকে বলে তার পরিচয় মনসারামের চেয়ে কে বেশি জানে? সে চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার বালিকা স্ত্রীকে ধর্ষণ করার দৃশ্য। সেই যন্ত্রণা, সেই আর্তনাদ তার বুক ছেঁদা করে দেয়। তার স্ত্রীর শরীরে এক একটি পোড়া দাগ তার হৃৎপিণ্ডে ছাপমারা হয়ে আছে।

এ সব অত্যাচারের কথা সে যখন বিপ্লবীদের কাছে বলত তখন তাঁরা রাগে মাটি কামড়াতেন।

তারপর তাকে আনা হল আলিপুর জেলে। সেখানে পেল শুভশঙ্করকে। তিনি বোম্বাইয়ে রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সেখানকার বস্ত্র শিল্প ও রেল—এই দুই প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করছিল। উনি সেই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সেই অপরাধে তাঁর চাকরি গেছে। পরিবারের উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে।

সেখান থেকে বাংলা মুলুকে এসে সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে এসেছেন। এটা তাঁর জীবনের পঞ্চমবার জেল ভ্রমণ।

হ্যাঁ। জেল খাটাকে উনি ভ্রমণের সঙ্গেই তুলনা করেন।

উনি ওকে আরেক মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন।

বলেছেন—মনসারাম! তুমি এতদিন যা করেছো তা অচেতনভাবেই। যদি শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে সচেতনভাবে করতে তবে কয়লা কুঠির শ্রমিকদের ইতিহাসে একটা স্বর্ণ সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারতে। এখনো অনেক সময় আছে। জেলে থেকে তুমি অনেক কিছুই শিখলে। এই শিক্ষা নিয়ে তোমার কুলি-কামিন ভাই বোনদের কাছে যাবে। তাদেরকে সংগঠিত করবে, ঐক্যবদ্ধ করবে, প্রতিষ্ঠা করবে ট্রেড ইউনিয়নের। কুলি-কামিনদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবে, দেশকে ভালবাসতে শেখাবে। দেশপ্রেমের মন্ত্র দেবে। তবেই সার্থক হবে তোমার আন্দোলন।

খাওয়া-দওয়া করতে রাত হয়ে গেল। চারিদিক শুনশান। তালপাতার তালাইয়ে একটি কাঁথা পেতে ছেলেগুলিকে শুইয়ে দিয়েছিল বৈশাখী। ওরা শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মাটির মেঝেতে আরেকটি কাঁথা পেতে মনসারামের শোবার জায়গা করে দিয়েছিল। সে বসেছিল একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটা পা মাটিতে মেলে দিয়ে।

লম্ফবাতিটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। তারই আভায় মনসারামকে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের মত মনে হচ্ছিল বৈশাখীর। সে যেন অনেকদূরের মানুষ। দেবতার মত। তাকে পূজো করতে হয়, প্রণাম করতে হয়, তার নাম মন্ত্রের মত ধ্যান করতে হয়। কয়লাকালি মাখা, ঘামে ভেজা শরীরটা বড়ই নোংরা।

মনসারাম ওরদিকে তাকিয়েছিল। বলল কি রে বসে রইলি যে? আয় কাছে আয়।

বৈশাখী মাথা নীচু করল। মনসারাম ওর কাছে এসে কাঁধে হাত দিল। চিবুকটি তুলে ধরে বলল— অমন পর পর ভাব দেখাছিস ক্যেনে?

—আঃ। অমন কথা বল না।

—তবে! কুথায় বুকে হামলে পড়ে বান ডাকাঞে দিবি। তা লয়। কলা বউ হঞে বসে রইলি।

বলতে বলতেই মনসারামের বলবান বাহু তাকে চেপে ধরল প্রচণ্ড আশ্লেষে। ষাঁড়া ষাঁড়ির বান ডেকে গেল দুটি ক্ষুধার্ত হৃদয়ে।

⁂

অসীম যন্ত্রণায় ভরে গেছে জয়-জয়ন্তীর সোহাগে বাসর। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে তবু কথা নেই। এমনিতেই সে কথা কম বলে এখন তো প্রায় বোবা বনে গেছে। ছেলেমেয়েদিগকেও সহ্য করতে পারে না। ওরা বেশি হুটোপুটি করলে বলে—এই আপদগুলোকে বিদায় কর।

পেটের ছেলেমেয়ে হল আপদ বালাই। জয়ন্তী ডুকরে কাঁদে। সপ্তাহে একটা রাত স্বামীকে কাছে পায় তবু সুখ নেই। হয়তো সারারাত জেগেই কাটবে। ভোর হলেই চলে যাবে। কী ভীষণ যন্ত্রণা।

জয়ন্তী বলল—আমি বলছিলাম কি দিদিকে খবর পাঠিয়ে আনলে হত না?

জয় উত্তর দিল—সে কি আমার কলিয়ারীর ইঞ্জিনটা চালিয়ে দেবে?

একথার জবাব জয়ন্তী জানে না।

খানিকপর জয় বলল—কাল সকালে গিয়ে দেখবো বয়লারের ধোঁয়া বন্ধ হয়ে গেছে। মানে কলিয়ারী বন্ধ হয়ে গেছে। লেবাররা খেতে না পেলে কি করে কাজ করবে? যে করেই হোক পেমেণ্ট করতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? কে দেবে টাকা? কোন মহাজন ধার দিতে চায় না।

জয়ন্তী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। যাক্ তাহলেও কটা কথা সে বলেছে। যত সমস্যাই হোক তবু ত কথা।

জয় আবার বলল—তোমাদের দুটি বউকে গয়না আমি কম দিইনি। যদি মরে যাই তাহলে ঐ গয়না বিক্রি করেই জীবন কেটে যাবে। তারই মধ্যে ভরি দশেক আমাকে ধার দাও না। সুদিন এলে শোধ করে দেবো।

জয়ন্তীর ভেতরটা মুচড়ে উঠল। যন্ত্রণাক্ত কণ্ঠে টেনে টেনে বলল—অমন করে বলছো কেন গো। তোমার যা খুশি নাও। কিন্তু একটা কলিয়ারীর পেট তো ছোটখাট নয়। তা কি সোনার গয়না দিয়ে ভরাট করতে পারবে?

—হয়তো পারবো না। তবু শেষ চেষ্টা। কলিয়ারীটাকে চালু রাখা। জুয়োতে দান এড়েছি—ফতুর হতে বাকি কি?

—ছেলেমেয়েদের কি হবে গো?

—পথে বসে কাঁদবে। অবশ্য তা দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকবো না।

—উঃ! তুমি কি নিষ্ঠুর! এভাবে কথা বলতে পারছো? একটু মায়া হচ্ছে না? জয় ওকে টেনে ধরল বুকের উপর। আস্তে আস্তে বলল—জানি না ভগবান আমাদের ভাগ্যে কি লিখেছেন। এসো একটু ঘুমোও?

অশ্রুমুখী জয়ন্তীর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিল। জয়ন্তী হয়ে গেল অশ্রু নদীর ধারা।

চুয়াম্ন

মর্মদাহে পুড়ে মরছেন ব্যারাকলউ সাহেব। বিস্ফোরণের মুহূর্তটি থেকে সময় কাটছে এক অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্যে। ভিতরের মানুষটি ক্ষণে ক্ষণেই জেগে ওঠে ও তাঁকে ভৎর্সনা করে একি করছো ব্যারাকলউ? একটি সত্যকে চাপা দেবার জন্য কেন তুমি হতভাগ্য নিরীহ শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছো?

ব্যাচারিদিকে কাঁদতে দাও। এমনি করে কুলিবাথানকে দলে পিষে চুরমার করে দিলে। অথচ ওরা তোমারই ঔরস জাত জারজ প্রজন্মের ঠিকানা। ওদের মা-দিকে ভোগ করেছো। সেই সুখের প্রহরগুলি স্মরণ করে ছেলেদিকে সুখে শান্তিতে থাকতে দাও।

সুখ ?

বিশ পাউণ্ড ওজনের হ্যামার থে্া হল ওঁর মাথায়। উনি নিজে কি সুখ পেয়েছেন ? রাশি রাশি যন্ত্রণার দল মিছিল করে যাচ্ছে স্নায়ু মণ্ডলীর মধ্যে। ঐ দেউলটি ! স্বপ্ন দিয়ে গড়া একটা কলিয়ারী। সমকালীন যুগের আধুনিক খাদ। আজ সেটা গণ সমাধিক্ষেত্র। দু'জোড়া হেডগীয়ার নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুলি চাকা ঘোরে না। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় না। অনবরত ফ্যান চলার ধ্বনি তরঙ্গ বাতাসে স্পন্দন তোলে না। কানে শুনতে পাওয়া যায় না সেই মধুর জীবন সঙ্গীত।

অত অত ধাওড়া খালি পড়ে আছে। সেখানে শিয়াল কুকুরও বাস করে না। অথচ একদিন ঐ ধাওড়া কত কোলাহল মুখর ছিল। আর তার নিস্তব্ধতা যেন তারই হৃদযন্ত্রের স্তব্ধতা।

ব্যারাকলউ সাহেবের ভিতরটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় টন্ টন্ করে।

একদিন রাত্রে ভীষণ শ্বাসকষ্ট হল। পেট ফুলে ঢোল।

উদ্বেগ, অশান্তি, অনিদ্রা, অনিয়ম, মদ্যপান তাঁর নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফল যা হবার তাই হল।

পানমোহরা বাংলোয় ছুটোছুটি পড়ে গেল। মিঃ ক্রীগ সেই রাত্রেই ডাঃ ডেভিডকে ডেকে আনলেন। তিনি তাঁর নাক দিয়ে পাকস্থলীতে নল ঢুকিয়ে সাকশান পাম্প দিয়ে জল বের করছেন। পাকস্থলীর পচা মল। কি বিটকেল তার দুর্গন্ধ। কাছে দাঁড়ানো দায়।

ধন্য ডাক্তার সাহেবের শক্ত ধাত। তিনি অসীম ধৈর্যে ও সাহিষ্ণুতায় সেই আবর্জনা বের করে দিলেন। স্যালাইন চালু করলেন। তারপর দু'চার ঘণ্টা পর পরই সেইভাবে জল বের করতে হল।

পনেরো দিন ধরে পানমোহরা বাংলোটা হাসপাতাল হয়ে রইল। ডাঃ ডেভিড প্রাণপণ লড়াই করে মিঃ ব্যারাকলউকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনলেন। উনি এখন একটু সুস্থবোধ করছেন। চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন। সকাল সন্ধ্যা ভ্রমণ ও বাগানের ফুল বাগিচায় বেতের চেয়ার পেতে খবরের কাগজ পড়া। মিঃ ব্রাউন, মিঃ ক্রীগ, ডাঃ ডেভিড, ফাদার ডাইসন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ওঁর বাংলোতে আলোচনা সভায় বসলেন—ওঁকে নিয়ে কি করবেন ?

মিঃ ক্রীগ বললেন—ওঁকে হোমে নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। সেখানে ওঁর মিসেস আছেন, মেয়ে জামাই নাতি নাতনীরা আছেন। উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তাহলে এখানে কেন?

সে কথায় সকলে সায় দিলেন। মিঃ ব্যারাকলউয়ের কাছে প্রস্তাব রাখা হল।

উনি বললেন—একটা বিপন্ন জাহাজকে ফেলে দিয়ে কোন নাবিকের কি চলে যাওয়া উচিত? আপনারা বুঝে দেখুন সারাজীবন ধরে কত বুদ্ধি খাটিয়ে কত মেহনত করে এই ইন্‌ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছি। আজকার এই বিপদসঙ্কুল সময়ে তাকে যদি ছেড়ে চলে যাই তবে নিজের কাছে কাপুরুষ হয়ে যাবো না?

মিঃ ব্রাউন বললেন - কিন্তু আপানার জীবনও তো বিপন্ন।

—আমি তো জীবনটাকে কোল ইণ্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করে দিয়েছি। তাই নিজের জীবন নিয়ে ভাবি না। শেষ লড়াইটা করেই মরবো।

তখন ফাদার ডাইসন পরামর্শ দিলেন—পানমোহরায় যতদিন থাকবেন ততদিন উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যেই কাটাবেন। সেদিক দিয়ে নওরঙ্গীর জলবায়ু ভালো। বেশ নিরিবিলি এবং প্রকৃতিটা সুন্দর। উনি যদি ওখানে যেতেন—

মিঃ ব্রাউন বললেন—তা যদি বলেন তাহলে একটা কাজ করতে পারলে ওঁর শরীরটা ম্যাজিকের মত রি-অ্যাক্ট করবে।

—কি বলুন ত?

—যদি কাবেরী দেবীকে ওঁর কাছে এনে দিতে পারেন।

সবাই গুম হয়ে গেলেন।

জয়গোপালকে বরখাস্ত করার পর সাহেবের সঙ্গে তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন। তারপরেও জয়ের উপর আক্রমণ কম হয়নি। পানমোহরা দাঙ্গায় তাকেও ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, চুরি ও দুর্নীতির মামলা আনা হয়েছে, ওর সাতথরিয়ার জমি-জমা আটক করে দেওয়া হয়েছে। সাহেব নিজে কাবেরীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কাবেরীও সাহেবের গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে—সরিতাকে আসতে দেয়নি। তাদের সব খরচ-খরচা মিঃ ক্রীগ বন্ধ করে দিয়েছেন।

এরপর তাকে কে আনতে যাবে?

ফাদার ডাইসন বললেন—আমি সে চেষ্টা করবো। কারণ আমি আপনাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত নই। স্রেফ মানবতার খাতিরে তিনি যাতে আসেন সেজন্য অনুরোধ করবো। আপনারা মিঃ ব্যারাকলউকে বলুন।

মিঃ ব্যারাকলউ নওরঙ্গী হাউসে যাবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু

কাবেরীর ব্যাপারে বললেন—ঐ মেয়েটাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি। এমন কি ওর মেয়েটির বিয়ে দেবো বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাও পালন করিনি।

যে গাছের ডালটি তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম তাও কেটে দিয়েছি। এর পরেও তাকে বিরক্ত করার কি কোন যুক্তি আছে?

মিঃ ব্রাউন বললেন—যতদূর জানি তিনি আপনাকে ভালবাসতেন। তাঁর চরিত্রে একটা সহজ সরলতা আছে। আশা করি এতে উনি বিরক্ত বোধ করবেন না।

--তা ঠিক। তবে ওঁর মনের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। জাগতিক প্রেম ভালোবাসাকে ঈশ্বর প্রেমে রূপান্তর করার জন্য লর্ড শ্রীকৃষ্ণের পূজো করছে। ওর গলায় তুলসীর স্যাকরেড গারল্যাণ্ডস। কেন আর তার অমর্যাদা করবেন?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। একদা দুর্দান্ত সেক্সীম্যান আজ কত অনায়াসে আত্মপীড়নের পথ বেছে নিতে পারেন।

সব খবরই মিসেস ব্যারাকলউয়ের কাছে যেত। তিনিও তখন ভীষণ বিপর্যস্ত। বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত চোট খেয়ে যাচ্ছে। সিসিল মেমসাহেব ফাইন্যান্স ডাইরেক্টরের দায়িত্ব নেবার পর শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই লড়ে যাচ্ছেন।

ওঁদের ধারণা এই মন্দার বাজার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী হবে না। বাজারে তেজীভাব দেখা দেবে। তখন আবার মুনাফা কামাতে পারবেন। সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

তবে ভারতবর্ষে কয়লা খনির ব্যবসার উপর আর তেমন আগ্রহ নেই। হতে পারে তা ব্যক্তিগতভাবে আহত হওয়ার জন্য।

মিসেস ব্যারাকলউ বলেন—আবার যদি একটা মহাযুদ্ধ লাগে তবেই ভারতের কয়লাখনি থেকে বাম্পার প্রফিট আসবে। তবে কি আমরা ব্যবসায়ে টাকা রোজগারের জন্য মহাযুদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকব? এটা কেমন মানসিকতা?

এলিজা তাঁর মায়ের ব্যবসা নিয়ে ভাবেন না। উনি একটু বিশেষ ধরনের শিল্পী। ওঁর স্বামী চলচ্চিত্র জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আর উনি ফ্যাসানের ডিজাইনার। দেশে-বিদেশে নানা ভ্যারাইটিজের ফ্যাশন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন ও ডিজাইন করেন। নিজস্ব ফার্ম ও শো-রুম আছে। তাই নিয়ে থাকেন। একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে আছে। অবসর সময়টুকু তাদের জন্যই ব্যয় করেন। উইক এণ্ডে বেড়াতে যান। স্বামীর সঙ্গ কদাচিৎ পান। এই একটি ব্যাপারে ব্যারাকলউ ফ্যামিলির সবাই বঞ্চিত। একটা

নিটোল সুখী দাম্পত্য জীবন তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। অবশ্যই সেজন্য তাঁদের নিজেদের দায়িত্বও কম নয়। সবাই তো ছুটছেন অর্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য।

মিসেস ব্যারাকলউয়ের ডাকে একদিন তিনিও এলেন। আইনত পান-মোহরা কোল কোম্পানী ও নওরঙ্গী কোল কোম্পানীর তিনিও একজন অংশীদার। মিঃ ব্যারাকলউ দুই মেয়ে ও স্বামি-স্ত্রী এই চারজনের মালিকানা রেজিস্ট্রী করিয়ে দিয়েছেন। চারজনেই ডাইরেক্টর।

ওঁরা তিনজনে দেউলটি খাদের বিস্ফোরণ ও তার ফলাফল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করলেন। মিঃ ব্যারাকলউ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেও আগামী রবিবার গীর্জায় গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করবেন বললেন।

তারপর এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে একটা স্কিম তৈরি করলেন। তা হচ্ছে যে সব কয়লা বিক্রি হচ্ছে না সেসব কলিয়ারী বন্ধ করে দেওয়া হোক। আস্তে আস্তে মজুত কয়লা বিক্রি করে বোঝা হাল্কা করা হোক। তাতে টাকাটা আনবার পথ খোলা থাকবে কিন্তু যাবার পথটা সঙ্কীর্ণতর হবে।

খরচ খরচার বাজেট এমনভাবে করতে হবে যেন ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাতে হাত না দিতে হয়। অর্থাৎ এই মন্দার বাজারেও ভারতের রোজগার থেকেই যেন ভারতের ব্যয় সঙ্কুলান হয়ে যায়।

ঐ স্কিমটি লিখিতভাবে তৈরি করে তিনজন দস্তখৎ করে দিলেন। ব্যাপারটা হয়ে গেল বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের রিজোলিউশ্যান।

ব্যারাকলউ সাহেব তখন নওরঙ্গী হাউসে। ঐ স্কিমটির কপি হাতে পেয়ে ব্যোম খাপ্পা হয়ে গেলেন।

কি ?

আমার উপরে খবরদারি ?

তেড়ে ফুঁড়ে চিঠি লিখতে বসলেন—ডিয়ার লেডী !

তুমি কি মনে কর ? মিঃ ব্যারাকলউ তোমার আম দরবারের চৌকিদার ? কেন তুমি বার বার আমার উপরে খবরদারি করতে আসো ? পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি—তোমার হুকুম মানবো না।

প্রচণ্ড রাগে চিঠিটা শেষ করে মিঃ ক্রীগকে তা ডেসপ্যাচ করার জন্য দিয়ে দিলেন। এবার একটু হাল্কা বোধ হচ্ছে।

বিকেলের রোদটা যখন মরে এল। তালগাছের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে এবড়ো খেবড়ো মাঠের উপর পড়ল তখন উনি লাঠিটি হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কলমীশায়েরের স্বপ্ন দ্বীপে এলেন।

এখানে এলে ওঁর মনটি বেশ প্রফুল্ল হয়। জলন্ত উদ্ভিদের গন্ধে কেমন একটা প্রাণের সাড়া পান। সারা কলমীশায়েরে এখন কেমন নিস্তরঙ্গ,

অস্তসূর্যের রক্তিমাভায় কেমন বর্ণাঢ্য তীরভূমির গাছ-গাছালিতে কমনীয় শ্যামশ্রী। এসব দেখতে ওঁর খুব ভালো লাগে।

দূর থেকে ভেসে আসে মহুল ফুলের গন্ধ। লাগরা মাদলের শব্দ। বন-জঙ্গলের মধ্যে সাঁওতাল পল্লীতে সরহুল উৎসব হচ্ছে। শাল মহুলের ফুল ফুটলে এই উৎসব হয়। আদিম জাতির বন্য ও অরন্য জীবনের যৌবনোৎসব।

একদা উনি ওদের কাছের মানুষ ছিলেন। ওরা সুখে-দুঃখে তাঁর কাছে আসতো। উনিও ওদের উৎসব আনন্দে যোগ দিতেন। মহুয়া খেয়ে মাতাল হতেন। সেই দিনগুলো ফুরিয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে ওরা ছাঁটাই হয়ে গেছে।

ওদের জন্য বুকে ব্যথা জাগে। কিন্তু কি বা করতে পারেন? যখন রম রম করে কলিয়ারী চলত, মোটা মোটা অঙ্কের চেক আসতো তখনই কিছু করেননি! আজ আর কি করতে পারবেন?

আর কুলিবাথান?

ওদের দুঃখ ঘুচবার নয়। মনসারাম যাদের নেতা তাদের পেটে ভাত জোটে নাকি? ও ব্যাটা বজ্জাত, ঝামেলাবাজ, পেশাদার দাঙ্গাবাজ। জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে শ্রমিক তাতিয়ে বেড়াচ্ছে। গান্ধীজীকে গুরু ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। ননসেন্স।

কিন্তু কে ওকে পয়দা করেছে?

মিঃ ব্যারাকলউ।

মাইগড!

তাঁরই ঔরসে জন্ম নিয়ে তাঁর সঙ্গেই দুষমনি করছে।

কিন্তু কেন?

ও ত অনুগত হয়ে থাকতে পারতো। যেমন ছিল বিবিবাথানে।

নাকি বিবিবাথানের অত্যাচারই তাদেরকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে? অত্যাচার তিনি নিজেও কম করেননি। লক্ষা ও তার পরিবারকে এত নিষ্ঠুর-ভাবে নির্যাতন না করলেও চলত! কুলিবাথানের কুলি-কামিনদিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় না করলে তারা দু'মুঠো খেতে পেত।

আজকাল এসব ভাবনা তাঁকে নাড়া দেয়। বড় নিষ্ঠুরভাবে উপলব্ধি করেন একাকাত্বের যন্ত্রণা। আজ তিনি কত একা।

অথচ জীবনটাকে তিনি ভোগ করেছেন সুরা, সাকি, অর্থ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে। আজ সব আছে কিন্তু যেন কিছুই নেই।

ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লেন কিন্তু ঘুম যে আসে না। বড় নিঃসঙ্গ, বড় ক্লান্তিকর এই প্রহর যাপন। এপাশ ওপাশ করতে করতে হয়তো একবার চোখ লেগেছিল। তখন তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত একদল ভিখিরী ও কালো কালো খনি মজুরদের সামনে আলখাল্লা পরা একটা বিরাট লম্বা মানুষ। লম্বা হাত মেলে সে দেখাচ্ছে জীবন রহস্যের ছবি। যম দুয়ার ও নরকের ছবি। তাতে গলিত শব ও দুর্গন্ধময় বিষ্ঠার ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মানুষ কিভাবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে তার মর্মন্তুদ চিত্র। অপঘাতে মৃত্যু হলে তার প্রেতাত্মা কেমন দম বন্ধ হয়ে গুমরায় তার শব্দ মগজে ঢুকে জীবন চক্রকে কম্পমান করে তোলে।

তারপর হঠাৎই ভেসে উঠল দেউলটি খাদের বিস্ফোরণ। সেই ভীষণ আলোর ঝলকানি, কান ফাটানো শব্দ এবং ভূমিকম্পের তাড়নায় খনির সুড়ঙ্গে কর্মরত শ্রমিকদের অনিবার্য মৃত্যুর ঘটনা চলচ্চিত্রের মত ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। ভয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। তিনি যেন শুনতে পেলেন তাঁদের আর্ত-কণ্ঠস্বর বাঁচাও বাঁচাও—

—কিন্তু কে বাঁচাবে? সবাই যে মৃত্যু পথের পথিক।

সেই আলখাল্লা পরা মানুষটা তাঁকে বলছে—মিঃ ব্যারাকলউ শুনতে পাচ্ছো?

—হ্যাঁ।

—ওদেরকে বাঁচাতে পারো?

—না।

খনির ভিতর অবরুদ্ধ মৃতদেহগুলির যদি সৎকার না হয় তাহলে তাদের প্রেতাত্মা মুক্তি পাবে না।

তুমি কি তাদের মৃতদেহ সৎকার করতে পারবে না?

—কিভাবে তা সম্ভব?

—তুমি খনির বিশেষজ্ঞ। কিভাবে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করবে সে ভাবনা তোমার। কিন্তু যারা প্রেত হয়ে খনির ভিতরে গুমরে গুমরে যন্ত্রণা-ভোগ করছে তাদেরকে উদ্ধার করা তোমার নৈতিক কর্তব্য। কারণ তুমি মালিক।

—কিন্তু সে যে বড়ই কঠিন কাজ।

—যতই কঠিন হোক এটা তোমাকে করতে হবে। না হলে ওদের মত তোমারও প্রেতাত্মা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হবে। তুমি সে যন্ত্রণা ভোগ করবে।

আঃ! একি দেখলাম?

মিঃ ব্যারাকলউয়ের সারা গায়ে ঘাম। মুখটা বিবর্ণ। ঘুম ভেঙে গেছে থর থর করে কাঁপছেন।

কে? কে ঐ আলখাল্লা পরা লোকটা? ও কিসের প্রতীক? কি বলতে চাইছে? দেউলটি পুনরুদ্ধার।

ওঃ। লর্ড যীশাস ক্রাইষ্ট।

পঞ্চান্ন

মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য। চারিদিকে আঁধির হাওয়া। কেমন রন্ রন্ করছে। অজয়ের বালি যেন তপ্ত কড়াইয়ের খইভাজা বালি। পা পড়লেই আগুনের ছ্যাকা। গরুর গাড়ির চাকার দাগ ধরে হেঁটে যাচ্ছে জয়গোপাল। তার পা চলছে না। মনে হচ্ছে যুগান্তরের ক্লান্তি, অবসাদ এবং হতাশা বুকের উপর চেপে বসে আছে।

বহুকষ্টে নদীটা পার হয়ে একটা পলাশ গাছের নিচে বসল। পা থেকে জুতো খুলে ঝেড়ে ঝেড়ে বালি বের করল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। নদীর স্রোত ঐ কিনারে। আর নিকটবর্তী গ্রাম অনেক-দূরে। আপাতত তেষ্টা মেটাবার কোন উপায় নাই।

নাই বা থাকল?

ওর জীবনটারই আর প্রয়োজন নাই। সব শাঁস শেষ। আঁটি ও খোসা-টুকুই সম্বল। এই নিয়ে যার কাছে দাঁড়াবে সেই দূর দূর করে বের করে দেবে। তাহলে যাবেটা কোথায়?

বাড়িটা তো অশ্রুগর্ভ। জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। তার কান্নার বিরাম নেই। ওকে দেখলেই সেই কান্নার ঢেউ বেগবতী হয়ে ওঠে। কি যে বিলাপ ধ্বনি—এ কি করলে গো? সব ফুঁকে দিয়ে ছেলেমেয়েদিকে পথে বসালে?

হায় ভগবান! আমি সেই জয়গোপাল। যার কাছে হাজার আদমী এসে সেলাম দিত। টাকা বাজতো ঝম ঝম করে। অজয় ভ্যালি কোলিয়ারীর চোরা বালিতে ডুবে গেল।

কিন্তু এখন যদি সে মরে যায় তাহলে কি হবে? সে বাঁচবে ব্যারাকলউ সাহেবের আনা দুর্নীতির মামলা থেকে। জয়ন্তী বাঁচবে সর্বনাশের সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়া একটা মানুষের দায় থেকে। আসানসোলের বাড়ি, তার গায়ের গয়না এবং সাতখরিয়ার বাইরে যে বিঘে পঞ্চাশেক জমি আছে তারই উপার্জনে সংসারটাকে চালিয়ে নেবে। সে বেঁচে থাকলে হয়তো সেগুলোও থাকবে না। চোরাবালিতে ডুবে যাবে।

তাহলে এই পলাশ গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে অনায়াসে ঝুলে যেতে পারে। পথের পথিকরা তার লাশটা নামিয়ে অজয়ে ভাসিয়ে দেবে। হয়তো বা অজয় ভ্যালির কোন কুলি-কামিন তার মৃতদেহ সনাক্ত করে বলবে—এই ছাখরে! এই খালভরা মালিক আমাদের হাজরী না দিঞে পালেঞে ছিল। বেশ হঞেছে মরেছে।

এই তো তার পরিণতি। এইজন্যই এতকাল ধরে জীবনযুদ্ধ।

মনটা বেশ শক্ত হয়ে উঠল। জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছাতে পেরেছে বলে

হাল্কাবোধ করল। উঠে দাঁড়াল। একটা দড়ি সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু এখানে দড়ি কোথায় পাবে? বাঁধন-ছেঁড়া দড়ি। তারই অন্বেষণে পথের দু'পাশে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। আর একটা অদৃশ্য দড়ি নিয়তির মত অমোঘ আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনাশ, বিত্তনাস জীবন পাঠের মস্ত বড় পাঠ। সে পাঠ যে নেয়নি তার সাধ্য নেই যে বোঝে এর যন্ত্রণা মর্মমূলের কত গভীর, কত তীব্রতায় নিঃশব্দে অস্ত্রচালনা করে। নিজের হাতে অর্জিত সম্পদ নিজের হাতে ফুরিয়ে দেওয়ার বেদনা বুঝি আত্মহত্যার চেয়েও মর্মভেদী।

অথচ তার চোখ ফেটে জল বেরোয় না। ফাটা বাঁশের মধ্যে বাতাস চলার মত একরকম দীর্ঘশ্বাস বয়।

পরাবনী ষ্টেশনে একটা খোলা ট্রলির মত বগিতে উঠে পড়ল ও। ঝিক্ ঝিক, ঝিক্ ঝিক্ শব্দে বেশ চলছিল। সকাল নাগাদ সালানপুরে পৌঁছেও গেল। সেখানে নেমে জয় অনুভব করল কিসের টানে সে এখানে এসে পড়েছে। চার পাঁচ মাইলের মধ্যেই কাবেরী কুটির!

হে ভগবান!

বেশ। তোমার ইচ্ছায় যখন এতদূর এসে পড়েছি তখন ওর সঙ্গে শেষ দেখাটা করেই যাব। ও হয়তো এখনকার জয়গোপালকে দেখলে সেই দেমাকি জয়গোপাল যে তাকে কটু কথা বলেছিল, রূঢ় আচরণ করেছিল তার পরিণতিতে খুশিই হবে। মনে মনে বলবে দেখলে ত! ভবী ভুলবার নয়। হয়তো বা শ্লেষ দিয়ে কথা বলবে। তা বলুক। মানুষ মানুষের দুঃসময়েই ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। তাও তার প্রাপ্য বলেই মেনে নেবে।

কারণ এই মেয়েটিই তার হাতে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছিল। আজ যখন সব হারিয়ে গেছে তখন তাকে শেষ বিদায় জানানো কর্তব্য।

গ্রীষ্মের সকালে রোদের আঁচ বড় কড়া। গাছের ছায়া বড় মিষ্টি। কাবেরী কুটিরের গেট পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। সেই ঘরটির দুয়ারে যেখানে সে তার প্রথম যৌবনের প্রচণ্ড তাড়না ও যাবতীয় লাবণ্য নিয়ে ফ্রেমে আঁটা ছবির মত দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই সে দাঁড়াল। তবে পটে আঁকা ছবির মত নয় ঝড়ে ভাঙা তালগাছের মত। সেও একটা ছবি।

কাবেরী আত্মস্থ হয়ে রেওয়াজ করছিল। জয়কে দেখেই চমকে উঠল— তুমি! জয় কোন উত্তর দিল না। কাবেরী উঠে এল বলল—তোমার একি চেহারা হয়েছে গো? জয় তারও উত্তর দিল না। কাবেরী বলল—এসো। ভিতরে এসো।

জয় বলল—জামা প্যাণ্ট ময়লা নোংরা হয়ে আছে।

—তা হোক। এসো।

জয় দু'পা এগিয়ে ঐ ঘরেই একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলল। মোজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে ঘামের পচা দুর্গন্ধে নিজেরই গা-টা গুলিয়ে গেল।

কাবেরী বলল—থাক ও সব। এ ঘরে এসো। জামা প্যাণ্ট ছাড়ো। ধুতি এনে দিচ্ছি।

ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরে বসিয়ে দিল। কাচা ধুতি গামছা এনে দিল। জয় বসেই রইল। টুসী এলো একগ্লাস জল ও দুটো প্যাড়া নিয়ে। জয় একটা প্যাড়া ভেঙে মুখে দিয়ে জলটা খেল ঢক্ ঢক্ করে। খালি পেটে গ্লাস ভর্তি জল থলবল করতে লাগল।

কাবেরী বলল—তোমার শরীর এত ভেঙে গেল কী করে? কি হয়েছে?

জয় কেমন ক্লান্ত কণ্ঠে বলল—তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি ঠিক আছি। একটু বিশ্রাম করে নিই তারপরে চলে যাব।

—সেই চলে যাব—চলে যাব। তবে এসেছো কেন।

—তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে। বাঁচার সাধ ফুরিয়ে গেছে বড়বৌ!

—চুপ করো। ওঠ। স্নান করগে। যা চেহারা করেছো ধোলাই করে সাফ সুফ করতে একবেলা লাগবে। নিজেই পারবে নাকি আমি হাত লাগাবো?

জয় ম্লান হেসে বলল—বলছি ত ব্যস্ত হয়ো না।

জয় কেমন উদাস, কেমন ক্লান্ত। কথা বললেও উত্তর দেয় না। মিট মিট করে তাকিয়ে থাকে। বলেছিল—চলে যাবো। কিন্তু যায়নি। স্নান করেছে, খেয়েছে, সারা দুপুর বিছানায় ওলট পালট করেছে। কাবেরী ওর মাথার কাছে বসে পাথার বাতাস দিয়েছে। তবু ঘুম আসেনি। কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

কাবেরী ওর মনের তল খুঁজে পায়নি। সদা ব্যস্ত মানুষটি, তেজী ও অহংকারী মানুষটি এমন কেন হয়ে গেল? প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না। ওর আচরণে কাবেরীর ভেতরে কেমন এক বুকচাপা অস্বস্তি।

ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে একটা ভাবনা—জয়কে জাগাতে হবে। না হলে ও শেষ হয়ে যাবে। ও বলছে শেষ দেখা করতে এসেছে তাই বুঝি সত্য হয়ে উঠবে। এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না।

ঠাকুর ঘরে উপুড় হয়ে অঝোরে কাঁদল। ঠাকুরের কাছে হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করল—হে ঠাকুর! জয়কে তুমি রক্ষা কর। ওর মুখে হাসি ফোটাও। ওকে সহজ করে দাও ঠাকুর।

এই ঠাকুর ঘরে সে সারা সন্ধ্যা কাটায়। ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনায়।

সেই গান শুনতে কত মানুষ আসে। আজ তার গলা দিয়ে গান বেরুলো না।

রাত্রের খাবার ছিল রাজের মত সাজা ঝরঝরে একথালা ভাত। নানা ভাজি-তরকারি পায়েস। মাছ ভাজা ও মাছের ঝোল।

জয় বলল—তুমি নাকি মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছো তবে এগুলো এলো কি করে?

—বাঃ রে। আমি ছেড়ে দিয়েছি বলে কি তুমিও ছেড়ে দেবে?

—না। তা বলছি না। এসব বাড়তি খরচ।

—হে ভগবান! আজ দু'বছর পরে তুমি এলে আমি খরচের হিসেব করবো?

একটা উঁচু বালিশে মাথা দিয়ে জয় শুয়ে পড়ল। কাবেরী ওর বুকের কাছে ত্যারছা ভাবে বসে ওর কপালে হাত রাখল। সেই কোমল শীতল স্পর্শে জয়ের কেমন সুখ বোধ হল। কাবেরী গাঢ়কণ্ঠে ডাকল—জয়!

একটি ডাক যেন যুগান্তরের স্মৃতিকে নাড়িয়ে দিল। খুব ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক না হলে কাবেরী ওকে নাম ধরে ডাকে না। সে মিট মিট করে তাকাল। কাবেরী ওর কাঞ্চন বর্ণ আঙুল তিনটি জয়ের ঠোঁটে ঠেকিয়ে হাসল। সেই হাসি। ঈষৎ বাঁকা দাঁতটির অম্লান হীরক দ্যুতি। ঘন পক্ষ ভুরুর টঙ্কার। তারা দুটির চঞ্চল চমক। ঘন কালো চুলের প্রেক্ষাপটে অনিন্দ্য সুন্দর মুখের কোমল লাবণ্য। ঈষৎ স্ফীত ঠোঁট দুটিতে বাসনার ব্যাকুল আহ্বান। জয়ের ভিতরটা কেমন হয়ে গেল।

কাবেরী বলল—সেই প্রথম রাতটার কথা তোমার মনে আছে জয়?

—ওরে বাব্বাঃ সে কি ভোলা যায়?

—সেদিন তুমি আমার গায়ে হাত দিতে চাইছিলে না।

—আমার কেমন ভয় করছিল।

—কেন?

—আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তোমার গা-টা সোনার মত ঝল্-মল্ করছিল।

—এখন কি আমি তামা হয়ে গেছি?

—না না। তা কেন হবে?

—তবে এমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছো কেন? পুরুষের মত জেগে ওঠ। ছাখো আমি সেই কাবেরী।

জয়ের তলপেটটা ছ্যাৎ করে উঠল। নাভিকুণ্ডলীতে পাক দিয়ে তরল রক্ত স্রোতের ধারা আজ্ঞাচক্রে গিয়ে ঘনীভূত হলো। এখন মাথাটা দপ্ দপ্ করছে।

কাবেরী বলল—আজ দু'বছর থেকে তোমার জন্য যুগিয়ে রেখেছি রাগ

অভিমানের মোদক। এ নেশায় ঘুমের ঘোরে লুটিয়ে পড়বে। তুমি নেবে না?

ওর কথাগুলো যেন কোন সংলাপ নয় সঞ্জীবনী মন্ত্র পাঠ। যার অপূর্বিয়ের শক্তিতে তুচ্ছ হয়ে গেল বিত্তনাশের ক্লেশ। জেগে উঠল প্রকৃত পুরুষের মতই। সেই শরীরে ডুব দিয়ে অনায়াসে তুলে আনল দু'চোখ জোড়া ঘুম। এক গভীর আবেশে সারারাত ঘুমিয়ে সকাল বেলায় উঠল। তখন সে ঝরঝরে তাজা।

সকাল ভোরে স্নান করে পিঠের উপরে চুল মেলে দিয়ে কাবেরী এল ওর জন্য এক কাপ গরম চা নিয়ে। বলল—ঘুম হয়েছে তো?

—হ্যাঁ খুব ঘুম।

—তাই বলে উঠেই যাবো যাবো করবে না। এখন সাতদিন তুমি আমার কাছে থাকবে। তোমাকে সেই আগের মত করে তবে জয়ন্তীর কাছে পাঠাবো। বুঝেছো?

কাবেরী ওর মুখে টোকা দেবার জন্যই হাতটা বাড়িয়ে ছিল। জয় সেটা খপ্‌ করে ধরে ফেলল। দুষ্টু হেসে কাবেরী বলল—একি গো? এখনো ক্ষুধা মেটেনি?

—তা-না। তা নয়। মানে—আমি তোমার উপরে বড় কঠোর ব্যবহার করেছি সেকথা মনে রাখবে না ত? আমাকে ক্ষমা করবে ত?

কাবেরী চোখ পাকিয়ে বলল—ত্মাখো—আদিখ্যেতা কোর না।

—আমি তোমার প্রতি কি ব্যবহার করেছি আর তুমি তার কি প্রতিদান দিলে—একথা মনে হলেই মরমে মরে যাচ্ছি।

—আহারে। কি আহ্লাদের কথা? তুমি এলে একবুক জ্বালা নিয়ে তখন আমি দুটো পুরনো কথার জের টেনে তোমার বুকটাকে ভেঙে দেবো—তাই না? তার আগে গলায় দড়ি দেবো।

—ঠিক ঐ কথাটিই আমি ভাবছিলাম। কালকের রাতটা যদি সোহাগে না ভরে দিতে তবে আজ এতক্ষণ আমি গলায় দড়ি দিয়েই ঝুলতাম।

কাবেরী আঁতকে উঠল—হে ভগবান! তাই বুঝি শেষ দেখা করতে এসেছি বলেছিলে?

—হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে ইচ্ছে করে আসিনি। কে যেন টেনে নিয়ে এল। তাই বুঝি আবার আমার বাঁচবার সাধ হচ্ছে।

—থামো! মরে খালাস পেতে ভাবছিলে? লজ্জা হচ্ছিল না? কাপুরুষ কোথাকার।

জয় ভাবতে পারেনি তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সংলাপ কাবেরীকে এত রাগিয়ে দেবে। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রলই।

কাবেরী বলল—তোমার রূঢ় আচরণে হয়তো আমার রাগ অভিমান হয়েছিলো। কিন্তু কখনো তোমাকে কাপুরুষ ভাবিনি। আজ আমি সত্যিই আঘাত পেলাম।

জয় ক্ষণকাল মাথা নিচু করে কি ভাবল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—ঠিক আছে। তোমার ভর্ৎসনা আমার মনে থাকবে।

—হ্যাঁ। মনে রেখো। তোমার ত একটা কলিয়ারী। আর ব্যারাকলউ সাহেবের যে সব কলিয়ারী বরবাদ হয়ে গেল। দেউলটির মত কলিয়ারী বিস্ফোরণে উড়ে গেল। তবু কি উনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন?

—না। আমিও ভাববো না। তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

দুপুরে ভীষণ গরম। মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে শুয়েছিল জয়। একটু পর কাবেরী এসে বসল। একটা তালপাতার হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলল—উঃ। গরমে জীবন আনচান হয়ে যাচ্ছে।

জয় বলল—এতো বাইরের গরম। তবুও সহ্য হয়। বুকের ভিতরে যে গরম তা সহ্যেরও অতীত। একেবারে ফতুর হয়ে গেলাম।

কাবেরী বলল—আচ্ছা জয়, তুমি একবার হিসেব করতো তোমার কি আছে? কি গেছে? একেবারে ফতুর হওনি। এখনো তোমার অনেক কিছু আছে।

—সবচেয়ে বড় কথা তুমি আছো। আমার বল বুদ্ধি ভরসা। দুষ্ট রাহু আমার মতিভ্রম ঘটিয়ে দিয়েছিল তাই তোমার সঙ্গে অমন রূঢ় আচরণ করেছি। এখন সেসব কথা আমার বুকেই শেলের মত বিঁধছে।

—ওসব কথা ছাড়ো। তোমার বিষয় সম্পত্তি কি আছে?

—আসানসোলের বাড়িটা আছে।

চারশো বিঘা জমি ব্যারাকলউ সাহেব মামলায় আটক করেছে। আর বিঘে পঞ্চাশেক আছে তোমার নামে কেনা।

—তোমার আমার আবার কি? ওটা তাহলে আছে বল।

—হ্যাঁ।

—জয়ন্তীর গয়নাগুলো আছে?

—না। একশ ভরি বিক্রি করেছি।

—আর কত আছে?

—একশ ভরি।

—অজয় ভ্যালিতে কি কি আছে?

—দশ হাজার টন কয়লা। বয়লার, ষ্টিম ইঞ্জিন, পাম্প, টব গাড়ির লাইন, টব বাড়ি, পাইপ, ধাওড়া, বাবু কোয়ার্টার, একটি বাংলো, একটি অফিস। খুচরো মালপত্র।

—জমি কতটা আছে ?

—দু' আড়াইশো বিঘে।

—চাষ বাস হবে ?

—কিছু খরচ করলে হবে।

—বাজারে দেনা পাওনা ?

—দেনা আছে দু'মাসের স্টাফদের বেতন, একমাসের লেবার পেমেণ্ট।

—তাহলে তুমি নাই-নাই রব তুলেছো কেন ? ফতুর হয়ে গেছি বলছো কেন ? তুমি ওখানে দু'লাখ টাকার মত পুঁজি লগ্নী করেছো তাতো তোমার আছে। বলতে পারো নগদে নেই। এই ত ?

—হ্যাঁ। কিন্তু কলিয়ারী না চললে— ওসব থাকবে না। ওখানকার বাবু চাপরাসীরাই লুটে-পুটে খাবে।

কাবেরী একটু ভেবে বলল—সে ব্যবস্থা আমি করব।

জয় আশ্চর্য হয়ে গেল। অবিশ্বাসী স্বরে বলল—তুমি ? তুমি কি করবে ?

—কুলিবাথানে আমার মনসা বেটা আছে—তা জানো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ও এসেছিল বুঝি ?

—তাই না আসে ? জেল থেকে ছাড়া পেয়েই দেখা করতে এসেছিল।

—ও আমার সঙ্গেও দেখা করতে গিয়েছিল। তখন বাড়িতে ছিলাম না। ছোট বউকে বলে গেছে—জয় কাকুকে প্রণাম করতে এসেছিলাম।

—তাহলে ওর সাহায্য তুমি পাবে।

—আচ্ছা—আচ্ছা !

জয় কেমন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল—এ দিকটা আমি একবারও ভাবিনি। কুলিবাথানের জন কয়েক ছোকরাকে ওখানে রাখলে ওরা এক ছটাক মাল বাইরে যেতে দেবে না। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তবে তো আমি নতুন প্ল্যান করতে পারি। হে ভগবান। হাতের কাছে এতবড় সহায় থাকতে আমি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলাম।

কাবেরী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে মুখটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল—ভাবো—আরো ভাবো। পথ একটা খুলবেই। তুমিও তো কর্মযোগী পুরুষ। সাময়িক ব্যর্থতার জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলে।

জয় খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল—আর বলতে হবে না। কলিয়ারীর মালপত্র গুছিয়ে রেখে ঐ অনাবাদী দু'শো বিঘে জমি আবাদ করবো। চাষ করবো। শস্য ফলাবো। এসো—এবার একটু ঘুমোই।

কাবেরীকে বুকের উপর জাপটে ধরে শুয়ে পড়ল।

কাল বয়ে চলল। গ্রীষ্ম পার হয়ে বর্ষা এল। বর্ষার সজল কালো মেঘ অজয়

নদের উপকূলে ঝুলে পড়ল। জয়গোপাল মেতে উঠল চাষের কাজে।

কুলিবাথান থেকে একদল কুলি-কামিন এনে অজয় ভ্যালি কলিয়ারীর পুরনো ধাওড়াতে রেখে চাষের কাজে জুড়ে দিল।

শুরু হল জয়গোপাল চরিত্রের দ্বিতীয় পর্বের অভ্যুত্থান।

ছাপান্ন

পানমোহরা ও নওরঙ্গী কোল কোম্পানীর সব অফিসারদিকে নিয়ে ব্যারাকলউ সাহেব মিটিং করছেন। তাঁর শরীরটা এখন কিছু ভালো। তাই সাম্প্রতিক কালের আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার উপায় নিয়েই সুদীর্ঘ আলোচনা হল। নওরঙ্গীর কয়লা বিক্রি হচ্ছে না সেজন্য ওটা বন্ধ করে দেবারই সিদ্ধান্ত নিতে হল।

তারপর উনি বললেন—দেউলটি কয়লার বাজার এখনো আছে। ওটা কি রিকোভারী করা যাবে না?

মিঃ ব্রাউন বললেন অসম্ভব কি? তবে কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ।

— ইয়েস! রেসকিউ টিম দিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের মোকাবিলা করতে হবে। সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হল মিঃ ব্রাউন বিলেত থেকে রেসকিউ টিম এবং যন্ত্র-পাতি নিয়ে আসবেন। মিঃ ক্রীগের উপর ভার পড়ল যাবতীয় চিঠিপত্র তৈরি করার ও টাকাকড়ি যোগাড় করার।

এবার ওঁকে চাঙ্গা মনে হচ্ছে। কাজ না থাকলে ওঁর মন মেজাজ খাট্টা হয়। দেউলটি নিয়ে ভাবতে বসে কত কি নোট করছেন। নকশার উপর দাগ দিচ্ছেন। 'রিকোভারি আফটার এক্সপ্লোশান' শিরোনামায় যে প্রবন্ধ লিখবেন তারও মুশাবিদা ফেঁদে ফেলেছেন কাজ শুরু হবার আগেই।

হঠাৎ সব উৎসাহ উদ্দীপনা দপ্‌ করে নিভে গেল। মিঃ ক্রীগ নিয়ে এসেছেন হার্ট ব্রেকিং নিউজ। স্ট্রোক হতে হতে বেঁচে গেলেন। আর্তকণ্ঠে বললেন—কি? কি বললে? ব্যাঙ্ক আমার চেক ডিসঅনার করেছে?

—হ্যাঁ স্যার।

— বাট হোয়াই?

চীৎকার করে উঠলেন। মিঃ ক্রীগ ভীত কণ্ঠে বললেন—ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানালেন বিলেতের একাউন্ট থেকে কোন টাকা ভারতে ট্রানজ্যাকশন হবে না।

—মাইগড! আমার এত এত টাকা ব্যাঙ্কে ডিম দিচ্ছে কিন্তু ভীষণ প্রয়োজনের সময় তা পাবো না।

মাই লর্ড! যীশান ক্রাইষ্ট!

ঘরে ঢুকে যীশুখ্রীষ্টের তৈলচিত্রের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল অবিরল ধারায়।

জেলে থেকে ফিরে মনসারাম তামাম কোলফিল্ড চষে বেড়াচ্ছে তার ট্রেড ইউনিয়নের বক্তব্য শ্রমিকদিকে বুঝিয়ে বলার জন্য। কেউ বুঝছে, কেউ বুঝছে না। সবাই ভয়ে মরছে। ভয়কে জয় করার মন্ত্রপাঠ হচ্ছে অতিশয় গোপনে। সারাদিন পর সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরল। বৈশাখীর এখন হামেশা জ্বর হয় ওকে বসতে দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল। একটু পর ওর কাসির শব্দ ভেসে এল। প্রথমে আস্তে আস্তে পরে জোরে জোরে ঘঙ ঘঙ শব্দ করে।

বড় ছেলেটি কান খাড়া করে শুনে বলল—মা আজ বড়া কাসছে।

ও ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে ডাকল—বাবা-বাবা মায়ের মুখে লহু বিরাছে।

—এ্যাঁ। যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মনসারামের মাথায়।

হুড় মুড় করে ঘরে ঢুকে দেখল বৈশাখী উবু হয়ে বসে কাসছে। কফ ও শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত উঠছে।

দৃশ্য দেখেই ওর মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে গেল। ওকে ধরে বলল—ছুটু বউ! ঈ-কি হঞেছে তুর রক্ত বিরাছে ক্যেনে?

বৈশাখী মুখ বিকৃত করে ছেলেকে বলল—তুর বড় মাকে ডেকে আন বেটা। পাশাপাশি ঘর। শান্তি হয়তো বৈশাখীর কাসির শব্দ শুনেছিল। তাছাড়া মনসা এসেছে তার সঙ্গে ত একবার দেখা করতে আসতোই। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল। ওর মুখটা তখন কালো অন্ধকার।

বলল—তুই বাইরে যা মনসা। আমি দেখছি।

বৈশাখী বলল—ভাতগুলান হঞে গেইছে দিদি। হাঁড়িটি নামাঞে দে।

—হঁ হঁ সব করছি।

শান্তি ওকে ধরে মুখে জল দিয়ে মুছিয়ে শুইয়ে দিল। ঢাকাঢুকি দিয়ে কফ রক্ত পরিষ্কার করে একটা ছাই ভরা মালসা দিয়ে বলল—এইটিতে থুতু ফেলবি ছুটু বউ।

উনুন থেকে ভাতের হাঁড়িটি নামিয়ে বলল—টুককুন বস্ মনসা। আমি আসছি। এসে ভাত দিব।

ও চলে যাচ্ছিল।

মনসা ডাকল—ভৌজী!

ও ফিরে দাঁড়াল।

মনসা বলল—ছুটু বউয়ের ঈ রোগ কখন থেকে হঞেছে?

—উ-কি কুছু বলে? বুকে পাথর দিঞে রাখে। গেঁজে হপ্তায় থাকে

কাসতে কাসতে শুঞে ছিলেক। তখন আমি ঠাহর পেলাম। ত উ বললেক কাহুকে বলিস না দিদি। তুর ছ্যাওরকে ত লয়-ই।

—ক্যেনে? আমাকে লয় ক্যেনে?

—কি বলব রে মনসা? তুর চেঞে উ কম মনে করেছিস? উ মরে যাবেক তবু তুকে কষ্ট পেতে দিবেক নাই। কুছু কর মনসা। ছুটু বউকে বাঁচা।

মনসা একদম চুপ মেরে গেল। এ কি সাংঘাতিক রোগ বাসা বেঁধেছে বৈশাখীর বুকে? এ রোগের ত দাওয়াই নেই। ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন ফুরিয়ে যাবে। এই তার ভবিতব্য!

হায়রে ছুটু বউ! মনসার বউ যদি না হতিস তবে দুটি খেতে পরতে পেতিস। এই ত ভরা যৌবন তোর। এই অকালে ধোঁকা কাসির রুগী হলি।

একটা গাঢ়, প্রাণ টাটানো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মনসার বুক চিরে।

তখন গভীর রাত। চারিদিক শুনশান।

মনসার ঘরের দেওয়ালে কুলুঙ্গীতে একটি পাথরের প্রদীপ জ্বলছে। বহুদিন আগে যখন ওরা প্রথম কুলিবাথানে আসে তখন কাজ পেয়েছিল বিঁদুড়ি নামে একটি ছোট কলিয়ারীতে। সেখানে হলেজ বয়লার কিছুই ছিল না। একজন দেশীবাবু মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটে খাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন গরীব মালিক। মালকাটা দিকে লম্ফ ভর্তি করে কেরোসিন তেল দিতে পারতেন না। সেজন্য কয়লার দেওয়ালে কুলুঙ্গী কেটে পাথরের তৈরি প্রদীপ রাখতেন। মেসিন তেলানো মোটা তেল, গ্রীজ ইত্যাদি জুট বা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে ঐ প্রদীপের জ্বালানী হত। সারিবদ্ধ প্রদীপগুলি দপ্ দপ্ করে জ্বলত। আধা আলো আধা অন্ধকারে কি রকম ভৌতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হত। কোমরে ফ্যানাড়ী পরে খালি গায়ে মাথায় ঝোড়া নিয়ে কামিনরাও সারি দিয়ে চলত। সেই কালো কালো আধ ন্যাংটো মেয়েগুলোকেও প্রেতিনীর মত দেখতে লাগত।

ঘরের কুলুঙ্গীতে প্রদীপটা দেখেই তার এত কথা মনে পড়ে গেল। কারণ এই প্রদীপটি বিঁদুড়ির স্মারক চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। এখনো বৈশাখী তেল গ্রীজ যোগাড় করে ছেঁড়া ন্যাকড়া ভিজিয়ে আলো জ্বালে। রেড়ীর তেল বা কেরোসিন কিনবার পয়সা কোথায়?

ওঃ কত কষ্ট করে যে এই সংসারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মনসারামকে বুঝতেও দেয়নি। তার এই আত্মত্যাগের হিসাব কে করবে।

মনসারামের শরীরও মনের ব্যাটারীতে চার্জ দিতেই বল বা তার ঘরে জ্বলতে জ্বালাতেই বল বৈশাখী ছাড়া কে আছে? আজ তার কানে বাজছে মৃত্যু দেবতার রণদামামা।

এক চিলতে আলোতে ওর দুটি বোজা চোখ, স্পন্দমান বুক এবং মেঝের উপর লুটিয়ে পড়া চুলের রাশির দিকে তাকিয়েছিল ও। চুপচাপ বসেছিল। কত কি দুঃখ দারিদ্র্য, অপমান, নির্যাতনের ছবি ট্রেনের চলমান কামরার মত ওর চোখের সামনে পার হয়ে যাচ্ছিল। বুকচাপা কান্না গুমরে উঠছিল ভিতরে। গলার কাছে আটকে যাচ্ছিল।

বৈশাখী আস্তে আস্তে চোখ মেলল। মনসাকে দেখল; ঘুমে লাট হয়ে থাকা ছেলেগুলিকে দেখল। গলা ঘড় ঘড় করে বলল তুমি বসে আছো ক্যেনে? ঘুমাও গা।

মনসা ওর মাথায় হাত রাখল। সেই হাত দু-হাতে চেপে ধরল বৈশাখী। বলল—বুকটি বড় ডহল করে উঠল। তাথেই কাসি হল। আর কুছু হবেক নাই। তুমি ঘুমাও।

—ছুটু বউ! কখন থেকে তুর ঈ-রোগ হঞেছে?

—কে জানে।

—টুকচুন মনে কর।

—মনে কি করব? তুমি যখন জেহেলে ছিলে তখন ভয়ে ভেবনায় ঘুম হত নাই। ঘুসঘুসা জ্বর হত।

—রক্ত কখন থেকে বিরাছে?

—এই নিঞে তিনবার হল।

—তুকে আমি ভাল করবই ছুটু বউ। ডিসের গড়ে হেকিম সায়েবের কাছকে যাব। দাওয়াই নিঞে আসব। পীরের দরগায় ধন্না দিব। ভাল হবেক নাই ক্যেনে?

বৈশাখী হাসল। বলল আমার লেগে অত উঠাতালা করতে হবেক নাই। আমি ঠিক হঞে যাব।

—তাই হ ছুটু বউ। তুই ভাল না হলে আমি কি নিঞে বাঁচব? কার লেগে বাঁচব? কিসের লেগে বাঁচব?

হু হু শব্দে কেঁদে উঠল মনসা।

কান্নাটা ওর বুকে দীর্ঘদীন থেকেই জমাট বেঁধেছিল। ও ভাবত যে ও কাঁদতে জানে না। বুক ফাটে না।

কিন্তু নির্ঝরিণী ধারার এতই শক্তি যে পাষাণকেও চৌচির করে দিতে পারে। তাই হল মনসার। সে কাঁদতে কাঁদতে বৈশাখীর ঘুনধরা বুকে মাথা গুঁজে দিল। ব্যথা বেদনার অবিরাম ধারা মন্দাকিনী স্রোতের মত শব্দ করে বইতে লাগল। বৈশাখী পাগলের মত মনসার মাথাটা বুকে চেপে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

প্রকৃতি আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দীপ্যমান দীপ শিখা দপ্‌, দপ্‌,

করে জলতে লাগল। শিশু সন্তানেরা অঘোরে ঘুমিয়ে রইলো। জেগে রইলো এক দম্পতি যাদের কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান, অভীপ্সা কয়লা কুলির কল্যাণে নিয়োজিত।

সাতান্ন

পরদিন বন্ধু সোহারাব মির্জার টাঙ্গায় চড়িয়ে মনসা ওকে নিয়ে গেল ডিসের-গড়ে হেকিম সাহেবের কাছে। সে যুগে এই রোগের চিকিৎসা ছিল না। ডাক্তার বদ্যিরা অনিবার্য পরিণতি আটকাতে পারতেন না তবে বিলম্বিত করতে পারতেন। সেই প্রক্রিয়াতেই চিকিৎসা শুরু হল।

কিছু ভেষজ বটিকা এবং মোদক সেবন করতে দিয়ে হেকিম সাহেব দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি বলকারক পথ্য নির্দেশ করে কোন শ্রম সাধ্য কাজ করতে নিষেধ করলেন।

একজন মেহনতী নারী শ্রমিকের হঠাৎ শ্রম বন্ধ হয়ে যাওয়াও যেমন বিড়ম্বনা তেমনি সে কাজ না করলে সংসারও অচল। কয়েকদিন ঘরে বসে থেকেই সে হাঁপিয়ে উঠল। তার চিকিৎসার জন্য কোথা থেকে যে পয়সা কড়ি আসছে তাও বুঝল না; মনসারাম কুলিবাথান ছেড়ে বাইরে বেরুল না। সারাদিন রাত সে বৈশাখীকে আগলে রাখে। দেখে ত বৈশাখীর চোখ টাটাতে লাগল।

একদিন বলল—তুমি কি করছ? আমাকে আগুলে বসে থাকলেই হবেক?

—তুই টুক্‌কুন ভাল হ। তারপর ত—

—হঁ। তবেই হল। ঐ আশাতে বসে থাকলে তুমার বেবাক পণ্ড হবেক।

—আহা! তুই ক্ষেপছিস ক্যেনে? গ্যাখ না কি করি?

মনসারাম বাইরে ঘোরে না বলে বাইরের লোকেই ওর কাছে আসে। ওর বন্ধুরা আগে জাগালির ডুমুর তলায় বসত এখন সন্ধ্যা হলেই ওর ঘরে চলে আসে।

একদিন তারা সবিস্ময়ে দেখল ওর কি করি ব্যাপারটার মাল মশলা। সে একটি টাঙ্গা ও ঘোড়া নিয়ে হাজির হল। কাল থেকে টাঙ্গা চালাবে। রুজি রোজগার তো চাই।

তাই দেখে বৈশাখী তেলে বেগুনে জলে উঠল। ওর বন্ধুরাও ভীষণ মর্মাহত। একটি দুটি লোক জমতে লাগল ওর উঠোনে।

সেদিন ফিকে জ্যোৎস্না উঠেছিল, কুলি-কামিনদের কালো কালো মাথাগুলো

ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়ের মত দেখাচ্ছিল। যারা এতকাল মনসার একটা ইঙ্গিতে জান কবুল করে দিয়েছে তারাই ওর সমালোচনায় মুখর।

মনসা তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছে—আমাকে তো কিছু রোজগার করতে হবেক। এই অসুখ নিঞে ছুটু বউকে ত খাদে খাটতে পাঠাতে লারব। তাহলে চলবেক কি করে ?

শান্তি বলল - যেমন চলছে তেমনি চলবেক।

—কেমন করে চলছে ? ভিখ মেগে।

সজনী বলল—অমন বলছ ক্যেনে দাদা তুমি কি আমাদের পর যে ভিখ মাগার কথা বলছ। আমাদের ছ্যিলা পিলা যদি খেতে পায় তবে তুমার ছ্যিলাতেও খেতে পাবেক।

—না। অমন করে চলতে হবেক নাই। আমার গতর আছে খাটাঞে খাব। কুলি-কামিনদের লেগে অনেক করেছি আর লারব।

বৈশাখী বলল—ওঃ বাড়া বললে। তুমার কথা শুনে গা-টিতে সলগা দিছে। বলি তাই যদি করবে তবে বিশ বছর আগে ক্যেনে টাঙ্গার লাগাম ধর নাই। তাহলে ত আমার ঈ-দশা হত নাই।

ক্ষোভ ও অভিমানের একটা পুঞ্জীভূত স্তূপ শান্তির বুক ঠেলে উপরে উঠে আসছে। বে বলতে শুরু করল—বিয়ার পরে আমি যখন পয়লা পথম শ্বশুর ঘর আসি তখন মনসা ছিল আমারই বয়সী। কিন্তুক্ তখনই আমরা মা ব্যাটার মতন হঞে গেলাম। তারপরে শাশুড়ী মরবার সময় নিজের ছ্যেলাদের চেঞে মনসার লেগেই বেশি হাদ্নসে গেইছিল। আমাকে বললেক বড় বউ মনসাকে কে দেখবেক ? অমি বললাম—আমি দেখব। ত আমি কি দেখি নাই ? উয়ার দাদা ঘরে এসে পয়লা কথা কি বলে জানিস ? মনসা এসেছে —উ খেঞেছে। ত তুর লেগে যে রোজ রোজ ভাত দিঞে আমি—সেইটি ভিখ মনে করছিস। এত নিমখারাম তুঁই। আঁৎ কলজা ছিঁড়া ভালবাসার এই দাম। মনে হছে ঝাঁটার বাড়িতে তুর মু ভেঙে দিই।

সহসা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। যে মনসারামের নামে মালিকদের পোষা পালোয়ান চাপরাসীরা থরহরি কম্পমান ঝাঁটা মেরে তার মুখ ভেঙে দেবার কথা কে বলতে পারে ?

মুখ ফসকে আলগা কথা বেরিয়ে যাওয়ার পর শান্তি মরমে মরে গেল।

দুই হাঁটুতে দুই হাত রেখে মুখ নিচু করে বসেছিল মনসা। শান্তি ওর মাথার চুলগুলো ধরে টেনে তুলল। ব্যাকুল ভাবে বলল—মনসা! তুঁই রাগ করলি মনসা।

মনসা উত্তর দিল না। শান্তি আরো ব্যাকুল হয়ে উঠল। ওকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল—মনসা! তুঁই আমার সঁথে কথা বলবি নাই। হু হু করে

কেঁদে উঠল।

মনসা বলল—অত কাঁদিস না ভোজী। তুদের সঁথে কথা বলাই দায়। হয় হাসবি—না হয় কাঁদবি আর চেঁচাবি। চুপ করত।

সজনী বলল—দাদা তুমি টাঙ্গা ফাঙ্গার মতলব ছাড়। ঘোড়াটিকে আমি পগার পার করে দিঞে আসছি। তুমি উঠ। এমন করে হাপসে যেও না। বউটি একা তুমার লয় সে আমাদেরও ভোজী।

মনসার জঙ্গী বন্ধুরা বিশেষ কিছু বলেনি। মেয়েরাই যখন হেসে কেঁদে আসর কাদা করে দিয়েছে তখন আর ওরা কি বলবে? ভরত ও কালো ফুক্ ফুক্ করে বিড়ি টানছিল।

সুখটান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে কালো উঠে দাঁড়াল। গলা উঁচু করে বলল—এই মেয়্যাগুলন যা ভাগ। ঘরকে যা। শ্যালা যেখানে মেয়্যা সেই খানেই কান্নাকাটি কচ্‌কচানি।

মেয়েজাত কি অত সহজে যাবার বটে? তবে ওরা চুপ করল।

কালো আবার বলল—ওরে মনসা যার যেটি সাজে তাকে সেইটিই করতে হয়। আজ যদি উল্টা করতে যাস তবে মেয়্যার মার খেতে হবেক।

মনসা বলল—তুরা আমার কথাটি বুঝলি নাই।

বৃদ্ধ ইরফান আলী বলল—দ্যাখ বাপ হেরে যাস না। যে লড়াই লাগু করেছিস তা চালাঞে যা। যেদিন তুর ইউনিয়নের ঝাণ্ডা উড়বেক সেদিন বেবাক কষ্ট ভুলে যাবি।

মনসা বলল—সবই বুঝি চাচা কিন্তুক সংসার চলবেক কি করে?

—তুর সংসার কি একা তুরই? তুই যে এত এত কুলি-কামিনের জান মান বাঁচাবার কাজ করছিস ত কুলি-কামিনরা তুর সংসার দেখবেক নাই? ভাবিস না। উঠ। এমন মনগুমানে বসে থাকিস না। এগে বাহু মনসাকে খেতে দেগা। চল রে—তোরা সব আপন আপন ঘরকে চল।

আটাম্ন

শীতের সকালে কাবেরী কুটিরের বাগানে বেগুন, টমাটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও পালংশাকের ছোট ছোট পিটালিতে সবুজ পাতার সমারোহ। ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে, পাতায় পাতায় শিশির টলমল করছে।

এক ঝাঁক শালিখ পাখী জোড়ায় জোড়ায় বসে কিচির মিচির করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, খুঁটে খুঁটে শস্যদানা সংগ্রহ করছে।

লাল রঙের একটি আলোয়ান গায়ে দিয়ে খালি পায়ে সরিতা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বাগানে। দৃশ্যটি ওর খুব ভালো লেগে গেল। ইঁদারার সিমেন্ট বাঁধানো

বেদীতে বসে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ উপভোগ করতে লাগল প্রকৃত ভাবুকের মত।

সে এখন পরিপূর্ণ যুবতী। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটি ভালবাসার নিখাদ রসে টইটম্বুর। ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার বার্তা নিয়ে দিন কয়েক আগে কলকাতা থেকে ফিরেছে।

ঠিক তখনই এক দারুণ রূপবান যুবক ঘোড়সওয়ার, দারুণ খুশির বার্তা বুকে নিয়ে ধানবাদ থেকে ছুটে আসছে কাবেরী কুটিরের দিকে। তার নাম রবার্ট টেলার।

রূপকথার রাজপুত্রের মত ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করে ছুটে এল। লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়াল।

ওকে দেখেই ছুটে এল সরিতা। প্রকাশ্য দিবালোকে মোরাম বিছানো পথের উপর একেবারে ইউরোপীয়ান কেতায় সরিতার একটা হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করল রবার্ট। আবেগ উচ্ছল কণ্ঠে বলল —হ্যাল্লো ডারলিং!

—হাই রবার্ট! আমি প্রতি মুহূর্তে তোমাকে আশা করছিলাম।

-- আমার চিঠি পেয়েছো ?

—ওঃ সিওর। এসো—ঘরে এসো।

খাটাল থেকে মতি সিং, রান্নাঘর থেকে টুসী, আড়াল আবডাল থেকে তাদের ছেলেমেয়ে এবং বসবার ঘর থেকে কাবেরী সেই দৃশ্য দেখে থ'। কাবেরী একেবারে বোবা বনে গেছে। একি ব্যাপার ? তার মেয়ের একি কাণ্ড ? অত ভদ্র, মার্জিত ও শিক্ষিত মেয়ের গোপন প্রণয় ? কিন্তু কি দারুণ রূপবান তার প্রেমিক।

টুসী ছুটে এসে কাবেরীকে বলল—ও দিদি! হাঁ করে দেখছেন কি ? বর এসেছে। শাঁখ বাজান।

—দূর মুখপুড়ি! চুপ কর।

—আমি চিনেছি গো দিদি। নওরঙ্গী বাংলোতে ওদের মেলামেশা দেখেই আমার মনে খটকা লেগেছিল। তারপর সাহেবও চলে গেল। সরিতাও চলে এল। কিন্তু ধন্যি মেয়ে। এতদিন ধরে প্রেমটিকে জাগিয়ে রেখেছে।

—তবে আমাকে এতদিন বলিসনি কেন ?

—বলবো কি ? ভুলেই গিয়েছিলাম।

বরার্টকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে সরিতা ওর মায়ের কাছে এল। কেমন ব্রাড়াবনত, দ্বিধাগ্রস্তভাব। কিছু বলতে যাচ্ছে—পারছে না।

টুসী বলল—এইটি সেই সাহেব—নাকি রে সরিতা ?

—হ্যাঁ মাসী।

কাবেরী বলল—এত কথা আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলি সরিতা।

—বললে যে তুমি ভেবে মরে যেতে মা।

—ও তোকে বিয়ে করবে ?

—হ্যাঁ মা।

—ওঃ।

—তোমার কিছু আপত্তি নেই ত মা ?

—এ্যাঁ! না-না! আপত্তি কিসের ?

—মনে হচ্ছে তুমি খুশি হও নি মা।

—কে বললে ? না-না। আমি খুশি হয়েছি।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ রে সত্যি! তুই খুশি হলে আমি হব না ?

—তবে তুমি হাসছো না কেন ?

—হাসছি তো। আবার কেমন করে হাসবো ? এমন রূপবান গুণবান ছেলের সাথে তোর বিয়ে হবে। এতে কি আমি না হেসে থাকতে পারি ?

হাসির পরিবর্তে ওর চোখ দিয়ে যা পড়ল তার নাম বিশুদ্ধ অশ্রুজল।

—তুমি কাঁদছো কেন মা ?

টুসী ধমকে উঠল—এত কিসের কেন কেন করছিস ? যা গল্প কর গে। আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

ওকে একরকম ঠেলেই বের করে দিল।

কাবেরীকে ধরে পালঙ্কের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল—কাঁদবেন না দিদি। জীবনে ত কখনও কারো ক্ষতি করেননি তাই ভগবান আপনাকে এই পুরস্কারটি দিলেন।

কাবেরী কান্না জড়ানো বিকৃত কণ্ঠে বলল—ওরে টুসী। আমি যে ভাবতে পারছি না রে যে ঐ ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে। এযে আকাশের চাঁদ রে।

—আপনার মেয়েও তো কম নয় দিদি। ওর মালা যে পরবে তাকেও ত যোগ্য হতে হবে। উঠুন। মুখে জল দিন।

কিছুক্ষণ পর সরিতা কাবেরীকে ধরে টেনে নিয়ে গেল রবার্টের কাছে। পরিচয় করিয়ে দিল—আমার মা।

রবার্ট উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। যদিও রবার্ট খুব স্মার্ট ছোকরা কিন্তু এখন কেমন ন্যাকা হয়ে গেছে।

গলা ঝেড়ে বলল—মাদার আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। মানে আমরা ছ'-বছর আগে পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমি সরিতাকে বিয়ে করব।

ওর ইংরেজী ভাষ্যের বাংলা তর্জমা সরিতাই করে দিল।

কাবেরী তখন মায়ের ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল।

বলল—বিয়েটা কখন হবে ?

—আমি ইণ্ডিয়াতে চাকরি নিচ্ছি। বাবা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দু'চার দিনের মধ্যে ডিউটিতে জয়েন করব। কিন্তু এখনই ম্যানেজারের পোস্ট পাচ্ছি না।

—কেন ?

—এই ত এবছরই মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি। কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তারপর ম্যানেজার হতে পারব। তখন বড় বাংলো, গাড়ি, আয়া মালি চাকরবাকর সবই পাবো। আমার ইচ্ছা ম্যানেজার হওয়ার পরেই বিয়ে করব। কারণ আমার ইণ্ডিয়ান ওয়াইফ নিয়ে বাবার সঙ্গে থাকতে চাই না।

কাবেরী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কিছু বলল না। কিছু একটা ভাবনায় ডুবে গেল।

সরিতা বলল—তুমি যে কিছু বলছো না মা ?

—কি বলবো ?

—রবার্ট তোমার অনুমতি নিতে এসেছে।

—বেশ। অনুমতি দিলাম।

—সো কাইণ্ড অফ ইউ মাদার।

রবার্ট উঠে দাঁড়িয়ে আবার বাউ করল।

মিঃ ব্যারাকলউ তখন তীব্র অবসাদে ডুবে গেছেন। তাঁর ব্লাড প্রেসার ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। মিঃ ক্রীগ খবর এনেছেন। মিসেস ব্যারাকলউ, সিসিল ও এলিজা যৌথভাবে তাঁদের ব্যাঙ্কারকে চিঠি দিয়েছেন—তাঁরা তিনজনে ভারতের পানমোহরা ও নওরঙ্গী কোল কোম্পানীর ন্যায়সঙ্গত অংশীদার। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুন ভারতেও কয়লার বাজারে মন্দা চলছে। বিশেষ করে নওরঙ্গীর কয়লা নিকৃষ্ট মানের। বাজারে বিক্রি হয় না। ক্ষয়-ক্ষতি এড়াবার জন্য তাঁদের ম্যানেজিং ডাইরেকটার মিঃ ব্যারাকলউকে নওরঙ্গী বন্ধ করে ব্যয় সঙ্কোচ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। ফলত আমাদের কোম্পানী বিপুল ক্ষতি স্বীকার করছে। পঁচাত্তর শতাংশের অংশীদার হয়ে আমরা তা হতে দিতে পারি না। ব্যাঙ্কে আমাদের যে মূলধন সঞ্চিত আছে তা দেশের কাজে বিনিয়োজিত। তা ড্রেন আউট হয়ে যাক এটাও কোন ইংলণ্ডবাসী চাইবেন না।

তাই পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ড ব্যাঙ্কের টাকা যেন ভারতে

না যায় তার ব্যবস্থা করতে ব্যাঙ্কারকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সেই চিঠির অনুলিপি মিঃ ব্যারাকলউকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঁর তা পড়ে দেখবারও ধৈর্য নেই ভিতরটা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে। জীবনে ধিক্কার এসে গেছে।

এ যে কি আক্ষেপ তার বুঝি কোন পরিমাপ হয় না আজ যখন জীবনের আয়ু শেষ হয়ে আসছে। তখন প্রদীপের তেলটুকুও লুঠ হয়ে গেল। এবার সল্‌তেটুকু পুড়ে শেষ হয়ে গেলেই একটা কর্মব্যস্ত জীবনের নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি।

মরণকালে এই আঘাত পাবো বলেই সারাটা জীবন টাকার পিছনে ছুটেছি? কি পেলাম? টাকা নেই। বিষয়-সম্পত্তির পঁচিশ শতাংশের অংশীদার মাত্র। নামেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ওঃ! এমন করে কেউ কখনো নিজের পায়ে কুড়ুল মারে? কেন তিনি দু' দুটো কোল কোম্পানির অংশীদার করেছিলেন তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদিকে? ওরাই তো আজ সাপ হয়ে দংশন করল।

অথচ কত স্নেহ মমতার বাঁধন দিয়ে গড়া এই সম্পর্ক। সব টুটে ফেটে একাকার। আজ তাঁর জীবনে স্নেহ-ভালবাসারও একটু অবলম্বন নেই। এত হতভাগা কেউ আছে? এমন স্বজনহীন, নিঃসঙ্গ!

বারান্দায় বসে ঘোলাটে চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এখান থেকেই দেখা যায় নওরঙ্গীর আকাশচুম্বী ইঁটের চিমনিটা। গল্‌গল্ করে ধোঁয়া উঠত। স্বপ্ন ও সাধ রূপায়নের ছবি ফুটত। আজ সেই ছবিটা মুছে গেছে। চিমনিটাকে মনে হচ্ছে ইঁটের পাঁজা। চিমনির ধোঁয়া মানে তাঁর নাকের নিঃশ্বাস। ইঞ্জিনের শব্দ মানে তাঁর হৃৎপিণ্ডের শব্দ। ওগুলো যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন তাঁর শরীরের হৃদ্‌যন্ত্রই বা কেন চলছে?

একজন কর্মযোগী পুরুষের কাছে এ যে কি ভয়ঙ্কর গ্লানি তার মূল্যায়ন কে করে?

একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। তিনি সেদিকে কান দিলেন না। বস্তুত চোখ ও কানের ক্ষমতাও ত কমে গেছে। তাই ভাল বুঝতে পারেননি। আর কিছু দেখার মনোযোগটাও ত হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটি সাহেব ডাক তাঁর আকাশ-বাতাস তোলপাড় করে দিল। এই কণ্ঠস্বর তাঁর মর্মে-মর্মে গাঁথা আছে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাগলের মত দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

মাই ডারলিং!

সাহেব ওকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন বেডরুমে। কি অসীম ব্যাকুলতা তাঁর চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে। হাত দুটোও কাঁপছে।

—কাবেরী! মাই ডারলিং। কতদিন পরে তুমি এলে!

কি রকম অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল ওঁর আচরণ। কাবেরী বলল—সাহেব! তুমি এমন পাগলের মত করছো কেন?

—তুমি জানো না কাবেরী, আজ এই মুহূর্তে আমি কি গভীর হতাশায় ডুবেছিলাম। তা থেকে টেনে তোলার সাধ্য তোমার নেই। কিন্তু এই যে একটা মুহূর্তের আনন্দ। এই যে তুমি এসেছো—আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

কাবেরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল একদা বলবান, বুদ্ধিমান, অসাধারণ কর্মক্ষম মানুষটির লোল চর্ম, স্তিমিত দৃষ্টি, পক্ক-কেশ, স্খলিত দন্ত, কম্পমান দেহ। এই বৃদ্ধ ব্যারাকলউ সাহেবকে দেখতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল।

বলল—সাহেব! এত বুড়ো হবার বয়স তো তোমার হয়নি। তাহলে এমন হয়ে গেলে কেন? কি হয়েছে তোমার?

—সে অনেক কথা কাবেরী। তা শুনলে তুমি হয়তো কেঁদে ফেলবে।

—অসুখ করেছিল বুঝি?

—অসুখ তো আছেই। অসুখকে অবলম্বন করেই ত বেঁচে আছি। না হলে মরে যেতাম। এ হচ্ছে তার চেয়েও বেশি। আজ আমার সব থাকতেও কিছু নেই। একটা ধনীলোক হঠাৎ গরিব হয়ে গেলে সে কী করে কাবেরী?

এই অভিজ্ঞতাটা কিছুদিন আগেই সে পেয়ে গেছে। জয়ের মত একটা শক্তসমর্থ মানুষও আত্মহত্যা করতে চায়। তাহলে ওকে কাপুরুষ বলে ভৎর্সনা করেছে কি জন্য? এ যে প্রকৃতির নিয়ম। বিত্তশালীর বিত্তনাশ সব দুঃখের বড় দুঃখ। ও কোন উত্তর দিল না।

সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন—যাকৃগে ওসব কথা। তুমি কেমন আছো?

—ভালো আছি সাহেব। একটা খবর এনেছি। সরিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

—মাই গড! সরিতার বিয়ে! কোথায়? কার সঙ্গে?

—তুমি তাকে চেনো সাহেব। টেলার সাহেবের ছেলে রবার্ট।

—রবার্ট! হ্যাট আর্টিস্ট বয়! সে সরিতাকে বিয়ে করবে? নাইস! ভেরী নাইস! মার্ভেলাস ম্যাচিং। ওহ্ মাই লর্ড। ইউ আর সো গ্রেসিয়াস!

সাহেবের চোখে-মুখে খুশির খোয়াব।

কাবেরী বলল—তুমি খুশি হয়েছো ত সাহেব?

—হ্যাঁ। খুব খুশি হয়েছি। দুঃখের বোঝায় আমি ভেঙে পড়েছিলাম। এই একটি খুশির খবরে তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে। বিয়ের দিন কি ঠিক হয়েছে?

—না। রবার্ট ম্যানেজার হওয়ার পর বিয়ে করবে বলেছে।

—দ্যাটস গুড আইডিয়া।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কাবেরী বলল—তুমি ত জানো সাহেব আমার অনেক গয়নাগাঁটি আছে। তোমরাই দিয়েছো। তুমি, জয়, জমিদার-বাবু। তাছাড়া মুজরো করতে গিয়েও পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু কিছু গয়না-গাঁটি সরিতার পড়ার খরচ দিতে বিক্রি হয়ে গেল।

সাহেব বললেন—তা কেন করলে? পানমোহরার টাকায় কুলোয়নি বুঝি?

কাবেরী বলল—সে টাকা ত বন্ধ হয়ে গেছে সাহেব।

—সে কি? সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

—হ্যাঁ সাহেব। গত একবছর যাবৎ ওর পড়ার খরচ, আমার হাত খরচ, মতি সিং ও টুসীর বেতন সব ত বন্ধ আছে।

—মাইগড! কে বন্ধ করেছে?

—মিঃ ক্রীগ।

—তবু তুমি আমার কাছে আসোনি? মানে লেগেছে তাই না? এত জিদ কিসের তোমার? কাবেরী কেমন হয়ে গেল! স্তিমিত কণ্ঠে বলল—সবদিকেই ত ব্যয় সঙ্কোচ হচ্ছে। তাই মনে করেছিলাম তুমি হয়তো বলেছো।

সাহেব থম্‌কে গেলেন। সটান্‌ উঠে দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে গর্জন করলেন—ইউ ফাকিন উওম্যান! আমি আমার মেয়ের পড়ার খরচ বন্ধ করে দেবো? তাও ঐ ব্রিলিয়্যাণ্ট স্কলারকে? তুমি আমাকে এত ছোট মনে কর?

কাবেরী থর থর করে কেঁপে উঠল। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল—আমার ভুল হয়ে গেছে সাহেব।

—ভুল নয়। এটা তোমার ইচ্ছাকৃত। গয়না বিক্রি করে লেখাপড়া শিখিয়েছো। বিয়ের কথা পাকা করেছো। তারপর খবর দিতে এসেছো। ভাবটা এই যে দ্যাখো, তুমি সাহায্য না করলেও মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়তে পারি। যেন একটা চ্যালেঞ্জের জবাব। এ তোমার অহঙ্কার। যতই বিনয় দেখাও আসলে তুমি আমার চেয়েও অহঙ্কারী।

গট্‌ গট্‌ করে চলে গেলেন। কাবেরী থ' হয়ে বসে রইল। একি ছন্দপতন! হিতে বিপরীত হয়ে গেল। হে ঠাকুর! এ তোমার কি পরীক্ষা?

অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর মনে পড়ে গেল সাহেবের শরীর ত রোগে ঝাঝরা হয়ে আছে। এত রাগ করলে আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না ত। উঠে দাঁড়াল। এঘর সেঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল। একটা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

দেওয়ালে টাঙানো মানুষ সমান লর্ড যীশাস ক্রাইস্টের তৈল চিত্র। নীচে

সারি সারি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি। ঘরভরা সুরভিত ধূপের গন্ধ। তার সামনে হাঁটুতে ভর দিয়ে দুটি হাত আড়াআড়ি ভাবে বুকের উপর রেখে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন উনি। চোখদুটি বোজা এবং মোমের আলোতে চিক্ চিক্ করছে দু'ধারা অশ্রু।

কাবেরী স্তব্ধ হয়ে গেল। সাহেবের এই ধ্যানগম্ভীর মূর্তি জীবনে কখনও দেখেনি। অভিভূত বিস্ময়ে নীরবে, নিঃশব্দে পাথর প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বুকে ক্রশ আঁকলেন। কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রভুর কাছে একটু শান্তি প্রার্থনা করতে এসেছিলাম।

—বেশ করেছিলে।

—চারিদিকে বড় অশান্তি। মনটা খিজিবিজি হয়ে আছে। এসো ও ঘরে বসি। কাবেরীকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে বসলেন। কাবেরী একটা চেয়ার নিয়ে ওঁর সামনে বসে বলল—এত রেগে গেলে কেন সাহেব? আমি কি দোষ করেছি? সাহেব ম্লান হেসে বললেন—কিছু মনে কোর না কাবেরী। আজকাল আমার কোনটা যে রাগ আর কোনটা ভালবাসা তাই বুঝি না। আমার সঙ্গে কে না বেইমানি করেছে?

—কে কি করেছে তা জানি না সাহেব। কিন্তু আমি কখনও বেইমানি করিনি।

—তুমিও করেছো।

কাবেরী চমকে উঠল—সেকি সাহেব?

—হ্যাঁ। ভেবে দ্যাখো কি অসীম যন্ত্রণায় আমি দিন কাটাচ্ছি। এসব ভুলতে পারতাম যদি তুমি আমার পাশে থাকতে। কিন্তু কি করলে তুমি? মেয়েটিকে পর্যন্ত আসতে দিলে না।

কাবেরী মাথা নিচু করে আঙুল দিয়ে শাড়ির আঁচল পাক দিচ্ছিল। অনেক কষ্টে বলল—তার জন্য আমাকে দোষী কোর না সাহেব।

—তবে কাকে বলব? জয় তোমাকে বারণ করল আর তুমি তা মেনে নিলে? এতটা পতি আনুগত্য কখন থেকে হল? কি করে হল?

—সে তো আমার স্বামী সাহেব। তার কথা কি করে অবহেলা করব?

—তবু যদি সে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে না যেত তাহলে আরো কি করতে?

—সে আবার ফিরে এসেছে সাহেব।

—রাসকেল!

গালিটা কাবেরীর বুকে গুম্ করে লাগল। মুখটা মলিন হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো শক্ত করে বলল—রাসকেল তো বটেই। না হলে কেউ বেশ্যাকে বিয়ে করে।

—লোভে পড়ে করেছে আখের গুছোবার জন্য। তোমার ভালবাসাকে ক্যাশ করেছে টাকা লুটবার জন্য।

—সে সুযোগ তুমিই তাকে দিয়েছো। আমাকে বিয়ে করার জন্য তার কোন তাগিদ ছিল না। তোমারই অবৈধ সন্তানকে তার ঘাড়ে চাপাবার জন্য তুমি উঠে পড়ে লেগেছিলে। এখন আর ওসব কথা বলে কি লাভ?

—কিন্তু আমি তো তাকে চুরি করতে বলিনি। আমার অফিসার-দিকে নষ্ট করতে বলিনি।

কাবেরী হাসল। বাঁকা হাসি। বলল—তোমার অফিসাররা কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয় সাহেব। ওরা যে পিপে পিপে মদ খেত তার টাকা কোথা থেকে আসত? বেতনের টাকায়? তারপরেও ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখত কোন বাপের জমিদারী থেকে? আর জয় হল চোর!

—সে আমার মেয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।

—সে একা নয়। সাহেবরাই ছিল নাটের গুরু। জয় বোকা তাই তাকে কাজে লাগিয়েছিল ওরা। সাহেব কুটিল হাসি হেসে বললেন—তবু তুমি স্বীকার করবে না যে জয় অন্যায় করেছে।

—তা কেন বলব না? এটা সে অন্যায় করেছে। গর্হিত কাজ করেছে। তার জন্য শাস্তি ত কম দাওনি সাহেব। ওর জমি কেড়ে নিয়েছো। শিকড়-বাকড় শুদ্ধ তুলে ফেলে দিয়েছো। ফৌজদারি আসামী করে গলায় মামলা গেঁথে দিয়েছো। লাখ টাকার পাওনা আটকে দিয়েছো।

—সেজন্য ও মামলা করেছে তা তুমি জানো?

—জানি।

—তোমার কি মনে হয় মামলায় জিতবার মত কাগজপত্র তার আছে?

—আমি ত জজ ম্যাজিস্ট্রেট নই সাহেব যে অত জানবো।

সাহেব বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললেন—মনসারামকে জেল থেকে কে ছাড়িয়ে এনেছে?

কাবেরী দৃঢ় কণ্ঠে বলল—আমি।

বিস্মিত কণ্ঠে সাহেব বললেন—তুমি? শেষে তুমিও আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে?

—শত্রুতা কেন করবো? আমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

উনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—কি? কি বলতে চাও তুমি?

—সাহেব! যাকে জন্ম দিয়েছো তাকে স্বীকার করে নিতে না হয় তোমার মানে লাগছে! কিন্তু তার উপরে অত্যাচার না করলেও পারতে। বিবি-বাথানের জারজ প্রজন্ম আজ কুলিবাথানের কয়লা কুলি। তুমি এবং তোমার মত সাহেবরাই তাদের মা দিকে ভোগ করে আস্তাকুঁড়ে ফেলে

দিয়েছো। চরম লাঞ্ছনার মধ্যে তারা যখন প্রতিবাদী হয়ে উঠল তখন তোমরা অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিলে।

—চুপ করো। ওরা সব দাগী ক্রিমিন্যাল। মনসারাম তাদের সর্দার। সাহেব যেমন অধৈর্যভাবে বললেন কাবেরীও তেমনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল —না। ক্রিমিন্যাল নয়। তারা শোষিত ও নির্যাতিত। মনসারাম তাদের নেতা। যদি পারো তাদেরকে কাছে ডেকে নাও। তাদের দুঃখ দুর্দশা মোচন কর। পিতার কর্তব্য ত কোনদিন পালন করনি। কি বুঝবে তার মর্ম।

রাগে ক্ষোভে মিঃ ব্যারাকলউয়ের মুখটা গস্ গস্ করছিল।

বললেন—আজ পর্যন্ত কেউ আমার মুখের উপর এমন চোপা করতে পারে-নি। তুমি আজ তৈরি হয়েই এসেছো।

কাবেরী ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার দোষ ত্রুটি মার্জনা করবে সাহেব। আর তোমাকে বিরক্ত করব না। যদি অনুমতি দাও তবে আমি চলে যাবো।

সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—তোমাকে আমি শান্তশ্রী প্রেমময়ী নারী রূপেই দেখেছি। তাই তোমার জালাময়ী মূর্তিটা সহ্য হচ্ছে না। তুমি যাও। পরে একদিন আমিই যাব তোমার কুটিরে।

উনষাট

কাবেরী চলে যাবার পরেও মিঃ ব্যারাকলউয়ের মাথাটা দপ্ দপ্ করছিল। একি হল? আজ কাবেরীও তাঁকে এত কড়া কথা বলতে পারাল? যত কথা বলেছে তার ভিতরে আরো না জানি কত কথা আছে। তাহলে সেও তাঁকে ঘৃণা করছে। না হলে এত জালা কি করে সঞ্চিত হয়?

কয়েকটি জলন্ত প্রশ্ন ওর অন্তরে ফুটে উঠেছে প্রেম ও ঘৃণাকে কেন্দ্র করে।

তখন এলেন মিঃ ক্রীগ। একটা ফাইল ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন —আজকের ডাকে মিসেস ব্যারাকলউয়ের চিঠি আছে।

উনি উদাসীনভাবে বললেন—রেখে দিয়ে যাও।

আগে মিসেসের চিঠি এলে উনি ব্যগ্র হাতে তা খুলতেন আজ সে উৎসাহ নেই। তবু একসময় খুলতে হল। মিসেস লিখেছেন—

ডিয়ার, ব্যাঙ্ক একাউণ্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তোমার অসুবিধা হবে জানি। তবু আমাদিকে এটা করতে হল কারণ একটা লুজিং কনসার্নকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টেনে নিয়ে যেতে পারি না।

তোমারও বয়স হয়েছে এ সময়ে নূতন করে কিছু করতে গেলে তা পেরে-

উঠবে না। আমিও খুব ক্লান্ত। এ সময়ে তুমি যদি হোমে ফিরে আসো তবে আমরা দুজনে সমুদ্রের ধারে কোন কটেজে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

সিসিল যাচ্ছে তোমাকে নিয়ে আসার জন্য। প্লিজ ওকে ফিরিয়ে দিও না। তুমি এসো ডিয়ার।

এক লাখ টাকার একটি চেক পাঠালাম। শেষ সময়ে তোমার বিজনেস গুটিয়ে নেবার জন্য কাজে লাগবে।

চিঠি ও চেক খামে পুরে রেখে দিলেন। ভাবনার গতি অন্য দিকে মোড় নিল। আবার সেই আলখাল্লা পরা বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হল।

পরদিন সকালে তিনি তাঁর গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললেন—দেউলটি চল।

যেন দেউলটি খাদের চারশো সতেরোটি মৃতের প্রেতাত্মা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পিটটপের সামনে। বন্ধ কলিয়ারীর দৃশ্যটি বড়ই উদাস। লোক নেই, জন নেই, চারিদিক ধূ ধূ করছে। মরচে ধরা লোহার পাত, ট্রামলাইন। সেই ডুলি, হেডগীয়ার, বয়লার স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে। সব নীরব, নিস্তব্ধ।

চালু কলিয়ারীর কত প্রাণ চাঞ্চল্য। হরদম বয়লারে স্টীম হয়, ফ্যান চলে, ডুলি চলে, লোকজন কাজ করে। সব সময়ে সশব্দ ব্যস্ততা।

মিঃ ব্যারাকলউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেলিংয়ের উপর হাত রাখলেন। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়ে চানকটি দেখলেন। চারিদিকে ঘুরলেন। যেন বা কোন মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন।

খবর পেয়েই মিঃ ব্রাউন এলেন। গাড়ি থেকে নেমেই লাফ দিতে দিতে সিঁড়ি ভেঙে কাছে এসে গুডমর্নিং করলেন। মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর লম্বা, শীর্ণ শিরাওঠা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—চলুন। অফিসে বসা যাক।

অফিসে বসে মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—আমি এই দেউলটি রিকোভারী নিয়ে খুব ভাবছি। আগে যে প্রোগ্রাম করেছিলাম তা টাকার জন্য আটকে গিয়েছিল। এখন আমি মিসেসের কাছ থেকে এক লাখ টাকার একটা চেক পেয়েছি। যদিও সেটা উনি ইণ্ডিয়ার বিজনেস গুটিয়ে নেবার জন্য পাঠিয়েছেন কিন্তু দেউলটির ভিতর মৃতদেহগুলি সৎকার না করলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

মিঃ ব্রাউন বললেন—খাদ জলে ভর্তি হয়ে গেছে। আগুন নিভে গেছে। সমস্যা বলতে ফাউল গ্যাসটা।

—আপনি ওয়েস্ট জার্মানী যান। কয়েকটা প্রিডিং অ্যাপারাটাস কিনে নিন আর একজন রেসকিউ অপারেশনের ট্রেনার নিয়ে আসুন। বাকী কাজগুলো আমরাই করে নিতে পারবো।

—এক লাখ টাকাতে তো হবে না স্যার।

—আরো টাকার যোগাড় করব। আমার ব্যাক্তিগত একাউন্ট এবং জমিদারী সেরেস্তায় কিছু টাকা আছে। বাকী ধার করব। কি বলেন?

—ও. কে. স্যার।

তারপর দুই বিশেষজ্ঞ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার বসে গেলেন একটা ঐতিহাসিক রেসকিউ ও রিকোভারী অপারেশনের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে। দেউলটি কলিয়ারীতে সাফ সুতরো, ঝাড় পোঁছ করার কাজ চলছে। অফিসে নূতন করে চূনকাম, রাস্তাঘাটে মোরাম দিয়ে মেরামত করা, মরচে পড়া যন্ত্রপাতি গুলিতে তেল গ্রিজ দেওয়া, বয়লারের নূতন প্যাকিং ও পাইপ লাইন মেরামতির কাজ চলছিল।

পানমোহরার ম্যানেজার আপাতত এসব কাজ দেখছেন, একজন মিস্ত্রী ও ওআরম্যানকে সারাক্ষণের ডিউটা দেওয়া হয়েছে। দামু ঘোষকে মোটা টাকা বকশিশ দিয়ে বিদায় করেছিলেন তাঁকে আবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

দেলউটি পুনরায় খোলা হবে এটা একটা খবর। চারিদিকে গুঞ্জন উঠছে। অনেক বরখাস্ত কর্মী ছুটে আসছে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। একটা নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে।

মিঃ ব্যারাকলউ সকালেই এসে অফিসে বসছেন। লোকজন, সাহেব সুবোর আনাগোনা হচ্ছে। ওতেই ওঁর মনের শূন্যতা কেটে গেছে।

এখন ওঁর একটাই বড় দুর্ভাবনা—তা হচ্ছে খাদে যদি বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ অত্যধিক হয়ে থাকে তবেই মুস্কিল।

অবশ্য মিঃ ব্রাউন রেসকিউ অ্যাপারাটাস আনার জন্য রওনা হয়ে গেছেন। উনি ফিরে এলেই সীল ভাঙবেন।

আনুষঙ্গিক প্রস্তুতিতেই পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। আরো যে কত হবে তার অনুমান করা সম্ভব হবে খাদের সীল ভেঙে পরিদর্শন করার পর।

এখন টাকার বড় অভাব। কোটি টাকার মালিক হয়েও তাঁকে ঋণের জন্য হাত পাততে হবে। তাতে উনি পিছপা নন। সিদ্ধান্ত যখন হয়ে গেছে তখন কাজ হবেই।

উনি স্মরণ করছেন সেই পানমোহরার দিনগুলি। তখন একটি মেয়ে প্রেমে ভালবাসায় তাকে এমনভাবে ভরে দিয়েছিল যে তাজা ঘোড়ার মত এক অদম্য শক্তিতে সব বাধা অতিক্রম করেছিলেন। জয় গোপাল নামে এক মুনশী জান কবুল করে কাজ করেছিল।

আজ সেই চরিত্রগুলি হারিয়ে গেছে। তাঁকে এবার নূতন প্রজন্ম থেকে লোক তৈরি করতে হবে। এই জরাজীর্ণ শরীর নিয়ে তা করা যে কত কঠিন তা উনি বেশ বুঝতে পারছেন।

সেদিন বয়লার হাউসে পৌছে দেখলেন জান মহম্মদ মিস্ত্রী ও একজন ফায়ারম্যান বয়লারটাকে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রেখেছে। দুটো কম বয়সী সাঁওতাল কামিন বয়লারে কয়লা রাখছে। একজন পুরোহিত যন্ত্রদেবতাকে পূজো দিয়ে সিঁদুর লেপছেন।

জানমহম্মদ বলল—সব রেডী আছে সাহেব।

উনি হুকুম দিলেন—ফায়ার।

বেলচা ভর্তি জলন্ত কয়লা ফার্ণেসে ভরে দিল বয়লার ফায়ার ম্যান। দেখতে দেখতে গন্‌গনে আগুন জলে উঠল এবং চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুল।

আঃ! এই ধোঁয়া—পূত পবিত্র যজ্ঞ ধূম। শিল্প বিপ্লবের পাদপীঠে এর কি তুলনা আছে? বড়ই প্রসন্ন হলেন।

হুকুম দিলেন—বয়লারের ধোঁয়া যেন বন্ধ না হয়। যে আগুন আজ জ্বালা হল তা যেন নিভে না যায়।

মিঃ ব্যারাকলউ যখন দেউলটি খাদ পুনরুদ্ধারের জন্য মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তখন এলেন সিসিল মেমসাহেব। তিনি এবার প্ল্যান করেই এসেছেন মিঃ ব্যারাকলউকে হোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু প্রথমবার এসে যেমন বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার কণা মাত্রও পেলেন না। মিঃ ব্যারাকলউ ছিলেন অতিরিক্ত শীতল। কোন উচ্ছ্বাস বা উত্তাপ তাঁর ব্যবহারে ছিল না। সদা সর্বদা দেউলটি নিয়েই ব্যস্ত। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হত ডিনার টেবিলে। কথাবার্তা খুবই কম। নেহাৎ সৌজন্য ও শিষ্টাচারটুকু বাদ দিয়ে অন্য কোন কথা হত না।

অথচ আগে পিতাপুত্রী এক ঠাঁই হলেই কথাবার্তা, হাসি ঠাট্টায় মাত হয়ে যেত, দিলখোলা পুরুষ তিনি। বৃটিশ চরিত্রের রক্ষণশীলতাও তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি হা-হা শব্দে হাসতেন।

এখন একেবারে টাইপ বৃটিশ চরিত্র বনে গেছেন।

এই অবস্থায় সিসিলের দম বন্ধ হবার মত হয়ে গেছে। তিনি বড়ই বিমর্ষ এবং গম্ভীর হয়ে গেছেন।

তখন ওঁরা পানমোহরা বাংলোতে আছেন।

মিঃ ব্যারাকলউ বেলা দেড়টার সময় লাঞ্চ সারলেন। কড়া করে সেঁকা দু' পিস পাউরুটি, একটু চিকেন এবং দু' আউন্সের মত ফলের রস। একজন খানসামা ওষুধ দিয়ে গেল। উনি তা খেলেন।

ওঁর প্রিয় বারান্দাটিতে চেয়ার পেতে আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরুবার জন্য তৈরি। সিসিল এসে কাছে দাঁড়ালেন।

বললেন—তুমি কি করছো ড্যাডি?

—কেন? কি করেছি?

—আবার কলিয়ারী যাচ্ছো। একটু বিশ্রাম পর্যন্ত নিলে না। ডাক্তার তোমাকে বাংলোর বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। আর তুমি ম্যানেজারদের মত দু'বেলা ডিউটি শুরু করে দিলে।

উনি হেসে বললেন—তোমাদের ডাক্তারগুলো আমার অসুখ ধরতে পারেনি। কাজ না থাকাটাই আমার অসুখ। এই যে কাজ শুরু করেছি আর কিছু হবে না।

—না। প্লিজ। আমি তোমাকে চারটের আগে বেরুতে দেবো না।

উনি বললেন—মাই সুইট চাইল্ড। ডোণ্ট ওরি। আমি কলিয়ারী যাচ্ছি না। একটা অন্য কাজে যাচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি ফিরবে তো?

—ওঃ ইয়েস!

মাথায় টুপি ও হাতে ছড়ি নিয়ে উনি গাড়িতে চড়লেন। গাড়ি ছুটলো কাবেরী কুঠিরের দিকে। সেই শেরগড় সাহেব কোঠীর স্মৃতি তাঁকে ডাক দিয়েছে।

ষাট

সাহেবের গাড়ি দেখেই তো কাবেরীর চক্ষু স্থির। একি অঘটন ঘটল আজ। তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—কি হল সাহেব?

—ওঃ নাথিং। তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? আমি এসেছি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। নাথিং মোর।

—এসো। ঘরে এসো।

হাত ধরে নিয়ে এল। সাহেবকে বসতে দিয়ে বলল—তোমার এই শরীর নিয়ে এতটা পথ কেন এলে সাহেব? আমাকে খবর দিলেই ত দেখা করে আসতাম।

—তা ঠিক। কিন্তু এই যে আমি এলাম এটা কি কম আনন্দের? আসলে আমি একটা বড় কাজ শুরু করেছি। তাই মনে পড়ল শেরগড় পানমোহরার দিনগুলো। তখন তুমি কত যত্ন করে সেবা করতে।

—আমার সেবাতে কি এখনই কোন যত্নের ত্রুটি আছে সাহেব?

—তা থাকলে কি আসতাম ? কি জানো তোমাকে দেখলেই আমি মনের মধ্যে একটা এনার্জি পাই।

—ওঃ সাহেব! এই অভাগা দাসীকে এমন করে কথা বোল না। যাক তোমার সেবার জন্য কি করব ?

সাহেব হাসলেন। ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—নাথিং। তুমি আমার কাছে বোস। দুটো গল্প কর। সেদিন খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়েছো আজ মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাও।

অনেকদিন থেকেই গুমরে মরছিলেন উনি। মন খুলে কথা বলারও কেউ ছিল না। নিজে যে এগিয়ে আসবেন তাও সম্ভব হচ্ছিল না বিপুল ভ্যানিটির জন্য। আজ উনি সে বাধা অতিক্রম করেছেন এবং তাতে ওঁর মনটাও ফ্রি হয়েছে।

কাবেরী ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। কোন্ কথায় যে সাহেবের মন প্রসন্ন হবে আর কিসে যে খিঁচড়ে যাবে তাই ভাবছে ও। চুপ করে আছে।

সাহেব বললেন—আমি এখন প্রায়ই এক আলখাল্লা পরা জ্যোতির্ময় পুরুষ মূর্তির স্বপ্ন দেখি। তিনিই আমাকে দেউলটি পুনরুদ্ধার করে চারশো সতেরোটি মৃতদেহ সৎকারের প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। আমিও সে কাজ শুরু করেছি।

কাবেরী বলল—উনি আর কেউ নন সাহেব—তোমারই বিবেক। তিনি তোমাকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করছেন।

সাহেব প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ওর হাতটা চেপে ধরে বললেন—ওহ্ মাই-ডারলিং! তোমার ব্যাখ্যা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্বপ্নের মধ্যে এমন অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

কাবেরী ওর লোমশ হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—দেউলটির খবর আমি শুনেছি সাহেব। ওটা করতে পারলে এতগুলি মানুষের পারলৌকিক ক্রিয়া হবে এবং কলিয়ারী চললে কত কুলি-কামিন খেটে খেতে পাবে। তখন কুলিবাথানের কথাটা স্মরণ করো সাহেব। ওরা বড় দুঃখী।

—তা জানি। কিন্তু ওরা ত আমার অনুগত কুলি-কামিন নয়। মনসা-রাম ট্রেড ইউনিয়ন করছে। নীতিগত কারণেই তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য।

কাবেরী একটু ভেবে বলল—একটু মান সম্মান। মানে বৌ-বিটিদের ইজ্জত যাতে লুট না হয় আর দুটি ভাত কাপড়ের যোগাড় করে দিলেই দেখবে ওরা তোমার আপন হয়ে গেছে।

—ওদের প্রতি তোমার খুব দরদ তাই না ?

—ওরা যে তোমাদেরই পয়দা সাহেব। আমার চেয়ে ত তোমারই দরদ বেশী হওয়া দরকার।

সাহেব একটু হাসলেন। বললেন—যাক্‌গে ওসব কথা। সরিতাকে পাঠিয়ে দেবে তো ?

—হ্যাঁ।

—জয় বাধা দেবে না ?

—ও ফুরিয়ে গেছে সাহেব। তুমি যা মনে করছো তা নয়। তোমাদের সাহেবরাই ওকে নষ্ট করেছিল। বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

—ও. কে। আমি তাহলে উঠি।

—আচ্ছা !

সাহেব চলে গেলেন।

দেউলটির কাজ পুরোদমে চলছে। মিঃ ব্রাউন রেসকিউ অ্যাপারেটাস এনে লোকজনকে তালিম দিয়েছেন। খাদের সীল ভাঙা হয়েছে। ফ্যান চালিয়ে বাতাস ঢোকানো হচ্ছে। রেসকিউ টিম দিয়ে ইনসপেকসান হয়েছে। চানকে ঝুলন পাটার উপর পাম্প বসিয়ে জল নিকাশ হচ্ছে।

এদিকে গরমও পড়েছে। রাঢ় বঙ্গের বৈশাখ মাসে মাঠ ঘাট খরার তাপে জ্বলছে। সিসিল মেম সাহেবের বড়ই কষ্ট হচ্ছে। আর ত ব্রজলাল নেই যে তাকে দিয়ে গায়ে বরফ ঘষা করাবেন অথবা কলমীশায়রে সাঁতার কাটবেন। পদিনার সরবৎ এবং তালরসের প্রভাবে কিছুটা স্বস্তি থাকলেও সুখ নেই।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের মনের তল খুঁজে পাচ্ছেন না - এটা তাঁর কাছে বিরাট দুর্ভাবনা। তবে কি তাঁর মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

একদিন ডিনার টেবিলে বসে বললেন—ড্যাডি ! তুমি যে কিছুই বলছো না। আমাকে অপরাধীর মত একপাশে ঠেলে দিচ্ছো—এতে আমি খুব দুঃখ পাচ্ছি।

উনি ওর দিকে তাকালেন। তাঁর আদরের মেয়েটি যেন আরো শীর্ণ হয়েছে। আরো বেশী প্রখর হয়েছে।

বললেন—দুঃখ পাবার জন্য তোমাকে ইণ্ডিয়াতে আসার প্রয়োজন ছিল না।

—কি বলছো ড্যাডি ? তোমাকে হোমে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

—তাতো হবে না সিসিল। তুমি ফিরে যাও।

—তোমাকে না নিয়ে আমি যাবো না।

—তোমার হাজব্যাণ্ড এবং ছেলেদের জন্য যা করার করগে। আমার জন্য অনেক ভেবেছো—অনেক করেছো—আর না করলেও হবে।

সিসিল নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। বললেন—আমরা জানি টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তুমি আমাদের উপর ভীষণ রেগে আছো।

মিঃ ব্যারাকলউ হঠাৎ জ্বলে উঠলেন—টাকা ! কার টাকা কাকে বন্ধ

করেছো ? আমি যদি তোমাদিকে আমার বিজনেসের অংশীদার না করতাম, কোল কোম্পানীর ডাইরেকটার না বানাতাম তবে কোথায় পেতে এত ক্ষমতা ?

সিসিল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এইসব শুনবার জন্যই মা আমাকে পাঠালেন। বেশ আমি এই কথাই বলবো গিয়ে।

—হ্যাঁ। বলবে। ছাট ষ্টোন হার্টেড উওম্যান কি মনে করে কি ? শেষ বয়সে আমাকে ভিক্ষা মাগতে বলেন—না কি ?

—তা বলছো কেন ড্যাডি ? উনি তোমাকে এক লাখ টাকার চেক দিয়েছেন। তুমিই বরং তা দেউলটির কবর খানায় ঢেলে দিচ্ছো ?

—তবে কি করব ? তোমার মায়ের নামে একটা স্মৃতিসৌধ ?

—মায়ের নামে না হোক নিজের নামে কিছু একটা করতে পারতে।

—না। এটা আমার বিবেকের আদেশ। তাই পালন করছি। দেউলটি পুনরায় চালু করতে পারলে আবার হাজার হাজার মানুষের সংস্থান হবে।

কি রকম নস্যাৎ করে দেবার ভঙ্গীতে সিসিল বললেন—হ্যাঁ। ঐ খাদ আবার চালু হবে। তবেই হয়েছে। আকাশে ফানুস ওড়াবার ব্যাপার। সেজন্যই মা টাকা বন্ধ করেছেন।

মিঃ ব্যারাকলউ তীব্র কণ্ঠে বললেন—উনি এই রকমই করেন। ভীষণ প্রয়োজনের সময় ধোঁকা দেন। গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নেন। পানমোহরা খোলার সময় উনি টাকা বন্ধ করে ছিলেন। অথচ সব ফাইন্যান্স দেবার কথা ছিল। তখন আমি নিজের ক্ষমতাতেই পানমোহরা কোল কোম্পানী এসটাবলিশ করেছিলাম। এবারেও দেউলটি খুলব। তোমাদের সহায়তার প্রয়োজন হবে না। যাও। আমাকে বঞ্চিত করে তোমরা টাকার কুমীর হয়ে এনজয় করগে।

উনি উঠে পড়লেন।

সিসিল বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

আর ইণ্ডিয়াতে পড়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। তিন মাস বৃথাই ব্যয় হল। তাঁর মিশন ব্যর্থ হল। তিনি তাঁর জন্মদাতা পিতাকে বোঝাতে পারলেন না।

তিনি চলে গেলেন। বুকের উপর পাষাণ ভার চড়িয়ে মিঃ ব্যারাকলউ সেই মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য করলেন। ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে দিন কয়েক ছট ফট করলেন। কাবেরীর কাছে ছুটে গেলেন সান্ত্বনা পেতে। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেউলটির কাজে। জোরদার পাম্পিং হচ্ছে।

আগে বাড়ো—আউর আগে—জলদি কর।

একষট্টি

আর মনসার পিছন ফিরে তাকাবার অবসর রইল না। প্রস্তুতি অনেকদিন থেকেই চলছিল। এবার জোর কদমে চলতে লাগল। বিভিন্ন খনিতে শ্রমিক সংগঠন তৈরি হল এবং নিরাপত্তা, বেতন, রেশন, তেল, কয়লা, জল কোয়ার্টার প্রভৃতি সতেরো দফা দাবি নিয়ে রচিত হল স্মারকলিপি। দিন ধার্য হল প্রকাশ্য অধিবেশনের।

ডিসেরগড় হাটের একপাশে ফাঁকা ময়দানে কুলি-কামিনরা জমায়েত হল। মুখে-মুখে খবর রটেছিল বহুদূর পর্যন্ত। মানুষ এসেওছিল চাল চিঁড়ে, ছাতু, মুড়ি গামছায় বেঁধে, পায়ে হেঁটে।

মঞ্চ নেই, মাইক নেই, লাইট নেই। ফুল ও মালাও নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হওয়ার পর কয়েকটি লম্ফবাতি জ্বলে উঠল। রুক্ষ, শুষ্ক, অনাহারী, অর্ধাহারী কুলি-কামিনের দল মাটিতে বসল পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবে।

লম্বা বাঁশের ডগায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাটি তুলে দিয়ে মনসারাম বলল—এই আমাদের খনি মজুর ইউনিয়নের ঝাণ্ডা পুঁতে দিলাম। কাল থেকে এই পতাকা সব কলিয়ারিতে পুঁতে দিতে হবেক। আর মালিক-ম্যানেজারকে দিতে হবেক আমাদের দাবিপত্র।

তখনকার দিনে শ্রমিকরা হাততালি দিতে জানত না। এতবড় ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল তবু পুষ্পবৃষ্টি হল না বা হাততালি পড়ল না। কোন সাংবাদিকও ছিলেন না খবরের কাগজে ছবি বা খবর ছাপাতে। ঝুপসি অন্ধকারেই রচিত হল ইতিহাস।

যাকে ভাষণ দেওয়া বলে তার রীতিরেওয়াজ মনসা জানত না। তবে তার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল এবং জেলে শিখে এসেছিল দেশাত্মবোধের মন্ত্র। সে তার মেঠো ভাষাতেই দেশপ্রেম, জাতির ইতিহাস, পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, ক্ষুদিরাম বসু থেকে বালগঙ্গাধর তিলক পর্যন্ত নেতাদের আত্মত্যাগের কথা, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সুভাষ বসু প্রমুখের নীতি, আদর্শ ও সংগ্রাম, কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি বিষয় বুঝিয়ে বলার পর ঘোষণা করল—আমরা কয়লা কুলি। মালিকদের শাসন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। তার জন্য তামাম কয়লা কুঠির কুলি-কামিনদিকে নিয়ে আসতে হবে ঐক্যের পথে। আমরা সব ভাই-বোন। আমি আজ তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি—আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনদের জান-মান বাঁচাবার জন্য আমার জান কবুল রইল।

ওর কথাগুলি শ্রমিকদের মর্মে গেঁথে গেল।

কয়লা কুঠিতে তখন শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব বলে কিছু ছিল না। মালিকরা হুকুম দিত শ্রমিকরা তা পালন করত। মালিকরা অত্যাচার করত শ্রমিকরা

সহ্য করত। শ্রমিকদেরও যে কিছু বলার আছে তা শোনার কান কারো ছিল না।

অত্যাচারে, নির্যাতনে, হত্যায়, রক্তপাতে ও ধর্ষণে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণী সেই প্রথম বুঝল প্রতিবাদ বলে একটা কথা আছে। তাই মনসারামের সেই বলিষ্ঠ ঘোষণা ভারতীয় কয়লা-কুলির ইতিহাসে এক পালা বদলের পূর্বাভাষ।

বৈশাখীর চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন। পোড়া গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। কোলের বাচ্চাটিকে বুকে চেপে ধরে হাঁ করে তাকিয়ে আছে মনসারামের দিকে। তাকে ওর মনে হচ্ছে কিংবদন্তীর নায়ক। ঐ মানুষটা তার স্বামী। আঃ। কি গর্ব! কি অহংকার!

ওর শরীরটা খুবই খারাপ। তবু সে কুলিবাথান থেকে হেঁটে এসেছে। কারণ আজ তার স্বামীর জীবনের অগ্নি পরীক্ষার দিন।

কত কি ঘটনা ঘটতে পারে। মালিকদের দালালরা মিটিং ভাঙচুর করতে পারে। পুলিশ এসে কুলি-কামিনদের উপর ঘোড়া দিতে পারে। মনসারামকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিতে পারে।

সে সব খবর ও পরের মুখে শুনবে? তা হয় না। ও তো মরার পথে পা বাড়িয়েই আছে। আমার জীবনের মায়া কি? দরকার হলে স্বামীর জন্য, কয়লা কুঠির কুলি-কামিনদের জন্য সে জান কোরবানি করে দেবে।

এত যার মনের জোর তাকে কেউ ঘরে আটকে রাখতে পারে? তাই কারো কথা মানেনি। জোর করে এসেছে এবং বিনা বাধায় এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য আনন্দে তার চোখের জল বাধা মানছে না।

শান্তি ওর কাছেই বসেছিল। সে বলল—ছুটু বউ, কাঁদছিস ক্যেনে?

—না দিদি। কাঁদব ক্যেনে? এই দিনটির জন্যেই আমি বেঁচে আছি। আজ তুমার ছ্যাওরের গরবে আমার বুক ফেটে গেছে।

মনসারামের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর কুলি-কামিনদের মধ্যে রোষ, ক্ষোভ, উত্তেজনা এবং প্রতিজ্ঞার হাওয়া বয়ে গেল। এবার ফিরতে হবে।

মনসারাম এসে ছোট ছেলেটিকে বুকে নিয়ে বৈশাখীর হাত ধরে হাঁটতে লাগল কুলিবাথানের পথে। তার সঙ্গে চলল একটা বিরাট শ্রমিক মিছিল।

বাষট্টি

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা পার হয়ে শরৎ এসেছে।

খোয়া ওঠা জি. টি. রোড দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে সরিতা। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ তাকে আবিষ্ট করে তুলেছে। শরতের কমনীয় শ্যামশ্রী, নীল আকাশে ভাসমান সাদা মেঘের পুঞ্জ, ধান মাঠের আলে আলে শ্বেত শুভ্র

কাশফুলের দোল দোলানি একটা মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করেছে। যা দেখছে তাই ভালো লাগছে ওর।

প্রেমিক ডাক দিয়েছে। প্রেমের পূর্ণতা যে বিবাহে তারই রঙীন কল্পনার জাল তার মনে।

রবার্টের জন্মদিন আজ। সে নিজে তাকে জন্মদিনের ডিনার পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে গেছে। লাঞ্চের আগে যেতে বলেছে মিঃ টেলারের সঙ্গে প্রথাগত-ভাবে পরিচয় করিয়ে আজকের ডিনার পার্টিতে যাতে ওদের এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করা হয় সেইজন্য। তাই সরিতার মনে খুশির মাত্রা একটু বেশি পরিমাণেই ছিল।

মিঃ টেলারের বাংলোর গেটে যখন ও ঢুকল তখন রবার্ট তার প্রতীক্ষাতেই ছিল। ও পৌছানো মাত্র কাছে এল। ঘোড়া থেকে নামতেই একটা হাত ধরে চুম্বন করল।

মিঃ টেলারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—মিস্ সরিতা সরকার।

উনি ওকে সহাস্যে আপ্যায়ন করে বললেন—আমি তোমাকে জানি। মিঃ ব্যারাকলউয়ের পার্টিতে তোমার নাচ দেখেছি।

—ইয়েস আংকল। আপনার মনে আছে দেখছি।

—তা কেন থাকবে না? তুমি ত সেই নাচগার্লের মেয়ে?

সরিতার বুকে একটা ঠোক্কর লাগল। তার মা ওদের চোখে নাচগার্ল। কথাটা এমন করে মনে করিয়ে দেবার কি জরুরী প্রয়োজন ছিল?

ওর সরল সুন্দর মুখে একটা কাঠিন্যের ছায়া পড়ল।

রবার্ট বলল—এটা কোন ব্যাপার নয় ড্যাডি। সরিতা একটা জিনিয়াস। ও এম এ-তে ফাস্টক্লাস পেয়েছে। নাচে গানে আন প্যারালাল।

—জানি।

আমরা পরস্পরকে ভালবাসি ড্যাডি। বিয়ে করতে চাই। আপনার অনুমতি নেবার জন্যই আজ ওকে ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছি।

মিঃ টেলারের মুখটা কঠোর হয়ে উঠল। কপালের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—তুমি তো আমাকে ভাববার সময় দেবে রবার্ট।

—সে ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

—তাহলে অনুমতির কি প্রয়োজন? তোমার নিজের জীবন সঙ্গিনী বেছে নেবার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আমাদের অনুমতির প্রয়োজন আছে বলে যদি মনে কর তবে ভাববার সময় দিতে হবে।

রবার্ট একটু উষ্ণভাবে বলল—আমি বুঝতে পারছি না এতে এত ভাবনার কি আছে?

মিঃ টেলার দুর্বোধ্যভাবে হাসলেন।

রবার্ট বলল—আমার ইচ্ছা ছিল আজকার ডিনার পার্টিতে আমাদের এনগেজমেণ্টের কথা ঘোষণা করা হবে। এখন ভাববার সময় নিলে তা হবে না।

উনি পাইপে তামাক ভর্তে ভর্তে বললেন—আচ্ছা, পরে বলব।

মিসেস টেলার বললেন—এত জিদ করছো কেন রবার্ট? বিয়ে তুমি করবে কিন্তু তোমার বিয়ের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক মানসম্মান জড়িত হয়ে আছে তা ত স্বীকার করবে।

রবার্ট যথেষ্ট উষ্মার সঙ্গে বলল—তবে তোমরা কি বলছ আজ ছ-সাত বছর ধরে যার সঙ্গে আমার ভালবাসা, যাকে পাবার জন্য আমি হোম ছেড়ে ইণ্ডিয়াতে এলাম তাকে বিয়ে করার স্বাধীনতা নেই?

ওদের কথাবার্তা ক্রমশই উষ্ণ হয়ে ওঠার জন্য সরিতা অস্বস্তি বোধ করছিল। সে একটা অছিলা করে উঠে পড়ল। বাইরে এসে দাঁড়াল। ও বুঝতে পেরেছিল মিঃ ও মিসেস টেলার কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু তার উপস্থিতিতে বলতে পারছেন না।

আড়ি পেতে কথা শোনা তার অভ্যাস নয় তবু তার কানে এল মিঃ টেলার বলছেন—তুমি যাই বল রবার্ট আমি তোমার প্রেমিকার পরিচয় জানি। সি ইজ দ্যা বাষ্টার্ড ইস্যু অফ মিঃ ব্যারাকলউ।

সরিতার মনে হল কেউ যেন তার মাথায় থান ইঁট ছুঁড়ে মারল। মুহূর্তের জন্য তার মাথাটা ঘুরে গেল তারপরেই সামলে নিল।

রবার্ট তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—স্টপ ইট ড্যাডি। আমি ওর পরিচয় জানি। এর মধ্যে কোন লুকোছাপা নেই।

—তবু তুমি বিয়ে করতে চাও?

—ইয়েস! আমি তাকে ভালবাসি।

পিতা ও পুত্রের সেই বাদানুবাদ সরিতার মনে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তক্ষুনি সে কি করবে তা ভেবে ঠিক করতে পারল না। বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল।

মোরাম বিছানো রাস্তার দু-পাশে কেয়ারি করা হেজ এবং মাঝে সবুজ ঘাসের লন। একজন মালি গোলাপ গাছের গোড়া পরিষ্কার করছিল। ওকে দেখে সেলাম করল।

সরিতা জিজ্ঞাসা করল—আমার ঘোড়াটা কোথায়?

—সহিস আস্তাবলে লিঞে গেইছে মেমসাব।

—আনতে বল ত।

তখনো ড্রয়িং রুমে উচ্চকণ্ঠে বাদানুবাদ চলছে মিঃ ও মিসেস টেলারের

সঙ্গে রবার্টের। বাগান থেকেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সরিতার তা শুনবার ধৈর্য নেই। সে আরো দূরে গেল যাতে শুনতে না হয়।

একটু পর রবার্ট এল ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে। তার চোখ মুখ রাগে লাল। গা-টাও কাঁপছে। দ্রুত পায়ে সরিতার কাছে এসে বলল—তুমি কিছু মনে কর না ডার্বলিং। একটা বাজে ইস্যু নিয়ে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল।

সরিতা ঠাণ্ডা গলায় বলল—এটা ঝগড়া করার বিষয় নয় রবার্ট।

—বাঃ রে। আমাদের এতদিনের ভালবাসা বাবা মায়ের ইগোর জন্য ভেস্তে যাবে বলছ।

—আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে। এবার থামা উচিত।

—তার মানে ?

কোন মানুষই তার নিজের জন্মের জন্য দায়ী হতে পারে না। তবু যে পরিবারের অভিভাবকদের মনে এত ঘৃণা সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া কি উচিত নয় ?

—না। আমি তোমার জন্য দারুণ ফাইট করেছি।

—কি প্রয়োজন ? একি আমার মনসারামদার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে লড়াই করে দাবি আদায় করব ? ভালবাসা হচ্ছে দেশ কাল জাতির গোঁড়ামি ছাড়িয়ে গভীর বোধের অনুভূতি। আমার ধারণা ছিল তোমাদের সমাজ উদার এবং প্রগতিশীল। বড় দেরি হয়ে গেল সেই ভুল ভাঙতে।

সহিস ঘোড়া নিয়ে এল। সরিতা ঘোড়ার গায়ে হাত রেখে বলল—ও. কে. রবার্ট—

রেকাবে পা দিয়ে এক লাফেই উঠে পড়ল।

রবার্ট বলল—এ কি ? তুমি চলে যাচ্ছ ?

—তবে কি তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করব ?

—কিন্তু আমার ভালবাসা।

—আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। গুড বাই।

রবার্ট থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টগবগ করে ছুটে চলল মহাকালের ঘোড়া। এতদিন ধরে তিল তিল করে জমে ওঠা ভালবাসা চোট খেয়ে গেল। তাহলে ভালবাসাটাই কি ? ওরা জান কোরবানি করে একটা উদাহরণ স্থাপন করতে পারল না ঘৃণা, অশ্রদ্ধা এবং সন্দেহের কারণে।

আফসোস !

সরিতা কাবেরী কুটিরে ফিরে এল। তেমনি সহজ স্বচ্ছন্দ চলাফেরা, কথাবার্তা। কাউকে ঘুনাক্ষরে টের পেতে দিল না যে তার জীবনে এতবড় ঘটনা ঘটে গেছে।

ভালবাসা হওয়া এবং তা ভেঙে যাওয়ার যে মর্মান্তিক বেদনা তার হৃদয়কে

দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিয়েছে তার ছায়ামাত্র পড়তে দিল না বাইরের আচরণে। সে যেন সর্বংসহা ধরণী। যার গর্ভে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণি বলয় সৃষ্টি করছে উত্তপ্ত লাভাস্রোত তবু তার ত্বক মাংসের উপর শ্যামল উপবন, কল্লোলিত সমুদ্র, তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের চিত্রে কতই না ফারাক।

কিন্তু পৃথিবীতেও ভূমিকম্প হয়। আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। সরিতার ভিতরে যে সুতীব্র বেদনার প্রবাহ তা বেগবান হয়ে ওঠে নীরব নির্জন রাত্রে।

দূরে কোথাও ব্যাঙ ডাকে। শরতের আকাশে মেঘ দেখা দেয়। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ে। ভেসে আসে গন্ধরাজ ফুলের সুবাস। পাশের ঘরে কাবেরী ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন সে হ্যারিকেনের মলিন আলোতে ডায়েরী লেখে—রবার্ট! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাদের ভালবাসাপূর্ণ হয়ে ওঠার সুযোগ পেল না। এই বেদনা বুকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া কি খুবই অসম্ভব? হয়তো নয়। আমি পারব। আমাকে পারতে হবে। খুঁজে নিতে হবে জীবনের কোন মহত্তর অর্থ।

দিন কয়েক পর এক শিউলিঝরা সকালে মাথার টুপি নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বসল। তার যাত্রা নওরঙ্গী হউস।

গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত দারোয়ান, খানসামা ও বেয়ারাদের টপাটপ সেলাম বাজতে লাগল। সে এক দুরন্ত যৌবন। লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খট্ খট্ শব্দে ঢুকে গেল মিঃ ব্যারাকলউয়ের অফিসে।

উনি তখন সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসে বসেছেন।

মিঃ ব্যারাকলউ চশমা নিয়ে ওকে ভালোভাবে দেখবার আগেই টপাটপ দুটো চুমু খেয়ে ফেলল।

উনি খুব খুশি হয়ে বললেন—হাই সরিতা! আমি তোমার আদরে খুব মুভ্ড হয়েছি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। ওর পিঠে হাত রেখে বললেন—চল। আমরা ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসি।

বিশাল ড্রয়িংরুমের একপাশে কারুকার্য করা একটা বেতের চেয়ারে বসে সরিতাকে কাছেই বসতে বললেন। খানসামা সেলাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—ছোট মেমসায়েবের জন্য কি ব্রেকফাস্ট আনব?

সরিতা বলল দুধ, পাঁউরুটি, ডিম সিদ্ধ।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—তুমি খুব দুষ্টু হয়েছো আমাকে একবার দেখতেও আসো না।

সরিতা বলল—আমি খুবই দুঃখিত আংকল। ঘটনা প্রবাহ এমনভাবে

আমাদিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যে আবেগ অনুভূতি সব কেমন টাল-মাটাল হয়ে গেল।

—তা ঠিক এজন্য আমিই দায়ী।

সরিতা চুপ করে ভাবল কিভাবে কথা বলা যায়।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—তুমি এবার কি করবে সরিতা ?

—ডক্টরেট করবো।

—মাইগড ! এখনো তোমার পড়ার নেশা ছোটেনি।

—ওটা যতদিন থাকে ততদিনই ভাল।

—আই সি !

সরিতা ওঁর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল—আমি আজ তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞসা করতে চাই আংকল। জবাব দেবে ?

—ওঃ সিওর।

—তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছো। লালন-পালন করেছো। স্নেহ ভালবাসা দিয়েছো। তবে কেন আমায় একটা লিগ্যাল আইডেন্টিটি দিলে না ? কেন তুমি আমার জীবনের উপর বাস্টার্ড ইস্যুর ছাপটা মেরে দিলে ? কেন আমি তোমাকে বাবা বলতে পারি না ? মিঃ ব্যারাকলউয়ের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সরিতার এক একটি প্রশ্ন যেন একটি সাপের ছোবল। তাঁর নিজেরই কৃতকর্মের এক বিরাট ক্ষতের উপর লঙ্কাবাটার ঝাল। অসহ্য তার দহন ক্রিয়া।

যৌবনের উন্মার্গগামী প্রবৃত্তির ফল আজ তাঁর দিকে তর্জনী তুলে ধিক্কার দিচ্ছে—তুমি জারজ সন্তানের পিতা।

সরিতা বলল—তুমি জানো আমার কি অপমান হয়েছে ?

—কি ?

—মিঃ টেলার বলেছেন—সি ইজ দ্যা বাস্টার্ড ইস্যু অফ মিঃ ব্যারাকলউ।

— মাইগড় ?

—রবার্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছি কারণ ওর মা বাবার ঘৃণা নিয়ে আমি বধূ সাজতে চাই না।

মিঃ ব্যারাকলউ ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ভিতরে হস্ হস্ শব্দে স্টিম ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। সরিতাকে কাছে টেনে নিয়ে তার কপালে চুম্বন করলেন। ভাঙা গলায় বললেন মাই সুইট চাইল্ড। তুমি একটা এঞ্জেল। হেভেন থেকে আসছো। তোমার অনেক গুণ। অনেক মহত্ত্ব। তাই দিয়ে আমাকে ক্ষমা কর। প্লিজ !

সরিতাকে ধরে থর থর করে কাঁপছেন। গলা বসে গেছে। চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছে। এক দুর্দান্ত পুরুষ সিংহের মদমত্ত অহমিকা গলে গলে নামছে।

সরিতা উঠে দাঁড়াল। একটা তোয়ালে দিয়ে ওঁর চোখের জল মুছে দিয়ে বলল—ব্যস্। নো মোর ইমোশন। তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। এসব কথাবার্তার এখানেই ফুলস্টপ। আমি যাচ্ছি। বাই।

টক্ টক্ জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের বুক ভেঙে গেল। জমাট বাঁধা অশ্রু নদীর মুখ খুলে গেল। এক মর্মান্তিক বোধ জেগে উঠল তাঁর মনে। ভুল। সবই ভুল। সারাজীবন শুধু ভুল করেছেন আর তার খেসারৎ দিয়েছেন। এই নিয়েই তাঁর জীবন।

দিন কয়েক পর সরিতা তৈরি হল কলকাতা যাবার জন্য।

কাবেরী বলল—সামনে মা দুর্গার পূজো। এসময়ে নাই বা গেলি।

—দুর্গা পূজাতে আমি কি করবো মা?

—পূজো দেখবি।

—না মা পূজোর ছুটি শুরু হবার আগেই আমাকে যেতে হবে। না হলে পূজোতে যদি হোস্টেল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে থাকার অসুবিধা হবে।

তুই আমার একটা কথাও শুনবি না বুঝি?

—কেন শুনবো না মা?

—হ্যাঁরে তোদের বিয়েটা কবে হবে?

মোক্ষম প্রশ্ন। সরিতা দো-টানায় পড়ে গেল। মায়ের কাছে সত্যি বলাও দায় মিথ্যা বলাও পাপ। তাই একটু হেসে পাশ কাটিয়ে গেল তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? ও নিয়ে তুমি একদম ভাববে না।

তখনকার মত সে প্রসঙ্গে ধামা চাপা দিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে বলল—মা! তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

—কেন রাখবো না? তুই বল।

—তুমি এই বাড়িটা ছেড়ে দাও।

—সে কি রে?

—হ্যাঁ মা। তুমি আমাকে বড় করেছো, লেখাপড়া শিখিয়েছো। একটা মায়ের ভার নিশ্চয়ই বইতে পারবো। আর আমি তোমাকে পরের অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচতে দেবো না। মিঃ ব্যারাকলউয়ের দয়ার দান তুমি ত্যাগ কর।

কাবেরী বড় চিন্তায় পড়ে গেল। বলল—এমন কথা কেন বলছিস খুকি?

—আমি বড় হয়েছি মা। আর তোমাকে অসম্মানের মধ্যে বাঁচতে দিতে পারি না। আর প্রশ্ন কোর না মা। আমাকে যেতে দাও।

ওকে প্রণাম করে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে চড়ল।

কাবেরী পড়ে রইল একরাশ ভাবনা নিয়ে।

তেষট্টি

খনি মজুর ইউনিয়ন তখন কয়লা শ্রমিকদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশই মজবুত হচ্ছে সংগঠন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মনসারামের অহ্বান—খনি মজুদুর এক হও।

দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই একদিন ওরা পানমোহরা কোল কোম্পানীর সঙ্গে মিটিংয়ে বসতে পেল।

মনসারাম, কালো বাউরী, ইরফান আলি ও সজনী—চারজন প্রতিনিধি গিয়ে দাঁড়াল ব্রাউন সাহেবের অফিসে।

মিঃ ব্রাউন বললেন—তোমরা কি আবার দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাতে এসেছো?

মনসারাম বলল -না স্যার। বরং দাঙ্গা হাঙ্গামা যাতে না হয় সে কাজে আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব।

—তাহলে এমনটা হচ্ছে কেন? তোমার কাজকর্মের পুরো খবর আমাদের কাছে আছে। ডিসেরগড় হাটে মিটিং করেছো। বিভিন্ন কলিয়ারীতে ঝাণ্ডা পুঁতে দাঙ্গা বাধিয়েছো। কথাটা মিঃ ব্যারাকলউয়ের কানে গেছে। তিনি তোমাকে শুধরে নেবার জন্য একটা সুযোগ দিতে চান।

মনসারাম তাদের ইউনিয়নের দাবিপত্রটি মিঃ ব্রাউনকে দিয়ে বলল—গণ্ডগোল যে হচ্ছে তার কারণ আমাদের পয়লা নম্বর দাবি: চাপরাসী, গোমস্তা ও সুদওলার অত্যাচারে শ্রমিকদের জান মান সব সময়েই বিপন্ন। আমরা এইসব অত্যাচারের বিবরণ আরো বিস্তৃতভাবে লিখে ছোট লাট, বড় লাট, পুলিশ সাহেব, গান্ধীজী, নেহরুজী ও জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের কাছে পাঠিয়েছি। কাজেই গণ্ডগোল যদি মেটাতে চান তাহলে প্রথমে আপনাদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে সংযত করুন।

উনি একটু ভেবে বললেন—অন্যায় অত্যাচার যদি হয় তবে আমরা ব্যবস্থা নেবো। তোমরা অভিযোগ করতে পারো।

—আমাদের অভিযোগ তো আপনাদের শোষণ প্রণালীর বিরুদ্ধে। শ্রমিকদিকে দমন পীড়ন করাটাই ত রীতি রেওয়াজ।

একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দাও।

—মিঃ ব্যারাকলউয়ের কালাকানুন! আজ দীর্ঘকাল থেকে তিনি কুলি-কামিনদিকে তিলে তিলে হত্যা করছেন।

– উনি মালিক। ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার তো আমার কাছে হতে পারে না। তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বল।

—ওঁকে পাবো কোথায় যে কথা বলবো?

—সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। তোমারা যাও।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে প্রস্তাবিত মিটিংয়ের ঘটনাটি ঘটল সপ্তাহখানেক পরে ওঁর পানমোহরা বাংলোর অফিস ঘরে। মিঃ ব্রাউনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ চারজনই ছিল প্রতিনিধি।

মনসারামকে দেখতে অনেকটা ওঁর মতই। রোদে পোড়া, দুঃখে সিদ্ধ তথাপি যেন মিঃ ব্যারাকলউয়ের যৌবনকালের প্রতিমূর্তি। উনি ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর নজর গেল ইরফান আলির দিকে। আরে এই বুড়োটা তো তাঁরই কচোয়ান ছিল। সজনীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন —তুই কার মেয়ে?

সজনী বলল —বঞ্চনার।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের যদি মানবিক অনুভূতি থাকতো এবং কিছুটা নস্ট্যালজিয়া ক্রিয়া করত তবে তিনি দেখতেন দুই প্রজন্মের প্রতিনিধি তাঁর সামনে। এদের মধ্যে দুজন তাঁর অবৈধ সম্ভোগের ফল।

বললেন—তোমাদের সব খবর আমি রাখি। কিন্তু এই বুড়া কচোয়ান ছাড়া কাউকেই আগে দেখিনি। তোমরা কেন আসোনি আমার কাছে?

মনসা বলল—কি করে আসবো স্যার? আপনি তো আমাদের কুলিবাথানের কুলি-কামিনদের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

—সে তো অনেক পরের কথা। তার আগে তো আসতে পারতে।

একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মত বললেন—তাহলে হয়তো ঘটনাগুলো অন্যভাবে ঘটত। কাবেরী তোমাদের কথাই বলেছিল।

এখন দেউলটি রিকোভারী নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।

মনসারাম বলল—আপনি কি মনে করেন না দেউলটি রিকোভারীর কাজে আমরা লাগতে পারি?

—কিভাবে?

—আমাদের শ্রম দিয়ে। আর জানেন তো কুলিবাথানের শ্রমিকরা খাদের পোকা। তাদের সাহস ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া—

—আর কি?

—দেউলটিতে আমাদের শ্রমিক ভাইদের মৃতদেহ পড়ে আছে। তাদেরকে তুলে যদি অন্তিম সৎকারের কাজে লাগতে পারি তবে বুঝব একটা নৈতিক কর্তব্য পালন করেছি।

মিঃ ব্যারাকলউ কয়েক মুহূর্ত মনসারামের মুখের দিকে তাকালেন। আঙুলের ইশারায় কাছে ডাকলেন। ওর হাত ধরে বললেন—তুমি আমার মনের কথাটি বলেছো। আমি এমনই সমর্পিত মানুষ চাইছিলাম। ও. কে.। তোমার কুলিবাথানের লোকজন নিয়ে কাজে লেগে যাও।

—ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু আমাদের ইউনিয়নের দাবি দাওয়া?

—তুমি যখন আমার লক্ষ্য ও আদর্শের শরিক হতে চলেছো তখন তোমার আদর্শকে অবশ্যই সম্মান দেবো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি দেউলটি খাদ পুনরুদ্ধার করে যেদিন উৎপাদন শুরু হবে সেদিন একটা অনুষ্ঠান করব। সেই অনুষ্ঠানে তোমাদের ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেবো এবং দাবি দাওয়া মেনে নেবো। ততদিন সবুর কর।

-ও কে. স্যার। ধন্যবাদ।

চৌষট্টি

সময় গড়িয়ে গেছে এক শীত থেকে আরেক শীতে। এক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেউলটি খাদ পুনরুদ্ধারের কাজ একটা নির্দিষ্ট রূপরেখা পেয়েছে। হলেজ, ইঞ্জিন চালু হয়েছে। একসঙ্গে চারখানা পাম্প চলছে গোঁ গোঁ শব্দে। মেন ফ্যান প্রতি মুহূর্তে উগরে দিচ্ছে লাখ লাখ ঘনফুট বাতাস। খাদের ভিতর অবরুদ্ধ বিষাক্ত গ্যাস বাতাসের তাড়নায় উপরে উঠছে। আবহমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে। প্রথম দিকে যতটা ভয় ভাবনা ছিল তা কেটে যাচ্ছে। এখন শুধু কাজ আর কাজ।

কিছুদিন পর মিঃ ব্যারাকলউ দেউলটি খাদে নেমে কাজকর্ম নিজের চোখে দেখে এলেন। মনসারাম তখন দারুণভাবে কাজের তোড়জোড় লাগিয়ে দিয়েছে। কুলিবাথানের লোকজন নিয়ে খাদের পাথর কাদা সাফ করে দুটি একটি গলা পচা মড়া তুলছে। ওর তো কাজের কোন বাছ-বিচার নেই। নিজের হাতেই পাম্প খালাসীর কাজ করছে আবার মুদ্দাফরাশও বনে গেছে।

সারাদিন উদ্ধার কার্যের পর সন্ধ্যাকালে আট দশজন লোক নিয়ে দামোদরের গর্ভে দাহন ক্রিয়া চালাচ্ছে। সেখানেও মনসারাম। তার না থাকলে কি চলে?

সে যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। কয়লা-কুলিদের অগ্নিক্রিয়া করার উত্তরাধিকার যে তার। বেদ পরম্পরায় তারই উপর বর্তেছে।

মিঃ ব্যারাকলউ তার দায়িত্ববোধ ও কর্মক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। তিনি নিজে যেমন প্রচণ্ড নৈতিক তাড়নায়, স্বপ্নে দৃষ্ট আদেশ পালনের প্রয়োজনে দেউলটি খাদ পুনরুদ্ধারের কাজ হাতে নিয়েছেন মনসারামও বুঝি তারই শরিক।

বহুদিন পর একটা কাজের লোক পেলেন। জয়গোপালের পর এমন কাজ আর কেউ করেনি। আর তাই তাঁর কলিয়ারীও লাটে উঠেছে। ও থাকলে এতটা ভরাডুবি হয়তো হতো না।

এখন সেজন্য আফসোস হয়।

যাক্ গে যা হবার হয়েছে। এখন কি করে শেষরক্ষা হবে সেটাই বড় চিন্তা। জল নিকাশের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। এখন টাকার দরকার। হাতের টাকাকড়ি শেষ। ঋণ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তা পাওয়া এত সহজ নয়।

জলের দামে কলিয়ারী বিক্রি হচ্ছে। মাড়োয়ারী ও সিন্ধি মালিকেরা তা কিনে নিচ্ছেন। ব্রিটিশদের কয়লাখনিতে হস্তান্তরের হিড়িক পড়ে গেছে। বিশেষ করে নিম্নমানের কয়লাখনিগুলিতে। সে অবস্থায় বিষয় বন্ধক রেখে টাকা পাওয়া সোজা ছিল না।

তবে মিঃ ব্যারাকলউয়ের মার্কেট গুডউইল ছিল তাই উনি ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে পার্টি পেলেন। আর দু' একদিনের মধ্যে ঋণ পত্রের চুক্তি সই হবে। তারই অপেক্ষায় পানমোহরা বাংলোতে আছেন।

হঠাৎ টেলিগ্রাম এল - মিসেস ব্যারাকলউ আসছেন।

ওঁর মগজে একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলে গেল। মিসেস কেন আসছেন? নিশ্চয়ই তাঁর বিষয় বন্ধক দিয়ে ঋণ নেবার খবর তাঁর কানে পৌছেছে। এবং তিনি তা বন্ধ করতেই আসছেন।

কিন্তু সে খবর তাঁকে কে দিল।

মিঃ ক্রাগকে ডেকে পাঠালেন। সিসিলের খুব কাছের মানুষ উনি। নিশ্চয় এটা তাঁর কাজ। তাছাড়া ব্যাপারটি খুবই গোপনীয়। মিঃ ক্রীগ ও মিঃ ব্রাউন ছাড়া কেউ জানেন না। মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে মিসেসের যোগাযোগ সামান্যই। তিনি একাজ করবেন না।

ওঁর ডাক পেয়েই মিঃ ক্রীগ এলেন।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি মিসেস ব্যারাকলউকে গতমাসের রিপোর্ট পাটিয়েছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—তাতে কি লিখেছেন?

—রেজিং, ডেসপ্যাচ, ক্যাশ, পেমেন্ট, দেউলটির প্রোগ্রেস এবং কস্টশীট।

– ঋণ নেওয়ার কথা লিখেছেন?

—হ্যাঁ স্যার। মিসেস ব্যারাকলউ একটা চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন দেউলটি রিকোভারীর জন্য কিভাবে অর্থ সংগ্রহ হবে?

—প্রোপার্টি মর্টগেজের কথা লিখেছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—ইউ কুইট দিস আফিস বাই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। ব্লাডি ট্রেইটর। কাল বেলা চারটে নাগাদ আমার বাংলো খালি দেখতে চাই। গেট আউট।

মিঃ ক্রীগ থর থর করে কেঁপে উঠলেন। সহসা একি বজ্রাঘাত। আমতা আমতা করে বললেন—স্যার। আমার সঙ্গে বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের পাঁচ বছরের এগ্রিমেণ্ট ছিল। এখনো একবছর বাকি আছে।

আমি তোমাকে ব্রিচ অফ ট্রাস্টের অভিযোগে বরখাস্ত করলাম। এক-বছরের বেতন নিতে হলে তোমাকে কোর্টে যেতে হবে। মনে রাখবে—আমি একটা স্পাই পুষে রাখতে চাই না। আমার হুকুম যদি তামিল না হয় তাহলে কুলিবাথানের ছেলেদিকে বলতে বাধ্য হব যে তোমাদিকে মিঃ ক্রীগ যেমন বেইজ্জত করেছিল তোমরা তার বদলা নিয়ে নাও। গো—

মিঃ ক্রীগের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কুলিবাথান! মনসারাম! ওঃ হরিবল। আর ভাবতে পারলেন না।

পানমোহরা দাঙ্গার দুর্দান্ত ভিলেন এক কথায় বরখাস্ত হয়ে চলে গেলেন। উনি ত মনসারাম নন, কুলিবাথানের কুলি-কামিনও নন যে মাটিতে দাঁত কামড়ে লড়াই করবেন। মালিকের ক্ষমতাতেই ক্ষমতাবান। তখন তিনি বাঘ। না হলে ইঁদুর।

বাক্সো বিছানা বেঁধে হাওড়ার ট্রেনে চড়লেন। ওঁর মিসেস বললেন—জীবনে আর কখনও ইণ্ডিয়াতে আসবো না।

মিসেস ব্যারাকলউ যথাসময়ে এলেন। মিঃ ব্রাউন তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য এয়ার পোর্টে গিয়েছিলেন। উনি বৃদ্ধা হয়েছেন। বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে। তবু তিনি দৃঢ় এবং ঋজু। মিঃ ব্যারাকলউয়ের মত শরীরের মাংস ঝুলে পড়েনি। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। দাঁত নড়েনি। সারা-জীবন ধরে পরিমিত আহার ও পরিশীলিত জীবন যাপনের পুরস্কার তিনি পাচ্ছেন।

পানমোহরা বাংলোতে দুজনের মুখোমুখি সাক্ষাৎ যেন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মিঃ ব্যারাকলউয়ের পরনে ছিল সাদা ফুলপ্যাণ্ট ও ফুল শার্ট। লাল টাই। মুখটা পাথর খোদাই মূর্তির মত। রেখায় রেখায় কণ্টকিত। একটা হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মৃদু চুম্বন ও আলিঙ্গনের পর ড্রয়িং রুমে বসলেন।

রাস্তায় কোন কষ্ট হয়েছে কি না? যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের ক্ষয় ক্ষতি কেমন হয়েছে? মেয়ে জামাই ও নাতি নাতনীরা কেমন আছে? সেসব সৌজন্যমূলক খবরা-খবর বেশ শান্তভাবেই নিলেন। এতই শান্ত যে মনেই হয় না দীর্ঘদিন পর স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হচ্ছে।

বললেন—স্নান সেরে ফ্রেশ হও। একটু বিশ্রাম নাও। উনি আস্তে আস্তে উঠে অফিসের দিকে চললেন। মিসেসের ভিতরটা গুমরে উঠেছিল।

সিসিল বলেছিল—আজকাল ড্যাডির ব্যবহার আইদার টু কোল্ড অর টু হট। আবেগ বিহ্বল, উষ্ণ, আনন্দময় চরিত্রটাই হারিয়ে গেছে।

উনিও সেরকম আঁচ পেলেন। শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে। মানুষটা বড় কষ্টে আছে।

ডিনার টেবিলে বসার পূর্বে মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মিসেস সে ঘরে ঢুকলেন। উনি ওঁর দিকে তাকিয়ে বসবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর আবার কাগজ পড়তে লাগলেন। মিসেস বসলেন না একটু দাঁড়িয়ে থেকে ওঁকে দেখলেন। কাছে এলেন। ওঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন ডিয়ার। এতদিন পরে এলাম। কিছু কথা বল। না হয় রাগারাগি করে আমাকে গালমন্দ কর। কিন্তু এমন মুখ গোঁজ করে থেকো না। এতে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি।

ওঁর কথা শুনে মিঃ ব্যারাকলউয়ের ভিতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। খবরের কাগজটা নামিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন- কথা আমার ফুরিয়ে গেছে ডারলিং। তোমরা আমাকে শেষ করে দিয়েছ।

— তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

- না। আমি এখানেই মরব।

— প্লিজ। এভাবে কথা বোল না।

মিসেস ওঁর মুখে হাত চাপা দিলেন। বললেন—আমার কথাটা একবার ভাব। কি কষ্টে আছি তা কি বুঝতে পারছ?

—কি বুঝব? তুমি ব্রিটিশ মহিলা। ভেরি সফিসটিকেটেড চরিত্র তোমার। আমি ত তা নই। চল্লিশ বছর ইণ্ডিয়ার জলবায়ুতে থেকে ইণ্ডিয়ানদের মতই হয়ে গেছি। তোমাদিকে আমি বুঝি না।

মিসেন ওঁর পাশে বসলেন। ওঁর একটা হাত নিজের কোলে নিয়ে বললেন —সিসিল এখানে তিন মাস ধরনা দিয়ে গেল। তুমি গেলে না। ও যে কি কষ্ট নিয়ে গেছে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

— আই অ্যাম সরি— খুবই দুঃখিত। এখন আমি সবারই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আমার কষ্ট কেউ দেখে না।

— এমন কেন বলছ ডিয়ার? তোমার কষ্ট যাতে না হয় সেজন্যই আমি এসেছি।

মিঃ ব্যারাকলউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—না। মিসেস ব্যারাকলউ তুমি সেজন্য আসনি। তুমি এসেছ আমি প্রোপার্টি মর্টগেজ দিয়ে

টাকা ধার নিচ্ছি—এই খবরটা পেয়ে। যাতে তা বন্ধ করা যায়। কিন্তু তুমি জেনে রাখ যে বিশ্বাসঘাতক তোমাকে খবর দিয়েছিল তাকে ক্যালকাটা পোর্ট-এ ডেসপ্যাচ করে দিয়েছি।

—সে কি? মিঃ ক্রীগ নেই?

—না। ওকে ডিসমিস করেছি। এবং প্রোপার্টি মর্টগেজ দিয়ে টাকাও নিয়েছি। আর তোমার কিছু বলার আছে?

মিসেস ব্যারাকলউ কিছুক্ষণ শুম্ভিত হয়ে থেকে বললেন—তবুও আমি বন্ধ করতে পারি। প্রোপার্টি মর্টগেজ দেওয়ার আধিকার একা তোমার নেই। দেউলটিও একা তোমার নয় যে ঐ কবরখানায় অত টাকা ঢালছ। সাতদিনের মধ্যে আমি সব বন্ধ করে দিতে পারি।

মিঃ ব্যারাকলউ চাপা আক্রোশে গর্জন করে উঠলেন—এই ত! ভদ্র ও মার্জিত মুখোশ খুলে চিরাচরিত ব্রিটিশ চরিত্র বেরিয়ে এল। তোমার টাকায় ইণ্ডিয়াতে প্রোপার্টি করিনি। এ আমার স্বোপার্জিত সম্পদ। এতে তোমাদের কানাকড়িও অবদান নেই। তবু অন গুড ফেথ তোমাদিকে প্রোপার্টির অংশীদার করেছি। তা থেকে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করেছ। আমাকে দম বন্ধ করে মারার প্ল্যান করেছ। অল রাইট। আমি মরে গেলে আমার ডেডবডিটা কুলিবাথানে পাঠিয়ে দিও।

রাগে, ক্ষোভে উনি ধক্ ধক্ করে কাঁপছেন। মিসেসের মুখেও লেগেছে রাগের আঁচ। কড়া গলায় বললেন—স্টপ ইট। এসব বাজে কথা শুনবার জন্য আমি আসিনি। ছলনা, বঞ্চনা আমার অভিধানে নেই। তোমার সম্পদ গচ্ছিত আছে ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে। যেদিন খুশি পাই-পয়সা হিসেব করে নিয়ে নিও। আমরা শুধু ব্যাঙ্কের ট্রান্সফার বন্ধ করেছি। তাও দেশের স্বার্থে।

—দেশের স্বার্থে? ইণ্ডিয়াটা দেশ নয়? এখানকার মানুষদের খেতে পরতে হয় না? যাদের রক্তমাংস শোষণ করে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের যুদ্ধবাজ সেনাপতিরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে নরহত্যা চালায় তাদের স্বার্থটাই বড় হল তোমার কাছে। তার জন্য আমাকে দেউলিয়া বানিয়ে দিলে?

মিসেস ব্যারাকলউ শান্তভাবে বললেন—তুমি যদি নিজের কর্মদোষে দেউলিয়া হও তার দায়ী তো আমি নই। যাতে তুমি ধীরে সুস্থে ইণ্ডিয়ার ব্যবসা গুটিয়ে, সুখে স্বচ্ছন্দে হোমে ফিরতে পার তার সব ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু তুমি সেই টাকা দেউলটির কবরখানায় ঢাললে। তাতেও কুলোল না ত ঋণ করে দেউলিয়া হলে।

ঋণ করতে বাধ্য হয়েছি তোমাদের বিশ্বাসঘাতকার জন্য। তুমি সব সময়ে মনে কর তোমার হুকুমটাই শেষ কথা। আমার কোন মিশন নেই। কিন্তু জেনে রাখ মিঃ ব্যারাকলউ কারো হুকুম তামিল করার বান্দা নয়।

বলতে বলতে উনি উঠে পড়লেন। লাঠিটি হাতে নিয়ে বাগানে চলে গেলেন। মিসেস বসে রইলেন গুম হয়ে।

আবলুস কাঠের নিকষ কালো পালঙ্কের উপর পালকের বিছানা। ঝকঝকে বেড শীট। বড় বড় তাকিয়া। ফিকে নীল আলোর আভা। ঘর ভরা মৃদু সুগন্ধ।

মাথার দিকে বিরাট আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে মিঃ ব্যারাকলউয়ের ঘুমন্ত অবয়ব। ঘুমের ওযুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছেন। মিসেস বসে আছেন একটি চেয়ারে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও বিনিদ্র দুটি চোখ। দু আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট।

এই মানুষটাকে নিয়ে তিনি কি করবেন? ইনি ত শরীরে মনে অসুস্থ। যদি হোমে নিয়ে যেতে পারতেন তবে ভাল চিকিৎসা হত। সমুদ্রতীর বা পাহাড়ী অঞ্চল দেখে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকলে শরীরটা চাঙ্গা হত। আরো দশটা বছর বাঁচতেন।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোলেও মিঃ ব্যারাকলউয়ের খুব যে একটা গাঢ় ঘুম হয় তা নয়। ক্ষণে ক্ষণে ঘুম ভেঙে যায়। তেমনিভাবে ঘুমটা ভাঙলে পর নাকে লাগল পরিচিত তামাকের গন্ধ। তাকিয়ে দেখলেন তাঁর মিসেস নাইটি পরে একটা চেয়ারে বসে আছেন টেবিলের উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে।

উনি উঠলেন। মিসেসের কাছে দাঁড়ালেন। ওঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন ডারলিং তুমি এখনো বসে আছো? এসো শুয়ে পড়বে এসো।

মিসেস ব্যারাকলউ বিছানায় এসে বসলেন। ক্লান্ত ও বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—উদ্বেগ, অশান্তি ও আত্মপীড়ন করে কি পেলাম মিঃ ব্যারাকলউ?

উনি জবাব দিলেন না। মিসেসের কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

—যৌবনের সোনালী দিনগুলো ফুরিয়ে গেল রাগ-অভিমান ও টাকা রোজগারের চেষ্টায়। আজ যে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু তোমার জন্যই এসেছি তারও কিছু মূল্য দিতে রাজী নও তুমি। তবে কি আমার ভালবাসা মেকী?

মিঃ ব্যারাকলউ ভীষণ বিচলিত বোধ করলেন।

—আমি তোমাকে আজীবন ভালবেসেছি। তুমি ইণ্ডিয়াতে এসে ট্রাইবেল উওম্যানদের সেক্সে ডুবে গেছো জেনেও ডিভোর্স করিনি। স্ত্রী হয়ে সে ব্যভিচার সহ্য করেছি। তখন যদি তোমাকে ডিভোর্স করে নিজের দেশেই কারো সঙ্গে জোড় বাঁধতাম তবে একটা জীবন একা নিঃসঙ্গ হয়ে কাটাতে হত না। আমার এত ত্যাগ তিতিক্ষার কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে। কথাটা বুঝতে আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল।

জাঁদরেল ব্রিটিশ মহিলার হৃদয় গভীর ব্যথায় মুচড়ে মুচড়ে উঠলো। মুখ থেকে ফোঁপানির শব্দ বের হল এবং চোখ দুটো ভিজে গেল।

কিন্তু তাতে মিঃ ব্যারাকলউয়ের মন ভিজল না। তিনি কঠিনভাবে বললেন- তখন তুমি যদি আমাকে ডিভোর্স করতে তাহলে আমি বেঁচে যেতাম। আমাকে এত যন্ত্রণার শিকার হতে হত না। তোমাদের বিশ্বাস-ঘাতকতার কারণে সর্বস্বান্ত হতাম না।

মিসেস ব্যারাকলউ ব্যঙ্গ করে বললেন—তাহলে ঐ নাচ গার্লটাকে নিয়ে খুব স্ফূর্তিতে থাকতে।

-- শ্যাট আপ। ওকে নাচগার্ল বলে অপমান করো না। ওর চরিত্রে যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও উদারতা আছে তার কণামাত্র তোমার থাকলে আজ মিঃ ব্যারাকলউয়ের জীবনটা অন্যরকম হত'। ইউ স্টোন হার্টেড সেলফিস উওম্যান আজ আমার কাছে চোখের জল ফেলার অভিনয় করে আমাকে ডুবিয়ে দেবে মনে করেছো। আমার এত কষ্টের উপার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করে ভালবাসার ছলনা করতে এসেছে।

মিসেস ব্যারাকলউ রাগে ক্ষোভে চীৎকার করে উঠলেন—চুপ করো। প্লিজ। আমি শুনতে পারছি না।

দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন—আমি তোমার টাকা আত্মসাৎ করেছি? আমার কি টাকা নেই? আমি হ্যাগার্ড? তোমার টাকায় বড়লোকী করছি? ব্রুট! শয়তান।

মিঃ ব্যারাকলউ ওঁর রাগী মুখটার দিকে তাকিয়ে একটু কি ভাবলেন তারপর বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে তখন রাত ঝম্ ঝম্ করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। বড় দেওয়াল ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। হিমেল বাতাস বইছে। কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে বাগানের গাছপালা।

ভিতরটা কাঁপছে রাগে, ক্ষোভে, উত্তেজনায়।

মিসেস ব্যারাকলউ ওঁকে ডিভোর্সের কথা শোনাচ্ছেন। যেন কত দয়া করে তাঁকে স্বামী বলছেন। ফাকিন উওম্যান।

আমি মিঃ ব্যারাকলউ! কোন মেয়ের তোয়াক্কা করি না।

চাপাকণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন—এ্যাই চাপরাসী। ড্রাইভারকে বল গাড়ি বার করতে। আনি দেউলটি যাবো।

জীবন দেবতা যেমন রসিক প্রকৃতির তেমনি নিষ্ঠুর। পাপ পুণ্যের ফল পেতে পর-জন্মের প্রতীক্ষায় থাকতে হয় না। এ জন্মেই শোধ হয়ে যায়।

তাই পাপ ও প্রবৃত্তির খেসারৎ গুণছেন মিঃ হবস। দেউলটি বিস্ফোরণের কুটিল চরিত্র। পদচ্যুত, বিতাড়িত, মাতাল, যৌনব্যাধিগ্রস্ত মানুষটা ক্ষুধায়,

দারিদ্র্যে, রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে মৃত্যুর জন্য দিন গুণছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ বিষাক্ত হয়ে গেছে। অসহ্য জ্বালায় পুড়ে মরছেন।

তাঁর স্ত্রী এসেছেন মিঃ ব্যারাকলউয়ের কাছে। পরনে মলিন ও জীর্ণ একটা স্কার্ট ফ্রক। চুল উড়ছে ফর ফর করে। মুখে বিষাদের কালিমা। লাবণ্যহীন ত্বক মাংস এবং জর্জরিত হৃদয়।

মিঃ ব্যাবাকলউ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে ?

—আমি মিসেস হবস।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে উনি বললেন—আই সি ! তুমি একটা বৃটিশ মহিলা। পরাধীন দেশে শাসকশ্রেণীর কোন মহিলার সর্বাঙ্গে এমন দারিদ্র্যের বিজ্ঞাপন বড়ই অসহ্য।

—আমি খুব দুঃখেই আছি মিস্টার ব্যারাকলউ।

--আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি ?

—আমার স্বামী মৃত্যু শয্যায়। তাঁকে আপনার কাছে আনা সম্ভব নয়। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি একবার তাঁকে দেখবার জন্য আসুন।

—ও একটা নষ্ট চরিত্রের মানুষ। নিজের দোষে মরতে বসেছে। আমি তাকে দেখতে যাবো কেন ?

—ওর কিছু বক্তব্য আছে। যা শুনলে আপনার কিছু কাজে লাগবে।

—তার চেয়ে তুমি নিজের কথা বল। অমন একটা বাজে লোককে আঁকড়ে ধরে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ কেন ? শুনেছি তোমার একটা ছেলে আছে। তাকে বাঁচাও। মিঃ হবসকে ত্যাগ কর।

—ও আর কটা দিন বাঁচবে ? শেষ সময়ে তাকে ত্যাগ করলে লর্ড যীশাস ক্রাইস্ট আমাকে ক্ষমা করবেন না।

— তবে তুমি কি চাও ?

—তিনি যাতে শান্তিতে মরতে পারেন তার জন্য যেটুকু করা সম্ভব।

—তাতে আমার কি করার আছে ?

—একবার আসুন স্যার। উনি কিছু বলতে চান।

— আচ্ছা কাল যাবো।

—ধন্যবাদ স্যার।

ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গেট পেরিয়ে গেলেন উনি।

মিঃ ব্যারাকলউ ঠোঁট ওল্টালেন। ব্লাডি হবস। এমন স্ত্রী বর্তমান থাকতেও বেশ্যালয় থেকে রোগ কিনে আনল। কোন একটা কোম্পানীতে ভালভাবে চাকরি করল না। ননসেন্স্। বৃটিশ জাতির কলঙ্ক।

কিন্তু এমন একটা নষ্ট ভ্রষ্ট দূষিত রোগজীর্ণ মুমূর্ষু মানুষকেও কেউ ভালবাসতে পারে ? কি আশ্চর্য !

অথচ তিনি যে একটা বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, কোটি কোটি টাকার মূলধন ও বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করলেন তবু ভালবাসার কাঙাল হয়েই রইলেন।

যদিবা একবার ভালবাসা এসেছিল, তাকে ত্যাগ করতে হল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। কি হল? জীবন খরচ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া। আজকের মিঃ ব্যারাকলউ একজন দেউলিয়া শিল্পপতি। আর যিনি তাঁকে দেউলিয়া বানিয়েছেন সেই রমণী এখন এই পানমোহরা বাংলোতেই আছেন, প্রেমের অভিনয় করছেন জীবনের বাকি রসটুকু চুষে খেতে।

মানুষের জীবনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হচ্ছে স্নেহ ভালবাসার আধার। অথচ স্বার্থপরতার কুটিল লিপ্সায় তারাই হল শত্রু।

না। আমি তাঁর সঙ্গে হোমে ফিরব না। তাতে যদি বিবাহিত জীবন বিচ্ছিন্ন হয় ত হোক। সারাজীবন হুকুম তামিল করে যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছি। আজ মিঃ হবসের যা আছে আমার তা নেই।

পরদিন লাঞ্চের পর তিনি মিঃ হবসকে দেখতে গেলেন। চঞ্চলবাবু ওঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য কিন্তু একটা পুরনো কোয়ার্টার দিয়েছেন থাকতে।

পরের অনুগ্রহে বাস করছেন। তাঁর স্ত্রী ওঁর প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। তিনি মিঃ হবসের কাছে নিয়ে গেলেন। একটা চেয়ার এনে বসতে দিলেন।

মিঃ হবস তখন শয্যায় লীন হয়ে গেছেন। শরীর কঙ্কালসার। মুখের হনু বাইরে ঠেলে বেরিয়েছে। চোখ দুটি ঘোলাটে।

ওঁর ছেলেটি তখন চলতে ও বলতে শিখেছে। জীর্ণ শীর্ণ অপুষ্টিতে ভোগা রুগী। তাকে দেখে মিঃ ব্যারাকলউয়ের মনে করুণার উদ্রেক হল। মিসেস হবসকে বললেন -তোমাদের যে এমন দুর্গতি হয়েছে তা আমাকে আগে বলোনি কেন?

উনি বললেন—আমার স্বামী আপনার কাছে যাবার মত মুখ রাখেননি।

—মিঃ হবস। তুমি একটা ক্রিমিন্যাল।

— তার চেয়েও বেশি স্যার।

—তার মানে?

—আমি এক মহাপাপী। আপনার কাছে স্বীকারোক্তি দেবার জন্যই মিসেসকে পাঠিয়েছিলাম। আমি জানি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এ অপরাধের ক্ষমা নেই। তবু ক্ষমা ভিক্ষা করছি শান্তিতে মরার জন্য।

—কি বলতে চাও তুমি ?

—দেউলটি খাদের মৃতদেহগুলি যেভাবে সৎকার করছেন আমার মৃতদেহটাও তেমনিভাবে সৎকার করিয়ে দেবেন স্যার।

—হোয়াই ? তুমি যদি মারা যাও তাহলে আমি খ্রীষ্টধর্ম মতেই তোমাকে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করব।

না স্যার। ওদের যে গতি হয়েছে আমারও যেন তাই হয়।

—হাউ ষ্ট্রেঞ্জ ! তোমার বক্তব্য পরিষ্কার কর।

মিঃ হবস বার কয়েক দম নিয়ে বললেন—স্যার ! সিসিল আমাকে ভীষণ অপমান করেছিল। সেজন্য মনের মধ্যে হিংসা ও প্রতিশোধ বাসনা ধ্বক্ ধ্বক্ করতো। আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। তখন পেয়ে গেলাম লঙ্কাকে। স্ত্রী পুত্র হারিয়ে প্রায় উন্মাদ এক জাহান্নামের মুসাফির। একটা সাংঘাতিক প্ল্যান করলাম তাকে দিয়ে আপনার দেউলটি খাদে আগুন ধরিয়ে দেবার। তাহলে আপনার খাদ বন্ধ হয়ে যাবে, বিপুল ক্ষতি হবে। কিন্তু একবারও ভাবিনি যে বিস্ফোরণ হয়ে যাবে। এতগুলি প্রাণহানি হবে। কিন্তু তাই ঘটে গেল স্যার। লঙ্কা আর ফিরলো না। সে খাদের বিস্ফোরণে খতম হয়ে গেল। আর আমি তিল তিল করে ক্ষয়ে যেতে যেতে মরণের দুয়ারে পৌঁছে গেছি। রোগ হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা করাইনি।

মিঃ ব্যারাকলউ স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন। যেন কোন অবিশ্বাস্য কাহিনী। একটু পর বললেন—মাইগড ! তুমিই সেই শয়তান।

—আমাকে শাস্তি দিন স্যার।

—আমি তোমাকে কি শাস্তি দেবো ? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। তিনি উঠে পড়লেন। মিসেস হবস তাঁর পিছনে আসছিলেন। তাঁকে বললেন এই পাপটা যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় ততই মঙ্গল।

—ওকে কি আপনি ক্ষমা করতে পারবেন না স্যার ?

—না। তবে ওর শেষ ইচ্ছা আমি পূরণ করব। ওর মৃতদেহ দেউলটি গণচিতাতেই দাহন করা হবে কারণ সে স্বীকারোক্তি দিয়ে আমার অনেক অনুসন্ধিৎসার জবাব দিয়েছে।

উনি চলে গেলেন।

মিসেস হবস তাঁর শিশু সন্তানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন বিষাদ প্রতিমার মতই।

বিশাল ডাইনিং টেবিলের এক প্রান্তে পাশাপাশি দুজন খেতে বসেছেন—মিঃ ও মিসেস ব্যারাকলউ। দুজনেই চুপচাপ। কথাবার্তা সামান্য। খাওয়াও সামান্য।

ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মিসেস ব্যারাকলউ বললেন—আমি আর কতদিন ইণ্ডিয়ায় বসে থাকবো ?

উনি কেমন উদাসীনভাবে বললেন—তার ত কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমাকে বলে আসোনি যে আমি তোমার যাবার ব্যবস্থা করবো।

—কিন্তু আমি ত তোমার জন্যই এসেছি—তোমাকে নিয়ে যেতে।

—তোমার ও মিশনটা ব্যর্থ হয়েছে ধরে নিতে পারো।

—যীশাস ক্রাইস্ট! এখনো তোমার রাগ পড়ল না।

--আমি খুব দুঃখিত। এখানে আমার অনেক কাজ।

উনি উঠে পড়লেন। মিসেস ব্যারাকলউ অনুযোগের ভঙ্গীতে বললেন—স্ত্রী কন্যাদের এত অনুনয় বিনয় মূল্যহীন।

—নো। স্ত্রী কন্যাদিকে অমি অনেক মুল্য দিয়েছি। বিষয় সম্পত্তি, মূলধনী বিনিয়োগ সব এখন তাদের। জীবনের বনিয়াদটাই ধ্বসে গেছে ওদের জন্য। এবার রেহাই দাও। প্লিজ! আমাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোর না।

দুটো হাত দিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গী করলেন।

মিসেস বললেন--তুমি এমন করছো যেন সবকিছুর জন্য আমরা দায়ী।

—ইয়েস। দায়িত্ব ত আছেই। দেউলটি বিস্ফোরণের পশ্চাতে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেখানে সিসিল একটা চরিত্র। তার ব্যভিচারিতার কারণে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। তুমি আমাকে একটা টাকা রোজগারের মেসিন বানালে। আমি সারাজীবন টাকার গোলামি করে অবশেষে গোলামের মতই পরিত্যাজ্য হলাম।

তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়। সব সময়ে রেগে আছো।

- স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক জীবনের বন্ধন কত দৃঢ় হতে পারে তা দেখে এসো মিসেস হবসের কাছে।

—লুক্ হিয়ার! তুমি আমাকে আজেবাজে মেয়ের সঙ্গে তুলনা কোর না। সেদিন ঐ নাচগার্লটার সঙ্গে তুলনা করলে আজ আবার মিসেস হবস। তুমি মনে কর কি ?

—যা মনে করি বলে দিয়েছি। আর কিছু বলার নেই।

চলতে শুরু করে দিলেন। তাঁর সংগ্রহশালাটির দিকে। সেখানেই আছে প্রাগৈতিহাসিক জীবনের ফসিলস্!

সাতষট্টি

সরিতা তৈরি হয়েই এসেছে। কলকাতায় চাকরি যোগাড় করে বাড়ি ভাড়া

নিয়েছে। কাবেরী ও ওস্তাদজীকে নিয়ে যাবে। সঙ্গীত শিক্ষার একটা বিদ্যালয় খুলবে।

ওর পরিকল্পনা শুনে ত কাবেরী থ। একি বলছে সরিতা? তাকে বসবাস উঠিয়ে চলে যেতে হবে।

বলল তাহলে তোর বিয়ের কি হবে?

—বিয়ে হবে না মা।

—কেন?

—সে অনেক কথা। সাদা চামড়ার সাহেবদের সঙ্গে কি আমাদের মত নেটিভের বিয়ে হয়?

—তোর এতদিনের ভালবাসা।

—হৃদয় জুড়ে আছে সেখানেই থাক।

—সে আবার কি কথা?

—অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না।

—তোর বাবাকে ত বলতে হবে।

—তা বলতে পার।

—সাহেবকেও জানাতে হবে।

—না। তার কোন প্রয়োজন নেই।

—সেকি?

কেমন জলন্তভাবে সরিতা ওর দিকে তাকিয়ে বলল—ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

কাবেরী স্তব্ধ হয়ে গেল। এ প্রশ্নের উত্তর সন্তানকে দেওয়া যায় না। বড় বিপন্ন বোধ করল।

সরিতা বলল—মা। আমি এমন একটা জীবন শুরু করতে চাই যেখানে ব্যারাকলউ সাহেবের ছায়া থাকবে না। আমি ভারতবাসী। ভারতের রমণী আমার জননী। সর্বংসহা মাতৃমূর্তি তুমি। গরলকে অমৃত করেছ। সেই অমৃত মাথায় নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

খবর পেয়েই জয় ছুটে এল। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সরিতা কাবেরীকে নিয়ে যাবে। তাহলে তার কি হবে? তার জীবনে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হারিয়ে গেলে যে জীবনটা বাক্সবন্দী হয়ে যাবে। অজয়ের চোরাবালিতে আবার যদি ডুবে যায় তাহলে কে তাকে টেনে তুলবে?

তড়িঘড়ি কাবেরী কুটিরে এসে আলুথালু বিভ্রান্ত কাবেরীকে দেখে আরো হতভম্ব হয়ে পড়ল। কেমন মিইয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরে সরিতাকে বলল—কেন খুকি? সবকিছু উল্টে দেবার ভাবনা কেন করছিস?

—ভাবনা নয় বাবা। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।

—তার আগে ত আমাকে একটা কথা বলবি।

—গতবারে মাকে আমি বলে গেছি।

কাবেরী বলল—আমি ওটা কথার কথা মনে করেছিলাম। তুই যে সত্যি সত্যি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে আসবি তা বুঝতে পারিনি।

জয় বলল—তুই এখানকার বাস তুলে দিতে বলছিস, ব্যারাকলউ সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলছিস—এসব কথায় আমার ষোলো আনা মত আছে। কিন্তু সে যেমন তোর মা তেমনি আমারও তো স্ত্রী। আমার কি কোন অধিকার নেই?

সরিতা রাগের সঙ্গে বলল—ছাখো এত কথার মারপ্যাঁচ আমার ভাল লাগে না। মা যদি যেতে না চায় ত যাবে না। আমি কি তাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি?

—আগা! রাগছিস কেন?

—তোমার উপর ত আমার কোন রাগ নেই বাবা। কিন্তু একদিন তোমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মা সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে এখানে চলে এসেছিল। তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখবে? সেও তো কঠিন বিডম্বনা।

জয় খুব দৃঢ়কণ্ঠে বলল—হোক বিড়ম্বনা। সমাজে আমি আজও পতিত। সমাজপতিদের ভ্রূকুটিকেও পরোয়া করি না। যখন আমাদের গামছা মাত্র সম্বল ছিল তখনই তাদের তোয়াক্কা করিনি ত আজ করব? আমি কয়লা-কুলির সমাজ নিয়ে থাকব। যে সমাজ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে, সন্তানকে পর করে তাতে আমার প্রয়োজন নেই।

কাবেরী ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। এই জয় তার অপরিচিত নয়। এমন কথা তার কাছে অনেকবার শুনেছে। কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি। আজ তার মনের দ্বন্দ্ব কেটে গেল। জয়কে স্বামী বলে প্রণাম করতে ইচ্ছা হল।

সরিতা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে এ বাড়ি ছাড়তে হবে—এই বলে দিলাম।

—আচ্ছা তাই হবে।

সব গোছগাছ করে তৈরি হতে সপ্তাহ খানেক লাগল। অজয় ভ্যালিতে জয় ওর বাংলো রঙ করার জন্য মিস্ত্রী লাগিয়েছে। সেখানেই কাবেরীকে নিয়ে যাবে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য জয়ন্তীকে আসানসোলে থাকতে হবে। তাছাড়া নিজের বাড়ি। আসানসোল ক্রমশই বড় শহর হতে চলেছে, একি ছাড়া যায়?

সকালবেলা। দু-খানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জয় মালপত্র বোঝাই করাচ্ছে। মতি সিং ঠায় বসে আছে। টুসী টুক টাক কাজ সারছে।

ওদের বুক ভারি হয়ে গেছে। চোখের কোলে জল টল টল করছে। একটা ছুতো নাতা পেলেই হু হু করে বইবে।

স্নান ও ঠাকুর পুজো করে কাবেরী তৈরি। এবার মদনমোহন ঠাকুরটিকে কোলে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়লেই হল।

হঠাৎ ব্যারাকলউ সাহেবের গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। মতি সিং ওঁকে সেলাম করে গেট খুলে দিল। সাহেব গাড়ি থেকে নামতেই জয় ওকে সেলাম করে সরে পড়ল। কাবেরী ওকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

সাহেব একাই ছিলেন। ঘরে ঢুকে আসবাবপত্রহীন ফাঁকা ঘর ধুলোবালি, পুরনো কাগজের উড়ে বেড়ানো, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাঙাচোরা জিনিসপত্র, বাঁধা ছাঁদা মালপত্র ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই করার দৃশ্য দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন

—কি ব্যাপার ? কোথাও যাচ্ছো বুঝি ?

—হ্যাঁ সাহেব। এখানকার বাস তুলে দিচ্ছি।

—সে কি ? হঠাৎ—

কাবেরী বিব্রত ও বিনীত ভঙ্গীতে বলল—সরিতা চাইল না যে আমি এখানে থাকি। জয় ওর কথাতেই সায় দিল। স্বামী সন্তানের কথা তো উপেক্ষা করতে পারি না সাহেব।

সাহেব কি রকম উষ্মার কণ্ঠে বললেন—স্বামী ! এই একটা ভুলের খেসারৎ যে এত ভারি হয়ে উঠবে তা কখনও বুঝিনি।

সরিতা কোথায় ?

—ও কুলিবাথান গেছে।

—কুলিবাথান ? ওখানে কেন ?

— মনসারাম ওকে বার বার বলত—দিদি আমাদের গরিব ঘরে একবার যেও। আমার বউ তোমাকে দেখলে হাতে চাঁদ পাবে। তাই ও বলল এখান-কার বসবাস তুলে দেবার পর ত আসা হবে না।

মতি সিং একটা কাঠের চেয়ার এনে দিল। সাহেব বসতে বসতে বললেন।

—ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়ে গেছে তা ত জানতাম না।

—মেয়ে খুব জিদ ধরল।

—বুঝতে পেরেছি।

কাবেরী ওর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—একদিন তুমি আমাকে হাতে ধরে এনে এই বাড়িতে রেখে গিয়ে-ছিলে। আজ যাবার দিনেও ঠিক সময়ে এসে পড়লে। এ যে আমার সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য, গর্ব না দুঃখ তাই বুঝে উঠতে পারছি না।

বলতে বলতে কাবেরীর গলা ভারি হয়ে এল। চোখ মুছতে মুছতে সরে

গেল। সাহেব গুম হয়ে বসে আছেন। তাঁর মগজটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। এমন দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেননি।

একটু পর কাবেরী এক গ্লাস ফলের রস এনে দিল। তাতে উনি চুমুক দিয়ে বললেন তুমি এখানে থাকতে ত আমার মনে হত কাবেরী আছে। মৃত্যু যদি ডাক দেয় সে এসে আমার শিয়রে দাঁড়াবে। শেষ মুহূর্তে একটু ভালবাসার ছোঁয়া পাব। এটা আমার বড় ভরসা ছিল আজ তাও টুটে গেল। আমি আরো একা হয়ে গেলাম।

সাহেবের চোখ ফেটে জল বেরুবার উপক্রম হল। কাবেরী কেঁদে ফেলল। চোখ মুছে বলল—এমন করে কথা বোল না সাহেব! আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

উনি খুবই অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—কাবো জন্যেই কিছু করতে পারলাম না। অথচ ইচ্ছা ছিল অনেক কিছু করার। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। টাকা রোজগারের মেসিনের মতই কেটে গেল একটা জীবন। তা যে এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে তা কে জানত?

কাবেরী ওঁর কাছে দাঁড়িয়ে বলল—যা হবার হয়ে গেছে। এসব ভেবে কি করবে?

—কিছুই করার নেই। তোমাকে আমার চিনতে অনেক দেরি হয়েছিল। অনেক আঘাত দিয়েছি। কোন মানুষ যে তার ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে তার উদাহরণ আমি। জীবনের দুঃখ বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এ জীবনে আর শান্তি পাব না।

—ওঃ সাহেব! তোমার মত একটা এতবড় মাপের মানুষ, এমন জবরদস্ত মালিক একটা মেয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছো।

সাহেব একটু হাসলেন। ঘাড় নেড়ে বললেন—তুমি কি শুধুই মেয়ে? তুমি যে প্রেরণার উৎস। যাক্ গে—তোমার কিছু বলার আছে?

কাবেরী একটু ভেবে বলল—কি বলব? সেদিন তোমার সঙ্গে বড্ড রাগারাগি হয়ে গেছে। সেই থেকে মনে বড় কষ্ট পেয়েছি। তুমি ওসব কথা মনে রেখো না।

—রাগ যে কেন করতাম তা তখন বুঝিনি। আজ বুঝি। আমি প্রতি নিয়তই তোমাকে চাইতাম কিন্তু পেতাম না। এই না পাওয়ার ব্যথা ভিতরে জ্বালা ধরাতো, রাগ জন্মাতো। আর রাগের কি আছে? সব তো শেষ হয়ে গেল।

কাবেরী অনেকক্ষণ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে করে বলল তোমার শরীর খারাপ। তুমিও হোমে ফিরে যাও।

—না কাবেরী। হোম আমার কাছ থেকে চলে গেছে। গতকাল মিসেস ব্যারাকলউকে বিদায় করে দিয়েছি।

—সেকি সাহেব ? বিদায় মানে—কি রকম বিদায় ?

—জীবন থেকেই। ওকে ডিভোর্সের ব্যাপার চূড়ান্ত করতে বলে দিয়েছি।

কাবেরী আকাশ থেকে পড়ল। অনেকক্ষণ লাগল নিজেকে সামলে নিতে। তারপর বলল—এমন কি হল সাহেব যে বৃদ্ধ বয়সে ডিভোর্স করার সিদ্ধান্ত নিলে ?

—এই সিদ্ধান্তটা নিতে অনেক দেরি হয়ে গেল ; আমার সবকিছুই বড় দেরিতে হয়। অথচ শেরগড়ের সাহেব কোটাতে যদি তার চাপের কাছে নতি স্বীকার না করতাম। তোমাকে বিয়ে করতাম তবে আমাকে সারাটা জীবন যন্ত্রণা পেতে হত না। হয়ত দেউলটি বিস্ফোরণ ঘটত না। আমাকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মড়া তোলার কাজ করতে হত না। সরিতার বিয়ে ভাঙত না। ওদের ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটত না।

কাবেরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে মেঝের উপর বলে পড়ল। বলল—তুমি জানো সরিতার বিয়েটা কেন ভাঙলো ?

—হ্যাঁ। আমার প্রতি শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে মিঃ টেলার ওকে জারজ সন্তান বলেছেন।

কপালে করাঘাত করে কাবেরী বলল—হে ভগবান ! শেষে তুমি আমার পাপের ভার আমার মেয়ের মাথায় চড়িয়ে দিলে।

মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

সাহেব বললেন—ভেঙে পড়ো না কাবেরী। এখনো আমরা ওর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারি।

—কি করে ?

—ওকে আমি লিগ্যাল চাইল্ডের আইডেনটিটি দেবো।

—তাই কি হয় সাহেব ?

—হয়। আমার তো ডিভোর্স হয়েই যাচ্ছে। তুমি জয়কে বলো। ওর যাবতীয় দেনা পাওনা মিটিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করে দেবো। ও শুধু তোমাকে ছেড়ে দিক ; তারপর আমি তোমাকে বিয়ে করব।

কাবেরী চমকে উঠল। তড়াক করে দাঁড়িয়ে বলল—না-না। এমন কথা ভেবো না সাহেব। জয় আমার স্বামী। তাকে আমি ভাসিয়ে দিতে পারব না। তুমি যাও। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

বলতে বলতে বিহ্বল, বিধ্বস্তভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মিঃ ব্যারাকলউ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে পড়লেন। স্খলিত পায়ে টাল খেতে খেতে বেরিয়ে গেলেন।

আটষট্টি

সরিতা কুলিবাথানে এসেছে—এটা ওদের কাছে মস্ত খবর। তারপরে সে দিনটা ছিল রবিবার। ছুটির দিন। কুলিবাথানেও সেই ছুটির আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। সরিতার খাতিরে দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর ডুমুর-তলার কালী থানে হারমোনিয়াম ডুগি তবলা নিয়ে বসে পড়ল কুলি-কামিনের দল। পুরনো দিনের নামকরা নাচুনি ও বাজনদাররাও আছে। যেদিন থেকে পেটে ভাত জুটেছে সেদিন থেকে গলাতেও গান খুলেছে। সরিতাকে ওরা গান না শুনিয়ে ছাড়বে না।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপমান ও নির্যাতনকে জয় করে এখানকার মানুষ কত অনায়াসে জীবন দেবতার পূজো করে তাই দেখে সরিতা অবাক হয়ে গেছে। সে ওদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ। ছেঁড়া তালাইয়ে বসে পড়েছে ওদের নাচগান দেখতে। তার পাশেই আছে বৈশাখী ও শান্তি। যেন এক পরিবারের ননদ ভাজ। তেমনি মধুর সম্পর্ক ওদের।

একটি মেয়ে ভাদু ধরেছে —

> কয়লা কেটে, খাদে খেটে ভাদুর হল ব্যারাম
> ওষুধ নাই; পথ্য নাই, ভুগে ভুগে লবেজান।
> সাহেববাবু জুতা মারে সুদখোরে গুঁতা মারে
> হাড় মাংস সিজে ভিজে গেল ভাদুর জানমান।

গানটি বড় মর্মস্পর্শী এবং ভাদুটি যেন তাদের ইমেজ। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার দুঃখ ক্লেশ ও বেদনা ঝরে পড়ছে সেই গানের সুরে এবং কথায়। সরিতা মুগ্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ শোনা গেল অশ্বক্ষুরধ্বনি। চঞ্চলা জোড় পার হয়ে ছুটে আসছে এক সাহেব ঘোড় সওয়ার।

আজকাল কুলিবাথানের মেয়েরা সাহেব দেখলে ভয় পায় না। ঘোড় সওয়ারকেও পরোয়া করে না। মনসারাম তাদেরকে এই একটা জগৎ এনে দিয়েছে।

কিন্তু সরিতার হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল। ঘোড় সওয়ারটি ছিল রবার্ট টেলার। তাকে সে দূর থেকেই চিনেছে।

সে ঘোড়া থেকে নেমে ঘর্মাক্ত মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল—হাই ডারলিং। তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। ঈশ্বরের অপার করুণা যে এখানে তোমাকে পেয়ে গেলাম। ওহ্! মাইগড়!

হাতের চওড়া পাঞ্জা এগিয়ে সরিতার কাছে এল উদ্ভাসিত মুখে। সরিতা খুব কষ্টে নিজেকে কঠিন আবরণে মুড়ে হাত গুটিয়ে রাখল। তবু রবার্ট শুধু আবেগের উচ্ছ্বাসে ওর হাতটা ধরে চুমু গেল।

সরিতার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। অব্যক্ত জ্বালায় বুকের ভিতরটা কন্ কন্ করে উঠল। এই সরল সুন্দর প্রেমিককে সে প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? ওকে দেখলেই যে বুকে দামোদরের বান ভাসি হয়। না জানি তাকে খড়কুটোর মত উড়িয়েই নিয়ে যাবে কি না?

জোর করে মুখে কাঠিন্য এনে বলল—তুমি এখানে এলে কেন রবার্ট?

—তোমাকে খুঁজতে।

—আমাকে খোঁজার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে?

—ওহ্—সিওর। দারুণ খবর আছে।

—কোন খবরে প্রয়োজন নেই। তুমি যেতে পারো।

—হোয়াট?

চলতে চলতে হোঁচট খাওয়ার মত চমকে গেল ও। তারপর দু'কাঁধ শ্রাগ করে বলল—তুমি আমাকে ধুলোপায়ে বিদায় করে দেবে? আমি যে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে এলাম ত বসতে দেবে না? দুটো কথা বলবে না? এত নিষ্ঠুর তুমি।

—এখানে তোমাকে কে আসতে বলেছে?

—মতি সিং। তোমার মা চলে গেছেন। ঘর ফাঁকা। মতি সিং বলল—তুমি কুলিবাথানে এসেছো।

—তোমার এত কষ্টের কোন প্রয়োজন ছিল না।

—মাই ডারলিং! তুমি কেন রাগ করছো? আমি কি দোষ করেছি? দেখো সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। এখনো লাঞ্চ করিনি। আর তুমি আমাকে যেতে পারো বলে দিলে। আমার কষ্টটা বুঝলে না? তুমি দুটো কথা বললে যে আমার সব কষ্ট উবে যেত তাও বুঝলে না?

সরিতার ভিতরে তখন গুর গুর শব্দে ডায়নামো চলছে। ক্রমাগত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে। বুঝি বা নেগেটিভ পজিটিভ সর্ট সার্কিট হয়ে স্পার্ক দিতে শুরু করে এবার।

বহুকষ্টে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সে বলল—এখানে সিন ক্রিয়েট কর না রবার্ট। তুমি যাও।

—না। তোমাকে না নিয়ে যাব না।

—জোর করে নিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ।

—এত সাহস তোমার? কুলিবাথান থেকে সরিতাকে নিয়ে যাবে জোর করে?

—সিওর।

রবার্ট ওর দাঁত দুটো চেপে ধরল। সরিতা বুঝি ভেঙেই গেল। থর থর

করে কাঁপছে ও। ঘন ঘন হাঁফাচ্ছে। শেষবারের মত ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে বলল - কি মনে কর কি? সরিতা খুব সস্তা মেয়ে। তাকে জোর করে নিয়ে যাবে। এত স্পর্ধা তোমার।

রুদ্রমূর্তি ধরে ফেলল। রবার্ট যেন ইলেকট্রিক শক খেল। তেমনি ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে গেল স্তম্ভের মতন। সরিতার রূপের ও চরিত্রের একটা প্রখর মাত্রা তার সামনে প্রকট হয়ে উঠল।

ঘাড় নিচু করে বলল—আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত। তোমার গায়ে হাত দেওয়া উচিত হয়নি।

সরিতা তখন শেষ হয়ে এসেছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঘন ঘন কাঁপছে, হাফাচ্ছে। রবার্ট যদি আর একবার সাহস করে ওকে ধরতে পারত তবে ওর বুকেই এলিয়ে পড়ত।

কিন্তু রবার্ট তা পারল না। বলল—সেইদিন তুমি চলে আসার পর থেকেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। সেটা তুমি বুঝলে না। বাবার একটা আলগা কথার গুরুত্ব হল বেশি।

—ইয়েস। তোমার বাবা যেভাবে আমাকে ও আমার মাকে অপমান করেছেন তারপর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলে না।

—আমি দুঃখিত। বাবার হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

না রবার্ট। তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। আমি বিয়ে করব না।

রবার্ট আস্তে আস্তে ঘোড়ার কাছে গেল। ক্লান্ত ও আহত সৈনিকের মত ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেল।

সরিতা টাল খেতে খেতে পড়ল ছেঁড়া তালাইটিতে। তার চোখের সামনে জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে গেছে। এতদিনের মানসিক প্রস্তুতি ভেঙে গেল বাঁধ ভাঙা অশ্রুপ্রবাহে। অতবড় শিক্ষিতা, আধুনিকা, পাশ্চাত্য ভাবধারায় লালিতা রূপসী যুবতীটি ভেঙে পড়েছে ডহল বিফল কান্নায়।

থেমে গেছে নাচগান, বাদ্যবাজনা, উৎসবের কোলাহল। সরিতার ব্যথায় সবাই ব্যথিত।

বৈশাখী ওর কয়লা কাটা কঠিন হাতে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। ভাঙা গলায় বলল—ভালবাসা কি সহজে আসে বুন? নাকি তাকে দূর দূর করে তাড়াতে হয়? বিটিছিলার কি ভালবাসার উপরে কিছু আছে? ঈ জিনিস যার না আছে তার সারা জীবন খরার মত শুকনা।

দেউলটি খাদের দৃশ্যটি বড়ই ভয়াবহ। ভাঙাচোরা কাঠ খুঁটি, ধ্বসে পড়া পাথর ও কয়লার পুঞ্জ পুঞ্জ স্তূপ, কল কাদা ও বাঁকাচোরা যন্ত্রপাতির মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা নরকঙ্কাল। কোনটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে, কোনটার অঙ্গ-প্রতঙ্গ খুলে গেছে, কোনটা বা ভেঙেচুরে তপরখানা। দুর্গন্ধে তিষ্টানো দায়। পুরো

আবহমণ্ডল বিষাক্ত। বাতাসের তীব্রতা বাড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে গ্যাস পরীক্ষা করার পর এক কদম এক কদম করে এগোতে হয়। সব সময় ভয়ে গা ছম ছম করে। আতঙ্কের এক শীতল স্রোত সুষুম্না কাণ্ড বেয়ে উঠতে উঠতে স্নায়ুমণ্ডলীকে শিথিল করে দেয়। যারা সেখানে কাজ করে তাদের রাত্রে ঘুম হয় না। খাওয়ায় রুচি হয় না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে। বীভৎস নরকঙ্কালের দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠে।

মড়া ওঠানো ও দাহন করার কাজ করতে-করতে মনসারাম কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গেছে। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, দাড়িতে জট পেকেছে, চোখ দুটি কোটরগত, গায়ের রঙটা কালো জং ধরা লোহায় মত দেখাচ্ছে। গা থেকে পচা মড়ার দুর্গন্ধ উঠেছে। ছেলেপুলেরাও কাছে যেতে ভয় পায়।

কালো বাউরী ঢুক্-ঢুক্ করে মহুয়া পান করায় তাতেই ওর ভিতরটা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়।

তখন মধ্যরাত্রি। শীতের বাতাস বইছে হু হু করে। দামোদরের বুকে সারি সারি চিতা জ্বলছে। একটা মড়া পুড়ে শেষ হচ্ছে ত আরেকটি এনে চড়িয়ে দিচ্ছে। চটে জড়ানো মৃতদেহগুলিও রাখা আছে কাছাকাছি।

জুমড়ো কাঠ হাতে মনসারাম দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রের মত। মনে মনে হিসাব করছিল আজ পর্যন্ত কত মড়া হল ?

তা প্রায় তিনশো ছাপ্পান্ন। খাদের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। একসঙ্গে অনেক লোক কাজ করার জায়গা হয়েছে। দলে দলে ভাগ করে দিয়েছে মড়া ওঠানোর কাজে।

খাদের হলেজ, ডুলি চালু আছে। চট দিয়ে বেঁধে-ছেঁদে টব-গাড়িতে চড়িয়ে দিলেই উপর পর্যন্ত এসে যায়। তারপর গরুর গাড়িতে চড়িয়ে শ্মশানে আনা হয়। গণ-চিতায় দাহন হয়।

প্রথম দিকে প্রচুর অসুবিধা ছিল। এখন সব ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গেছে।

হঠাৎ এক ঝলক আলো পড়ল ওর চোখে। চমকে উঠল। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা গাড়ি আসছে। তার হেড-লাইটে শ্মশান ভূমি আলোকিত হয়ে গেল।

গাড়ি দাঁড়াল পাড়ের উপর। হাতে ছড়ি নিয়ে মিঃ ব্যারাকলউ নামছেন ঢালু বেয়ে টাল খেতে খেতে। ওঁর পা সোজা হয়ে পড়ছে না। বালির উপর চলার সময় তো আরো টলমল করছেন। কিন্তু পড়ে যাচ্ছেন না। সামলে নিচ্ছেন।

মনসারাম কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল—গুড ইভিনিং স্যার। চিতার আগুনে আলো ঠিক্‌রাচ্ছে। তাতেই দেখা যাচ্ছে সাহেবের মুখ উদ্ভাসিত।

খুব উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বললেন—হ্যাল্লো মনসারাম ! ইউ আর মাই সন।

মনসারাম বাউ করে বলল—ক্ষমা করুন স্যার। আমার বাপ ঢালু দাস। মা ছলনা দাসী।

—ওঃ নো-নো। তুমি রাগিনীর ছেলে। আমি তোমাকে পয়দা করেছি।

মনসারাম বুঝতে পারল সাহেব আজ হুঁশে নেই। এখন কথার পিঠে কথা বললেই উত্তেজনা বাড়বে। তাই সে উত্তর দিল না। সাহেব এগিয়ে চললেন। জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রশ আঁকলেন। ঈশ্বরের কাছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করলেন। এটা উনি করেন। যখনই শ্মশানে আসেন তখনই চিতার সামনে দাঁড়িয়ে একটু নীরবতা পালন করেন। তারপর কাজ-কর্মের খবরাখবর নিয়ে চলে যান।

কিন্তু সেদিন গেলেন না। একটা বালির ঢিবিতে বসে পড়লেন। দশ পনেরোজন শবযাত্রী ছিল তাদেরকে কাছে ডাকলেন। সবারই পরিচয় নিলেন। ড্রাইভারকে ডাকিয়ে বললেন—গাড়িতে মদের বোতল আছে। ওদের জন্য এনে দাও।

আঃ। বিলাইতি মাল!

ওরা দারুণ খুশি। বোতলগুলো ভাগ করে নিয়ে তিন-চারজন পুঞ্জ পুঞ্জ-ভাবে বসে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে।

সাহেব মনসারামকে ছাড়লেন না। বললেন—না-না। কাছে এসে বোস। আমি তোমার কাজে খুব খুশি হয়েছি।

মিঃ রজারকে গ্লাসে মদ ঢালতে ইঙ্গিত করলেন। সে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা মনসারামকে দিল।

ও বলল—ক্ষমা করুন স্যার।

—হোয়াই? তুমি কি মদ খাও না?

—তা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু আমার ত মাতাল হলে চলবে না।

—ইয়েস। ইয়েস। উনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘাড় নাড়লেন। তারপর নিজের গ্লাসটা তুলে বললেন—চিয়ার্স। মাই সন।

মনসারাম বলল—স্যার! ডাক্তার সাহেব আপনাকে মদ খেতে নিষেধ করেছেন।

—সো হোয়াট?

—এতে আপনার শরীর খারাপ হবে।

—হ্যাঁ। হবে।

—তবু আপনি খাবেন?

—হ্যাঁ। খাব। বিকেল থেকেই শুরু করেছি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবো না।

—কি বলছেন স্যার ?

—আমাকে বাধা দিও না। আমার ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। এই পবিত্র শ্মশান ভূমিতে জ্বলন্ত চিতার সামনে আমি প্রাণ খুলে কথা বলতে চাই।

মনসারাম চুপ করে রইলো। তার ভয় ভয় করছে।

সাহেব বললেন—আমি আজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। আমার স্ত্রী ও কন্যারা আমাকে ঠকিয়ে যাবতীয় ব্যাঙ্কব্যালেন্স আত্মসাৎ করে নিয়েছে। আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেউলটির পুনরুদ্ধার শুরু করেছি। তার জন্য আমাকে প্রচুর ঋণ নিতে হয়েছে। তা যে কোনদিন শোধ করতে পারবো সে আশা করি না। তখন পাওনাদার বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করবে। আমি ত এক সিকির মালিক। হয়ত সবটাই চলে যাবে দেনা শোধ করতে।

মনসারাম এতকথা জানতো না। সে অবাক হয়ে গেল।

সাহেব নতুন করে গ্লাস ভর্তি করলেন সেই আগের দিনের মত।

বললেন—যাক গে। কিসের জন্য বিষয় সম্পত্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি। ডিভোর্স পাকা করতে বলেছি।

মনসারাম স্বগতোক্তি করল - লর্ড যীশাস ক্রাইস্ট !

—কিন্তু যার উপরে সবচেয়ে বেশি ভরসা ছিল সেও আজ আমাকে পরিত্যাগ করল।

—কে স্যার ?

—কাবেরী ? সে আজ চলে গেছে। তুমি আমার সন্তান। তোমার কাছে বলতে লজ্জা হয়—কিন্তু না বলেও পারি না। ঐ মেয়েটার তুলনা হয় না। তাকে আমি পরের হাতে তুলে দিয়েছি।

বলতে বলতে যেন দম আটকে গেল তেমনিভাবে চুপ করলেন। কয়েকটা ঢোঁক গিলে একটু দম নিয়ে বললেন—আই ড্যাম কেয়ার।

মনসারাম সত্যিই দুঃখিত হল। বলল—আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি বলুন স্যার!

—তুমি ত অনেক কাজ করছ। আমার জীবনের বিরাট কর্তব্য কর্মকে তুমি সফল করে চলেছো। দেউলটির পাতাল পুরীতে এই যে চারশো সতেরোটি মৃতদেহ তাদের অগ্নি সংস্কার হয়ে গেলেই আমার কর্তব্য কর্ম শেষ। তারপর তুমি আমার সমাধি দেবে।

—স্যার !

—আমি খুব ইমোশন্যাল হয়ে পড়েছি - তাই না ? হতে দাও। এ সব কথা বলার সুযোগ আসবে না।

গ্লাসের তলানি পর্যন্ত এক ঢোকে গিলে ফেললেন। মনসারামের মনে

হল এবার ওঁর হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু পারল না। তার দৃষ্টিতে ব্যারাকলউ সাহেব বিরাট ব্যক্তি। অত বড় ব্যক্তিত্বের সামনে কেঁচো হয়ে থাকাই স্বাভাবিক।

সাহেব বললেন—যারা আমার আত্মার আত্মীয় ছিল, বন্ধু ছিল তারা সবাই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আর যাকে জীবনে দুঃখই দিলাম, জেল খাটালাম, অনাহারে দারিদ্র্যে পীড়ন করলাম, যার স্ত্রীকে নিগ্রহ করালাম, তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলাম সেই আজ শ্মশান ভূমিতে আমার দোসর হয়ে রইল। কি বৈচিত্র্য এই জীবনের। মানুষকে চিনে নিতে বড় দেরি হল।

—আমার কথা বাদ দিন স্যার।

—না। বাদ দেব কেন? আমি তোমার কাছে অপরাধী। তোমার কুলি-কামিন ভাইবোনদের কাছে অপরাধী। আমি খুব দুঃখিত।

উনি চুপ করলেন। নেশার প্রভাবে মাথাটা ঝুঁকে পড়েছিল। চোখ দুটি বুজে আসছিল। কথাও জড়িয়ে যাচ্ছিল।

তা দেখে মনসারাম খুব চিন্তায় পড়ে গেল।

সাহেব বললেন—আরো একটা বিরাট ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। ফাকিন টেলার সরিতাকে অপমান করেছে।

ওঁর জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে গেল। কথা জড়িয়ে গেল। ঝুমতে ঝুমতে হাত পা ছড়িয়ে বালির উপর এলিয়ে পড়লেন।

মনসারাম এই আশঙ্কটাই করেছিল। একজন দুর্দান্ত পুরুষের এমন অসহায়, এমন হতমান, হৃত ঐশ্বর্য দশা দেখে ঈশ্বরের অলৌকিকত্বের উপর তার বিশ্বাস আরো গাঢ় হয়ে গেল। কে ভাবতে পেরেছিল মিঃ ব্যারাকলউ একদিন বিলাপ করতে করতে শ্মশান ভূমিতে লুটিয়ে পড়বেন?

বুকে ক্রুশ এঁকে মনসারাম উঠে পড়ল। সঙ্গী সাথীদিকে ডাকতে গিয়ে দেখল তারা সবাই বেহেড মাতাল হয়ে হাসছে, কাঁদছে, দামোদরের বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

তার নিজের মাথাটাও ঝিম্ ঝিম্ করছে। তাতে অবশ্য তার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাবার কথা নয়। সে মিঃ রজারকে ডেকে দুজনে ধরাধরি করে সাহেবকে গাড়িতে লোড করে পানমোহরা বাংলোতে নিয়ে গেল।

সেই রাত্রেই ডাঃ ডেভিডকে ডেকে আনল। উনি দেখেশুনে হতাশ ভঙ্গী করে চিকিৎসা শুরু করলেন।

উনসত্তর

আর দুটো দিন। তারপরই ঘনিয়ে এল তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্ন। হল না

শেষ ইচ্ছার পূরণ। হঠাৎ থেমে গেল দ্রুতগামী ইঞ্জিনের চাকা।

প্রেম-ঘৃণা-দাহকে অতিক্রম করে তিনি চলে যাচ্ছেন জীবনের প্রতি মর্মান্তিক বিতৃষ্ণা নিয়ে। এক কর্মযোগী পুরুষের বিপুল ব্যাপ্ত কর্মযজ্ঞ অসমাপ্ত রয়ে গেল।

তখন গভীর রাত্রি। ঘরের ভিতরে সমস্ত বিজলি বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। চন্দন ধূপের সুগন্ধে সুরভিত ঘরে সারি সারি মোমবাতি জ্বলছে। যীশু খ্রীস্টের বিরাট তৈলচিত্রটি ওঁর চোখের সামনে টাঙানো আছে। মোমের আলোতে অপার্থিব হয়ে উঠেছে সেই দৃশ্যটি।

ফাদার ডাইসনের হাতে পবিত্র বাইবেল। ডাঃ ডেভিড প্রহরীর মত বসে আছেন মিঃ ব্রাউন যেন ভাবলেশহীন মোমের মূর্তি। শিয়রের কাছে মনসারাম ডশ। আজীবন বিদ্রোহী সন্তান জন্মদাতার শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে পুত্রের কর্তব্য পালন করতে।

তার চোখ দুটো ছল ছল করছিল। সে নিজেকে অপরাধী মনে করছিল। অর্ধস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলল—আমি যদি আর একটু সাহস পেতাম। ওঁর হাত থেকে মদের গ্লাস কেড়ে নিতে পারতাম···

মিঃ ব্রাউন বললেন—তাতে এমন কিছু ইতর বিশেষ হত না। যেদিন ওঁর চেক ব্যাঙ্ক থেকে ডিস্‌অনার হয়ে ফিরে এল সেদিনই ওঁর মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তবুও যে এতদিন অদম্য শক্তিতে লড়াই চালিয়ে গেলেন—এটাই আশ্চর্য!

ফাদার ডাইসন বললেন—উনি বিরাট মানুষ। আসুন আমরা ওঁর জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

রাত্রি প্রভাত। পানমোহরা বাংলোর বিরাট বারান্দা লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য চাকর-বাকর, আশ্রিত আশ্রিতা, শ্রমিক কর্মচারী, সাহেব বাবু শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ফুলে ফুলে সুসজ্জিত মৃতদেহ বারান্দায় রাখা আছে দর্শনার্থীদের জন্য। দলে দলে লোক আসছে। ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

কিন্তু যাঁদের সঙ্গে তাঁর জীবন পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল, যাঁদের সহচর্যে তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে হাসি, অশ্রু, বেদনার সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হত—তাঁরা কেউ নেই। জীবনে নিঃসঙ্গতার নিদারুণ যন্ত্রণা মরণের পারে গিয়ে শান্তি পেল, শেষ হয়ে গেল একটা যুগের চরিত্র।

রাঢ় বঙ্গের লাল ধুলোর ডহরে ক্ষীণস্রোতা চঞ্চলা জোড়ে, পাহাড়ী ঝর্ণা সীতানালায়, চাঁপাতলার বনে, বাঘমুড়ি পাহাড়ে, পানমোহরা ডহরের তাল-বীথিতে, দামোদরের উপত্যকা থেকে অজয়ের অববাহিকায় যে দুর্দান্ত ঘোড়

সওয়ার কালো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে খুঁজে বেড়াতেন নুড়ি পাথর, কয়লার স্তর, গ্রস্ত উপত্যকার চ্যুতি তাঁর যুগ শেষ হয়ে গেছে।

চিমনির ধোঁয়ায় যিনি শিল্পবিপ্লবের ছবি দেখতেন, ইঞ্জিনের শব্দে যাঁর হৃৎপিণ্ড চলত, সুমধুর সঙ্গীত শুনতেন ফ্যানের একটানা গোঁ গোঁ শব্দে, ঝোড়া মাথায় কুলি-কামিনের খাদ থেকে ওটাকে যিনি নৃত্যছন্দ মনে করতেন, সারিবদ্ধ কয়লা-কুলির দল হয়ে যেত কালো যবনিকার স্থির চিত্র—তিনি চলে গেলেন।

ঘোড়ার ক্ষুরের টগবগ শব্দে যে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত তা আজ বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তির সুবর্ণযুগে এসে খুঁজে পেয়েছে তৈলশক্তির উদ্দাম গতি। ঘোড়ার যুগের অন্যতম নায়ক প্রস্থান করেছেন।

নতুন যুগ আসছে যন্ত্রশক্তির দানবীয় গরিমা নিয়ে। তার পরিমাপ করতে অশ্বশক্তি নামটাই রয়ে যাবে।

মহাকালের ঘোড়া ছুটছে বিশ্বব্যাপী চড়া-মন্দার বাজার পেরিয়ে, শিল্প-বিপ্লবের দামামা বাজিয়ে, জোয়ার-ভাটার ঢেউ তুলে তুলে। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ইতিহাস এবং সভ্যতা।